# রাজনীতি বিপ্লব কূটনীতি

কাশীকান্ত মৈত্র

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫-২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

পরমারাধ্য পিতৃদেবের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

# ভূমিকা

অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। বর্তমান সম্বন্ধে চিন্তা করতে গেলে আমাদের অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই হবে, অতীতকে ভালভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করতে হবে। তার নিরিখে বর্তমানের মূল্যায়ন করে ভবিষ্যতের লক্ষ্যে পদক্ষেপ স্থির করতে হবে। তেমনি আবার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের কর্মপদ্ধতি ও চিন্তা-ভাবনা সঠিকভাবে স্থির করতে হলে বর্তমানের সঠিক বাস্তব যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অতীতের পর্যালোচনা আমাদের দেশে অপ্রয়োজনীয় বলে ধরে নেবার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। রাজনীতি ও সমাজনীতির ছাত্রদের পক্ষে সেটা মারাত্মক বলে মনে করি। বর্তমান যুগে 'হঠাৎ' যখন একটা বড় ঘটনা ঘটে যায় তখনই অতীতের ইতিহাস ঘেঁটে তার নজীর ও ব্যাখ্যা খুঁজে বার করার চেষ্টা হয়ে থাকে। ইতিহাসের বড় বড় ঘটনাগুলিকে হঠাৎ-ঘটা ও আকস্মিক বলে মনে করার কোন কারণ নেই। ইতিহাসেরও একটা দর্শন আছে। প্রকৃত ইতিহাস-বিশ্লেষণের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু মনের কাছে সেটা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ইতিহাস ব্যাখ্যা ও পাঠ সার্থক হতে পারে না, যদি না সেই সঙ্গে বিভিন্নদেশের ভৌগোলিক অবস্থিতি ও তার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চাপ ও প্রতিক্রিয়া ( geopolitics ) বোঝার চেষ্টা করা হয়। বিশ্ব-রাজনীতিতে বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বজনীনতার নিষ্ঠাবান সমর্থক ভারতবর্ষের মহান ভূমিকা ও 'মিশন' সম্বন্ধে যাঁরা উৎসাহী ও আগ্রহী তাঁদের জন্যই অতীত ইউরোপীয় ইতিহাসের একটি যুগের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছি।

১৯১৭ সালের সফল রুশ-বিপ্লবের পর বিশ্বের বিভিন্ন খণ্ডে যে পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও দুর্বল নিপীড়িতের ক্ষমাহীন রক্তমোক্ষণ চলে আসছিল তার বিরুদ্ধে বিপ্লব ও বিদ্রোহের মশাল প্রজ্বলিত হয়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে—বিশেষ করে ইউরোপে। আর তার পেছনে প্রেরণা সঞ্চারকারী আদর্শ হিসাবে কাজ করেছিল সমাজবাদী গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা এবং বিশেষ করে মার্কস্ ও লেনিনের বৈপ্লবিক আদর্শ ও চিন্তাধারা।

বিশ্ব-বিপ্লব ত্বরান্বিত করার সঙ্কল্প নিয়েই লেনিন ১৯১৯ সালে 'তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' বা কমিণ্টার্ণ ( Third International ) প্রতিষ্ঠিত করলেন।

লেনিনের সেই প্রত্যাশা ও স্বপ্ন কতটা বাস্তবতার মর্যাদা লাভ করেছিল সেটার আঙ্গিকেই এই পুস্তকের আলোচনা শুরু। 'তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' বিশ্ব-বিপ্লবের আদর্শকে রূপ দেবার হাতিয়াররূপে কতটা কাজ করেছে সে আলোচনাও করেছি। 'কমিণ্টার্ণ' কিভাবে 'লেনিনবাদী' স্তালিন ভেঙে দিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী জার্মানীকে পর্যুদস্ত করার সামরিক ও জাতীয় স্বার্থরক্ষার তাগিদে ও সাম্রাজ্যবাদী মিত্রপক্ষের চাপে—সে আলোচনাও করেছি। ইতিহাস কতটা রাজনৈতিক দলের দর্শন ও তত্ত্বের কচকচি অনুসরণ করে চলে, আর রাজনৈতিক-সামাজিক দর্শন ও বিপ্লবী উন্মাদনাসৃষ্টিকারী নিছক দার্শনিক তত্ত্ব ( Polemics ) জাতীয়-সামরিক-আমলাতান্ত্রিক স্বার্থের তল্পীবাহক হিসাবে কতটা কাজ করে থাকে সেটাও ইতিহাস বিশ্লেষণ থেকে ধরা পড়ে যায়। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় ভক্তিবাদের কোনই স্থান নেই। সত্য বাস্তব তথ্যগুলি নির্ভীকভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। লেখকের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একমত হবার কোনই প্রশ্ন নেই—কিন্তু পাঠকবর্গকে সেই তথ্যগুলির ভিত্তিতে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে পৌছুতে হবে।

জাতীয় সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, নিজ নিজ জাতীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-ভাবধারা মনীষা অনুযায়ী নিজ নিজ দেশকে গড়ে তোলার অধিকার—এই সব কথা ও তত্ত্বগুলি বুর্জোয়া অভিধানের বিশেষত্ব মনে করা চরম মূঢ়তা। 'সাচ্চা' সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জাতীয় অভিধানে এইসব কথাগুলি আজও বিশেষভাবে অলঙ্কৃত ও সমাদৃত—মার্কসীয় তত্ত্বে এগুলো একেবারে বস্তাপচা বুর্জোয়া-গন্ধী বলে নিন্দিত হওয়া সত্ত্বেও। ভারতবর্ষে রাজনীতির সিরিয়াস ও চিন্তাশীল ছাত্রদের জাতীয় ঐতিহ্য মনীষা, সংস্কৃতি—জাতীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে সর্বপ্রযত্নে যে কোন মূল্যে রক্ষা ও লালন করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করার সময় এসেছে। এইসব তত্ত্বকথাগুলি পুঁথি পড়ে হৃদয়ঙ্গম ততটা করা যায় না, যতটা ঐতিহাসিক ঘটনার আঙ্গিকে করা যায়। আন্তর্জাতিক ঘটনা-পরম্পরার পরিপ্রেক্ষিতেই আমি ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কালের আলোচনা উপস্থিত করেছি। ধ্বংস, রক্তস্নান, জাতির উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ইতিহাস বার বার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য',—প্রমাণ করে দিয়ে গেছে বড় বড় মহৎ আদর্শের বুলি দিয়ে সম্প্রসারণবাদী হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির মোকাবিলা করা যায় না, শুধু 'আইডিয়া'—নিছক আদর্শবাদ দিয়ে রাইফেল-কামান-বোমারু বিমানের গর্জনকে স্তব্ধ করে দেওয়া কখনই যায় না,—যেমন শুধু কামান-রাইফেলের গর্জন দিয়ে কখনই

কোন 'আইডিয়া' বা আদর্শের অভিযানকে রোখা যায় না। চাই মহৎ আদর্শবাদ ও 'আইডিয়ার' অবলম্বন, আর সেই 'আইডিয়া', মহৎ স্বপ্ন, উন্নত-মার্গী জাতীয় সাধনার দুর্গকে রক্ষা করার জন্য সদাজাগ্রত সচেতন উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন নির্ভীক রাইফেলধারী অগণিত নাগরিক-সৈনিকের সযত্ন প্রহরা। শোষণ-দারিদ্র্য-অবিচারমুক্ত ভারতবর্ষ গড়ে তোলার স্বপ্ন যে তরুণের দল দেখেছেন তাঁদের সামনে সেই দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরা আমার কর্তব্য—সেই চেতনা আমার লেখার পেছনে কাজ করেছে বলেই নিচ্ছি সে-কথা।

এই পুস্তকে হিটলার-স্তালিন দোস্তি বা নাৎসী জার্মানী-কমিউনিস্ট রাশিয়ার অনাক্রমণ মৈত্রীচুক্তি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রূপে তার বিস্তৃত আলোচনা করেছি। আর সেই মারাত্মক কূটনীতির পটভূমিতে ইউরোপীয় বিপ্লবের তথা বহু প্রচারিত 'সর্বহারাদের আন্তর্জাতিকতাবাদের' অপমৃত্যু ঘটেছে।

কূটনীতিকে কূটনীতির দৃষ্টিতে যেন দেখা হয়। কূটনৈতিক সখ্যতা বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক মৈত্রীর ওপর ভাবালুতা ও আবেগের আস্তরণ চড়িয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করার চেষ্টাকে সচেতনতার সঙ্গে প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তা ভুললে চলবে না। এ প্রচেষ্টা উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবেও হতে পারে, আবার সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে এই ধরনের মানসিকতা একটা জাতিকে পেয়ে বসতে পারে। বিদেশী রাষ্ট্রীয়-স্বার্থের তল্পীবাহী স্বার্থান্ধ রাজনীতিবিদ ও তোষামোদকারী আমলারা সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে জাতীয় জীবনে অঘটন ঘটিয়ে দিয়ে থাকেন। বুদ্ধিজীবির ধর্ম সে সম্বন্ধে সজাগ থাকা। কূটনৈতিক মিতালি সাময়িক স্বার্থের আন্তঃরাষ্ট্রীয় মালাবদল ও আদর্শের মিতালি বা 'আইডিয়ার' পার্টনারশিপের মধ্যে যে পরিষ্কার সীমারেখা বিদ্যমান সেটা যেন বুঝতে ভুল না হয়। ভারতের সঙ্গে সদ্য-সম্পাদিত রাশিয়ার বিশ বছর মেয়াদী মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তিকেও যেন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। এই ধরনের চুক্তি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অতীতে অনেকবার হয়েছে। সেগুলো কতটা কার্যকরী হয়েছে তাও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছি। এখানেও তাই কোন ভাবালুতা বা কোন প্রকার আবিল সৃষ্টির অবকাশ নেই। যাঁরা সেই চেষ্টা করবেন তাঁদের সম্বন্ধে সজাগ থাকাই জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রীর কর্তব্য। কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের ১৯৫৪ সালের 'মিত্রতা কী যাত্রার' বা 'পঞ্চশীলের' ঘটনাকে কূটনৈতিক ঘটনারূপে না দেখে অন্ধ মোহসৃষ্টিকারী আবেগের আতিশয্যে সেই কূটনৈতিক কার্যকে রাতারাতি ভাতা-পুষ্ট পরাশ্রিত বুদ্ধিজীবী, একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও খানা-পিনা-খুশি

কিছু সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিরামহীন প্রচারে 'হিন্দি চীনি ভাই ভাই' তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছিল। আর শেষ পর্যন্ত তার কি খেসারত দিতে হয়েছিল গোটা দেশকে—সেটা বার বার আত্মবিস্মৃত জাতির স্মরণ করার প্রয়োজন আছে। একটি রাষ্ট্র আর একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বন্ধুত্বের জন্য হাত বাড়াবে সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু তার জন্য ভাই-ভাই তত্ত্ব প্রচার করে নাটুকেপনার প্রয়োজন থাকে কি? বন্ধুর সঙ্গে চোখে চোখ রেখেই হাত মেলাতে হয়। এও ইতিহাসের অন্যতম শিক্ষা।

আমার এই পুস্তকে ইউরোপীয় ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে অনিবার্যভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলোচনা করেছি—অবশ্য গোটা বিশ্বযুদ্ধের নয়।

ইউরোপের রাজনীতিতে ফ্যাসিবাদের—ইতালীয় ও জার্মান ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের পটভূমি ও কারণ নিয়ে আলোচনা করেছি। যে-ফ্যাসিবাদের নিন্দায় মার্কস্‌বাদীরা তথা কমিউনিস্টরা মুখর—ইউরোপীয় ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে তাকে মার্কস্-লেনিনের মন্ত্রশিষ্য স্তালিন 'matter of taste and convenience' বলে বর্ণনা করেছিলেন। জার্মানী ইতালীর 'বিশেষ রুচি ও জাতিগত সুবিধা' বলে যে তন্ত্র ( Ism ) বিবেচিত—বিশ্ব-বিপ্লববাদী বলশেভিকদের ও বিশ্ব-বিপ্লব তথা সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের হাতিয়ার কমিণ্টার্ণের তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই! ১৯৪১ সালের ২১শে জুন যখন মৈত্রীচুক্তি পদদলিত করে বিশ্বাসঘাতকের মত নাৎসী জার্মান সেনাবাহিনী রাশিয়ার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল তখনই আবার আবিষ্কৃত হল ফ্যাসিবাদের মানবতা ও সভ্যতাবিধ্বংসী চরিত্রের কথাটা। আর যে-জার্মানীতে সে যুগের শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক সংবিধান—হ্বাইমার সংবিধান ( Weimar Republic ) রচিত হয়েছিল সেখানে সেই গণতান্ত্রিক সংবিধানকে অবলম্বন করেই—গৃহযুদ্ধের পথে আদৌ নয়—হিটলার ও তাঁর সৃষ্ট ন্যাশন্যাল সোস্যালিস্ট পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই ইতিহাস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছে বড় বড় গালভরা, মনের-পরিতৃপ্তিকারী বাছা-বাছা প্রগতিগন্ধী শব্দে ও অনুচ্ছেদে ( Articles ) ঠাসা গণতান্ত্রিক সংবিধান গণতন্ত্রের প্রকৃত নির্ভরযোগ্য গ্যারাণ্টি নয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার উপযোগী সংগ্রামী আদর্শবাদী নাগরিক সৃষ্টি করা চাই, যাঁরা গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপ দিতে পারেন। চাই গণতন্ত্রের প্রতি—সাংবিধানিক প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ, সাম্য মৈত্রী অর্থনৈতিক সামাজিক ন্যায়-বিচার তথা অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতি প্রচণ্ড আবেগ।

গণতন্ত্রের প্রতি আবেগ ও শ্রদ্ধাবিহীন জনগণ প্রজাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোর সহায়ক হয় না। 'A republic without passion for republicanism'—হ্বাইমার প্রজাতন্ত্রের এই ছিল আসল রূপ। জার্মানীতে সমাজতন্ত্রীরা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পেছনে সেই আবেগ আদৌ সৃষ্টি করতে পারেননি। সমাজতন্ত্রীরা বহুলাংশে মার্কস্-লেনিনের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন।

তাঁদের মধ্যে পুরাতন এক তর্ককে কেন্দ্র করে নিজেদের লক্ষ্য সম্বন্ধে ও সেই লক্ষ্য রূপায়ণের পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল: 'Social change first—democracy next.' Vs. 'Democracy first—social change next.' অর্থাৎ 'সামাজিক পরিবর্তন আগে তারপর গণতন্ত্র-বনাম-গণতন্ত্র সর্বাগ্রে তারপর সামাজিক পরিবর্তন' এই নিয়ে তর্ক চলেছিল সমগ্র ইউরোপে।

গণতন্ত্র সম্বন্ধে সমাজতন্ত্রীদের একটি বড় অংশের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল মূলত কৌশলগত। সমাজতন্ত্রীরা এই সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেননি। নাৎসী দল এই মানসিকতার সুযোগ নিতে ছাড়েননি। হিটলার ও তাঁর অনুগামীদের গণতন্ত্রের প্রতি কোন অনুরাগের বাষ্পমাত্রও ছিল না। সামাজিক পরিবর্তনের অগ্রাধিকার-তত্ত্বের আড়ালে তাঁরাও তাদের সংগঠনকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। ইউরোপের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের বামপন্থী বলে কথিত দলগুলির ও সকল জাতীয়তাবাদী দলগুলির গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করা একান্ত প্রয়োজন। হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি ও পরম অসহিষ্ণুতার কি পরিণাম হতে পারে সেটা গভীরভাবে ভাববার সময় এসেছে প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মীর।

মার্কস্‌বাদী ভাবধারার প্রভাবে ইউরোপের সমাজতন্ত্রীরা জাতীয়তাবাদ ও প্রতিরক্ষা নীতি সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত ছিলেন। 'জাতীয়তাবাদ'কে একটি 'প্রতিক্রিয়াশীল' শক্তিরূপে মনে করার মাশুল কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হয়েছে তাঁদের। জাতীয়তাবাদ বর্তমান বিশ্বে অন্যতম মূল চালক শক্তি। 'দেশপ্রেম' একটি মহৎ মূল্যবোধ। জাতীয়তাবাদকে সামরিক স্বার্থ বা বিশেষ স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়াররূপে ব্যবহার করা এক জিনিস, আর তাকে জাতি গঠনের কাজে স্বাভাবিক সহজাত ভিত্তিরূপে অবলম্বন করা অন্য আর এক জিনিস। জাতীয়তাবাদ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদ নয়। শুধু জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করে দেশ গড়া যায় না। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়-বিচারকে, অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে সংযোজিত করা একান্ত প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদী ভাবধারা—সামাজিক ও গণতান্ত্রিক মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে

সমন্বিত না হলে জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ পরিগ্রহ করে সম্প্রসারণ-ধর্মী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক দল ও তার নেতা-কর্মীদের মনে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুন্দর স্বপ্ন, দুঃখ-গ্লানি প্রতিফলিত হওয়া চাই। দলের শিকড় প্রোথিত থাকা চাই দেশের মাটির গভীরে। তা না হলে দেশের জনগণ সেই দলকে আপন বলে মনে করতে পারেন না। দেশকে অন্তর দিয়ে গভীরভাবে ভালবাসার কোন অর্থ ই হবে না, যদি না দেশের অবহেলিত শোষিত অসহায় জনগণকে শোষণ-অবিচার বৈষম্য-নৈরাশ্যের গ্লানি থেকে মুক্ত করার স্বতঃপ্রণোদিত নিরলস আন্তরিক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। আবার দেশপ্রেম সার্থক হতে পারে না, যদি রাজনৈতিক দল সেই দেশকে—তার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে—সুনিশ্চিত করার জন্য দেশের সার্বিক প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় না করে। ইউরোপের সমাজতন্ত্রীরা এদিকটাও অবহেলা করে এসেছেন। মস্কো-নিয়ন্ত্রিত 'তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের' সঙ্গে সংযুক্ত ( affiliated ) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা নিজ নিজ দেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে দুর্বল করে রাখতেই চেয়েছিলেন, কেননা, সেটাই ছিল তাঁদের রণকৌশল। কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা কোন্ যুক্তিতে যে নিজের দেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার অত্যাধুনিকীকরণ ও সুদৃঢ়ীকরণের কাজে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন তা বোধগম্য নয়। ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীদের ধোঁয়াটে কল্পনা, স্বপ্নবিলাস ও প্রগতিবাদীতার নামে বাস্তব-বিমুখতা যে শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল—সে সময় বিভিন্ন দেশের দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসে। প্রকৃতি কখনও শূন্যতা বরদাস্ত করে না। ভারতবর্ষে একমাত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ ও গণতন্ত্র এই নীতিত্রয়ের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করে শক্তিশালী ষড়ৈশ্বর্যশালী আধুনিক জনকল্যাণবাদী রাষ্ট্র গড়ে তোলার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রেখেছিলেন। ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে ধার-করা চিন্তাধারা দিয়ে ভারতবর্ষকে গড়তে তিনি চাননি। ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মনীষাকে অবলম্বন করে জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার অনুকূলে সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করে গেছেন। সেই পথেই সমাজের নানাবিধ বাধা ঠেলে ঠেলে আমাদের এগুতে হবে।

জাতীয় স্বাধীনতা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, গণতান্ত্রিক অধিকার ও মূল্যবোধগুলি রুটি-মাখনের-দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শেখানোর পরিণতি মারাত্মক হতে বাধ্য। জড়বাদী আদর্শ বা দর্শন ( Materialist philosophy ) মানুষকে আত্মসুখ চরিতার্থ সাধনের পথেই উৎসাহিত করে। আদর্শবাদী ভাবধারা ও চেতনাই মানুষকে সর্বোচ্চ ত্যাগের পথে উৎসাহিত করতে পারে।

শুধুমাত্র বর্ধিত বেতন, মাগগীভাতা, বর্ধিত বোনাস, ক্রমবর্ধমান জীবিকার মানোন্নয়নের মানদণ্ডেই সমাজতন্ত্রের পরীক্ষার্ সার্থকতা যাচাই-এর দৃষ্টিভঙ্গী ভ্রান্ত। সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। যে কোন স্বাধীন দেশই উন্নত জীবনের মান ও বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিরলস চেষ্টা করবে—বৈষম্য দূর করতে ও সমতা প্রতিষ্ঠিত করতে তাকে উদ্যোগী হতে হবে। কিন্তু সমতা, সামাজিক ন্যায়-বিচারের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমজীবিদেরও কঠোর শ্রম, শৃঙ্খলা ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সমাজতন্ত্রেরও একটা ভাববাদী মূর্তি সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন, যা মানুষকে নিঃস্বার্থপর নির্লোভ আচরণে উদ্বুদ্ধ করবে, মানবতাবাদী হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করবে।

সামাজিক ন্যায়-বিচার, সাম্য ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে পরিহার করে তাকে পঙ্গু রেখে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পরীক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আবার রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে বর্জন করে সমাজতন্ত্রের পরীক্ষার সার্থকতা সম্বন্ধে ইতিহাসের রায়ও নির্মম এবং সুস্পষ্ট। চীন ও রাশিয়ায় বৈষয়িক উন্নয়ন যথেষ্ট হয়েছে নিঃসন্দেহে—কিন্তু সে-সব দেশের নাগরিকরা—বুদ্ধিজীবিরা আবার রাজনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। বিশ্ববিশ্রুত রুশ পদার্থবিজ্ঞানী সাখারভের প্রতিবাদ-বিদ্রোহ কি এ যুগের সমাজতন্ত্রী ও বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ নয়? নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক সলঝেনিৎসিনের বিদ্রোহ তো অন্ধকারের নায়কদের বিরুদ্ধেই। রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সাধনা ও প্রয়াস নিরলসভাবে চালিয়ে যেতে হবে যুগপৎ। একটি অপরটির ওপর অনিবার্যভাবে নির্ভরশীল। ভারতবর্ষকে সেই নূতন পথে সাহসের সঙ্গে এগুতে হবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই বলিষ্ঠ পথের সন্ধান দিয়েছেন ভারতবাসীকে। ইউরোপের সমাজতন্ত্রীদের ও মার্কস্‌বাদীদের 'অগ্রাধিকার তত্ত্বের' ভ্রান্তিজালে জড়াবার বিপদ সম্বন্ধে এদেশের জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের সজাগ হতে হবে। প্রচলিত শাসনব্যবস্থার স্থিতাবস্থার (status quo) বিরুদ্ধে যে-বামপন্থীরা সোচ্চার হতে চান তাঁদের বুঝতে হবে পূর্ণ রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক উদারনৈতিকতা ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অসম্ভব। মহামতি লেনিন নিজেও একথা একসময় স্বীকার করেছিলেন। [ **"Whoever approaches socialism by any other path than that of political democracy will inevitably arrive at absurd conclusion."—Lenin** ] কিন্তু লেনিনের পরবর্তী আচরণ এই মৌল বক্তব্যের বিরুদ্ধেই গিয়েছিল। প্রকৃত

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পূর্ণ রাজনৈতিক গণতন্ত্রের গ্যারান্টি না থাকলে দেশের জনগণ একপার্টি শাসনের লৌহহস্তের বজ্রমুষ্টির পেষণে নিষ্পেষিত হয়। ভারতের জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীলদের এই মহাসমন্বয়ের নূতন পথেই এগুতে হবে। মহারাত্রির তপস্যা কি রুশ ও চীনের অপ্রয়োজনীয় নকল সংস্করণ-রূপে ভারতবর্ষকে গড়ে তোলার জন্যই ? যে কোন দেশভক্ত, দেশব্রতী ও দেশহিতৈষী এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করবেন।

আমাদের দ্রুতবেগে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য এগিয়ে যেতে হবে—কোটি কোটি শোষিত বঞ্চিত মানুষকে শোষণ অবহেলা বঞ্চনার হাত থেকে মুক্ত করতেই হবে। আর সেই দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের জন্য (social changes) চাই পূর্ণ রাজনৈতিক গণতন্ত্র। আর পূর্ণ রাজনৈতিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব-কথা অর্থহীন গালভরা প্রলাপ, রাজনৈতিক ধোঁকা বলেই বিবেচিত হবে —যতদিন কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যের জ্বালায় জর্জরিত থাকবে। ভারতবর্ষ অন্য কোন সমাজতান্ত্রিক দেশকে মডেলরূপে অনুকরণ করলে কোন শুভ ফল হবে না। স্বাধীনভাবে নূতন সমন্বয়ের পথ ধরে গ্রহীষ্ণু মন নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে নির্ভয়ে। কোন বিপ্লবী আন্তর্জাতিক মতবাদের সঠিক ব্যাখ্যা বা তার একমাত্র সাচ্চা ধারক ও বাহকরূপে কোন দেশ পৃথিবীতে কোন ছাড়পত্র নিয়ে আসেনি। এই ধরনের কোন দাবীকে কোন সমাজতন্ত্রী মেনে নিতে পারেন না। এর পরিণতি কি হতে পারে—অতীতে কি পরিণাম হয়েছে সেটা আলোচনা করেছি। যে-বিশ্ববিপ্লব ত্বরান্বিত করার জন্য 'তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের' জন্ম হয়েছিল—সেই বিশ্ব-বিপ্লবের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করার জন্য ছলনা কূটনীতি জাতিরাষ্ট্রের (Nation state) রাষ্ট্রীয়-স্বার্থের যূপকাষ্ঠে সেই আন্তর্জাতিক সংস্থাকে বলি দেওয়া হয়েছিল। কোন সমাজবাদী—জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীশক্তি—জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের শক্ত জমির ওপর না দাঁড়াতে শিখলে কি পরিণতি হতে পারে ইতিহাসের ছাত্রদের সেটা জানা দরকার। অভিজ্ঞতার আলোকে তত্ত্ব-কথাগুলি বিচার ও বিশ্লেষণ করা দরকার। ভারতবর্ষ বিশ্বসৌভ্রাতৃত্বের সাধনা করেছে স্মরণাতীত কাল থেকে; বিশ্বজনীনতাবোধ ভারতের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চিন্তার অন্যতম মূল স্তম্ভ—বিশ্ব-মানবের ভবিষ্যতের সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা। তাই দেশভক্ত জাতীয়তাবাদীদের আন্তর্জাতিকতার আদর্শের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকা হবে চরম মূঢ়তা। কিন্তু দেশপ্রেম-জাতীয়তাবাদের শক্ত জমির ওপর দাঁড়িয়েই আন্তর্জাতিকতার স্বপ্ন দেখতে হবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই স্বপ্নই

দেখেছিলেন। লেনিন, মাও সে তুঙ্-ও সেই দেশপ্রেমের শক্ত জমির ওপর দাঁড়িয়ে নিজ নিজ দেশে সমাজতন্ত্রের মঞ্জিল তৈরীর সাধনা করেছেন। সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদকে একটা মৌল নীতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন বলেই কোন সর্পিল কূটনীতির আড়ালে তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারাকে দাঁড় করানোর প্রয়োজন কোনদিনই হয়নি। প্রতিটি 'সমাজতান্ত্রিক' দেশ রাশিয়া-চীন-কিউবা-যুগোশ্লোভিয়া-আলবেনিয়া-পোল্যাণ্ড নিজ নিজ দেশকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে সচেষ্ট। চীনের বিপ্লবের মধ্যে চীনের সর্বত্যাগী মহান নেতা মাও সে তুঙ্ 'Chineseness'—'চীনের নিজস্বতা-স্বকীয়তাকে' তুলে ধরেছেন তাঁর দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে। মার্কস্‌বাদকে তিনি 'চৈনিক' রূপ দিতে বদ্ধপরিকর। ভারতের সমাজতন্ত্রীরা, জাতীয়তাবাদীরা ভারতের সমাজতন্ত্রের মধ্যে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য দান করার চেষ্টা করলে, ভারতের ঐতিহ্য-মনীষা-সংস্কৃতির পরিপূরক ও সহায়করূপে ভারতীয় সমাজতন্ত্রকে, ভারতীয় সাম্যবাদী ভাবধারাকে নিজস্বতা ও স্বকীয়তার প্রতিমূর্তিরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলে সেটা নিন্দনীয় হবে কোন্ যুক্তিতে?

সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ চিরদিনই সজাগ। সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শোষণকারীরা উর্দিপরা বন্দুকধারী সৈন্য ও বণিকের পণ্যবাহী জাহাজ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পতাকার আড়ালেই শুধু শোষণ চালায় না। এ যুগে মতবাদের আড়ালে সামরিক সাহায্যের অজুহাতে দুর্বল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা খর্ব ও হরণের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। মতবাদ-সচেনতা রাজনৈতিক কর্মীর ও নেতার অন্যতম ধর্ম। নিজের মতবাদের প্রতি যাদের কোন শ্রদ্ধা নেই, আত্মবিশ্বাস নেই—অপরের মতবাদকে নির্বিচারে শ্রদ্ধা জানাতে পারেন তাঁরাই। একটি শক্তিশালী দেশকে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ প্রশ্নে বা ইস্যুতে সমর্থন করার অর্থ সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় মতবাদকে কুর্নিশ করা নয়। কোন শক্তিশালী দেশের সহযোগিতা বা বন্ধুত্বের সর্ত কখনই সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় মতবাদকে সমর্থন হতে পারে না। নূতন ধ্যানের ভারতবর্ষ যাঁরা গড়তে চান তাঁরা এ বিষয়ে যেন সদা সচেতন থাকেন। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে হীনমন্যতার বশে অন্য দেশকে অনুসরণ ও অনুকরণের মানসিকতা নিষ্ফল ভিক্ষুকতারই নামান্তর। নিজের আদর্শের প্রতি যেমন অবিকম্প শ্রদ্ধা, আবেগ থাকা চাই—তেমনি সঙ্গে সঙ্গে শক্তির সাধনা অব্যাহত রাখা চাই। চীন ও রাশিয়ার পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষনীয় অনেক কিছু রয়েছে। খোলা মন নিয়ে তার মূল্যায়ন দরকার। দুটি 'সমাজতান্ত্রিক' দেশ পরস্পরকে

'এক নম্বর শত্রু' বলে মনে করছে এবং দুই দেশই অবিশ্রান্ত যুদ্ধ-প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে।

দুই সমাজতান্ত্রিক দেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আজ পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। 'সমাজতন্ত্র' কায়েম হওয়া সত্ত্বেও দুই সমাজতান্ত্রিক দেশে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অবিশ্রান্ত সমর-প্রস্তুতি চলেছে কেন? সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে? সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্ব কোন্ দেশের হাতে থাকবে এই তর্ককে কেন্দ্র করে? কোন বিপ্লবী তত্ত্বকথাকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধ-প্রস্তুতি, না এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা 'বড়দাদা' ( Big brother ) হয়ে প্রভুত্বের চাবিকাঠি কার হাতে তাই নিয়ে? জোট-নিরপেক্ষ ভারতবর্ষকে তার জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা স্বয়ম্ভর করার কাজে হাত লাগাতেই হবে। সামাজিক ন্যায়বিচার-ভিত্তিক বাস্তববাদী জনকল্যাণধর্মী অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার আধুনিকীরণ ও সুদৃঢ়ীকরণ কখনই পরস্পর-বিরোধী নয়—ইতিহাসের এই শিক্ষা বিস্মৃত হলে সর্বনাশকে আমন্ত্রণ জানান হবে।

বিপ্লবের জন্য চাই দেশমাতৃকার জন্য বলি-প্রদত্ত উৎসর্গীকৃত নির্লোভ সন্ন্যাসীর দল। পৃথিবীতে যুগে যুগে যাঁরাই বিপ্লবের, সামাজিক পরিবর্তনের দীপবর্তিকা হাতে নিয়ে এসেছেন তাঁরাই ছিলেন নির্লোভ নিঃস্বার্থপর মহৎ চরিত্রের, উৎসর্গীকৃত সন্ন্যাসীর সমতুল্য। ভোগবাদী দর্শন, জড়বাদী চিন্তাধারা তাঁদের প্রেরণা জোগায়নি। প্রত্যেক দেশেই যুগে যুগে একদল মানুষ এগিয়ে আসবেন বিপ্লবী আদর্শ নিয়ে স্থিতাবস্থার অচলায়তনকে ভাঙবার জন্য। যে দেশে তরুণের দল বুদ্ধিজীবির দল বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন না সে দেশে প্রগতিশীল প্রাক্-বিপ্লবী শাসনকারী দল নূতন কায়েমী স্বার্থ, প্রচলিত ব্যবস্থা ও একচেটিয়া ক্ষমতার প্রতিভূ ও রক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। এদেশের নিঃস্বার্থপর আদর্শবাদী চরিত্রবান বেপরোয়া তরুণ ও বুদ্ধিজীবির দল বঞ্চিত দরিদ্র শোষিত কোটি কোটি মানুষের চোখের জল মোছাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবেন—অন্যায় অসাম্য-অবিচারের বিরুদ্ধে শানিত ও সংস্কৃত উন্মুক্ত চেতনা নিয়ে নিরলস সংগ্রাম করে যাবেন,—দুর্বিনীত ও ক্ষমতাবানের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে ধৃতাস্ত্র হয়ে দুর্বল ও অক্ষমের পক্ষ নেবেন, কূটনীতিবিদদের ছলনা ও চালাকিতে বিভ্রান্ত হয়ে আদর্শকে জলাঞ্জলি দেবেন না। বৃহৎ শক্তিদের ভ্রূকুটি ও অস্ত্রের জোরে গোটা দুনিয়াকে ভাগাভাগি করে পদানত করার রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁরা দাঁড়াবেন। তাঁরা—কি আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে—কি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে—অন্যায়কে

বিনা প্রতিবাদে সহ্য করা অন্যায় কাজ করারই সমতুল্য জ্ঞান করবেন। রাজনীতি তাঁদের কাছে আদর্শ-নিরপেক্ষ মূল্যবোধ—রিক্ত হবে না কখনই। ম্যাকিয়াভেলীর কূটনীতি তাঁদের জীবনের মূল বা শেষ কথা বলেই গণ্য হতে পারে না। সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রী ও ন্যায়-বিচার—যা মানুষের জন্মগত অধিকার তা হরণের যে কোন চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাঁরা থাকবেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁরা বলবেন ঃ

'সদা লেখা থাকে প্রাণে
তুমি যা দিয়েছ মোরে অধিকার ভার
তাহা কেড়ে নিতে দিলে
অমান্য তোমার।'

শেষ করার আগে এই পুস্তকের প্রকাশক 'রবীন্দ্র লাইব্রেরী'র শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা—এই পুস্তক প্রকাশনের জন্য। প্রকাশক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই পুস্তক প্রকাশনের আগ্রহ না দেখালে এই বই লেখা হয়ে উঠত না। আর ধন্যবাদ জানাই স্নেহভাজন পার্থসারথি বসুকে।

**কাশীকান্ত মৈত্র**

# বিষয়-সূচী

# ॥ গ্রন্থারম্ভ ॥

## ১

## রুশ বিপ্লব, তৃতীয় আন্তর্জাতিক ও বিশ্ববিপ্লব-প্রস্তুতি

১৯১৭ সালের অক্টোবরে বলশেভিক দল রাশিয়ায় ক্ষমতা দখলের পর থেকেই বিশ্ববিপ্লব ত্বরান্বিত করার কাজে হাত দিয়েছিলেন। মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম সূচনা হওয়ার কথা অতি শিল্পোন্নত জার্মানীতে। কিন্তু মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক জড়বাদী ব্যাখ্যা ও ডায়লেকটিকের নিয়ম লঙ্ঘন করে অনুন্নত, অনেক পিছিয়ে থাকা রাশিয়াতেই সেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সূচিত হল সর্বপ্রথম।

এর কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে শুধু একা লেনিনেরই প্রাপ্য নয়। অত্যাচারী জারতন্ত্রের অসহনীয় শোষণ, অবিচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে গোটা দেশই এই জাতীয় বিপ্লবের পেছনে সামিল হয়েছিল। এ কোন বিশেষ দলের বিপ্লব নয়—বিশেষ শ্রেণীরও বিপ্লব নয়। এ ছিল সকল অর্থে জনগণের খাঁটি জাতীয় বিপ্লব। একজন উদারপন্থী অধ্যাপক লিখেছিলেন ঃ

"This revolution is unique. There have been bourgeois revolutions and proletarian revolutions but I doubt there has ever been a revolution so turly national in the widest sense of the trem, as the present Russian one. Everyone 'made' this revolution, everyone took part in it—the proletariat, the soldier, the bourgeoisie, even the nobility—all the social forces of the land" ( Professor Eugene Trubetskoy )

সফল বিপ্লবের জন্য যে যে উপাদান ও বাস্তব ও মানসিক পরিবেশ প্রয়োজন ( objective and subjective ) রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্রে তা ছিল। এই বিপ্লবের পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ উপযোগী। বাস্তব ও মানসিক পরিবেশের এরূপ বিরল মিলন বড় একটা ইতিহাসে ঘটে না। লেনিন দিয়েছিলেন অসাধারণ নেতৃত্ব। কিন্তু একথাও সত্য অধিকাংশ বলশেভিক নেতাই বিপ্লবের সময় রাশিয়াতে ছিলেন না। লেনিন রাশিয়ায় ফিরে আসেন ১৯১৭ সালের এপ্রিল

মাসের মাঝামাঝি। ট্রট্স্কি দেশে ফিরে আসেন তারও প্রায় একমাস পরে। ১৯১৭ সালের মার্চ থেকে ১৯১৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত (পুরাতন পঞ্জিকা মতে ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবর) বিপ্লব-যুগটিও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ বলা হয়ে থাকে। বলশেভিকরা এই বিপ্লবকেই 'নভেম্বর বিপ্লবের' উপক্রমণিকা বলে প্রচার করে থাকেন। কিন্তু ঘটনা হিসাবে সেটা সত্য নয়। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর যে রাশিয়া জন্ম নিল লেনিন ২০শে এপ্রিল তারিখে (১৯১৭) এক ঘোষণায় তাকে "বিশ্বের সর্বাপেক্ষা স্বাধীন রাষ্ট্র" বলে অভিহিত করেছিলেন ("Freest country in the world")। আবার সেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যেই 'নভেম্বর বিপ্লবের' নেতৃত্ব তিনিই দিলেন।

১৯১৭ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার সকল বলশেভিক নেতাই বিশ্বাস করতেন ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লব সাধিত না হলে রাশিয়ার সমাজতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়বে। ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ ব্রেস্ট লিটোভস্ক চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন, "This is a lesson to us because the absolute truth is that without a revolution in Germany we shall perish" অর্থাৎ এই চুক্তিটি আমাদের কাছে একখণ্ড শিক্ষা। কেননা এ এক চরম সত্য যে, জার্মানীতে বিপ্লব না হলে আমাদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবে। ঐ একই বছর ২৩শে এপ্রিল তিনি আবার বললেন:

"Our backwardness has thrust us forward, and we shall perish if we are unable to hold out until we meet with mighty support of other countries"

তিনি আরও বললেন সাম্রাজ্যবাদ ও সফল সোভিয়েট বিপ্লবের সহাবস্থান অসম্ভব। দুয়ের সংঘর্ষ অনিবার্য—শেষে বিজয়ী হিসাবে একটি পক্ষকেই টিকে থাকতে হবে। তাই বিশ্ববিপ্লব ত্বরান্বিত করার কাজে নূতন বিপ্লবী সরকার (Sovnarcom) ২৪শে ডিসেম্বর (১৯১৭) ২০ লক্ষ রুবল বরাদ্দ করলেন। (Soviet of Peoples' Commissars-এর সংক্ষিপ্ত রুশ নামকরণ Sovnarcom) পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনে সাহায্য করার জন্যে এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়। লেনিন, ট্রট্স্কী, বলচ্ব্রুয়েভিচ প্রভৃতি ইজভেস্তিয়া পত্রিকায় এক স্বাক্ষরিত নির্দেশনামায় ঘোষণা করে বললেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বামপন্থী অংশকে অর্থ দিয়ে এবং অন্য নানাভাবে সাহায্য করা তাঁরা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করছেন। যে সব দেশে এই ধরনের বাম

আন্দোলনকে এইভাবে প্রত্যক্ষ মদত্ দেওয়া হবে সেইসব দেশ রাশিয়ার বন্ধু, কি শত্রু, কি নিরপেক্ষ তা নিয়ে রুশ সরকার আদৌ মাথা ঘামাবে না।

"...to come to the aid of the Left Internationalist wing of the working class movements of all countries with all possible resources including money, quite irrespective of whether these countries are at war or in alliance with Russia or whether they occupy a neutral position".

[ David Shub : Lenin ]

মনে রাখা দরকার রাশিয়ার বিপ্লবী সরকার যখন লেনিনের নেতৃত্বে এইসব সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন তখন সে দেশ রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও ছিল সঙ্কটজনক। তবু লেনিন বিশ্ববিপ্লবের লক্ষ্য পরিত্যাগ করেন নি। জার্মান বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য রুশ সরকার সক্রিয় ভূমিকা নিলেন। বার্লিনে অবস্থিত রুশ রাষ্ট্রদূত জোফে—জার্মানীর সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে বিপ্লব প্রস্তুতির কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন বলে দাবীও করেছিলেন। জার্মানীতে সে সময় যে সোস্যাল ডেমক্রাটিক সরকার এবার্ট ও শীডম্যানের ( Ebert & Scheidemann ) নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল সেই সরকার সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করায় বলশেভিক নেতারা জার্মানীতে আর একটি বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবীদের কাছে আহ্বান জানালেন। স্পার্টাসিস্ট দলের অন্যতম নেতা কার্ল লিবনিখ্টের সঙ্গে বলশেভিকদলের একটি গোপন বোঝাপড়ার চেষ্টাও হল। লেনিন তাঁদের দলকে সর্বপ্রকার সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে স্পার্টাসিস্ট দলের নেতৃত্বে বার্লিনে একটি অভ্যুত্থান হয়। কিন্তু অচিরেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ঐ বছর জানুয়ারী মাসে লেনিন ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এক খোলা চিঠির মাধ্যমে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানালেন। এই ধরনের নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য লেনিন এত ব্যগ্র হলেন কেন ? কারণ, ১৯১৮ সালের শেষভাগে বলশেভিক নেতারা জানতে পারলেন ব্রিটিশ শ্রমিক দলের উদ্যোগে—ইউরোপের প্যারিস সহরে একটি আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ও শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। লেনিন বুঝলেন 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' [ Second (Socialist) International ] পুনরুজ্জীবনের এটা একটা কৌশল মাত্র। এটা প্রতিহত করতে তিনি বদ্ধপরিকর

হলেন। লেনিনের আশঙ্কা ছিল যে, এই সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন যদি কোন রকমে বাস্তব রূপ নেয়—তাহলে সেই সম্মেলন 'অক্টোবর বিপ্লবের' পর প্রতিষ্ঠিত লেনিনের একনায়কতন্ত্রের নিন্দা করবে। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল দুনিয়ার সর্বত্র রুশ অনুগত কমিউনিস্ট মহলে সোস্যালিস্টদের তীব্র নিন্দাবাদ ও ধিক্কার প্রচার। সোস্যালিস্টরা "বিশ্বাসঘাতক" "প্রতিবিপ্লবী"—এই জবরদস্ত দলীয় প্রচার ব্যাপকভাবে সুরু হয়ে গেল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বামপন্থী সমাজতন্ত্রীদল ও পার্টিগুলি যাতে "দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের" সঙ্গে কোনভাবেই সংযুক্ত ( Affiliated ) হতে না পারে তার জন্যও ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হল। ব্রিটিশ শ্রমিকদল-প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে 'শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের সমাবেশ' ( "gathering of the enemies of the working class" ) বলে চিত্রিত করা হল। সাথে সাথে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে 'তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠার আয়োজন সুরু হল।

এ ব্যাপারে লেনিন, ট্রট্স্কী, জিনোভিয়েভ, রাকোভস্কী, এ্যাঞ্জেলিকা বালাবানফ—প্রভৃতি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

খুব তাড়াহুড়া করেই 'তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠিত হল এবং তার প্রথম কংগ্রেস ২রা মার্চ (১৯১৯) ক্রেমলিনে বসে। মোট ৩৫ জন প্রতিনিধি এবং বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ১৫ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে। যাঁরাই এসেছিলেন—তাঁদের সবাই ছিলেন লেনিনের পছন্দমত বাছাই করা ব্যক্তি। কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী সম্মেলন আহ্বান করা হয়নি বা প্রতিনিধি নির্বাচনও করা হয়নি। এঁদের মধ্যে অনেক প্রতিনিধি ছিলেন যাঁরা ঐ সময় জারের আমলে রাশিয়ায় বন্দী হয়েছিলেন অথবা অন্যদেশের বামপন্থী চিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তি যাঁরা সেই সময় রাশিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে লেনিনের নীতি অনেকেই সমর্থন করতে পারেন নি। যেমন হাঙ্গেরী থেকে এসেছিলেন এমন একজন প্রতিনিধি যিনি পূর্বে ছিলেন একজন কয়েদী—এবং অনেক টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করে সরে পড়েন। পরে ফরাসী দলের প্রতিনিধি গিল্‌বোঁ-কে ( Guilbeaux ) এই সম্মেলনে ৫টি ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। মাদাম বালাবানফ এই সম্বন্ধে বলেছিলেন :

"I was astonished and disgusted at this news but after my previous conversations with Lenin on the subject of Guilbeaux I knew it would be useless to protest." অর্থাৎ এ

বিষয় নিয়ে লেনিনের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছিল তা থেকে বুঝেছিলাম প্রতিবাদ করা অর্থহীন। এই গিলবোঁ পরে ফ্যাসিস্ট দলভুক্ত হয়েছিলেন। সম্মেলনে রাশিয়ার বাইরের একমাত্র উপস্থিত ব্যক্তি যাকে প্রকৃত প্রতিনিধির মর্যাদা দেওয়া যায় তাঁর নাম এবারলীন। তিনি জার্মান স্পার্টাসিস্ট দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। জার্মান স্পার্টাসিস্টরা হিউগো এবারলীন ও লেভাইন—এই দুজনকে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন "আন্তর্জাতিকের" প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য। যাবার পথে লেভাইন জার্মান সীমান্তে গ্রেপ্তার হয়ে যান। তাই এবারলীন একাই জার্মান প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব নিয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে আগেও কোন আলোচনা হয়নি। সম্মেলন চলাকালে ট্রট্স্কীই প্রস্তাবের খসড়া রচনা করেন। প্রস্তাব নিয়ে কোন আলোচনা-বিতর্ক হ'ল না। সম্মেলন চলাকালে লেনিন মাদাম বালাবানফকে ইতালীর সোস্যালিস্ট পার্টির হয়ে মঞ্চে উঠে ভাষণ দেবার জন্য অনুরোধ জানান। ( "Please take the floor and announce the affiliation of the Italian Socialist Party to the Third International."—Lenin ) এইভাবে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে দুনিয়াকে দেখাতে হবে "ইতালীর সমাজতান্ত্রিক দল" "দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের" সঙ্গে সংযুক্ত না হয়ে বিপ্লবী "তৃতীয় আন্তর্জাতিকের" সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। মাদাম বালাবানফ প্রথমে রাজী হলেন না। তিনি লেনিনকে কাগজের টুকরোয় লিখে জানালেন: "আমি তা করতে পারি না। তাদের সঙ্গে আমার কোনই যোগাযোগ নেই। তাদের আনুগত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তা যাই হোক তাদের বক্তব্য তাদের প্রতিনিধিরাই এসে সম্মেলনে বলুন।" সঙ্গে সঙ্গে লেনিন আর একটি কাগজের টুকরোয় লিখে পাঠালেন: "আপনাকেই এই ঘোষণাটি করতে হবে। আপনি তাদের প্রতিনিধি। আপনি ইতালীর পার্টির 'আভান্তি' ( Avanti ) পত্রিকা পড়ে নিন। তা থেকেই বুঝতে পারবেন ইতালীর পরিস্থিতি কি।"

এর পর আর তর্ক না বাড়িয়ে বালাবানফ রাজী হয়েছিলেন। তিনিই 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকে'র প্রথম সম্পাদিকা মনোনীত হন।

এই প্রসঙ্গে বালাবানফের মন্তব্য উল্লেখ্য:

"I heard that Radek was organising foreign sections of the Communist Party with headquarters in the Commissariat of Foreign Affairs. When I went there to investigate I found

that this widely heralded achievement was a fraud. The members of these sections were practically all prisoners in Russia. Most of them had joined the party recently because of the privileges which membership conferred. Practically none of them had any contact with the revolutionary labour movement in their countries and knew nothing of socialist principles. Radek was grooming them to return to their native countries where they were to work for the Soviet Union. Two of these prisoners, Italians from Trieste, were about to return to Italy with special credentials from Lenin and a large sum of money. I understood that they knew nothing of the Italian movement or even of the elementary terminology of socialism I decided to take my protest directly to Lenin : Vladimir Ilyich, I advise you to get back your money and credentials. Those men are merely profiteers of Revolution. They will damage us seriously in Italy." [ David Shub : Lenin ]

"আমি শুনেছিলাম র‍্যাডেক বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট শাখাগুলিকে সংগঠিত করছিলেন ; পররাষ্ট্র দপ্তরকে এই সংগঠনের প্রধান কার্যালয়রূপে ব্যবহার করা হবে। যখন আমি সেই সদর দপ্তরে অনুসন্ধান করতে গেলাম তখন দেখলাম এই বহু প্রচারিত তথাকথিত কৃতিত্বপূর্ণ কাজটি একটি নিছক ধাপ্পা। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট শাখার সদস্য বলে যাদের হাজির করা হল তাদের অধিকাংশই ছিল রাশিয়ায় অবস্থানকারী যুদ্ধবন্দী। সবে তারা দলে যোগ দিয়েছে দলের সদস্যরূপে সুযোগ-সুবিধা ভোগের লোভে। তাদের নিজ নিজ দেশের শ্রমিক বা বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে কোন যোগাযোগই আদৌ ছিল না। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। র‍্যাডেক এই সব ব্যক্তিদের কমিউনিস্ট বানিয়ে তাদের নিজ নিজ দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করছিলেন। আর তাদের কাজই হবে স্বদেশে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে রাশিয়ার হয়ে কাজ করা। এই ধরনের উপরে উল্লিখিত যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে দুজন ইতালীর নাগরিক ছিলেন,— ত্রিয়েস্তি-র অধিবাসী। লেনিনের কাছ থেকে বিশেষ পরিচয়পত্র ও প্রচুর রুশ অর্থ দিয়ে তাঁদের ইতালীতে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমি বুঝেছিলাম

এঁদের দুজনের ইতালীর আন্দোলনের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই, আর সে সম্বন্ধে এঁরা কিছু জানতেনও না। সমাজতন্ত্রের অ আ ক খ তাঁরা জানতেন না। এ হেন ব্যক্তিদের লেনিনের প্রশংসাপত্র দিয়ে বিপ্লবী কমিউনিস্টদের তকমা চড়িয়ে পাঠান হচ্ছে ইতালীতে।

বালাবানফ লেনিনকে বললেন "আপনি এদের কাছ থেকে পরিচয়পত্র ও অর্থ ফিরিয়ে নিন। এরা সুবিধাবাদী, বিপ্লবের নামে কিছু কামিয়ে নিতে চায়। এদের মতো লোককে ইতালীতে পাঠালে আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে দারুণ-ভাবে।" লেনিন তার উত্তরে বলেছিলেন: "For the destruction of Turati's (Socialist) Party they are quite good enough" অর্থাৎ 'ইতালীর টুরাটির নেতৃত্বাধীন সোস্যালিস্ট পার্টিকে খতম করার জন্য তারাই যথেষ্ট।' এরপর খবর আসে এই দুই প্রতিনিধি রুশ সরকার প্রদত্ত এই বিপুল অর্থ মিলান সহরের রেস্টুরেণ্ট ও গণিকালয়ে উড়িয়েছে। বিপ্লবী সংগঠন বা আন্দোলনের কাজে এই অর্থ ব্যয় হয়নি।

ইতালীর সোস্যালিস্ট পার্টি বলশেভিক রাজনীতির চক্রান্তে কিভাবে ভেঙে গেল, সমাজতন্ত্রী আন্দোলনকে কিভাবে কমিউনিস্টরা ধ্বংস করে মুসোলিনি ও ফ্যাসীবাদের উদ্ভবে সাহায্য করল সেটা পরে আলোচনা করছি। ইতালীতে সে সময় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটা বড় সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটল 'কমিণ্টার্ণের' ভ্রান্ত রাজনীতির ফলে। বালাবানফ পরে লেনিনের কাছে 'কমিণ্টার্ণের' কার্যপ্রণালীর নানাবিধ নিয়মবিরুদ্ধ কাজের সমালোচনা করায় লেনিন তাঁকে জানান:

"Dear Comrade, the work you are doing is of the utmost importance and I implore you to go on with it. We look to you for our most effective support. Don't consider the cost. Spend millions, tens of millions, if necessary. There is plenty of money at our disposal. I understand from your letters that some of the couriers do not deliver our paper in time. Please send me their names. These saboteurs shall be shot." [ David Shub : Lenin ]

"প্রিয় সাথী, আপনি যে কাজ করেছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। আমি আপনাকে ঐকান্তিকভাবে আবেদন করছি আপনার কাজ চালিয়ে যাবার জন্য। আমাদের সর্বপ্রকার সক্রিয় সমর্থনের জন্য আপনার দিকে আমরা চেয়ে আছি। কাজের জন্য অর্থব্যয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করবেন না আপনি। প্রয়োজন বোধ করলে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করুন। আমাদের হাতে পর্যাপ্ত

অর্থ আছে। আপনার চিঠিপত্র থেকে বুঝছি আমাদের কোন কোন সংবাদ-বাহক দূত সময়মত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পৌছে দিচ্ছে না। অনুগ্রহ করে তাদের নামের তালিকা পাঠান। এই ষড়যন্ত্রকারীদের গুলি করে মারা হবে।" [ লেনিন ]

মাদার বালাবানফ উত্তরে লেনিনের কাছে জানাতে চান, রাশিয়ার হয়ে প্রচার অভিযান চালাবার জন্য অথবা বিশ্ববিপ্লবের জন্য এত অর্থই বা কেন লাগবে? কিন্তু অঢেল অর্থ আসতে লাগল বিভিন্ন দেশে। কমিউনিস্টদের অনুচর পাঠিয়ে কমিউনিস্ট দল গঠন করার কাজ এগুতে লাগল সর্বত্র; প্রচারিত লক্ষ্য—বিশ্ববিপ্লব ত্বরান্বিত করা।

অতিকেন্দ্রীকরণের ( Ultra-Centralisation ) নীতির ভিত্তিতে লেনিন এবার "তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে ( কমিণ্টার্ণ )" গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হলেন। ১৯২০ সালের তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের পরিচালনায় কমিণ্টার্ণের সদস্যগুলির আবশ্যকীয় সর্ত স্বরূপ জিনোভিয়েভ স্বাক্ষরিত ২১ দফা সর্ত-সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হল (Twenty-One Points)। পরে এই ২১ দফা সর্ত যে লেনিনের রচনা তা জানা যায় লেনিনের রচনাবলীতে সন্নিবেশিত হওয়া থেকেই ( Third Edition of Lenin's Collected Works )। এই সর্তগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সর্তগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :

১। যে সব রাজনৈতিক দল ও সংহতি এই আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চাইবে তাদের সম্পূর্ণভাবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব সংস্কারপন্থী অথবা মধ্যপন্থী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

২। রাজনৈতিক দলগুলিকে দল, ট্রেড ইউনিয়ন, পরিষদীয় দল বা সংস্থা—পত্র-পত্রিকার সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে এই সংস্কারপন্থী বা মধ্যপন্থীদের অপসারণ করে তাদের জায়গায় সাচ্চা কমিউনিস্টদের বসাতে হবে। এই নীতি কার্যকরী করতে গিয়ে যদি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন "সুবিধাবাদীদের" স্থানে অপরিপক্ক অনভিজ্ঞ সাধারণ কর্মীদের বসাতে হয় তাও করা দরকার।

৩। যে সব দল তাদের কৌশলগুলির মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি তাদের দেখতে হবে যাতে তাদের কেন্দ্রীয় সমিতি অথবা অন্যান্য স্তরের কার্যকরী সমিতিগুলিতে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য এমন ব্যক্তি অবশ্যই হবেন যাঁরা এই আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের আগেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এবং প্রকাশ্যেই 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের' প্রতি সমর্থন ও আনুগত্য ঘোষণা করেন।

৪। যে সব রাজনৈতিক দল তাদের পুরাতন সোশ্যাল ডেমক্রাটিক কর্মসূচী আঁকড়িয়ে পড়ে আছে তাদের অবিলম্বে সেই কর্মসূচী ছেঁটে বাদ দিয়ে তার জায়গায় কমিউনিস্ট কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে; আর এইসব কর্মসূচী স্থানীয় পরিস্থিতির উপযোগী করে রচনা করতে হবে। এইসব কর্মসূচী কার্যকরী হবার আগে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কার্যকরী সমিতির (Executive Committee of the Communist International) অনুমোদন লাভ করা চাই।

৫। সমস্ত দলগুলির কমিণ্টার্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পৃথক নাম পাল্‌টিয়ে দলের নামাকরণ করতে হবে "কমিউনিস্ট পার্টি"। এইভাবে নাম পরিবর্তন করার ফলে 'সমাজতান্ত্রিক দলগুলির' সঙ্গে বিগত দিনের পার্থক্য প্রত্যেকের কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

৬। সকল দলগুলিকেই "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের নীতি" (democratic centralisation) এবং লৌহ কঠিন শৃঙ্খলার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হবে। তবে এই ক্ষমতা অবশ্যই 'কমিণ্টার্ণের' নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

৭। কমিউনিস্টদের 'বুর্জোয়া বৈধতা বা আইনানুবর্তিতা'-র (bourgeois legality) ওপর নির্ভর করা চলবে না। প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্মুক্ত প্রকাশ্য সংগঠনের সাথে সাথে গুপ্ত সংস্থা (Secret apparatus) স্থাপন করতে হবে। এই গুপ্ত সমিতিগুলি বিপ্লবের সময় মূল রাজনৈতিক দলকে (অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টিকে) সমর্থন করতে এগিয়ে আসবে। সকল রাজনৈতিক দলগুলিকেই, যাদের অস্তিত্ব বৈধ বলে স্বীকৃত—তাদের, মধ্যে মধ্যে সদস্যদের ঝাড়া-মোছা করা দরকার। দলের মধ্যে 'পাতি বুর্জোয়া' মনোভাবাপন্নদের দল থেকে বিতাড়িত করতে হবে পর্যায়ক্রমে।

৮। কমিণ্টার্ণের অধিবেশনের সিদ্ধান্তগুলি এবং কমিণ্টার্ণের কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্তগুলি সংযুক্ত সকল রাজনৈতিক দলের অবশ্যমান্য। যাঁরা এইসব সিদ্ধান্ত বা কেন্দ্রীয় নির্দেশের বিরোধিতা করবেন তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে বহিষ্কার করা হবে।

৯। সংযুক্ত প্রতিটি দলকেই আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার—যার কেন্দ্রীয় কার্যালয় আমস্টারডাম-এ অবস্থিত—বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযানে নামতে হবে। অকমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন, সামাজিক দেশাত্মবোধ (Social patriotism) ও সামাজিক শান্তিবাদিতার (Social Pacifism) বিরুদ্ধে,

জাতিসংঘ ( League of Nations ), নিরস্ত্রীকরণ এবং যুদ্ধ এড়াবার পথ হিসাবে কোন রাষ্ট্র বা ব্যক্তির মধ্যস্থতা-তত্ত্বের ( Arbitration ) বিরুদ্ধে 'কমিণ্টার্ণ'-সংযুক্ত দলগুলিকে প্রচার চালিয়ে যেতে হবে।

১০। প্রত্যেক দলই বাধ্য থাকবে ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি ও বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকদের সংগঠনগুলির মধ্যে জোরাল প্রচার অভিযান চালাতে—আরও তাদের কাজ হলো এই সব সংগঠন ও আন্দোলনের মধ্যে 'কমিউনিস্ট সেল' তৈরী করা। আর সেই সব কমিউনিস্ট সেলগুলি মূল রাজনৈতিক দলের বশীভূত থাকবে।

১১। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক ও জোরাল প্রচার অভিযান চালানোর। যে সব দেশে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে এই ধরনের প্রচারকার্য আইনত নিষিদ্ধ সেইসব দেশে গোপনে ( by secret means ) এই প্রচার চালিয়ে যেতে হবে।

১২। পার্টির পত্র-পত্রিকা পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে। কমিণ্টার্ণের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র—বড় বড় বহুল প্রচারিত পার্টি-পত্রিকাগুলিতে প্রকাশ করতে হবে।

'কমিউনিস্ট' আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যুক্ত হবার আবশ্যিক ২১ দফা সর্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যে সকল কমিউনিস্ট বা সোস্যালিস্ট পার্টি মেনে নিয়েছিল সেইসব দলগুলিকে অনিবার্যভাবে নিজ নিজ দেশে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়েছিল:

(১) দলের নাম সোস্যালিস্ট থেকে 'কমিউনিস্ট পার্টি'-তে রূপান্তরিত করতে হয়েছিল—'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের' ( Second International ) সঙ্গে যুক্ত সমাজতন্ত্রীদের থেকে নিজেদের পার্থক্য প্রমাণের জন্য।

(২) কমিণ্টার্ণের যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা—দলের পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা ও সেই নির্দেশমত কাজ করে যাওয়া।

(৩) 'কমিণ্টার্ণে'র সঙ্গে সংযুক্ত হবার ৪ মাসের মধ্যে দলের নিজ নিজ জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করে এই সব সিদ্ধান্ত অনুমোদন, আর সেই সম্মেলনেই পার্টির নেতৃত্ব ( Party Direction ) গঠন। সেই নেতৃত্বে যাঁরা থাকবেন তাঁদের দুই-তৃতীয়াংশ এমন ব্যক্তি হবেন যাঁরা ২১ দফা কর্মসূচী মেনে নেবার আগেই কমিউনিজম-এর আদর্শে আস্থা জ্ঞাপন করেছেন।

(৪) দলের মধ্যে যাঁরা ভিন্নমত পোষণ করবেন তাঁদের দল থেকে বিতাড়ন।

(৫) নিয়মিতভাবে দল থেকে 'পার্জ' করার কর্মসূচী গ্রহণ।

(৬) রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশী কোন শক্তির হস্তক্ষেপের বা সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও জনমত গঠন।

(৭) 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের' বিরুদ্ধে তার সঙ্গে যুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির বিরুদ্ধাচরণ ও প্রচার অভিযান চালান।

(৮) ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সেল গঠন।

(৯) আন্তর্জাতিকতার নামে 'দেশভক্ত' সমাজতন্ত্রীদের মুখোশ উন্মোচন।

(১০) বুর্জোয়া সরকারের পাশাপাশি বিকল্প পাল্টা বেআইনী সংস্থা গড়ে তোলা।

(১১) সেনাবাহিনীর মধ্যে বেআইনী প্রচারকার্য চালিয়ে যাওয়া।

(১২) দলের অভ্যন্তরে কোন বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিকে কোনমতে স্থান না দেওয়া বা তাদের অস্তিত্ব বরদাস্ত না করা।

(১৩) রাশিয়ার সকল কাজের—আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির প্রতি নিঃসর্ত সমর্থন।

(১৪) আমস্টারডাম বিশ্ব-শ্রমিক শ্রেণী-সংস্থার বিরোধিতা।

(১৫) লৌহ-কঠিন শৃঙ্খলা ও কেন্দ্রীকরণের নীতি গ্রহণ ( Iron discipline and democratic centralisation )।

(১৬) দলের সংস্কারপন্থী ও ঐক্যপন্থীদের বিরুদ্ধে বিরামহীন প্রচার অভিযান।

কিন্তু এই ২১ দফা সর্ত মেনে নেওয়ার অনিবার্য পরিণতি হল দেশের বামশক্তির এবং শ্রমিক আন্দোলনের প্রচণ্ড ভাঙন। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের জন্য উদার-ভিত্তিক ব্যাপক শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐক্য যখন একান্ত প্রয়োজন—তখন এই ২১ দফা কর্মসূচীকে কমিণ্টার্ণের সঙ্গে সংযুক্তির সর্ত ( Affiliation ) রূপে লেনিন কর্তৃক চাপিয়ে দেবার রাজনীতির সার্থকতা খোলা যুক্তিবাদী বিশ্লেষণী মন নিয়েই যেন ইতিহাসের ছাত্ররা বিচার করে দেখেন। যে রাজনীতির কথা লেনিনের নির্দেশে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' প্রচার করলেন তা কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ঐক্য-বিধ্বংসী বিভেদের বীজই বপন করতে সাহায্য করে এসেছে। পুঁজিবাদী শিবির তাতে দুর্বল হয়ে পড়েনি।

পরবর্তী কংগ্রেসগুলিতে এই মূলনীতির ভিত্তিতে বিস্তারিত কার্যসূচী প্রণীত হয়েছে। কমিণ্টার্ণের নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত হবার বা কোনরকম স্বতন্ত্র পথ অবলম্বনের কোন অধিকার জাতীয় পার্টিগুলির আর রইল না।

লেনিন বিশ্ববিপ্লবের কৌশলই শুধু রচনা করে যাননি, তিনি এক অদ্ভুত 'বিপ্লবী নৈতিকতার' ('Revolutionary morality') ওকালতি করে গিয়েছিলেন। সেই দ্বৈত নৈতিকতার মধ্যে যে বিরাট ফাঁকি ও নীতিহীনতা রয়েছে তা যুগে যুগে বিপ্লবী আদর্শের ভাবমূর্তিকে অস্পষ্ট করেছে, বিশ্ববিপ্লবের আদর্শের বাস্তবতার গৌরব অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, বিপ্লবের চরম সাফল্যের মুখে বিপ্লবীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, হতাশা জাগিয়েছে, আচরণ ও আদর্শের ব্যবধান পরিস্ফুট করেছে। লেনিন বলেছিলেন :

"The Communist must be prepared to make every sacrifice, and, if necessary, even resort to all sorts of cunning, schemes and stratagems to employ illegal methods, to evade and conceal the truth in order to penetrate into the trade unions, to remain in them and conduct the communist work in them at all costs." [ Lenin ]

অর্থাৎ : কমিউনিস্টদের সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং প্রয়োজন হলে সকল রকমের ছলনা চাতুরী কৌশল প্রয়োগে পটু হতে হবে। প্রয়োজনবোধে অবৈধ পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে; ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভিতরে অনুপ্রবেশের নীতিকে সফল করার জন্য এবং তার ভিতরে থেকে সর্ব অবস্থায় কাজ করে যাবার জন্য অসত্যের আশ্রয় নিতে হবে—সত্য গোপন পর্যন্ত করতে হবে। [ লেনিন ]

লক্ষ্য হিসাবে বিশ্ববিপ্লবের কথা তত্ত্ব হিসাবে প্রচার করা হলেও তার পেছনে রুশ-রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের জাতীয় স্বার্থের তাগিদও যথেষ্ট ছিল। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলকে ধরে রাখার জন্য—অন্যান্য দেশে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী কবলিত শিল্পোন্নত দেশগুলিতে কমিউনিস্ট বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে পারলে সেই সব দেশগুলি আর রাশিয়ায় মাথা গলাতে আসবে না, প্রতি-বিপ্লবী শক্তিগুলিকে মদত জোগাবার ফুরসৎও সাম্রাজ্যবাদী ও গণতান্ত্রিক দেশগুলো পাবে না। রুশ বিপ্লবের স্বার্থে অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট দল ও ক্যাডাররা একস্‌পেনডেবল্ (expendable)। সে সব দেশের বিপ্লব ব্যর্থ হলেও কিছু আসে যায় না মস্কোর। ইন্দোনেশিয়া, সুদান ও হালে মিশরে কমিউনিস্ট নিপীড়ন সত্ত্বেও সেইসব দেশের সরকারের সঙ্গে মস্কোর সম্পর্ক ছিন্ন হয় কি? সফল হলে সে সব দেশের বিপ্লবী সরকার পুরোপুরি মস্কোর অনুগত হবে। মস্কো প্রয়োজনমত

তার নিজের স্বার্থে ষোল আনা অন্যান্য দেশের কমিউনিস্টদের ব্যবহার করে এসেছে। বিশ্ববিপ্লবের কাজকে ত্বরান্বিত করতে কমিণ্টার্ণ কতটা কার্যকরী হয়েছে অথবা কমিউনিস্ট রুশ-স্বার্থসিদ্ধির বাহন হিসাবে কতটা কাজ করেছে তা ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করা দরকার।

"তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের" প্রতিষ্ঠার পেছনে বড় রকমের রাজনৈতিক কূটনীতি প্রেরণা জুগিয়েছে। প্রথমত, "দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের" (সোস্যালিস্ট) [১৮৮৯-১৯১৪] পুনরুজ্জীবন প্রতিহত করতে লেনিন যে বদ্ধপরিকর হয়ে পড়েন তাও মূলত রাশিয়ার স্বার্থে। লেনিনের গভীর আশঙ্কা ছিল আগেই বলা হয়েছে—এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক (সোস্যালিস্ট) পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে তা লেনিনের একনায়কত্বকে অনুমোদন করবে না। "দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের" পেছনে যে আন্তর্জাতিক প্রভাব ও মর্যাদা ছিল—সেটা যদি রাশিয়ার পক্ষে না আসে তাতে রাশিয়ার প্রভূত ক্ষতি হবে লেনিন বুঝেছিলেন। তৃতীয়ত, বিশ্ববিপ্লবের ভয়াল হুমকী ডেমক্লীসের উদ্যত তরবারির মত পুঁজিবাদী দুনিয়ার ওপর ঝুলিয়ে রাখলে তাদের মনে একটা ভীতিও সঞ্চারিত হবে। রাশিয়ার বিপ্লবকে নিষ্পন্ন কার্য (Fait accompli) বলে মেনে নিয়ে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে মাথা গলানোর নীতিকে পরিহার করতে বাধ্য করবে। সেটা হলে বলশেভিক দল নিশ্চিন্ত মনে দেশ গড়ার কাজে হাত লাগাতে পারবে। রুশ বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিপ্লব ছড়িয়ে দেবার রাজনীতির তত্ত্বকথার মধ্যে যে কূটনীতি প্রচ্ছন্ন ছিল তা পরবর্তীকালে বহু আলোচিত "চিরন্তন বিপ্লব বনাম একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা তত্ত্ব" (Permanent Revolution *vis-a-vis* socialism in one country) রূপে পরিচিতি লাভ করে রাজনৈতিক মহলে।

লেনিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, জার্মানী ও ইউরোপের অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলিতে সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লব সফল না হলে রুশ বিপ্লব ব্যর্থতার গ্লানিতে নিমজ্জিত হবে। ট্রট্স্কী ছিলেন এই বিশ্বাসে অবিচল। চিরন্তন বিপ্লব তত্ত্বটি (Permanent revolution or uninterrupted revolution) ট্রট্স্কীর একান্ত নিজস্ব তত্ত্ব নয়। মার্কসের রচনায় তার ইঙ্গিত ছিল:

"It is our interest to make it permanent until the proletariat has captured state power in all dominant countries of the world." [Address to the Communist League. (1850)]

লেনিনের জীবদ্দশাতেই বিশ্ববিপ্লবের লক্ষ্য দূরে সরে যেতে থাকে। দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন NEP চালু হয়েছিল—ঠিক তেমনি রুশ-পররাষ্ট্র-নীতিতেও NEP-নীতি প্রতিফলিত হয়েছিল। E. H. Carr—তাঁর গবেষণামূলক মূল্যবান গ্রন্থে লিখেছেন :

"The idea of Moscow as the deliverer, through the process of national and socialist revolution of the oppressed masses of the east was not abandoned. But it began to take second place to the idea of Moscow as the centre of a Government which, while remaining the champion and the repository of the revolutionary aspiration of mankind, was compelled in the meanwhile to take its place among the "Great Powers of the capitalist world..." ( The Bolshevik Revolution—1917-1923—By E. H. Carr—Vol. 3. Chap. 27, P. 290 ).

তাহলেই দেখা যাচ্ছে শোষিত দুনিয়ার "পরিত্রাতার" ভূমিকা অগ্রগণ্য কখন হবে, সেটা নির্ধারণ করবে কে এবং কি পরিস্থিতিতে সেটাই তো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। রুশ জাতীয় স্বার্থেই কখনও—পরিত্রাতার ( deliverer ) ভূমিকা অগ্রগণ্য বিবেচিত হবে—কখনও বা সে ভূমিকা থাকবেই না।

লেনিনের জীবদ্দশাতেই রাশিয়া তার পররাষ্ট্রনীতির বৈপ্লবিক কাঠিন্যের খোলস আস্তে আস্তে পরিত্যাগ করতে শুরু করে। ১৯২১ সালের ১৬ই মার্চ সম্পাদিত "ইঙ্গ-সোভিয়েট বাণিজ্যিক চুক্তি" ( Anglo-Soviet Trade Agreement ), সোভিয়েট-আফগান মৈত্রী চুক্তি, তুরস্ক-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি ( Soviet-Afghan Treaty of Alliance of Feb. 1921, Turkish-Soviet Treaty of Alliance of March 16, 1921 etc. —all signed in Moscow )—এর ফলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বাধাগুলি দূরীভূত হতে থাকল।

১৯২০ সালের শেষভাগে মস্কো দুটি আশু সমস্যার সম্মুখীন হয় : (১) রাশিয়ার যে সব পণ্যদ্রব্য ইংলণ্ডে রপ্তানী হয়েছিল—তার ওপর প্রাক্-বিপ্লব কালের মালিকদের আইনের আশ্রয় নিয়ে রুশ অর্থনৈতিক স্বার্থের ওপর আশু আঘাতের সম্ভাবনা, (২) ইংলণ্ডে রুশ-স্বর্ণের ওপর ব্লকেড

( gold blockade )। রুশ সরকার ব্রিটিশ সরকারের কাছে আইন প্রণয়ন-পূর্বক রুশ-স্বার্থ সংরক্ষণের প্রস্তাব করেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার রাজী ছিলেন কিন্তু তারও সর্ত ছিল। সেটা হল: এশিয়া ভূখণ্ডে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার বন্ধ করতে হবে রাশিয়াকে।

অধ্যাপক কার লিখছেন:

"At one moment the British Government desired to include Asia Minor and the Caucasus among the regions in which the Soviet Government undertake to refrain from anti-British propaganda, but eventually agreed to abandon any specific enumeration of 'the peoples of Asia', except for 'India and the independent state of Afghanisthan'." [ The Bolshevik Revolution—Vol. 3, P. 287 ].

সোভিয়েট রাশিয়ার স্বর্ণ তার পূর্ণ মূল্যে গ্রহণ করতে ব্রিটিশ সরকার সম্মত হন। ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে একটি রুশ বাণিজ্যিক সংস্থা ( ARCOS: All-Russian Co-operative Society ) ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য প্রথম তিন মাসের মধ্যে রাশিয়ার জন্য ক্রয় করে ইংলণ্ডের বাজার থেকে। ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে অযথা বিলম্ব হচ্ছে দেখে লেনিন অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আর এই বিলম্বের জন্য ব্রিটেনের বুর্জোয়া সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল একটি গোষ্ঠীকে তিনি দায়ী করলেন ( "the *reactionary part* of the British bourgeoisie and the official military clique" and declared that Soviet policy "*proceeds on the line of maximum concessions to England*"—E. H. Carr's, The Bolshevik Revolution 1917—23; P. 288 ) এ লেনিনেরই উক্তি কিন্তু। [ তাহলে মস্কোর কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কাছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীরও একটা 'প্রগতিশীল' অংশ স্বীকৃতি পেয়েছিল। অন্য কোন দেশের কমিউনিস্ট নেতা এই ধরনের ব্যাখ্যা করতে গেলে মার্কসীয় অভিধানের চোখা-চোখা গালিগালাজে জর্জরিত হতে হত: শোধনবাদী বলে তো তিনি চিহ্নিত হতেনই নিঃসন্দেহে।] শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইঙ্গ-সোভিয়েট বাণিজ্যিক চুক্তি ১৯২১ সালেই সম্পাদিত হল। কার বলেছেন—

"...the country was in a desperate plight; reconstruction was needed and, even at the apparent sacrifice of

revolutionary principle, *Concessions* must be made not only to the peasant, but to the foreign capitalist world". [ The Bolshevik Revolution, Vol. 3, P. 289 ].

গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে এই সমঝোতার সমর্থনে লেনিন বলেছিলেন: "It is important for us to open one window after another ...... Thanks to the treaty we have opened a certain window".

অর্থাৎ: "আমাদের দেশের পক্ষে এমনি করে একটার পর একটা জানালা উন্মুক্ত করার কাজটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের একটা চুক্তি ভাগ্যিস হয়েছিল তাই আমরা অন্তত একটা বন্ধ জানালা খুলতে সক্ষম হয়েছি।"

রাশিয়ার স্বার্থে একটি দেশে সমাজতন্ত্রকে কায়েম করার প্রয়োজনবোধে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার সঙ্গে ব্যবসায়িক কূটনৈতিক মৈত্রী চুক্তিতে সামিল হলে বলা হবে কৌশল! চীন জানালা-দরজা দরাজ করে খুলে পশ্চিমের পুঁজিবাদী দুনিয়ার হাওয়া আমদানীর ব্যবস্থা করলে বলা হবে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাবাদ, আর ভারত তার প্রয়োজনের স্বার্থে পুঁজিবাদী কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি করলে বলা হবে 'আত্মসমর্পণ', 'বিশ্বাসঘাতকতা'! ভাষান্তরে জাতি-স্বার্থ সংরক্ষণের কথা বিশেষভাবে ভাববার অধিকার কেবলমাত্র রাশিয়া বা চীনেরই আছে আর সেই জাতি-স্বার্থের মূল্যায়নের ভিত্তিতে কি পররাষ্ট্র কি আভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণের নিরঙ্কুশ অধিকার সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বড় কর্তাদেরই থাকবে—আর কারুরই নয়!

১৯২১ সাল; ৭ই সেপ্টেম্বর। ব্রিটিশ মিশন মস্কোয় আসে। ঐ তারিখে কার্জন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি দীর্ঘ স্মারকলিপি রুশ কমিউনিস্ট সরকারকে পাঠান। এই প্রতিবেদনে কার্জন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে "তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের" এশিয়ায় ভারতবর্ষ, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থানে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার কার্যকলাপের ("against the institutions of the British Empire") বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন যে, এই ধরনের ব্রিটিশ স্বার্থ-বিরোধী প্রচারকার্য মূলতঃ লেনিনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তির (১৯২১) [ Anglo-Soviet Agreement ] পরিপন্থী। কিন্তু এই প্রতিবেদনটি হাল্কাভাবে তৈরী হয়েছিল। ফলে অভিযোগগুলি খুব স্পষ্ট ছিল না বা তথ্যভিত্তিকও ছিল না। তবে

কৌতূহলের বিষয় এই যে, মস্কো-নেতৃত্ব কিন্তু এই 'কার্জন মেমোরাণ্ডামের' জবাবে সরাসরি বলতে পারেন নি: সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে এশিয়া ভূখণ্ডে ভারতবর্ষে, আফগানিস্তানে, তুরস্ক বা পারস্যদেশে আন্তর্জাতিক বিপ্লবে বিশ্বাসী কমিণ্টার্ণ যে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার চালিয়েছে তা আদর্শ-ভিত্তিক এবং ন্যায়সঙ্গত কাজ; সোভিয়েট রাশিয়া তার জন্য আদৌ লজ্জিত বা দুঃখিত নয়। বরং মস্কো তার জবাবে ঘটনাগুলি সত্য নয়—এটাই দেখাতে চাইল। উক্ত ব্রিটিশ প্রতিবেদনে লেনিনের ৮ই জুন তারিখের একটি বক্তৃতার উল্লেখ করা হয়েছিল। এর জবাবে রুশ সরকার জানালেন: ঐ তারিখে লেনিন কোন বক্তৃতাই করেন নি। [ E. H. Carr: The Bolshevik Revolution, Vol. 3, p. 344-345 ]

এ সম্বন্ধে কার লিখেছেন:

The Soviet authorities who had been willing almost from the moment of the revolution to undertake to abstain from hostile propaganda against other states, interpreted that undertaking in a fully formal sense...thus they felt entitled to deny in the face of well-known facts, that there was a propaganda school in Taskent for Indian revolutionaries, or that Jemal had received support from the Soviet Government for his mission to Kabul; and the whole rejection of responsibility for the activities of Comintern and its agents rested on more than a formal distinction. *They would have been on stronger ground if they had been content to argue that the British, no more than they themselves, had allowed the conclusion of the agreement to interfere with the unfriendly behaviour of their agents.* [ E.H. Carr: The Bolshevik Revolution, Vol. 3, p. 345 ]

রুশ কমিউনিস্ট সরকারের বিপ্লবী নেতারা কেন সরাসরি বলতে পারলেন না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মুখের ওপর যে, বিটিশ সরকার ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি সত্ত্বেও রুশ সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন? তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছো আমরাও আত্মরক্ষার্থে তাই করছি। একথা বলতে পারলেন না কেন? এখানেও রুশ কূটনীতির যূপকাষ্ঠে বিপ্লবী আদর্শবাদ

বন্দি হল। লেনিন এশিয়ার কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশে ব্রিটিশ-বিরোধী বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলে থাকলে অন্যায় কিছুই করেন নি। আর সেটাই তো কমিউনিস্ট মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কাজ বলেই গণ্য হবে। ৮ই জুন অথবা ১২ই নভেম্বর অথবা ৫ই জুলাই লেনিন কি বক্তৃতা করেছিলেন—তাতে ব্রিটিশ বিরোধিতা আদৌ ছিল কিনা (Reference was made to Lenin's speech at the Third Congress of the Comintern in Curzon's Memorandum) এ সব কথার অবতারণার কোনই আদর্শগত যুক্তি থাকতে পারে না। যুক্তিটা ছিল মুখ্যত কূটনীতিগত। এই ধরনের গা-বাঁচানো উত্তর সত্যি সত্যিই সুবিধাবাদী মনোভাবেরই পরিচায়ক।

অধ্যাপক কার মন্তব্য করেছেন: দু-পক্ষই ইঙ্গ-সোভিয়েট সহযোগিতা চুক্তির আড়ালে নিজ নিজ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মতলব হাসিল করতে সচেষ্ট ছিল। তবে ব্রিটিশ সরকার এই চুক্তি অচল ও অকেজো প্রমাণ করে এর আওতা থেকে বার হয়ে আসার অজুহাত খুঁজছিল, আর মস্কো নেতৃত্ব এই চুক্তিকে বাঁচিয়ে রেখে কতটা অগ্রসর হওয়া যায় সেটা দেখছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণে-অত্যাচারে অতিষ্ঠ পরাধীন ভারতবাসীদের বা ভারতের তথা এশিয়ার কোন বিপ্লবী, পরিবর্তনকামী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের পক্ষে এই দু-মুখো রুশ রাজনীতিকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করার কি কারণ থাকতে পারে? রাশিয়ার স্বার্থ ছিল বাইরে বাইরে "ব্রিটিশ বিরোধিতার" ভাব আদৌ না দেখান; আর ভারতের বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী বা দেশভক্ত কোন দলের লক্ষ্য প্রকাশ্যে "ব্রিটিশ বিরোধী" মনোভাব ও প্রচার জোরদার করা। এই দুই পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর শুভদৃষ্টি বিনিময় কি করে সম্ভব আদর্শ জলাঞ্জলি না দিয়ে? এই কারণেই ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন রুশ স্বার্থের তল্পিবাহী হয়ে এসেছে এবং ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থের পরিপন্থীরূপে প্রতিভাত ও প্রমাণিত হয়েছে পুনঃ পুনঃ। কি ১৯৩০ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন, কি ১৯৪০-৪১ সালের মুক্তি আন্দোলন, গান্ধীজীর ডাকে ১৯৪২ সালের ঐতিহাসিক আগস্ট বিপ্লব, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ছয় মাসের চরমপত্র দেবার নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রস্তাবিত দাবী (Six months' ultimatum: National Demand), নেতাজী সুভাষচন্দ্র পরিচালিত আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা ও তাঁর ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধ—সব কিছুই কমিউনিস্ট বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। এঁরা রাশিয়ার

স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে। পরবর্তীকালে চীনের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এঁরা কখনও রুশ অনুগামী—কখনও বা চীন অনুগামী।

১৯২৪ সালে লেনিনের লোকান্তর ঘটে। কমিণ্টার্ণের পঞ্চম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৪ সালেই। এই অধিবেশনে স্বীকার করা হল বিশ্ববিপ্লব-পরিস্থিতিতে ভাঁটা পড়েছে এবং পুঁজিবাদ এখন একটা সাময়িক স্থিতাবস্থায় ( temporary stabilisation ) এসে পৌঁছেছে। লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্বেও কিন্তু ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে বিপ্লব ঘটে নি বলে রাশিয়ার সমাজতন্ত্র বিপর্যস্ত হয় নি। এ থেকে স্তালিন তাঁর একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতা-তত্ত্ব প্রচার করলেন ( "Socialism in one country" ), ট্রট্স্কী এই নীতির তীব্র বিরোধিতা করলেন। স্তালিনের এই তত্ত্বকে তিনি 'পাতি বুর্জোয়া'-তত্ত্ব বলে নিন্দা করলেন।

ট্রট্স্কীর জোরাল যুক্তির ভিত্তি ছিল মার্কস-লেনিনের থিয়োরী ও রাজনৈতিক তত্ত্ব; আর স্তালিনের যুক্তির ভিত্তি ছিল কঠোর বাস্তবতাবোধ ও রুশ জাতীয়তাবাদী স্বার্থের বাস্তববাদী মূল্যায়ন। স্তালিন নিজ দলের কাছে বোঝাতে চাইলেন: রাশিয়া নিজেই এখন যথেষ্ট শক্তিশালী, কোন বিদেশী শক্তিই বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ করে তাকে পরাভূত করতে পারবে না। বহির্বিশ্ব যাই করুক রাশিয়া নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে একাই সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ স্বদেশে গড়ে তুলতে পারবে। ট্রট্স্কীর তত্ত্বের অপব্যাখ্যা করে দলের কাছে স্তালিন তাঁকে ছোট করলেন। স্তালিনের মতলব হাসিল হল। আবার অন্যান্য দেশের কমিউনিস্টদের স্তালিন বোঝালেন, যদি রাশিয়া শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে ওঠে তবেই সে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট বিপ্লব প্রচেষ্টায় সক্রিয় সাহায্য সার্থকভাবে করতে পারবে। স্তালিন এভাবে ঘরেরও সমর্থন কুড়োলেন, বাইরের সমর্থনও কুড়োলেন।

প্রভাব সাফল্যের অনুগামী হয়। স্তালিনের সাফল্য শেষ পর্যন্ত তাঁর তত্ত্বকে দুনিয়ার কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করল। ট্রট্স্কীর বক্তব্যের সমর্থনে ছিলেন জিনোভিয়েভ, ক্যামেনেভ ও আরও অনেকে। এঁরা কমিউনিস্ট আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করেও "ফ্যাসিবাদের দালাল" (agent of fascism) বলে আখ্যাত হলেন। কমিউনিস্ট দুনিয়া বেমালুম এই অবিশ্বাস্য মিথ্যা অপবাদ মেনে নিল।

তত্ত্বের দিক থেকে স্তালিন নিজেই একদিন "একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তত্ত্ব" নাকচ করেছিলেন ( see : Leninism—By Stalin )। আজ

অবস্থার সুযোগ নিয়ে তিনি সেটাকে নিজের রাজনৈতিক কৌশলের অন্যতম মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করলেন। স্তালিন প্রশ্নটিকে পরে ঘুরিয়ে উপস্থিত করেছিলেন :—(ক) একটি দেশে তার নিজের উদ্যোগ, চেষ্টা ও জাতীয় সত্তার দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা (possibility) হচ্ছে একটি প্রশ্ন, আর,

(খ) একটি দেশ যেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ-আয়োজন চলেছে—শুধুমাত্র সেই দেশের নিজস্ব শক্তির ভিত্তিতে—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সফল বিপ্লবের গ্যারান্টি ব্যতিরেকে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিরুপদ্রব মনে করতে পারে কিনা—এটি আর একটি ভিন্ন প্রশ্ন। [ see : Leninism, p. 5 ]

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে স্তালিন বলেছিলেন 'হ্যাঁ' এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন 'না'। স্তালিনের কৌশলের কার্যকারিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ক্যারু হাণ্ট বলেছেন :

"For, while many of the leaders were suspicious of what 'Socialism in one Country' might involve, the doctrine came to the masses as a profound relief. They had been taught that unless world revolution occurred their own revolution would fail and conditions of civil war would return. What Stalin asserted amounted to the admission that the Soviet Union was strong enough to stand on its own feet whatever the outside world might decide to do. Moreover, it did something to soften the asperities of international relations by suggesting that 'Socialism was not for export'—to use a phrase which he (Stalin) was later to employ." [Theory and Practice of Communism—Carew Hunt, p. 221: Chapter 17]

স্তালিন পরবর্তীকালে ট্রট্স্কীগোষ্ঠীকে কোণঠাসা করার জন্য যে মনোভাব অবলম্বন করলেন তার মর্মার্থ হল : রাশিয়া নিজেই যথেষ্ট শক্তিশালী ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ—বাইরের কোন শক্তিকে তার পরোয়া করার কোন প্রয়োজন নেই। "সমাজতন্ত্র অন্যদেশে রপ্তানীর বস্তু নয়" এই তত্ত্বটিকে "সমাজতন্ত্র একটিদেশে বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থন ব্যতিরেকে গড়ে তোলা যায়" এই তত্ত্বের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে স্তালিন যেমন নিজের দেশের জনসাধারণের ও

দলের সদস্যদের মধ্যে নূতন আশা সঞ্চার করলেন—তেমনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও লেনিনবাদী পররাষ্ট্র নীতির রুক্ষতার বাহ্যিক আবরণ খসিয়ে দিতে সাহায্য করলেন। সমাজতন্ত্র যেমন রপ্তানীযোগ্য বস্তু নয়—তেমনি সর্বহারার বিপ্লবও কোন দেশে রপ্তানী করা যায় না এ তত্ত্বও প্রচারিত হল।

স্তালিন ট্রট্স্কীর তীব্র সমালোচনা করে তাঁর পরিবর্তিত ভাবধারার আভাস দিলেন তাঁর পরবর্তী গ্রন্থে ( Problems of Leninism )। স্তালিন দেখাতে চেয়েছেন লেনিনের চিন্তাধারার মধ্যেই একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাতত্ত্ব নিহিত রয়েছে।

স্তালিন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন :

"It goes without saying that for the complete victory of socialism, for complete security against the restoration of the old order the united efforts of proletarians of several countries are necessary……"

স্তালিন জাতীয়তাবাদী হিসাবে বাস্তবতার শক্ত জমির ওপর দাঁড়িয়ে অপরিমেয় রাজশক্তির অধিকারী হয়ে বললেন অন্যান্য দেশের, পশ্চিম ইউরোপের, এমনকি উপনিবেশগুলির শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর নৈতিক সমর্থন, শুভেচ্ছা, সহানুভূতি আর রাশিয়ায় শ্রমিক-কৃষক ও লালফৌজের সামরিক শক্তির জোরেই রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সম্ভব হবে। স্তালিন ট্রট্স্কীর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : তিনি (১) রুশ বিপ্লবের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত নন, (২) নৈতিক সমর্থনের অপরিসীম গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে অক্ষম, (৩) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অভ্যন্তরে যে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগ সংক্রামিত হয়েছে যার ফলে তার শক্তির প্রতিনিয়তই অবক্ষয় ঘটছে তা বুঝতে পারেন নি। এবার ট্রট্স্কীর বক্তব্য সংক্ষেপে তাঁর নিজের ভাষাতেই তুলে ধরা দরকার।

"The fact that the workers' state has maintained itself against the whole world in one country, and in a backward country at that, bears witness to the colossal might of the proletariat, which in other countries, more advanced, more civilised, will be capable of performing real miracles. But, although we have held our ground in the political and military sense as a state, we have not yet undertaken

or even approached the task of creating a socialist society......As long as the bourgeoisie remains in power in the other European countries, we will be compelled in our struggle against economic isolation, to strive for agreement with the capitalist world but at the same time it may be said with certainty that these agreements may at best help us to mitigate some of our economic ills, to take one or another step forward, but that a genuine advance of socialist economy in Russia will become possible only after the victory of the proletariat in the most important countries of Europe". [ A programme of peace : postscript, written in 1922 ]

"রাশিয়ার মত একটি পিছিয়ে থাকা অনুন্নত দেশে শ্রমিক-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র বিশ্ব পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও যে নিজেকে এযাবৎকাল টিকিয়ে রাখতে পেরেছে তা সর্বহারাশ্রেণীর অভূতপূর্ব শক্তির সাক্ষ্যই বহন করে নিঃসন্দেহে। রাশিয়ার চাইতে আরও উন্নত আরও মার্জিত দেশে এরূপ বিপ্লব সাধিত হলে এতদিনে অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেত। একটি রাষ্ট্রে অর্থাৎ রাশিয়ায় যদিও রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে আমরা নিজেদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখতে পেরেছি—তথাপি আমরা এখনও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে হাত লাগাতে পারিনি। ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রে যতদিন পর্যন্ত বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতার লাগাম নিজেদের মুঠোর মধ্যে রাখতে পারবে—আমরা আমাদের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার ( economic isolation ) চাপে পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে বাধ্য হব। একথাও ঠিক যে, এই ধরনের সাময়িক বোঝাপড়ার ফলে নিজেদের দেশের আর্থিক দুরবস্থাজনিত কিছু কিছু অসুবিধার তীব্রতা লাঘব করাও সম্ভব হবে। এমন কি সামনের দিকে এগুবার উপযোগী একটি বা দুটি পদক্ষেপ করাও নিঃসন্দেহে সম্ভব হবে। তবে একটি কথা খুব পরিষ্কার : প্রকৃত সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া রাশিয়ায় তখনই সম্ভব, যখন ইউরোপের সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশগুলিতে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লব সাফল্য লাভ করবে।" ( ট্রট্স্কী )

মার্কসীয় তত্ত্বের দিক থেকে ট্রট্স্কীর এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে কি বলার থাকতে পারে! যে "অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার" ও "পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়ার" কথা উল্লেখ তিনি করেছিলেন, পরবর্তীকালের ঘটনা প্রমাণ করবে তার সত্যাসত্য। পরবর্তী অনেকগুলি অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। স্তালিন "চিরন্তন বিপ্লব"-তত্ত্ব (Permanent Revolution) সম্বন্ধে বলেছিলেন :

"The whole course of October Revolution, its whole development, has demonstrated and proved the utter bankruptcy of the theory of "Permanent Revolution" and its absolute incompatibility with the foundations of Leninism". [ Problems of Leninism—J. Stalin, p. 109. ]

অর্থাৎ সমগ্র 'অক্টোবর বিপ্লবের' ধারা এই "চিরন্তন বিপ্লব" তত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা এবং লেনিনবাদের মৌলিক নীতির সঙ্গে অসঙ্গতি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছে। ট্রট্স্কীর থিয়োরীর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে "স্তালিনের একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা" তত্ত্ব এবং "বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র রপ্তানীর বস্তু নয়"—এই তত্ত্ব মেনে নেবার অন্যতম অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে—প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের এবং সমাজতন্ত্রের রূপরেখা নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা স্বীকার করে নেওয়া। শুধু তাই নয়, অন্য কোন সমাজতান্ত্রিক দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার সমাজতান্ত্রিক পরিবারের কোন তথাকথিত 'বড় ভাইয়ের' ( **Big brother** ) নেই।

সমাজতন্ত্র যখন রপ্তানীর বস্তু নয়—তখন সমাজতন্ত্রের গায়ে লেবেল এঁটে দিয়ে সেই লেবেল-মার্কা সমাজতন্ত্রই সাচ্চা খাঁটি এরূপ বলারও কোন যৌক্তিকতা থাকে না। নিজের দেশের শক্তি, উদ্যম, জাতীয় মনীষা, ভৌগোলিক পরিবেশ, ঐতিহ্য ও উদ্যোগের ভিত্তিতে যদি নিজের দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয় সকল প্রতিকূল অবস্থা ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে—একথা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব ও সত্য বলে গ্রাহ্য হলে তা চীন, ভারত, আলবেনিয়া, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, কিউবা, তিব্বত, পোল্যাণ্ড, ইজরাইল, সুদান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশের পক্ষেই বা সম্ভব হবে না কেন?

স্তালিনের পরবর্তীকালের আচরণ, তাঁর অনুসৃত পররাষ্ট্র-নীতি, কমিণ্টার্ণকে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির উপদলীয় আভ্যন্তরীণ চক্রান্তের ও রাশিয়ার উগ্র

জাতীয়তাবাদী স্বার্থ সংরক্ষণ ও চরিতার্থতার হাতিয়াররূপে ব্যবহারের চক্রান্ত থেকে দেখা যাবে তিনি একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা-তত্ত্বকে তাঁর লেনিনোত্তর রাজনীতির যুগের মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করলেও—সেই তত্ত্বের সঙ্গে অনিবার্যরূপে জড়িত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন নি।

রুশ কমিউনিস্ট নেতা ব্রেজনেভের "সীমিত সার্বভৌম-তত্ত্ব" ( **Doctrine of limited sovereignty** ) (১) সমাজতান্ত্রিক দেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও (২) নিজের দেশের সমাজতন্ত্রের রূপরেখা নির্ধারণের চূড়ান্ত অধিকারের ওপর প্রচণ্ডতম আঘাত বলেই বিবেচিত হবে।

রাশিয়া বা চীন আজ সমাজতন্ত্রের মডেলরূপে নিজেকে দাবী ও প্রচার করতে ব্যগ্র। প্রত্যেক সমাজতান্ত্রিক দেশকে সেই মডেলের ছাঁচ অনুযায়ী গড়তে হবে—যদি সে দেশ সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে গণ্য হতে চায়। বিশ্ববিপ্লবের প্রস্তুতিকার্যে সাহায্যের নামে অপর দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা গলিয়ে আখেরে রাশিয়ার কোলে ঝোল টানার মজাদার সুবিধাবাদী রাজনীতির প্রতি স্তালিনের কোনই অনীহা ছিল না। স্তালিন নিজদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামরিক বনিয়াদ মজবুত করে গড়ে তোলার সাথে সাথে দেশের জাতীয় সীমানার বাইরে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন। ঠিক এই একই নীতি অনুসরণ করে চলেছেন কমিউনিস্ট চীনের নেতা মাও সে-তুঙ।

ধনতান্ত্রিক দুনিয়া দ্বারা পরিবৃত একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব—স্তালিনের এই তত্ত্বকে কেন্দ্র করে রাশিয়া ও কমিণ্টার্ণ-নিয়ন্ত্রিত কমিউনিস্ট দুনিয়ায় "জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিক বিপ্লব" ( **Nationalism vs. International Revolution** ) তর্ক সৃষ্টি হয়েছিল।

ট্রট্স্কী নিছক শুদ্ধ মার্কসবাদী থিয়োরীর ওপর নিজের 'চিরন্তন বিপ্লব'-তত্ত্বকে দাঁড় করাতে গিয়েছিলেন। বাস্তবতার রূঢ় আঘাতে তাঁর থিয়োরী সফলতার গৌরব অর্জন করতে পারে নি। জার্মানীতে ১৯২৩ সালের জার্মান কমিউনিস্টদের অক্টোবর অভ্যুত্থান ( **October Rising** )-এর পরিকল্পনা মস্কোতে বসে কমিণ্টার্ণের নির্দেশে রচিত হয়েছিল। ট্রট্স্কীর তাতে সমর্থন ছিল। অক্টোবর অভ্যুত্থানকে 'বিপ্লব' বলা চলে না কোনমতেই—এ ছিল বিপ্লবের নামে নিছক খোকামী। এই অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছিল ট্রট্স্কী, র‍্যাডেক, জার্মান কমিউনিস্ট নেতা ব্র্যানড্লার, সিনোভজেভ-এর মতামত অনুযায়ীই। এঁদের কেউই এই অভ্যুত্থানের চরম ব্যর্থতার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।

জার্মান ‘বিপ্লবের’ সময় র‍্যাডেক জার্মানীতে উপস্থিত ছিলেন কমিণ্টার্ণের প্রতিনিধিরূপে। জার্মানীর অক্টোবর অভ্যুত্থানের চরম ব্যর্থতার মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের শিল্পোন্নত ও মার্জিত ( “Civilised”—ট্রট্স্কী ও লেনিনের ভাষায় ) দেশগুলির শ্রমিক আন্দোলনের ওপর আস্থাশীল না হবার তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা আবিষ্কার করলেন স্তালিন।

ট্রট্স্কী যে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের কথা বলেছিলেন, তা তো ফরমাস দিয়ে সংগঠিত করা সম্ভব ছিল না। জার্মানীতেই তো ১৯১৭ সালের পর বার বার সুযোগ এসেছিল—তবুও একের পর এক কমিউনিস্ট বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ কেন হল? কেন সে দেশে জার্মান ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠা হল? কমিউনিস্ট দলগুলির মধ্যে বার বার কেন নেতৃত্বের ক্লেদাক্ত সংঘাত দেখা দিয়েছিল? এই সব দল কেন উপদলীয় আড্ডায় পরিণত হয়েছিল? কেন ট্রেড ইউনিয়নগুলি ও শ্রমিক শ্রেণী দলের রাজনৈতিক সংগ্রাম-সিদ্ধান্তের পিছনে সামিল না হয়ে জাতীয়তাবাদী ও দক্ষিণপন্থীদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল? জার্মানীর “অক্টোবর অভ্যুত্থানের” পূর্বাহ্ণে কেন সে দেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সভ্যসংখ্যা ৮০ লাখ থেকে কমে ৪০ লাখে দাঁড়াল? জনগণ থেকেই বা বিপ্লবী দল বিচ্ছিন্ন হল কেন? চূড়ান্ত পরীক্ষার মুহূর্তে কেনই বা পশ্চিম ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশসমূহের কমিউনিস্ট দলগুলি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে সর্বনাশ ডেকে এনেছিল?

ট্রট্স্কীপন্থী ও স্তালিনবাদীদের ইতিহাসের কাছে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে।

আন্তর্জাতিক বিপ্লব ত্বরান্বিত করার অথবা অন্যদেশের ‘বিপ্লবী’ অন্তর্ঘাতী কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট-ঘেঁষা আন্দোলনে মদত দেবার বিপ্লবী তত্ত্বটি কতটা প্রকৃত “বিশ্ববিপ্লবের” স্বার্থে অথবা কতটাই বা এই তত্ত্বের প্রচারক দেশের জাতীয় স্বার্থে সেটা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝতে হবে। অন্য অকমিউনিস্ট দেশগুলিকে এই সব “বিপ্লবী” দিয়ে বিব্রত রাখতে পারলে সেই সব দেশের সরকার আর সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লববাদী রাষ্ট্রের ব্যাপারে কোনরকম মাথা গলাতে সাহস পাবে না বা তার সম্প্রসারণবাদী রাজনীতিতেও বাধা দিতে আসবে না। রাশিয়া ও চীনকে দিয়ে যেমন এই তত্ত্ব প্রমাণ করা যায় তেমনি ল্যাটিন আমেরিকাবাদী কিউবার নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রোর আচরণ দিয়েও সেটা দেখানো যায়।

ফিডেল ক্যাস্ট্রো নিজের দেশে বিপ্লব করেছেন, সফলতা অর্জন করেছেন। এই কিউবার বিপ্লবে সে দেশের কমিউনিস্টদের ভূমিকা কি ছিল? মার্কসবাদী

পার্টি ব্যতিরেকেই যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হতে পারে এই শতাব্দীতে তার অন্যতম বড় দৃষ্টান্ত কিউবার বিপ্লব। কমিউনিস্টরা তো বিপ্লবের প্রথম দিকে আদৌ ক্যাস্ট্রোর পক্ষেই ছিলেন না। ক্যাস্ট্রো নিজের দেশে বিপ্লব সফল করার পর ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলিতে বিপ্লব "রপ্তানী" করার কাজে হাত দিলেন,—যেমন বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা, পেরু, ব্রেজিল, কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা, চিলি ইত্যাদি দেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন।

১৯৬২ সালে কিউবা ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের পর গত দশ বছরে কিউবা-রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের হেরফের হয়েছে—কখন কখন বন্ধুত্ব—কখনও বা প্রকাশ্য নিন্দা ও বৈরিতা। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে রাশিয়া—চিলি, ভেনিজুয়েলা, ব্রেজিল, কলম্বিয়ার ক্যাস্ট্রো-বিদ্বেষী "প্রতিক্রিয়াশীল" প্রতি-বিপ্লবী দক্ষিণপন্থী সরকারগুলিকে নানারকম সাহায্য দিয়ে এসেছে—এবং রাশিয়ার সঙ্গে এই সব ক্যাস্ট্রো-বিরোধী সরকারগুলির সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে ( Normalisation of the diplomatic and trade relations )। ক্যাস্ট্রো ল্যাটিন আমেরিকার সংগ্রামী সংগঠনের সমন্বয় সংস্থার [ Latin American Solidarity Organisation ( O L A S ) ] ১৯৬৭ সালের ১০ই মে সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে কটাক্ষ করে বলেন :

"If internationalism exists, if solidarity is a word worthy of least that we can expect of any state of socialist camp is that it refrain from giving any financial or technical and to these regimes." অর্থাৎ আন্তর্জাতিকতা বলে যদি কোন তত্ত্ব সত্যি সত্যিই থাকে, যদি সমআদর্শবাদীদের সৌহার্দ্যের কোন দাম থাকে তাহলে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ন্যূনতম আচরণটুকু অন্তত আশা করা যেতে পারে যে, এইসব সরকারগুলিকে সেই সব সমাজতান্ত্রিক দেশ কোনরকম অর্থনৈতিক বা কারিগরি সাহায্য দান করবে না।

শুধু রাশিয়া এই ক্যাস্ট্রো-বিরোধী সরকারকে সাহায্যই করে যাচ্ছে না, এই সব দেশে ক্যাস্ট্রোপন্থীরা যে বিপ্লবী গেরিলা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন—স্থানীয় কমিউনিস্টরা তারও বিরোধিতা করছেন। ভেনিজুয়েলাতে এটা প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। ভেনিজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টি ( P.C.V. ) ক্যাস্ট্রোপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। ক্যাস্ট্রোও তাদের তীব্র নিন্দা করতে ছাড়েন নি। ভিয়েৎনাম যুদ্ধ ও আরব-ইস্রাইল সংঘর্ষে রুশ মনোভাবকে

কেন্দ্র করেও রাশিয়া ও কিউবার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে একাধিকবার। আবার ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় রুশ আক্রমণ কিউবার এই বিপ্লবী নেতাকে একটা মস্ত সুযোগ এনে দিল দুই দেশের সম্পর্ককে ঝালিয়ে নেবার।

প্রথমে ক্যাস্ট্রো এই আক্রমণের ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তিনি আমলাতান্ত্রিক নোভৎনি ও 'শোধনবাদী' ডুবচেকের সমালোচনাও করলেন। তিনি আবার একইসঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার সার্বভৌমত্বের ওপর আক্রমণ এবং রুশ ও ওয়ারশ জোটভুক্ত সেনাবাহিনী কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া দখল সমর্থন করলেন। তিনি বললেন, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রতি-বিপ্লবের দিকে গড়িয়ে চলেছিল—ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদীদের খপ্পরে গিয়ে পড়ছিল। রাশিয়া এটা হতে না দিয়ে ঠিকই করেছে। এতে রাশিয়াকে খুশী করা হল বটে, কিন্তু আসল কথাটা পরেই ছিল। তিনি দাবী করলেন এই একই যুক্তি দ্বারা রুশ ও ওয়ারশ জোটভুক্ত সেনাবাহিনী উত্তর ভিয়েৎনাম, উত্তর কোরিয়া ও কিউবায় পাঠান উচিত তাদের প্রতিরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের আক্রমণ করলে বা আক্রমণের হুমকী দিলে কি রাশিয়া এই বিপুল সেনাবাহিনী এদেশে পাঠিয়ে এদেশকে রক্ষা করবে?

"...will they send the divisions of Warsaw Pact to Cuba if Yankee imperialists attack—or even threaten to attack – our country, if we request it?" (Castro)

আবার দুই দেশের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের দখিন হাওয়া বইতে সুরু করল। উত্তেজনা প্রশমিত হল। কারুর পৌষমাস কারুর সর্বনাশ। একটি গর্হিত অন্যায় ও আন্তর্জাতিক অপরাধকে সমর্থন করে কিউবার ভাগ্যে জুটল নতুন রুশ দাক্ষিণ্য ও সাহায্য—বেশ কিছু অস্ত্র-শস্ত্র, আরও কিছু প্রতিশ্রুতি।

ল্যাটিন আমেরিকায় বিপ্লব ছড়াবার কাজে হাত দিয়ে কিউবা-ও শেষ পর্যন্ত বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন (isolation) হয়ে পড়ছিল। রাশিয়ার সঙ্গে ১৯৬৮-৬৯ সালের নতুন বোঝাপড়ার দরুন সেই পরিস্থিতি থেকে নিজের দেশকে ক্যাস্ট্রো বাঁচাতে সচেষ্ট হলেন। অবস্থার চাপে ও বাস্তববাদী হিসাবে তাঁকে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকতে হয়েছে। কেননা ১৯৬৫-৬৭ সালের মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বামপন্থী গেরিলা সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটে। বলিভিয়ায় ১৯৬৭ সালে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নেতা আরনেস্টো চে গুয়েভারার প্রতিপক্ষের হাতে মৃত্যু—এই ধরনের আন্দোলনের ব্যর্থতার দিকটাই ফুটিয়ে তুলেছিল সেদিন। ক্যাস্ট্রো গেরিলা-ধাঁচের সংগ্রামের অপরিহার্যতার উপর

আর জোর দিচ্ছিলেন না। ১৯২৮ সালের ২৬শে জুলাই-এর এক ভাষণে তিনি বলেন:

"Every people and every nation has its way of interpreting revolutionary ideas. We do not pretend to be the most perfect revolutionaries. We do not pretend to be the most perfect interpreters of Marxist-Leninist ideas, but we have our own ways of interpreting those ideas."

অর্থাৎ: প্রত্যেক জাতি ও দেশই বিপ্লবী ভাবধারাকে নিজের মত করে ব্যক্ত করে থাকে। আমরা একমাত্র খাঁটি ত্রুটিমুক্ত বিপ্লবী বলে বড়াই করি না কখনও। আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবধারারও একমাত্র সঠিক সমঝদার তাও বলি না। তবে আমরা আমাদের বিচারমত সেইসব ভাবধারার ব্যাখ্যা করে থাকি। (ক্যাস্ট্রো)

সশস্ত্র গেরিলা-ধাঁচের বিপ্লবের পথ থেকে ক্যাস্ট্রোকে সরে আসতে হয়েছে—রাশিয়ার সাহায্য বেশী করে পাবার আশায়ও। তিনি তাঁর আগের দিনের আপোষহীন গেরিলা-যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মনোভাব পরিহার করতে দ্বিধা করেন নি। এতে কিউবার সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের দ্রুত উন্নতি যেমন হয়েছে, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের রুশ অনুগত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সঙ্গে সম্পর্কও সাথে সাথে মিত্রসুলভ হয়েছে। অবশ্য এই মৈত্রীর স্থায়িত্ব আবার নির্ভর করবে ক্যাস্ট্রো কর্তৃক কিউবার জাতীয় স্বার্থের মূল্যায়নের ওপর। কিন্তু রাশিয়া ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সঙ্গে কিউবার সম্পর্ক একদিকে যেমন ভাল হচ্ছে তেমনি আবার ল্যাটিন আমেরিকার গেরিলা আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে ক্যাস্ট্রোর সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। ভেনিজুয়েলার গেরিলা সংগঠনের নেতা ডগলাস ব্রেভো ( Douglas Bravo ) ক্যাস্ট্রোর এই নীতির সমালোচনা করেছেন। অভিযোগ: (১) কিউবা বিপ্লবী আন্দোলন থেকে সমর্থন সরিয়ে নিচ্ছে, (২) রাশিয়ার কাছে নতি স্বীকার করছে। পেরুতে একটি কমিউনিস্ট-বিরোধী সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্যাস্ট্রো এই পেরু-র সামরিক শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন এখন।

পেরু-র শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে এই নতুন বোঝাপড়ার নীতির সাফাই গাইতে গিয়ে সমাজতন্ত্রী নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রো বলেছেন: কিউবার সমর্থন যে কেবলমাত্র সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রামী আন্দোলনের সমর্থনেই সীমাবদ্ধ থাকবে এমন নয়। যে-কোন সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে থেকে নিজের

দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করে সে দেশকে বাঁচাতে চাইবে তাদেরই কিউবা সমর্থন করবে। যে-দেশেই সেই সরকার ক্ষমতা দখল করুক না কেন তাতে এসে যায় না। কিউবা তাকে সমর্থন করবে।

ভেনিজুয়েলার দক্ষিণপন্থী সরকারের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক ১৯৫২ সালের জুন মাসে ছিন্ন হয়—রুশ দূতাবাসের দুজন কূটনৈতিক অফিসারের আচরণকে কেন্দ্র করে। ১৮ বছর পর রাশিয়া আবার ১৯৭০ সালে ভেনিজুয়েলার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে ভেনিজুয়েলার সরকারের সর্ত মেনে নিয়ে।

ডগলাস ব্রেভো (Douglas Bravo) ফিডেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে তাঁর সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন এই অভিযোগ তুলে যে, ক্যাস্ট্রো রাশিয়ার পক্ষে ঝুঁকেছেন এবং সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের মৌল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। ব্রেভোর বিপ্লবী গেরিলা সংস্থা [National Liberation by Armed Forces (NLAF)] গত কয়েক বছর ধরেই ভেনিজুয়েলার সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা বিদ্রোহ চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্রেভো ক্যাস্ট্রোর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করেছেন যে, কিউবা ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবী আন্দোলনে সর্বপ্রকার সাহায্য দান বন্ধ করে দিয়েছে এবং "ল্যাটিন আমেরিকান সলিড্যারিটি অর্গানাইজেশনের" প্রস্তাব উপেক্ষা করেছে। ক্যাস্ট্রো ভেনিজুয়েলার রুশ-পন্থী 'দক্ষিণপন্থী' (Right) কমিউনিস্ট পার্টির পথ অবলম্বন করায় ব্রেভো তীব্র সমালোচনা করেছেন। [CARACAS Jan. 14, 1950 Douglas Bravo, head of the Venezualan Leftist guerilla movement, announced in a document published here today that he had broken away from Cuba's Fidel Castro because the latter had abandoned principles of "proletarian internationalism"—report A.F.P., see Hindusthan Standard, dated 15th January, 1950]

বিভিন্ন দেশে বিপ্লব ছড়িয়ে দেবার আদর্শ কতটা বাস্তববাদী, যারা এই আদর্শের একটানা প্রচার চালিয়ে দুনিয়ায় নিজেদের বিপ্লবী-ভাবমূর্তি ও গ্ল্যামার তৈরী করেছেন তাঁরা কতটা নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে সেই আদর্শ অনুসরণ করছেন, দুনিয়ার অনুন্নত পরিবর্তনকামী দেশগুলির সংগ্রামী বিপ্লববাদী মানুষগুলিকে কতটা বোকা বানিয়ে নিজেদের বিশেষ বিশেষ জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও পরিবর্তন করছেন তা ওপরের আলোচনা থেকেও বোঝা যাবে।

ল্যাটিন আমেরিকার OLAS ( Latin American Solidarity Organisation ) একটি আঞ্চলিক কমিণ্টার্ণ-ধাঁচের সংগঠন। ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবীদের ভূমিকা ও আচরণের মধ্য দিয়ে সমগ্র মহাদেশে বিপ্লব সংগঠিত করার আন্তরিকতা, আগ্রহ ও কৌশলবাজী কোনটা কতটা তা বোঝা যাবে।

লেনিন তাঁর বিখ্যাত রচনা Left Wing Communism-এ মন্তব্য করেছিলেন :

"After the victory of proletarian revolution in at least one of the advanced countries, situation, in all probability, will take sharp turn. Very soon after that Russia will cease to be the model country and once again become a backward (in the 'Soviet' and the socialist sense) country." [Selected Works—vol. X, p. 57]

অর্থাৎ "পৃথিবীর অন্তত একটি উন্নত প্রাগ্রসর দেশে সর্বহারা বিপ্লব সংগঠিত ও সফল হওয়ার পর ইতিহাস খুব সম্ভবত একটি বড় রকমের মোড় নেবে এবং তার পর রাশিয়া আর মডেল বলে গণ্য হবে না। হয়ত সে আবার পিছিয়ে পড়া দেশ বলেই বিবেচিত হবে।" ( লেনিন )

এর এক বছর পর ট্রট্স্কী Third Comintern Congress-এ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন :

"Our country is quite backward, indeed barbarous. It is a country that reflects the picture of misery. Still we are defending this picture of the world revolution because there is no other one at the present moment. When there is another one, France or Germany, the Russian pillar will lose nineteenths of its importance and we are all ready to join you in Europe to defend another more important pillar."

[Revolutionary International (1864—1943), p. 173, Edited by Milorad Drachkovitch ]

ট্রট্স্কী আরও জোরাল ভাষা ব্যবহার করেছিলেন :

"আমাদের দেশ বেশ অনুন্নত, শুধু তাই নয়, বর্বরও বলা চলে। এই দেশ পুঞ্জিত দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি। তবু বিশ্ববিপ্লবের স্তম্ভস্বরূপ। এই দেশকে আঁকড়িয়ে ধরে আছি, কেননা সামনে এদেশ ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় দেশ নেই যাকে এইভাবে আঁকড়িয়ে ধরতে আমরা পারি এই মুহূর্তে। কিন্তু যখন

জার্মানী বা ফরাসী দেশে এরূপ বিপ্লব সাধিত হবে তখন বিশ্ববিপ্লবের স্তম্ভস্বরূপ রুশদেশের প্রাধান্য ও গুরুত্ব দশভাগের নয় ভাগ লোপ পাবে। তখন আমরা ইউরোপের এই সব উন্নত দেশের বিপ্লবকে আরও জোরালভাবে রক্ষা করতে এগিয়ে আসব। সেই দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে হাত মেলাব।" (ট্রট্স্কী)

মনে রাখতে হবে ট্রট্স্কীর "চিরন্তন বিপ্লব" তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর এই ঘোষিত মন্তব্যের সঙ্গতি রয়েছে। তিনি এই একই কারণে স্তালিনের "একদেশেসমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা-তত্ত্বের" বিরোধী ছিলেন (Socialism in one country)। রাশিয়া সমাজতন্ত্রের মডেল হবে একথা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। ঠিক একই মার্কসীয় তত্ত্ব ডায়ালেকটিক অনুযায়ী চীন দেশকেও সমাজতন্ত্রের মডেল-রূপে মেনে নেওয়া যায় না। আবার স্তালিনের "Socialism in one country" এই তত্ত্বের সঙ্গে রাশিয়াকেই বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আদর্শ মডেল বলে জোর করে সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে দিয়ে মানিয়ে নেবার সংকীর্ণতাবাদী রাজনীতি ও কূটনীতি লুকানো রয়েছে। চীনের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

বুখারিনও বলেছিলেন, "a backward country would not remain the vanguard of an international proletarian movement."

তাঁর ভাষায়:

"We must not infer that the Russian Communist Revolution is the most thorough-going revolution in the world ; nor must we infer that the less developed capitalism is in any country, the more "revolutionary" will be that country and the nearer to Communism. The logical consequence of such a view would be that the complete realisation of Socialism would first occur in China, Persia, Turkey and other countries where practically no proletariat has yet come into existence. Were this the case the teachings of Marx would be completely falsified [ Bukharin : The ABC of Communism ( London 1922 ) p. 131—132 ] এ তো মার্কসবাদী যুক্তি। কিন্তু লেনিন এই যুক্তিতে আস্থা হারিয়ে ছিলেন শেষ জীবনে।

পশ্চিম ইউরোপে বিপ্লব ত্বরান্বিত হবে এই বিশ্বাস লেনিনের শিথিল হয়ে আসছিল। তিনি অনুন্নত প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। ১৯২৩ সালের ৩রা মার্চ একটি রচনায় তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন:

"The final issue of the struggle depends in the last analysis on the simple fact that Russia, India, China, etc., constitute the overwhelming majority of the population of the globe. The majority is swept along during these last years, with an extraordinary rapidity, in the struggle for its liberation and there could not exist the shadow of a doubt about the nature of the definite result of that world struggle. For that reason the definitive victory of socialism is assured and obtained in advance." [Better fewer, But better—Lenin.]

কিন্তু এ চিন্তা কি আদৌ "মার্কসবাদী" না অ-মার্কসবাদী? মার্কসীয় তত্ত্ব-বিশারদ বুখারিনের মন্তব্যেরও ঠিক বিপরীত। লেনিনের উপরোক্ত মন্তব্যের সঙ্গে ডায়ালেকটিক্সের সঙ্গতিই বা কতটুকু? আর বিপ্লবী সংগ্রামের শেষ ফয়সালা হবে প্রাচ্য-ভূমি থেকেই আশা করেছিলেন লেনিন। কিন্তু এই প্রাচ্যেই দুটি সমাজতান্ত্রিক দেশ চীন ও রাশিয়া তাদের সুদীর্ঘ সীমান্ত বরাবর বিপুল সৈন্য মোতায়েন করেছে—দুটি দেশ পরস্পরকে পরস্পরের চরম শত্রু বলে ঘোষণা করছে—দুই দেশের "শ্রেণী-সচেতন" জনমানসে জাতিবিদ্বেষ, জাতি সঙ্কীর্ণতার (national chauvinism) বীজ বপন করে চলেছে। রাশিয়া আজ কমিউনিস্ট চীনের চোখে "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী" বলে বিবেচিত, আর চীন রাশিয়ার চোখে কুবলাই খাঁ, চেঙ্গিস খাঁ প্রমুখ লুণ্ঠনকারী চৈনিক মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণিত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী সমর্থক বলে পরিচিত। কমিউনিস্ট চীনে মাও সে-তুঙ এহেন বীভৎস অত্যাচারী লুণ্ঠনকারী চেঙ্গিস খাঁর স্মৃতিসৌধ "শ্রেণী সচেতন" শ্রমিকদের দিয়ে শোষিত জনগণের অর্থ দিয়ে নির্মাণ করেছেন বলে প্রচারিত। এই দুই সমাজবাদী রাষ্ট্রের পরস্পর-বিরোধিতার কাছে পুঁজিবাদী দুনিয়ার আদর্শগত সংঘাত দিন দিন ম্লান হয়ে যাচ্ছে—দুই শিবিরের বিভাজন রেখাও আবছা থেকে আবছাতর হচ্ছে।

লেনিনের উপরোক্ত শেষ প্রত্যাশা বা বিশ্বাসের সঙ্গে দুই সমাজতান্ত্রিক দেশের এই বিবদমান আচরণের প্রচণ্ড অসংগতি কি রাজনীতির ছাত্রদের চোখে প্রকট হয়ে দেখা দেয় না? "শেষ বিপ্লবী সংঘর্ষের চূড়ান্ত ফয়সালা" কি শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংঘাতের মধ্য দিয়ে আসবে নরমেধ যজ্ঞের মাধ্যমে? আর এই দুই সমাজবাদী রাষ্ট্রের সংঘাত এড়াবার জন্য অদৃষ্টের আর

এক নিষ্ঠুর পরিহাস পুঁজিবাদী ত্নুনিয়ার শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকসন প্রশাসনকে মধ্যস্থতার ভূমিকা নিতে হচ্ছে। তুই দেশের সাচ্চা মার্কসবাদী বিপ্লবী নেতারা কূটনীতিবিশারদ কিসিংগারের কানে কানে পরস্পরের আক্রমণাত্মক সম্প্রসারণবাদী মনোভাবের কথা শোনাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া ও আমেরিকা এবং চীন ও আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক মধুরতম ও বন্ধুপ্রতিম হয়ে উঠছে, পৃথক পৃথক চুক্তিও একের পর এক সম্পাদিত হয়ে চলেছে। লেনিনের বিশ্ববিপ্লবের তত্ত্ব, আন্তর্জাতিক সংগ্রামের 'শেষ ফয়সালা'-তত্ত্বের বা বিশ্বাসের প্রতিফলন কি এই অবিশ্বাস্য তত্ত্ব-বিরোধী আচরণের মধ্যে ঘটেছে? রাজনীতির ছাত্ররাই খোলা মন দিয়ে বিচার করে দেখবেন।

রাশিয়া, ভারত ও চীনের জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মধ্যে সর্ববৃহৎ গোষ্ঠী। এই তিনটি দেশ সমাজবাদী শিবিরের শরিক হয়ে পুঁজিবাদী তুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই-এ অবতীর্ণ—আর সে লড়াই-এর ভবিষ্যৎ যে সমাজবাদী শিবিরেরই পক্ষে—সুনিশ্চিতভাবে সেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়—এই লেনিনবাদী বিশ্বাস প্রচণ্ড আঘাত খেয়েছে—চীন কর্তৃক তিব্বত দখল করে—সেই সুবিশাল স্বাধীন দেশকে "চীনের ভূখণ্ড" বলে বন্দুকের নলের জোরে গোটা বিশ্ব বিশেষ করে সমাজবাদী তুনিয়াকে দিয়ে মানিয়ে নেওয়ার দ্বারা। এ বিশ্বাস প্রচণ্ড চোট খেয়েছে ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে বিনা প্ররোচনায় কমিউনিস্ট চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের ঘটনার দ্বারা। আবার বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শরিক কমিউনিস্ট চীন—প্রকাশ্যে তুর্বার মুক্তি আন্দোলন দমনকারী পাকিস্তানের সামরিক জুন্টাকে সাহায্য করেছে, লক্ষ লক্ষ মুক্তিপাগল বাঙলাদেশের শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী ছাত্র-যুবককে পরিকল্পিত উপায়ে হত্যা করার তুর্ধর্ষ সামরিক জুন্টার বিকৃত কুৎসিততম চক্রান্তকে নিরঙ্কুশ ও নিঃসর্ত সমর্থন জানিয়ে। চীনের মাওবাদী-লেনিনবাদী শাসকগোষ্ঠী কি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে শেষ ও চূড়ান্ত সাফল্য-সম্ভাবনা ও অনিবার্য বিশ্ব-বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন?

ভিয়েৎনামে—যেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের এশিয়া ভূখণ্ডে 'শেষ সংগ্রাম' গত কয়েক বছর ধরে চলেছে (এখন বন্ধ হয়েছে) সেখানেই কি রাশিয়া ও চীনের লক্ষ লক্ষ 'মুক্তিযোদ্ধা' (Liberators) উত্তর ভিয়েৎনামের ইতিহাসের 'শেষ রক্তাক্ত বিপ্লবের' মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যবনিকাপাত ঘটিয়ে সফল ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের গৌরব-মুকুট পরিধান করার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েনি? মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা

ভেবে দেখবেন প্রশ্নগুলি আর একবার। সমাজতন্ত্র যখন পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত তখন কোন সমাজতান্ত্রিক দেশই আর এক জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক দেশের কাছে "মডেল" হবে না। প্রত্যেক দেশই তার ভৌগোলিক পরিবেশ, ঐতিহ্য, জাতীয় মনীষা, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির বাস্তববাদী মূল্যায়ন, স্বার্থ তথা দেশপ্রেমের ভিত্তিতেই নিজ নিজ দেশের সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলবে। কিন্তু তাতে চীন বা রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতাদের—তথা স্তালিনবাদী ও মাওপন্থীদের মন ভিজবে না তো! সমাজতন্ত্রের তথাকথিত মডেল-তত্ত্বকে সমাজবাদী শিবিরকে দিয়ে মানিয়ে নেবার জন্যেও "Socialism in one country" তত্ত্বকে স্তালিনবাদীরা আঁকড়িয়ে ধরে থাকে—অবিরামভাবে বিশ্ব-বিপ্লবের তত্ত্বকথা প্রচারের আড়ালে। কিন্তু একথা আজ সকলের কাছে স্পষ্ট যে, প্রত্যেক দেশকে জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই নতুন সমাজ গড়ার ব্রত নিতে হবে—আন্তর্জাতিকতাবাদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে রাশিয়া, চীন বা আর কারও তাঁবেদারি করার কোনো দরকারই নেই।

২

## জার্মান বিপ্লব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগ থেকেই জার্মান জনগণ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। তারা যুদ্ধের অবসান চাইছিল, যেমন চাইছিল অগণতান্ত্রিক শাসনের অবসান। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক দলগুলি দেশপ্রেমিক হিসাবে যুদ্ধ সমর্থন করেছিল এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পক্ষে ছিল। জনগণ ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এইখানে একটা মানসিক ব্যবধান গড়ে ওঠে। জার্মানীতে ১৯১৭ সালে স্বতন্ত্র দল হিসাবে ইউনাইটেড সোস্যালিস্ট পার্টি ( U. S. P. ) গঠিত হয়। দেশের উদারপন্থীদের প্রভাব ছিল অনেক বেশী। উদারপন্থীদের পেছনে সমাজতন্ত্রীরা সামিল হয়েছিলেন।

যুদ্ধের শেষভাগে জার্মানীর পরিস্থিতি সব মিলিয়ে ছিল অগ্নিগর্ভ। উগ্রপন্থীরা সোভিয়েট দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করছিলেন—অর্থ ও অস্ত্র দুই-ই মিলছিল সেখান থেকে। এই সময় জার্মানীর আর একটি বাম শক্তি স্পার্টাকাসবুন্দ ( Spartacusbund ) সক্রিয় ছিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন রোজা লুক্‌সেমবুর্গ, কার্ল লিব্‌নীখট্‌ প্রভৃতি। তবে এঁদের শক্তি ছিল খুবই সীমিত। এঁদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল চরমপন্থী ও সংগ্রামাত্মক। এই গোষ্ঠীর নেতা ও কর্মীরা ছিলেন সৎ, নিষ্ঠাবান, আত্মত্যাগী ও আদর্শবাদী। নেত্রী রোজা লুক্‌সেমবুর্গ ছিলেন যেন বিপ্লবের আগুনে আত্মাহুতি দেবার নিমিত্ত এক উৎসর্গীকৃত প্রাণ—বিপ্লবী আদর্শবাদের প্রজ্বলন্ত এক শিখা। এই গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা লিব্‌নীখট্‌ ১৯১৮ সালে কারামুক্তি পেয়ে বিপ্লব প্রস্তুতির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

সেনাবাহিনীর মধ্যে খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষ এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে দেখা দিচ্ছিল। এইসব সংঘর্ষের মধ্যে কিয়েল-এর নাবিক বিদ্রোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্রোহী নাবিকরা শহর দখল করে নেয়। অবশ্য এদের আন্দোলনে কোনরূপ রাজনৈতিক শ্লোগানই ছিল না। বিদ্রোহ কিয়েল থেকে মিউনিখ নগরীতে ছড়িয়ে পড়ল। "Revolutionary Shop Stewards"

—দল সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ৯ই নভেম্বর সাধারণ ধর্মঘটের দিন ধার্য হল। সমাজতন্ত্রীরা ছিলেন এর পুরোভাগে। পরিবেশ যখন বিপ্লবীদের অনুকূলে তখন বিপ্লবীরা বহু দল-উপদলে বিভক্ত। 'Revolutionary Shop Stewards Committee' বার্লিন শহরে সোভিয়েট গঠন করলেন। নির্বাচনেরও ডাক দিলেন, কিন্তু এখানে তাঁরা ব্যর্থ হলেন। U. S. P. ও বার্লিন নগরীর সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক প্রতিনিধিরাই বার্লিন সোভিয়েটের কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করলেন শেষ পর্যন্ত—১৯১৮ সালের ১০ই নভেম্বর। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটল।

১৯১৯ সালের ১৯শে জানুয়ারী গণপরিষদের নির্বাচন হল। সমাজতন্ত্রীরা বিপুল সংখ্যায় নির্বাচিত হলেন। তারা U. S. P. দলের চাইতেও ৫ গুণ বেশী ভোট পেলেন। শ্রমিকশ্রেণী শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিল, রক্তাক্ত বিপ্লব চায়নি। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে জোয়ার এল। এক বছরের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্যসংখ্যা ৮০ লক্ষে গিয়ে দাঁড়াল। যুদ্ধের আগে সদস্যসংখ্যা এর ক্ষুদ্র এক ভাগ ছিল মাত্র। সর্বত্র বেতন বৃদ্ধির দাবী উঠল। যুদ্ধে পরাজিত ক্লিষ্ট মানুষ আর দুঃখ-কষ্টের বোঝা ও দিনযাপনের গ্লানি সহ্য করতে পারছিল না। আবার, দেশের যা আর্থিক পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল তাতে শ্রমিকদের সব দাবী মেটান সম্ভবও হয়নি। ফলে তিক্ততা ও ছোট-খাট সংঘর্ষ দেখা দিচ্ছিল দেশের বিভিন্ন অংশে।

দেশে এই সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ সোস্যালিস্ট ও স্বতন্ত্রপন্থীরা মিলে একটা কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। কিন্তু কর্মসূচী নিয়ে মতভেদ দেখা দিল। তবে তাঁরা শ্রমিকদের কয়েকটা বড় দাবী মেটাতে সক্ষম হয়েছিলেন, যেমন—শ্রমিকদের জন্য দিনে আট ঘণ্টা কাজের প্রবর্তন। কারখানাগুলিকে সামরিক কর্তৃত্ব থেকে রেহাই দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত হল। এই সরকার শিল্পের জাতীয়করণ নীতি গ্রহণের অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কিন্তু ক্ষমতায় আসবার আগে সমাজতন্ত্রীরা পূর্ণ জাতীয়করণের আশ্বাস দিয়েছিলেন দেশবাসীকে। তাঁদের আচরণের এই স্ববৈপরীত্য কমিউনিস্ট উগ্রপন্থীদের হাতে তাদের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক জেহাদ ও প্রচার অভিযান চালাবার মস্ত সুযোগ দিল। সমাজতন্ত্রীদের এই নূতন ভাবধারাকে পরবর্তীকালে অনেকে German N. E. P. বা 'জার্মানীর নয়া অর্থনীতি' [লেনিন রাশিয়ায় ১৯২১ সালে N. E. P. প্রবর্তন করেন এবং এই নীতিকে "কৌশলগত পশ্চাদপসরণ" ("tactical retreat") বলে বর্ণনা করেছিলেন।]

সমাজতন্ত্রীদের কার্যপ্রণালী দেখে মনে হয় যেন দলের কোন সুষ্ঠু আদর্শই নেই। কোন ব্যাপক গঠনমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভূমিসংস্কারের পরিকল্পনাও সরকার দেশবাসীর কাছে রাখতে পারেননি। শুধু শ্রমিকদের মজুরী বা বেতন বৃদ্ধি করেই দেশের অর্থনীতিকে ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। আর শ্রমিকরাও জাতীয়করণের ব্যাপারে তত উৎসাহী ছিল না—যতটা উৎসাহী ছিল নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের আশু প্রয়োজনীয়তায়। দেশে দাঙ্গা-বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল। এইসব হাঙ্গামা বন্ধ করার জন্য সোস্থালিস্ট কোয়ালিশন সরকার "স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর" সাহায্য নিলেন। কিন্তু এই স্বেচ্ছাসেবকরা আদৌ প্রজাতন্ত্রের আদর্শে আস্থাবান ছিল না। অবস্থা বুঝে U. S. P. সদস্যরা কোয়ালিশন সরকার থেকে ইস্তফা দিলেন।

এই সময় জার্মান বিপ্লবীদের মধ্যে একটা নতুন চিন্তা প্রভাব বিস্তার করল। তাঁদের ধারণা পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত নিয়ে কাজ করতে গেলে পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না। রাশিয়ার 'অক্টোবর বিপ্লবের' শিক্ষাকে জার্মান পরিস্থিতিতে কাজে লাগান যাক—এই ছিল তাদের মনের কথা। লেনিন গণপরিষদে নিজের দলের সংখ্যাল্পতা দেখে চরম অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণপরিষদ বাতিল করে দিয়ে সামরিক বাহিনী ও পুলিশের সাহায্যে জোরপূর্বক সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের শাসন চাপিয়ে দিয়েছিলেন রাশিয়ায়।

কমিউনিস্ট ভাবধারায় অনুপ্রাণিত জার্মান বিপ্লবীরা সে সময় মোটামুটিভাবে তিনটি উপদলে বিভক্ত ছিলেন: (১) রোজা লুক্‌সেমবুর্গ ও লিব্‌নীখটের নেতৃত্বাধীন স্পার্টাকাসবুন্দ্‌গোষ্ঠী; (২) লেনিন-র‍্যাডেক প্রভাবিত ব্রেমেন-এর উপদল (Bremen group); (৩) রেভলুশনারী শপ স্টুয়ার্ড-গোষ্ঠী। এই তিনটি উপদলের মধ্যে মতভেদ খুব তীব্র ছিল। রোজা লুকসেমবুর্গ চেয়েছিলেন যে, যখন স্পার্টাসিস্টরা ও তাঁর অনুগামীরা যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলির তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে তখনই তাদের ক্ষমতায় থাকার প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা ক্ষমতায় যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভাবলেন দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ শক্তি তার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। পরে একনায়কতন্ত্রী সরকার জনগণকে বুঝিয়ে তাদের পক্ষে আনতে পারবে। রাশিয়ায় যখন এটা সম্ভব হয়েছিল—জার্মানীতেই বা কেন হবে না? আদর্শবাদী রোজা লুক্‌সেমবুর্গ

ও কার্ল লিব্‌নীখট্‌ শেষে চাপে পড়ে হঠকারিতার পথে ( adventurism ) পা বাড়ালেন। বিপ্লবের আগুনে আত্মাহুতি দিলেন নিজেরাই শেষ পর্যন্ত।

স্পার্টাসিস্টরা পার্লামেণ্টের প্রতি আস্থবান ছিলেন না, ট্রেড ইউনিয়ন আমলা-তান্ত্রিকতা ও কায়েমী স্বার্থের ঘোর বিরোধী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই গোষ্ঠী সকল প্রকার আমলাতন্ত্রেরই বিরোধী ছিলেন। রুশ কমিউনিস্টদের 'সোভিয়েট' প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীকে এঁরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রোজা লুক্সেমবুর্গ ছিলেন গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি গভীর আস্থাবান। এ ব্যাপারে লেনিনের সঙ্গে তাঁর গভীর মত-পার্থক্য হয়েছিল। তিনি লেনিনের 'পেশাদারী বিপ্লবীদের' বিপ্লব পরিচালনা তত্ত্বের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। লেনিন-ট্রট্স্কীর সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব-সম্পর্কিত ভাবধারার সমালোচনা করে তিনিই একদিন বলেছিলেন :

"...bourgeois class rule has no need of political training and education of the entire mass of the people, at least not beyond certain narrow limits. *But for the proletarian dictatorship that is the life element, the very air without which it is not able to exist.*"

এই সর্বহারার একনায়কত্বের প্রাণবায়ু হল গণতন্ত্র যা ব্যতিরেকে এ বাঁচতেই পারে না। লেনিনকে গণতন্ত্র—স্বাধীনতার (freedom) কথা বললেই বলতেন—'গণতন্ত্র—স্বাধীনতা'? কার বা কাদের গণতন্ত্র বা স্বাধীনতা? ( whose liberty ) নিজের বা নিজমতাবলম্বী দলের বিরুদ্ধবাদী বা ভিন্নমতাবলম্বীদের 'স্বাধীনতা' লেনিন মানেননি। এ সম্পর্কেও রোজা লুক্সেমবুর্গের মত ছিল। তিনি বলেছিলেন :

"Freedom only for the supporters of the government, only for the members of our party—however numerous they may be—is no freedom at all. *Freedom is always and exclusively —freedom for the one who thinks differently.*"

"শুধু সরকার পক্ষের লোকদেরই, তাদের সংখ্যা যত বেশীই হোক না কেন,—শুধুমাত্র 'স্বাধীনতা' থাকবে—একটি দলের লোকদেরই কেবলমাত্র 'স্বাধীনতা' থাকবে—তা হতে পারে না। এরূপ স্বাধীনতা 'স্বাধীনতাই' নয়। স্বাধীনতার অর্থই হল ভিন্নমতাবলম্বীর মত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা।"

এহেন আদর্শবাদী আত্মনিবেদিত নিষ্ঠাবান নেত্রীও দলের চরমপন্থীদের চাপে শেষ পর্যন্ত হঠকারিতার পথে চলে গেলেন। চিন্তা ও কাজের মধ্যে

বিরাট ব্যবধান পরিস্ফুট হয়ে পড়ল জনসাধারণের কাছে। কমিউনিস্ট ভাবধারায় পরিচালিত বিপ্লবীরা minority dictatorship-এর তত্ত্বটিকে চূড়ান্ত গোঁড়ামির সঙ্গে আঁকড়িয়ে ছিলেন। এখানেও তাঁদের চিন্তা ও কর্মসূচীর মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিয়েছিল। এঁরা সোভিয়েট-প্রথা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, সকল জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সোভিয়েট-ব্যবস্থা চাননি। তাঁরা আশা করতেন সংখ্যালঘিষ্ঠ একনায়কত্ব জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত হবে—নেতা বা পেশাদারী বিপ্লবীদের দ্বারা নয়। স্পার্টাসিস্টদের কথা ও কাজের গরমিল আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠল যখন সোভিয়েট-নির্বাচনে জনগণ ও শ্রমিকরা বেশী সংখ্যায় U. S. P. ও দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের নির্বাচিত করলেন। এইসব নির্বাচনের ফলাফল দেখে এই বিপ্লবীগোষ্ঠী সোভিয়েট-ব্যবস্থার নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিল।

এই স্পার্টাসিস্ট দল ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে স্বতন্ত্রদের (Independent) সহায়তায় একটি বিকল্প বিপ্লবী সরকার বার্লিন শহরে গঠন করলেন—তিনজন মন্ত্রী নিয়ে। লিব্‌নীখট্‌ একজন মন্ত্রী ছিলেন তাঁদের মধ্যে। জনগণ এর জন্য কিন্তু আদৌ প্রস্তুত ছিল না। এই সরকারের সমর্থনে ও বিরুদ্ধে সমাবেশ সংগঠিত হয়েছিল। বিপ্লবী সরকার সমর্থনকারী জনগণকে কোন আশার বাণী শোনাতে পারল না—কোন সঠিক কর্মসূচীও রাখতে পারল না দেশবাসীর কাছে। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার বিপ্লবীদের সায়েস্তা করার জন্য প্রস্তুতি নিল। সৈন্য ও যুবকদের সাহায্যে পাল্টা আক্রমণ সুরু হয়ে গেল। কোন গণপ্রতিরোধই হল না। কয়েকশত স্পার্টাসিস্ট বীরের মত প্রাণ দিলেন—রোজা লুক্সেমবুর্গ ও লিব্‌নীখটকে হত্যা করা হল। এই দুই নেতা পালিয়ে যাননি—হাঙ্গেরীর কমিউনিস্ট নেতা বেলা কুনের মত সংগ্রাম সাথীদের পেছনে ফেলে দিয়ে। এই দুই নেতার শূন্যস্থান পূরণ করার মত কোন নেতাই জার্মানীতে ছিলেন না। বিপ্লবের নামে হঠকারিতা কি বিপর্যয় ডেকে আনে এই বিপ্লবের ব্যর্থতা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

দেশের জনসাধারণের ওপর স্পার্টাসিস্ট দলের প্রভাব কত কম ছিল—তা ১৯২০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বোঝা গেল। ১৯১৯ সালের নির্বাচনে এই দল অংশ নেয়নি। কিন্তু ১৯২০ সালের নির্বাচনে পার্লামেন্টের ৪০০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ২ জন প্রতিনিধি এই দল থেকে নির্বাচিত হয়েছিল। সে সময় Revolutionary Shop Stewards-দের পেছনে সবচেয়ে বেশী শক্তি

ছিল। নূতন দল গঠনে তাদের ইচ্ছাও ছিল। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে স্পার্টাকাসবুন্দ দলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হল। যাঁরা বামপন্থী চিন্তায় বিশ্বাস করতেন তাঁরা U. S. P. দলে যোগ দিচ্ছিলেন।

সোস্যালিস্ট Noske-সরকারের ভিতরে থেকে U. S. P. ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। স্পার্টাসিস্ট বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর মিউনিখ-এ অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়। সে সময় বার্লিনের সঙ্গে মিউনিখের বিশেষ কোন যোগাযোগও ছিল না, তাই Noske-এর সরকারের কোন প্রভাব সেখানে ছিল না। এটি ছিল কৃষিপ্রধান অঞ্চল—এবং অধিকাংশ মানুষই সমাজতন্ত্রীদের পক্ষে ছিল। ব্যাভেরিয়ার 'বিপ্লবী' সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন Kurt Eisner—একজন স্বতন্ত্রপন্থী নেতা (Independent)। তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। সাংবিধানিক গণতন্ত্রের পথে এগুনো আর সম্ভব নয় মনে করে কমিউনিস্ট ও বাম সমাজতন্ত্রীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের একনায়কত্বের (minority dictatorship) বিকল্প পথকেই বেশী উপযোগী মনে করে সেই পথ বেছে নিলেন। ১৯১৯ সালের (৭ই) এপ্রিল মাসে একটি সোভিয়েট সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হল। এই মিউনিখ সোভিয়েটের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল প্রচুর। সংখ্যাগরিষ্ঠ সোস্যালিস্টদের একটা অংশ এই বিকল্প সরকারকে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু তাদের বড় অংশটি সমর্থন করেনি। কেননা—তারা বরাবরই নীতিগতভাবে যে-কোন একনায়কতন্ত্রে বিরোধী ছিল। মিউনিখের অভ্যুত্থান শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল।

জার্মান বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ের এই ব্যর্থতা দক্ষিণপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করল। সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেল। কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ল। দলের নেতৃত্ব এসে পড়ল পল লেভি-র (Paul Levi) ওপর। লেভি ছিলেন খুব ধনী পরিবারের সন্তান। তাঁর মার্জিত স্বভাব, পাণ্ডিত্য, পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য দলের ক্যাডারদের কাছে ঈর্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। তিনি ছিলেন রোজা লুক্সেমবুর্গের শিষ্য। লেভি—(১) বুঝে-সুঝে হিসাব করে পা ফেলে চলার নীতিতে আস্থাবান ছিলেন; (২) সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে গণসংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দলকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, (৩) ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে ও নির্বাচনে অংশ গ্রহণের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এখানে তিনি দল থেকে বাধা পেলেন। পল লেভি দলের অধিবেশনে (১৯১৯ সালে বার্লিনে) যে থিসীস উপস্থিত করলেন তাকে কেন্দ্র করে তুমুল বিতর্ক সুরু হল। তাঁকে দল থেকে

বহিষ্কার করা হল। অনেক সদস্য দল পরিত্যাগ করে বাম-ঘেঁষা নীতি অনুসরণের জন্য "কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি অব জার্মানী" গঠন করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই নূতন দলও ভেঙে গেল। বামপন্থীরা দল ছেড়ে চলে যাবার পর লেভি-র সঙ্গে কম কর্মীই ছিলেন। লেভি-র প্রভাব দু-তিনটি জেলায় (যেমন Cheminitz, Wartemberg-এ) সীমাবদ্ধ ছিল। রুর, ব্রেমেন, হামবুর্গ, বার্লিন শহরের সংগঠন তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। লেভি দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালালেন—তবে তাঁরা বড় একটা আগ্রহ দেখাননি এ ব্যাপারে। জার্মান কমিউনিস্টদের দুর্বলতা দেখে রাশিয়া কমিণ্টার্ণ মাধ্যমে প্রত্যক্ষ সাহায্য ও যোগাযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হল। কমিণ্টার্ণের প্রতিনিধিরূপে র‍্যাডেক জার্মানীতে অনেক দিন ছিলেন। রুশ প্রভাবে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করল।

এরপর জার্মানীতে দক্ষিণপন্থী প্রতি-বিপ্লবী শক্তির এক অভ্যুত্থান ঘটল। ১৯২০ সালের ১৩ই মার্চ জেনারেল লুৎউইৎস্ (General Luttwitz) সেনাবাহিনীর একাংশ নিয়ে বার্লিন শহর আক্রমণ করে বসলেন। আক্রমণকারীরা তৎকালীন গণতান্ত্রিক সরকারকে গদীচ্যুত বলে ঘোষণা করে ডাঃ ক্যাপ (Dr. Kapp) নামে একজন অতি-প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করল (Kapp Putsch)। অবশ্য এই সামরিক অভিযানে সকল জার্মান সেনাপতিরা যোগ দেয়নি। 'বুর্জোয়া' দলগুলি দ্বিধাবিভক্ত ছিল। গণতান্ত্রিক সরকার স্টুটগার্ট-এ পালিয়ে গেলেন। জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণী সেদিন অভূতপূর্ব সঙ্ঘ শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করতে তারা এগিয়ে এসেছিল। তাদের এই আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক—গণতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত। জনগণ আধা-সোস্যালিস্ট এই গণতান্ত্রিক সরকারকে বাঁচাতে চেয়েছিল, যদিও কমিউনিস্টরা ও চরমপন্থীরা তাদের ঘৃণা করতে শিখিয়েছিলেন। শ্রমিকরা বার্লিন শহরে ধর্মঘটের ডাক দিলেন। রুর অঞ্চলের শ্রমিকরাও রুখে দাঁড়াল প্রজাতন্ত্রের পক্ষে। সেনাবাহিনী তাদের কাছে পরাস্ত হল। চেম্‌নিৎস-এ সোস্যালিস্ট-কমিউনিস্ট যৌথ কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত হল হাইনরীখ্ ব্র্যান্‌ড্‌লারের নেতৃত্বে।

প্রজাতান্ত্রিক সরকার তখন স্টুটগার্টে চলে গেছে। বার্লিন শহরে কোন হাঙ্গামার চিহ্ন ছিল না। কমিউনিস্টরা মনে করলেন শ্রমিকরা সোস্যালিস্টদের বর্জন করেছে এবং সোস্যালিস্টদের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁদের ব্যক্তব্য গ্রহণ করেছে।

উল্লসিত হয়ে কমিউনিস্টরা সোস্যালিস্টপন্থী Noske-সরকারের সমর্থনে ধর্মঘট না করার জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু শ্রমিকরা কমিউনিস্টদের কথায় কর্ণপাত করল না। তখনও দেশের শতকরা ৫০ জন শ্রমিক সোস্যালিস্টদের পক্ষে ছিল। বার্লিন শহরের পথে পথে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল ধর্মঘটী ও ধর্মঘট-বিরোধীদের মধ্যে। লেভি তখন বার্লিন শহরের বাইরে ছিলেন। পরে ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে কমিউনিস্টরা ধর্মঘটে যোগ দিতে বাধ্য হল চাপে পড়ে। চার দিনের প্রতিরোধের পর প্রতি-বিপ্লবী ক্যাপ্-সরকার পদত্যাগ করল। সামরিক বাহিনীর মধ্যে মতভেদও ক্যাপ্-সরকারের পতনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল নিঃসন্দেহে।

নূতন সরকার গঠনের সমস্যা আবার দেখা দিল। বৃদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কার্ল লিজিয়েন (Karl Legien) যিনি প্রজাতন্ত্র রক্ষার কাজে ধর্মঘটের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন—স্বতন্ত্র ও ডান-ঘেঁষা সোস্যালিস্টদের সাহায্য চাইলেন। একটি যৌথ কর্মসূচীর ভিত্তিতে সরকার গঠনের প্রস্তাব তিনি করেন। এই কর্মসূচীর মধ্যে ছিলঃ (১) খনিগুলির জাতীয়করণ, (২) সামাজিক আইনের ব্যাপক উন্নতি সাধন (social legislations), (৩) সরকারী প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণ, (৪) সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজান, (৫) ভূমিসংস্কার ইত্যাদি। স্বতন্ত্ররা লিজিয়েনকে প্রধানমন্ত্রী করতে চাইল বটে তবে মন্ত্রিসভায় বড় বড় দপ্তরগুলি ও বেশী মন্ত্রী দাবী করে বসল। লিজিয়েন তাতেও রাজী হয়ে গেলেন। ১৯২০ সালের ১৮ই মার্চ-এর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে দু'জন কমিউনিস্ট প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন—জ্যাকব্ ওয়ালচার ও উইলিয়াম পিয়েক (Jacob Walcher & William Pieck)—এ. দু'জনেই লেভি-র অনুগামী ছিলেন। নূতন সরকার গঠিত হলে কমিউনিস্টরা কি ভূমিকা নেবেন জানতে চাওয়া হলে আশ্বাস দেওয়া হলঃ দল কর্মসূচীর ভিত্তিতে সমর্থন করে যাবে এবং "Loyal opposition"-এর ভূমিকা নেবে। সরকারকে কোনরকম বেকায়দায় ফেলবে না প্রতিশ্রুতি দিলেন নেতারা। গণতন্ত্রকে সমর্থন জানাবার কথা বলায় দলের ভিতরে ওয়ালচারের এই আচরণ নিয়ে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হল। প্রশ্ন উঠলঃ সোস্যালিস্টদের কিভাবে বিশ্বাস করা যায়? তারা বিশ্বাসঘাতক যে! গণতন্ত্র মানেই তো বুর্জোয়া-শ্রেণীর একনায়কত্ব! অতএব 'গণতন্ত্র' দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর কোন কল্যাণ হতে পারে না। ওয়ালচার মার্কসবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে গিয়েছেন—এই অভিযোগ উঠল।

শ্রমিকনেতা লিজিয়েনের পরিকল্পনাটি আর একদিক দিয়ে বানচাল হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। স্বতন্ত্ররা সোস্যালিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিছুকাল যাবৎ চরমপন্থীরা এই দলের মধ্যে অনুপ্রবেশের কৌশল অবলম্বন করেন। এই দলের সুস্পষ্ট কোন মতবাদ বা কর্মসূচী ছিল না। ধীরে ধীরে দলটি চরমপন্থীদের অনুপ্রবেশের ফলে কমিউনিস্ট-ঘেঁষা হয়ে পড়ছিল। Independents-দের দল ভাঙনের সম্মুখীন হল মন্ত্রিসভায় যোগদানের প্রশ্নে। অতি-বাম কমিউনিস্ট-গোষ্ঠীর মত বাম-ঘেঁষা স্বতন্ত্ররাও বিশ্বাস করতেন যে, গণতান্ত্রিক প্রশাসনের মাধ্যমে দেশের কোন সুরাহা হবে না। দেশের বামপন্থী মহলে আবার 'সংখ্যালঘুর একনায়কত্ব বনাম সংখ্যালঘিষ্ঠের গণতান্ত্রিক শাসন' ( Minority Dictatorship vs. Majority Rule ) 'বিপ্লব বনাম সংস্কার' ( Reform vs. Revolution ) এইসব শাস্ত্রীয় তর্কের ঝড় উঠল। অথচ দেশের জন্য তখন প্রয়োজন ব্যাপক গঠনমূলক পরিকল্পনা, মতবাদের চুলচেরা বিচার বা তাত্ত্বিক কচকচি নয়। শেষ পর্যন্ত লিজিয়েনের প্রস্তাব নামঞ্জুর হল।

রুর ও চেমনিৎস্ প্রদেশে কমিউনিস্টদের শক্ত ঘাঁটি ছিল। পার্টি সেখানে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ঘোষণা করল। কেন্দ্রীয় সরকারী সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণের মুখে দাঁড়ান খুবই কঠিন ছিল। লেনিনের পরামর্শে চেমনিৎস্-এ পার্টির সংগ্রামরত কর্মীরা গৃহযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু রুর-এ পার্টি অন্য নীতি নিল। উগ্রপন্থী স্বতন্ত্ররা ও কমিউনিস্টরা গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাবার সঙ্কল্প ঘোষণা করল। সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে সকল প্রতিরোধ চূর্ণ হল। রুর-এর অভ্যুত্থান এভাবে ব্যর্থ হল।

বিপ্লবী তত্ত্ব-কথার আবহ-সঙ্গীতের পেছনে রাজনৈতিক কূটনীতি কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ইতিহাসের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেবার মুখে সেটা অনুধাবন করা প্রয়োজন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধির সর্তগুলিকে কেন্দ্র করে ইউরোপে জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র মন কষাকষি চলছিল। রাশিয়ার বলশেভিক সরকার তখন এই দুই দেশের দ্বন্দ্বের পূর্ণ সুযোগ নিতে আগ্রহী। এই ফাঁকে আমরা একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক চুক্তি ও তার তাৎপর্য আলোচনা সেরে নেব পরবর্তী অধ্যায়ে।

# ৩

## জেনোয়া ও র‍্যাপালো চুক্তি
## কমিউনিজম-ক্যাপিটালিজমের সহাবস্থান

১৯২২ সালের ইতালীয় সমুদ্রোপকূলস্থ র‍্যাপালো সহরে (Rapallo Treaty) জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তাতে জেনোয়া আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত ব্রিটেন ও ফ্রান্স (Ententis Powers) স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ভার্সাই চুক্তির পর জার্মানীর ওপর নানা ধরনের অবিশ্বাস্য অপমান-অসম্মানের বোঝা ইংরেজ ও ফরাসী রাষ্ট্রনেতা কূটনীতিবিদরা চাপাতে চেয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন রাশিয়াকে ইউরোপীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনার অংশীদার ও অন্তর্ভুক্ত করতে একদিক থেকে, অন্য দিক দিয়ে তাঁরা চেয়েছিলেন রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে বৈরিতার দেওয়াল তুলে দিতে। তাঁরা চেয়েছিলেন যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ফরাসী ইংরেজদের মত রাশিয়াও মোটা অংক দাবী করুক। জেনোয়া বৈঠকে যখন কালনেমির লঙ্কা ভাগের আয়োজন চলছে ঠিক তখন র‍্যাপালো সহরে তড়িৎগতিতে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হয়ে গেল। স্তালিন ১৯৩৯ সালে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির সময় হয়ত বা Rapallo Treaty-র দৃষ্টান্ত থেকে প্রেরণা পেয়ে থাকতে পারেন। যদিও দুটো চুক্তির মধ্যে বিপুল পার্থক্য রয়েছে, আর Rapallo Treatyতে সংযোজিত হয়নি ইউরোপ ভাগাভাগির জন্য কোন গোপন সর্ত (Secret Protocol)। হিটলার-স্তালিন চুক্তিও অনুরূপভাবে ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে সম্পাদিত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার উইলি ব্রানডট্ পূর্ব-জার্মানীর সঙ্গে যে নতুন চুক্তি করলেন তার মধ্যে দ্বিতীয় র‍্যাপালো চুক্তির নির্যাস আছে বলা কি ভুল হবে? ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। ১৯৩৯ সালেও স্তালিন Co-existence of conflicting systems-এর সপক্ষে বক্তৃতা করেছিলেন।

. জেনোয়া সম্মেলনেও সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিচেরিন ক্রুশ্চভের মত শুনিয়েছিলেন :

"Whilst maintaining the standpoint of their Communist principles the Russian delegation recognise that in the present period of history, which permits the parallel existence of the old social order and of a new order now being born, economic collaboration between the states representing these two systems of property is imperatively necessary for the general economic reconstruction."

ক্রুশ্চভকে কট্টর মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা 'শোধনবাদী' বলে নিন্দা করলেও লেনিনের জীবদ্দশায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিচেরিন জেনোয়াতে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তাকে-ও শোধনবাদী, বুর্জোয়াগন্ধী, আত্মসমর্পণকারী মনোভাব বলে তো খোদ লেনিনও নিন্দা করেননি। দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে এই বৈপ্যরীত্য কেন ?

পশ্চিম ইউরোপের উদারপন্থীরা র‍্যাপালো চুক্তির মধ্যে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুশ-জার্মান ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছিলেন ( ১৯২২ সালের মার্চে স্বাক্ষরিত হয় চুক্তি )। অনেক জার্মান মনে করেছিলেন এর মধ্যে স্বাধীন স্বতন্ত্র পররাষ্ট্রনীতির ইংগিত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি থেকে বাঁচাবার একটা পথ মাত্র—an alternative to hopelessness and passivity ! জার্মানী ছিল ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী শিল্পপ্রধান রাষ্ট্র। সেদিন রাশিয়ায় প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী দ্রব্য সামগ্রী জার্মানীই সরবরাহ করতে পারত। জার্মানীর অবস্থা সেদিন ছিল অসহনীয়। মরিয়া হয়ে পড়েছিল সে দেশ। যুদ্ধে অপমানিত হয়েছে—ধ্বংস হয়েছে। বিকল্প পথও ছিল না। রাশিয়া তার সুযোগ নিতে ছাড়েনি। সুযোগ বুঝে রাশিয়া ১৯২১ সালেই জার্মানীর সঙ্গে স্বাভাবিক বাণিজ্য সুরু করতে উৎসাহী হয়েছিল। রাশিয়ার তর সইছিল না। কিন্তু পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে না জানিয়ে এইরূপ ব্যবস্থায় আসতে তদানীন্তন জার্মান প্রেসিডেন্ট Friedrich Eber-এর মত ছিল না। কিন্তু সেদিন জার্মানীর নীচের তলার অফিসাররা ভিন্ন মত পোষণ করতেন। এঁদের নেতা ছিলেন সে সময় Baron Age Maltzan ( পরে ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন )। এঁরা স্বাধীন ভিন্ন পথ অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের চিন্তাশীল সাহসী অপেক্ষাকৃত তরুণ অফিসাররা তাই চেয়েছিলেন। তাঁদের মতাবলম্বী সহযোগী

অন্য দেশেও ছিল। সামরিক বিভাগ ও ব্যবসায়িক মহলেও তাঁদের পক্ষের লোক ছিল অনেক। এঁদের বলা হত "Easterners"। পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি জার্মানীকে রাশিয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছিল বললেও ভুল হবে না। দুটি দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে কিভাবে এই পশ্চিমী শক্তিজোট জার্মানীকে অন্য দিকে ঠেলে দিচ্ছিল।

১। ১৯২১ সালের মে মাসে ফ্রান্স ও ব্রিটেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দাবীর ফিরিস্তি ( Reparation Bill ) দাখিল করল জার্মানীর কাছে। মোট দাবীর পরিমাণ ছিল ১৩২ মিলিয়ান স্বর্ণমার্ক। জার্মানীর পক্ষে এই টাকা সংগ্রহ করে দেওয়া অসম্ভব ছিল তখন।

২। অপর ঘটনাটি হল—ঐ বছরের শেষে লীগ অব নেশনস্-এর বিতর্কিত আপার সাইলেসিয়া ( Upper Silesia ) নিয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত। সাইলেসিয়া ছিল জার্মানীর গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল ( Industrial district )। ফরাসী সরকারের চাপে রাষ্ট্রসংঘ ( League of Nations ) জার্মানীকে তার এই স্বীয় অঞ্চল থেকে বঞ্চিত করল। সাইলেসিয়ার গণভোটে—লীগের তত্ত্বাবধানেই হয়েছিল সেটা। তাতে যে সিদ্ধান্ত হয়, লীগের এই নতুন অন্যায় সিদ্ধান্ত ছিল তার বিরোধী। একদিকে অবিশ্বাস্য স্ফীতকায় ক্ষতিপূরণের ফর্দের বোঝা চাপল, অন্যদিকে জার্মানীকে তার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল থেকে বঞ্চিত করা হল।

১৯২২ সালের প্রথম ভাগের অবস্থাটা এইরূপই ছিল। জার্মানীও বসে ছিল না। সাথে সাথে ১৯২১-২২ সালে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে গোপন সামরিক ও বাণিজ্যিক শলাপরামর্শ চলছিল। দুই দেশই এই সব আলোচনা সম্বন্ধে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করে চলছিল।

রাশিয়া এই সুযোগে জার্মান সহযোগিতায় নিজের লালফৌজকে সুশিক্ষিত করে নিচ্ছিল ও তাদের সাহায্যে সমরোপকরণের কারখানাগুলি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হল। জার্মানীও ভার্সাই সন্ধির অনেক নিষেধাজ্ঞা, কড়াকড়ি থেকে অব্যাহতি পাবার পথ খুঁজে পেয়েছিল এই সহযোগিতার মধ্যে।

এরপর ১৯২২ সালে এপ্রিল মাসে জেনোয়া ( Genoa ) সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে ফরাসী সরকার German Reparation-এর প্রশ্ন তুলতে দিতে অস্বীকার করে। জার্মানী তার অভিযোগ পেশ করতে পারল না ফরাসী সরকারের অনমনীয় জিদের জন্য। ফরাসী সরকার রুশ সরকারের ওপর চাপ দিল জার্মানীর কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য। যদিও

রাশিয়া ভার্সাই চুক্তির সামিল ছিল না—ফরাসী সরকার ১১৬ নং ধারা অন্তর্ভুক্ত করেছিল। তাতে জার্মানীকে রাশিয়াকে ঘাটতি পূরণ দেবার দায় চাপান হয়। লেনিন এই ১১৬ নং অনুচ্ছেদের প্রয়োগের বিরুদ্ধে ছিলেন ( no reparation, no indemnity )। ঐ যুদ্ধের আগে ফরাসীদের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা রাশিয়ায় বিপুল অর্থ লগ্নী করেছিল। এই "ক্ষতিপূরণ" আদায় করতে পারলে রুশ সরকার ফরাসীদের ব্যক্তিগত বণ্ডের দেনা শোধ করতে পারবে এই ছিল মতলব।

১৯২২ সালে ইউরোপের অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করার কথা রাষ্ট্রনীতিবিদরা গভীরভাবে ভাবছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের চেষ্টায় এই পুনরুজ্জীবনের কাজে সক্রিয় কোন পদক্ষেপ নেবার মত অবস্থায় সেদিন ছিল না। প্রয়োজন হয়েছিল যৌথ পারস্পরিক চেষ্টা, এই মন নিয়েই জেনোয়ায় সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব হল। এই সম্মেলনে ইউরোপের পুনরুজ্জীবনের কর্মসূচীতে রাশিয়ার ইউরোপীয় শক্তিরূপে অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং জার্মানীর কাছ থেকে যুদ্ধের দরুন ক্ষতিপূরণ আদায়। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী Poincare জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা আদায়ের প্রশ্ন সম্মেলনে কিছুতেই আলোচনার জন্য তুলতে দেবেন না জিদ ধরলেন। এই সম্মেলনে এই বিষয়ে জার্মানদের কোন অভিযোগ বা আপত্তি করবার কোন সুযোগ দেওয়া চলবে না। অতএব সম্মেলনে জার্মানীর বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা করারই সুযোগ রইল না। পশ্চিমের শক্তিবর্গের কাছ থেকে রাশিয়ার অর্থনৈতিক সাহায্য পাবার সম্ভাবনা উন্মুক্ত হল; এতে তার খুশী হবারই কথা। রাশিয়া তাই এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে আমন্ত্রণ গ্রহণ করল।

ভার্সাই সম্মেলনে ( ১৯১৯ ) রাশিয়ার কোন প্রতিনিধি ছিল না। তবু সন্ধি চুক্তিতে একটি বিশেষ ধারা সন্নিবেশিত হয়েছিল ( ১১৬ ধারা )। এই ধারায় রাশিয়াকে অধিকার দেওয়া হয়েছিল যে, সে ইচ্ছা করলে জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে। ফরাসী পুঁজিপতিদের স্বার্থ এই ছিল তারা বিপুল অর্থ রাশিয়ায় লগ্নী করেছিল যুদ্ধের আগে। তারা টাকা দাবী করছিল। রাশিয়াই বা টাকা শোধ করবে কিভাবে? যদি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের মোটা অঙ্ক রাশিয়া পায় জার্মানীর কাছ থেকে তাহলে রাশিয়া ফরাসীদের টাকা শোধ করতে পারবে। কি নিষ্ঠুরতা! জার্মানী বুঝতে পারেনি রুশ সরকারের কি মনোভাব হবে এ ব্যাপারে। রাশিয়াও চাইছিল যাতে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানী একদিকে শেষ পর্যন্ত জোট করতে না পারে।

জার্মানীকে ওদের খপ্পর থেকে ছিনিয়ে আনতে কৌশল ভাঁজছিল রুশ সরকার। সম্মেলনে রুশ প্রতিনিধি কানে কানে ছড়িয়ে দিল যে, ফরাসী সরকার রাশিয়াকে আর্থিক সাহায্য দেবে, তবে জার্মানীর টাকায়—মাছের তেলে মাছ ভাজা হবে—১১৬ ধারার ভিত্তিতে।

রাশিয়া তাই সম্মেলন সুরু হবার আগেই জার্মানীর সঙ্গে একটা বোঝা-পড়ায় আসতে চাইছিল—কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। যদি জার্মানী এতে রাজী হয় তা হলে রাশিয়া আর ১১৬ ধারার সুযোগ নিয়ে জার্মানীকে বিব্রত করবে না।

প্যারিস শান্তি সম্মেলনের পর ঐ দশকে এই আর একটি শীর্ষ সম্মেলন বলা যায়। ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দিলেন তাঁদের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ। ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলে পররাষ্ট্র দপ্তরের লর্ড কার্জনকে বাদ দেওয়া হল প্রতিনিধি-মণ্ডলী থেকে। রুশ দলের প্রতিনিধিত্ব করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জি চিচেরিন।

সম্মেলনের রাজনৈতিক উপ-সমিতির বৈঠকে (Political Sub-committee) রাশিয়া কর্তৃক ফরাসীদের দেয় ঋণের টাকার অঙ্ক এবং কিভাবে সেটা শোধ হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা চলল। জার্মানী কিছুই জানতে পারল না। তাকে একঘরে করে রাখা হল। এই আলোচনা দিয়ে আঁতাত জোটভুক্ত মিত্রদল রাশিয়া ও জার্মানীকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করেছিল। জার্মান ও রাশিয়ানদের এই রিপোর্ট নিয়ে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য আলোচনা ৪৮ ঘণ্টার জন্য মুলতুবী রাখা হল। এই উপ-সমিতি (Sub-committee) থেকেও ফরাসী সরকার জার্মানীকে বাদ দিতে চেয়েছিল। তবে সেটা সফল হয়নি। তখন ফরাসী প্রতিনিধিরা আলোচনা কয়েক দিনের জন্য মুলতুবী রাখার প্রস্তাব করল এবং সেই অবসরে ফরাসী সরকার ব্রিটিশ ও রুশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করেন—আর সেই সব আলোচনায় জার্মান প্রতিনিধি থাকবে না। এই প্রস্তাবে অন্যরা সম্মত হলেন। লয়েড জর্জ যেখানে উঠেছিলেন (The Vila Alberti) সেখানে আলোচনা চলছিল। জার্মানী কিছুই জানল না কি আলোচনা হচ্ছে—কি দায়-দায়িত্ব এই আলোচনার ভিত্তিতে আবার তার ওপর চাপান হবে। জার্মানীর সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করা হয়েছিল। স্বাভাবিক কূটনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করাও জেনোয়া সম্মেলনে সম্ভব ছিল না জার্মানীর পক্ষে। র‍্যাথেনো লয়েড জর্জের সঙ্গে বার বার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন—তা নামঞ্জুর হল। জার্মান চ্যান্সেলারও অনুরূপ অনুরোধ করে নিরাশ হয়েছিলেন। এ ছিল এক চরম অসৌজন্যসূচক কাজ।

আলোচনা শনিবার পর্যন্ত গড়িয়ে গেল। তখনও পর্যন্ত জার্মানী সম্মেলনে তার কোন বক্তব্যই পেশ করতে পারল না। তার প্রতিনিধিরা হোটেলে চুপচাপ বসে কাটাল। [ See : Russia And West Under Lenin And Stalin ; By George Kenan ]

এমন সময় সেদিন সোভিয়েট প্রতিনিধিরা যে-হোটেলে ছিলেন সেখান থেকে জার্মান প্রতিনিধিদের হোটেলে রাত্রি ১ টা ১৫ মিনিটে টেলিফোন এল : জার্মানরা কি রাশিয়ার সঙ্গে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চান ( German Soviet Agreement ) ? যে যে পোষাকে ছিলেন সেই অবস্থায় রাত্রি ১ টা ১৫ মিনিটে ( পায়জামা পরা অবস্থায় ) জার্মান প্রতিনিধিরা এক কক্ষে সমবেত হয়ে আলোচনা করলেন সারারাত্রি ধরে। জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরে এটা "Pajama party" বলে পরিচিত। র‍্যাথনোর কিন্তু রাশিয়া ও পশ্চিমের সঙ্গে জার্মানীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে খুব আগ্রহী ছিলেন। তিনি পশ্চিমে মিত্র পক্ষের থেকে সরে এসে রাশিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কোন উপায়ই বা ছিল কি তখন ? এ সুযোগ হারালে পাওনাদার হিসাবে রাশিয়াও ঘাড়ে চাপবে। ভোরে জানান হল ফোনে : আলোচনায় বসতে জার্মান প্রতিনিধিরা রাজী। জার্মান প্রতিনিধি এত অপমান ইংলণ্ডের কাছ থেকে সয়েও ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ ওয়াইজকে ( Mr. Wise ) জার্মান প্রতিনিধি জানাতে চাইলেন। তখন জানান হল ওয়াইজ ঘুমুচ্ছেন—বিরক্ত যেন করা না হয় তাঁকে ঘুমের সময়। সকালে জার্মান ও রুশ প্রতিনিধিরা র‍্যাপালোতে আলোচনা সুরু করলেন দ্বিপাক্ষিক চুক্তির এক খসড়া সামনে রেখে। শেষে চুক্তি হয়ে গেল। Times পত্রিকায় একে 'unholy alliance' বলে বর্ণনা করা হল ; "an open defiance and studied insult to Entente Powers" একথাও বলা হল ঐ কাগজে।

এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর লয়েড জর্জ জার্মান প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠালেন। কৈফিয়ৎ তলব করে জানতে চাইলেন কেন এই চুক্তিতে সামিল হবার আগে তাঁরা লয়েড জর্জের সঙ্গে দেখা করেননি। উত্তরে জার্মান প্রতিনিধি জানান ৪ বার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে তাঁরা বিফলমনোরথ হয়েছেন।

এই চুক্তির বিরুদ্ধে নীতিগত কোন কিছুই বলা চলে না। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এ নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য। দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হল। সোভিয়েট কূটনৈতিক বড় বিজয় বলে চিহ্নিত হবে এই চুক্তি নিঃসন্দেহে।

১৯২১ সালের মার্চ মাসে 'ইঙ্গ-সোভিয়েট বাণিজ্য চুক্তি' স্বাক্ষরিত হবার সময় থেকে কমিউনিস্ট রাশিয়া ও ইউরোপের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমঝোতা গড়ে তোলার চেষ্টা সুরু হয়। জেনোয়া ( Genoa ) সম্মেলন ছিল সেই প্রচেষ্টার দিকেই এক অনিশ্চিত পদক্ষেপ। এই সময় রাশিয়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তথা কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছিল—র‍্যাপালো চুক্তি। লক্ষ্য ঃ কমিউনিস্ট রাশিয়া ও পুঁজিবাদী জার্মানীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন। জেনোয়া বৈঠকের ব্যাপারে আদৌ কোন গোপনীয়তা ছিল না। কিন্তু র‍্যাপালোতে রুশ-জার্মান চুক্তি হয়েছিল একান্ত চুপিসারে গোপনে। পরে অবশ্য জেনোয়া ও র‍্যাপালো চুক্তি একই পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির দুটি দিক রূপেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

ভার্সাই চুক্তির সর্তানুসারে সামরিক সম্ভার—অস্ত্রপাতির প্রস্তুতি ও উৎপাদন জার্মানীতে নিষিদ্ধ হয়। র‍্যাপালো চুক্তির ফলে জার্মানী রাশিয়া থেকে যাবতীয় সমরোপকরণ অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন করার সুযোগ পেল। এমন কি বিমান, ডুবোজাহাজ, বড় কামান রাশিয়াতে তৈরী করার অনুমতি পেল জার্মানী। লেনিন, ট্রট্স্কী, চিচেরিনের সম্মতি নিয়েই পরিকল্পনাটি রচিত হয়। জার্মান অস্ত্র-বিশারদ ও কারিগররা রাশিয়া পরিদর্শন করেন চুক্তির প্রারম্ভিক পর্যায়ে। রাশিয়ার প্রয়োজন ছিল জার্মানীর কারিগরী জ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, শিল্পোন্নয়নের কাজে জার্মান পারদর্শিতার ; আর জার্মানীর প্রয়োজন ছিল রাশিয়ার অপরিসীম কাঁচামাল, প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি। দুইদিক থেকেই দুয়ের প্রয়োজন ছিল। জেনোয়া সম্মেলনে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিচেরিন যে বক্তব্য রাখেন সেটা পুঁথিগত ও প্রচারিত মার্কসীয় বা লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে একটু অভিনবই ঠেকবে ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে। তিনি পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রপ্রধান কূটনীতিবিদ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি মহলের মন ভেজাবার মত কয়েকটি বক্তব্য রেখেছিলেন। এই সব বক্তব্য মার্কসীয় বিচারে নিশ্চয়ই চরম "শোধনবাদী" বলে মনে হবে। তিনি নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার ( Concession ) প্রলোভন দেখাতে কসুর করেননি—একটা সমঝোতা ও বোঝাপড়ার জন্য দুই শিবিরের মধ্যে রাশিয়ার প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদ সদ্ব্যবহার করে একটা বিরাট বহির্বাণিজ্য লেনদেনের সম্ভাবনার কথাও শোনালেন। একদিকে যেমন এ কথা বললেন—অন্যদিকে আবার সুচতুরভাবে জার্মানীর সঙ্গে নূতন বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার ইংগিতও দিয়েছিলেন। বিরাট কূটনৈতিক বিচক্ষণতার

পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন। এই বক্তব্যের মধ্যেই র‍্যাপালো চুক্তির প্রচ্ছন্ন ইংগিত ছিল। সেটা অবশ্য জেনোয়া সম্মেলনে লয়েড জর্জ ধরতেও পারেননি।

চিচেরিনের বক্তব্য সম্বন্ধে কার লিখেছেন :

"He opened up visions of the vast potential contribution of Russian untapped resources, developed and made available through the co-operation of Western capitalists, to the cause of world-wide economic recovery...noting that restoration of world economy would be impossible unless the threat of wars were removed, he announced he would at a later stage of the conference "propose a general reduction of armaments", and support all proposals aimed at lightening the burden of militarism .....time had come for a world congress on the basis of equality between all nations "for the establishment of general peace", the Russian Government for its part was prepared to take existing international agreements as a starting point, while "introducing into these agreements necessary amendments" and even to participate in a revision of the "Statute of the League of Nations"......excluding the domination of some by others and doing away with the present division into victors and vanquished." (E. H. Carr : Bolshevik Revolution, vol. 3. P—372)

চিচেরিনের এই বক্তব্যের মধ্যে কোন বৈপ্লবিক ভাবধারা আদৌ ছিল না। যেটা ছিল সেটা হ'ল কঠোর বাস্তবতাবোধ ও জাতিস্বার্থপরিপূরক কূটনীতি। পরস্পবিরোধী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ও প্রচলিত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলিকে মেনে নিয়ে আন্ত-র্রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে এগিয়ে চলার প্রস্তাব করা হয়েছিল। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিতে বিপ্লবের আগুন ছড়াবার বা শোষিতদের 'মুক্ত' করার কোন বিপ্লবী উদ্গীরণ তাঁর ভাষণে ছিল না।

বিজিত ও বিজেতার দুই শিবিরে দুনিয়াকে ভাগ না করা এবং ভার্সাই ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির "প্রয়োজনীয় সংশোধনের" প্রস্তাব ( necessary amendments ) উপস্থিত জার্মান প্রতিনিধিদের খুশী করেছিল। সুকৌশলে জার্মানীকে বোঝবার সুযোগ দেওয়া হল—জার্মানীর এই দারুণ দুর্দিনে কে তার

সম্ভাব্য বন্ধু হতে পারে! এখানেই র‍্যাপালোর গোপন চুক্তির সম্ভাবনার বীজ লুকানো ছিল। কোন বিপ্লবীতত্ত্ব নয়, বিপ্লবী নাটুকেপনা নয়, সর্বহারা শ্রেণীর জন্য উদ্‌ভ্রান্ত উদ্বেগ নয়; নিছক জাতিস্বার্থ-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী বাস্তববাদী রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ। রাশিয়া সব সময় চেয়েছিল শক্তিশালী শিল্পোন্নত জার্মানী যেন ইঙ্গ-ফরাসী শিবিরে ভিড়ে না যায়। জার্মানীর সঙ্গে ফরাসী ও গ্রেট ব্রিটেনের সংঘাতকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই রাশিয়ার লাভ। আবার ব্রিটেন ও ফরাসী দেশের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনীতিবিদ্‌রা বরাবরই চেয়েছিলেন জার্মানী ও রাশিয়ার বিরোধকে বাঁচিয়ে এই বিরোধের ঘোলাজলে মাছ শিকার করতে। কি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র, কি মার্কসবাদী সমাজবাদী রাষ্ট্র উভয়েই একই কূটনীতি অবলম্বন করে এগিয়েছে—কেউই কোন মৌল নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে পররাষ্ট্রনীতি গড়ে তুলবার চেষ্টা করেনি। দুই বিরোধী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে বিপ্লবী ও প্রতি-বিপ্লবী শক্তির সংঘাত বলা যায় না।

জেনোয়া সম্মেলনে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি-গোষ্ঠী পরাজিত ও অপমানিত জার্মানীর পেছনের খিড়কির দরজা দিয়ে গোপনে সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-স্বার্থের সঙ্গে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-স্বার্থের গাঁটছড়া বাঁধতে চেয়েছিল। রাশিয়াও আবার ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিজোটের আড়ালে চেয়েছিল অনুরূপ সমঝোতা গড়ে তুলতে। জার্মানীকে জড়িয়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলিকে রাশিয়ার সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সুযোগ দিলে রাশিয়া পিছিয়ে-পড়া দেশ ( backward country ) হিসাবে বেকায়দায় পড়তে পারে, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া পুঁজিবাদী দেশগুলিকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ( Concessions ) দিতে অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু ভয়ও ছিল।

"Genoa conference had confronted Soviet Russia with the danger..... of a Europe united to exploit Russian resources and impose terms on Soviet Russia as an economically dependent 'backward country'. [ E. H. Carr : Bolshevik Revolution, vol. 3—P. 380 ]

রাশিয়া তাই জার্মানীকে এই জোট থেকে বার করে আনতে চেয়েছিল। র‍্যাপালো চুক্তি রাশিয়াকে নূতন মর্যাদা দান করেছিল। লেনিন বলেছিলেন, প্রথম তিন বছরের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলির দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে চলা ( "utilize the division between capitalist countries" : Lenin. )।

জার্মানী ছাড়া অন্য কোন ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাশিয়ায় মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনে কোন বাধা এই র‍্যাপালো চুক্তিতে আদৌ ছিল না। লেনিন ও তাঁর সরকার যেমন পুঁজিবাদী শিবিরের স্বার্থ-সংঘাতের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন— তেমনি অর্ধশতাব্দী পরে সমাজবাদী শিবিরের তীব্র সংঘাত-দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে দুটি পৃথক মৈত্রী ও বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে নিয়েছে। চীনের সঙ্গে যখন নিক্‌সন প্রশাসনের সমঝোতা হয় তখন তাতে এমন কোন সর্ত ছিল না যাতে রাশিয়ার সঙ্গে পৃথক বন্ধুত্বচুক্তি সম্পাদনে কোন বাধা থাকতে পারে।

## ৪

## প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর হাঙ্গেরীর বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লব

বিপ্লবী মার্কসবাদী ট্রট্স্কীপন্থীরা বলে থাকেন "যুদ্ধ ও বিপ্লব" দুই-ই অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত (war and revolution are inseparable)। আরও বলা হয়ে থাকে যে, যুদ্ধ বিপ্লব আনবে, না হয় বিপ্লব যুদ্ধ ঠেকাবে। দুটোর কোনটাই তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে প্রমাণ করা শক্ত। যুদ্ধ যেমন বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে—তেমনি প্রতি-বিপ্লবও ডেকে আনে, বিপ্লবোত্তর সরকার হলেই যে যুদ্ধ বন্ধ হবার গ্যারান্টি থাকে না তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ রাশিয়া ও চীনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত। ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তই ধরা যাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এদেশের পরিস্থিতি ছিল অগ্নিগর্ভ। ১৯৪৫-৪৬ সালে খণ্ড খণ্ড বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান পরিলক্ষিত হয়েছিল—যেমন বোম্বাই-এর নৌবিদ্রোহ, বিহারের পুলিশ বিদ্রোহ, কলকাতার রসিদ আলি দিবস, রামেশ্বর দিবস, আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী বীর সেনানীদের মুক্তির আন্দোলন। আবার তারই পাশাপাশি দেখা গেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী-সৃষ্ট ভারতের মুসলীম লীগের নেতৃত্বে সংগঠিত বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ডাক—কলকাতায় নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন। কলকাতার মনুমেণ্ট ময়দানে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট মুসলীম লীগের 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের' রক্তাক্ত সংঘর্ষের ডাক। মুসলীম লীগ এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে কলকাতার ময়দানে যৌথ সভা ও সমাবেশ। পরিশেষে দেশ দ্বিখণ্ডিত হল। বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লব পাশাপাশিই চলে। ইতিহাসের এরকম বহু নজীর আছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের ফলশ্রুতি আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এবার হাঙ্গেরীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হাঙ্গেরীতে পার্লামেণ্টারী শাসন-প্রথা চালু থাকলেও দেশটা ছিল প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক। চাষের জমি বড় বড় ভূমি-মালিকদের হাতেই সীমাবদ্ধ ছিল; কৃষকদের হাতে জমি ছিল না বললেই হয়। ভূমিহীনদের সংখ্যা ছিল প্রচুর, বড় বড় ভূম্যধিকারী বাবুশ্রেণী কিছু বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যে দেশ শাসন করছিল। দেশে শিল্প বড় একটা ছিল না, ব্যবসা-

বাণিজ্য ইহুদী শ্রেণীরই কুক্ষিগত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হাঙ্গেরী ও রাশিয়ার অবস্থার মধ্যে বেশ একটা মিল ছিল। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, দেশে বুর্জোয়া শ্রেণী দুর্বল ছিল। হাঙ্গেরীতে ইহুদীদের হাতে পুঁজি ও ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রীভূত থাকায় ধারণা জন্মেছিল যে, আন্তর্জাতিক ঘটনার চাপে সঙ্কট আস্‌লে বল্‌শেভিক ধাঁচের বিপ্লব সংগঠিত করা সম্ভব। প্রলিটেরিয়েট শ্রেণী 'পেশাদারী বিপ্লবীদের' নেতৃত্বে দুর্বল বুর্জোয়া শ্রেণীকে হটিয়ে দিয়ে কৃষকশ্রেণীর সাহায্যে একটি ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কিন্তু হাঙ্গেরীতে রাশিয়ার মত 'পেশাদারী বিপ্লবীদের' কোন সংস্থা গড়ে ওঠেনি তখনও। হাঙ্গেরীর শ্রমিক আন্দোলনও ছিল খুব দুর্বল এবং আপোষমুখী। শ্রমিক শ্রেণী অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গেই বরাবর ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই দল যুদ্ধ সমর্থন করেছিল। শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে বেশ বৈষম্য ছিল, শহরের শ্রমিকরা বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। কৃষকরা অনেক বেশী অবহেলিত ছিল তুলনামূলক বিচারে। আগেই বলা হয়েছে শ্রমিক শ্রেণী সংঘর্ষের পথ এড়িয়েই চলছিল—কোন বিপ্লবী কর্মসূচীতে আকৃষ্ট হয়নি। আবার শাসকশ্রেণীও এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে বিব্রত করার পথ পরিহার করেই চলছিল।

দেশে বেকারী বৃদ্ধি পাচ্ছিল—দারুণ হতাশার ভাব চারিদিকে। পুরাতন রক্ষণশীল সরকার বিনাযুদ্ধে পথ ছেড়ে দিল অক্টোবর মাসে। তার জায়গায় সকল প্রগতিশীলদের নিয়ে একটি 'জাতীয় পরিষদ' ( National Council ) গঠিত হল। তার কিছুদিন পরই একটি 'প্রজাতন্ত্র' ঘোষিত হল। এই নূতন প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী হলেন কাউণ্ট মাইকেল ক্যারোলি ( Count Michael Karolyi )। এই সরকারের পেছনে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূল রাজনৈতিক শক্তি ছিল সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা ( SDP )। নূতন সরকারের সামনে চারটে মূল সমস্যা দেখা দিয়েছিল: (১) শান্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, (২) গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন ও তা স্থায়ী করা, (৩) প্রশাসনিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ, (৪) কৃষি ও ভূমি সংস্কার সাধন। কিন্তু এই চারটি মূল কর্মসূচীর কোনটাই কার্যকরী করতে পারেনি ক্যারোলি সরকার। তার ওপর একের পর এক নূতন দাবী তুলে ফরাসী সরকার নূতন সরকারকে বার বার বিব্রত করে চলেছিল। ফরাসী সরকারের এইসব দাবী মানতে গেলে হাঙ্গেরীর সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হত—তার ভৌগোলিক আয়তনও সঙ্কুচিত হত। ক্যারোলি ছিলেন

পশ্চিমী গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু সময়টা তখন ছিল এমনই, পরিস্থিতি ছিল এমনই অগ্নিগর্ভ যে, সে সময় গণতন্ত্রের কথা বললে সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হত, উপহাস করত—বিশেষ করে যখন দেশে গণতন্ত্রের কোন ট্র্যাডিশনই ছিল না। বরকেন্তো মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন :

"These were times when to hold such an opinion brought a man nearer to gallows than to power". [The Communist International—P. 112]

দেশের আত্মসম্মান প্রতিনিয়ত ভূলুণ্ঠিত হচ্ছিল। জাতি যেন মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারছিল না। এই পরিস্থিতিতে সামরিক অফিসাররা, প্রশাসকরা বল্‌শেভিক দলের সাহায্যে কিছু করার কথা ভাবছিলেন। যুদ্ধের মধ্যেই তারা নূতন সম্ভাবনা দেখলেন। শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে যেমন ক্যারোলি সরকারকে দায়ী করা যায় না (ফরাসী সরকারই একের পর এক আবদার তুলে তাঁকে বিব্রত করেছিলেন), তেমনি ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁর সরকারকে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা যায় না। এর জন্য দায়ী কমিউনিস্ট ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও তাত্ত্বিক লড়াই।

সমাজতন্ত্রের সহায়ক ও সমর্থক অফিসাররা প্রশাসনকে নিজেদের কব্জায় রেখেছিল। এইসব অফিসারদের দিয়ে প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করাটা ছিল হাস্যকর ব্যাপার। নতুন কোন গোষ্ঠীকে শিক্ষা-দীক্ষায় প্রশাসন ব্যবস্থায় পোক্ত করে দায়িত্ব দেবারও কোন ব্যবস্থা হয়নি। তাই প্রশাসনিক সংস্কার অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও কোন সংস্কারের লক্ষণ দেখা গেল না। তাই সঙ্কট আরও বেড়েই চলল। মানুষের মনে ধারণা জন্মাল—যা স্বভাবতই জন্মিয়ে থাকে এরকম পরিবেশে—বিপ্লবই সঙ্কটের অবসান ঘটাতে পারে। কিন্তু বিপ্লবের প্রস্তুতি কোথায়? নূতন নির্বাচন আহ্বানের প্রস্তাবও মুলতুবী রাখা হল। অথচ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু আমলাদের কাছ থেকে বাধা এল। গণতান্ত্রিক বিকাশের পথ যেই রুদ্ধ হল দেশে হিংসা, হানাহানিও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। শ্রমিকশ্রেণী কৃষকশ্রেণীর স্বার্থকে উপেক্ষা করেই চলছিল। মার্কসিস্ট ভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী বামপন্থী ও সোস্যালিস্টদের মনে এক অদ্ভুত ধারণা সৃষ্টি করেছিল : কৃষকশ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল, রক্ষণশীলতার সমর্থক। তাই কৃষকশ্রেণীর প্রতি দরদ দেখানর অর্থই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে মদত্ দেওয়া।

হাঙ্গেরীতে কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টরা কৃষকদের জমি বণ্টনের কর্মসূচীতে সম্মতি দিলেন না। মার্কসবাদী পণ্ডিতরা জমি বণ্টনের কর্মসূচীকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বিদ্রূপ করতেন। এঁদের বক্তব্য আরও ছিল এই যে, জমি এইভাবে ভূমিহীনদের মধ্যে ভাগ করে দিলে জোতগুলি খণ্ড খণ্ড হবে, ছোট ছোট হবে। জমির উৎপাদন অনেক কমবে। ভবিষ্যতে জমি ব্যাপক রাষ্ট্রীয়করণের ( collectivization ) কর্মসূচীতে ছোট ছোট জোতের মালিকরা তখন বাধা রচনা করবে। অথচ লেনিন নিজেই 'লাঙল যার জমি তার' ('Land to the tiller') শ্লোগান দিয়েছিলেন। কৃষিপ্রধান হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়ায় কৃষক-সমাজ ও ভূমিহীন কৃষকদের প্রতি চরম অবজ্ঞা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা ও রক্ষণশীলতার সমর্থকরূপে এই বিপুল সমাজকে দেখার ভ্রান্ত মনোভাবের মধ্যেই দুই দেশের বিপ্লবের ব্যর্থতার বীজ উপ্ত ছিল। শ্রমিক-শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের এই উন্নাসিকতা দেশের এই বিশাল কৃষক-সমাজকে দূরে সরিয়ে রেখে দিল। হাঙ্গেরীর বল্‌শেভিক ধাঁচের বিপ্লবের এই ছিল পটভূমি।

হাঙ্গেরী-অস্ট্রিয়ার যুদ্ধবন্দীরাই বল্‌শেভিক আদর্শ ছড়িয়েছিল। ব্রেস্ট লিটভস্ক চুক্তির পরই সৈন্যরা মুক্তি পেয়ে নিজ দেশে ফিরেছিল। এই সব যুদ্ধবন্দী সৈনিকদের মধ্যে যারা রাজনৈতিক দিক দিয়ে সবচেয়ে সচেতন ছিল রাশিয়া তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে হাঙ্গেরী-অস্ট্রিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট নেতা বেলা কুন হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক মঞ্চের পুরোভাগে আসেন। কিছুকাল তিনি বুর্জোয়া ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের কাগজে সাংবাদিকতা করেন। তবে সাংবাদিক হিসাবে কোন খ্যাতি তিনি অর্জন করেননি। কিছু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন রাশিয়ার কাছ থেকে। লেনিন এঁকে হাঙ্গেরীর বিপ্লব পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বেলা কুন ব্যক্তিগত জীবনেও রাজনৈতিক নেতারূপে বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেননি। যখন তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত একনায়কতন্ত্র হাঙ্গেরীতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল তখন তিনি ভিয়েনার সরকারের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে ট্রেনে করে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে শুধুমাত্র তাঁর নিজের পরিবারের লোকজন ও নিকটতম কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে যাবার পরিকল্পনার কথা পরে তাঁর বিপ্লবী সাথীদের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। বেলা কুনের চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর নির্দয়তা। ১৯২০ সালে রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় চীফ্ পলিটিক্যাল্ কমিসার ব্যারন র‍্যাঙ্গেল-এর (Baron Wrangel) নেতৃত্বে পরিচালিত

একটি বৃহৎ সেনাবাহিনীর অংশ (white army) ক্রিমিয়ার রণাঙ্গনে বন্দী হয়। এই যুদ্ধবন্দীরা ছিল সেনাবাহিনীর অফিসার শ্রেণীর। গৃহযুদ্ধও এদিকে সমাপ্তির মুখে। তা সত্বেও বেলা কুন হাজার হাজার যুদ্ধবন্দী ও প্রতিপক্ষের সামরিক অফিসারদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সেই নির্দেশমত তাদের হত্যাও করা হল। এই নেতাকেই আবার জার্মান বিপ্লবের এক সন্ধিক্ষণে জার্মানীতে পাঠান হয়েছিল।

হাঙ্গেরীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফিরে এসেই সেদেশের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই নেতৃত্ব দিলেন। শ্রমিকশ্রেণীর কাছে খুব সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর হয়ে—অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয় হাঙ্গেরীর মত অনুন্নত একটি দেশের পক্ষে—এমন অবাস্তব দাবী উত্থাপন করতে লাগলেন যা কোন সরকারের পক্ষেই মেনে নেওয়া যেত না। [ভারতবর্ষে মার্কসবাদী দলগুলির যে-ভাবেই হোক 'কিছু পাইয়ে দেবার" রাজনীতির সঙ্গে বেলা কুনের শ্রমিক শ্রেণীকে কিছু 'পাইয়ে দিয়ে' নিজের ও দলের দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জনের কৌশল রাজনীতির ছাত্ররা তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখবেন।] এই কৌশল অবলম্বনের ফলে তিনি খুব তাড়াতাড়ি ভীষণ লড়াকু ও দরদী বিপ্লবী নেতারূপে পরিচিত হলেন। এতে উৎসাহিত হয়ে তিনিও দায়িত্বজ্ঞানহীন দাবী ও প্রস্তাব সমর্থন করে চললেন। এমন প্রত্যাশা শ্রমিকশ্রেণীর মনে তিনি জাগালেন যে, তারা তাঁকে পরিত্রাতারূপে মনে করল। তিনি জনপ্রিয়তার শিখরে চড়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন শেষ পর্যন্ত। লেনিনও তো একদিন অর্থাৎ বিপ্লবের আগে ও অব্যবহিত পরে, এই ধরনের বড় বড় গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রচণ্ড প্রত্যাশা জাগিয়েছিলেন এবং জীবনের সায়াহ্নে এসে হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। বেলা কুনের আশু সাফল্যের ও জনপ্রিয়তার কারণই কিন্তু তাঁর সুনিশ্চিত পরাজয়ের ও ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ক্ষমতায় এসে বেলা কুন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি। তিনি বেতন বৃদ্ধি করতে পারেননি। তিনি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাগত সৈনিকদের যে সব বিশেষ বিশেষ সুযোগ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাও রাখতে পারেননি। হাঙ্গেরীর কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনাতে এই দলের সর্বহারা শ্রেণীচরিত্র ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসা বেকার সৈন্যরাই ছিল দলের বড় খুঁটি।

১৯১৮ সালের ২০শে মার্চ Armistice Commission-এর প্রধান হাঙ্গেরীর সরকারকে জানালেন যে, হাঙ্গেরীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী Debreczem পরিত্যাগ করতে হবে হাঙ্গেরীর সরকারকে। আর সেখান বরাবর হাঙ্গেরী ও

রুমানিয়া দুই দেশের সীমানা চিহ্নিত হবে। প্রধানমন্ত্রী ক্যারোলি এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। সরাসরি বিরোধিতা করার মত শক্তিও তাঁর সরকারের ছিল না। যাই হোক, সরকার এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করল। তখন সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার কথা চলছিল। তড়িঘড়ি করে দুই দলের একীকরণ হয়ে গেল। ক্যালোরি ভাবতেই পারেননি পরস্পর-বিরোধী দুই শক্তির এইরূপ মিলন সম্ভব হতে পারে। দুই দলের মধ্যে ঠিক হয়ে গেল তারা একত্রে সরকার গঠন করবে। ক্যারোলিকে কিছু না জানিয়েই এইরূপ নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল। সোস্যালিস্টদের এই আচরণ তাঁকে স্তম্ভিত করেছিল।

দেশে কম্যিউনিস্ট ধাঁচের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এই সরকার দেশের সঙ্কটকে আরও তীব্রতর করল। অবস্থা ক্রমে ক্রমে অসহনীয় হয়ে উঠতে থাকে। বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এই অবস্থার জন্য সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা পরস্পর পরস্পরকে দায়ী করে পরস্পর-বিরোধী অভিযানে নেমে পড়লো। জনগণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজছিল। তখন দু' দলই সরকার ভেঙে দিতে আগ্রহী। লেনিন কিন্তু সোস্যালিস্টদের সঙ্গে সমঝোতা করে সরকার গঠনের জন্য বেলা কুনকে ভর্ৎসনা করেন। লেনিন চেয়েছিলেন বেলা কুন একটি স্বতন্ত্র কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করুন। দু' দলের সাধারণ কর্মীরা কিন্তু ঐক্য চেয়েছিল। লেনিনের পরামর্শ তারা মেনে চলেনি আদৌ। কিন্তু দুটি দল পরস্পর-বিরোধী আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে কিভাবে একটি সরকার চালাবে? [ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে পরস্পর-বিরোধী আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলি নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলির পরিণতি কি হয়েছিল সেটা স্মর্তব্য।]

হাঙ্গেরীর সোস্যালিস্টরা ভেবেছিলেন সোস্যালিস্ট-কমিউনিস্ট মিলনের (**merger**) ফলে কমিউনিস্টরা সন্ত্রাস ও হিংসার পথ থেকে সরে আসবেন। সমাজতন্ত্রীদের উপর হামলা বন্ধ হবে, বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ওপর কমিউনিস্টদের হামলা বন্ধ হবে। আবার সোস্যালিস্টরা নিজের শক্তির জোরে সরকার গঠনের ঝুঁকিও নিতে চায়নি। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। অন্যদিকে কমিউনিস্টদের শক্তি এতই কম ছিল যে, নিজের শক্তিতে কোন বিকল্প সরকার গঠন করা সম্ভবই ছিল না। 'আরমিস্টিস্ কমিশনের' প্রস্তাব হাঙ্গেরী সরকারের মেনে নেবার কোন পথই সেদিন ছিল না। দেশে অতি-বাম রাজনীতির দিকে ঝোঁক দেখা দিল।

বেলা কুন নিজের দেশে লেনিনের ভূমি-নীতি গ্রহণ করেননি। জঙ্গী কমিউনিজমের (War Communism) পথ বেছে নিল তাঁর সরকার। দেশে ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথা বিলোপ করা হল। ব্যক্তিগত মালিকানার দ্বারা চালিত ছোট ছোট দোকানগুলির মালিকানা বেআইনী ঘোষণা করা হল। মুদির দোকান ও ওষুধের দোকানগুলিকে রেহাই দেওয়া হয়। কমিউনিস্ট নেতা র‍্যাকোসী (Mathias Rakosi) এই আইন জারী করেন। এমনই অবাস্তব সিদ্ধান্ত যে, চালু হবার ক'দিন পরই সেটাও রদ করা হল। ব্যক্তিগত উদ্যম ও উদ্যোগ ব্যাহত হল। মূলধন লগ্নী প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। রাজনৈতিক কারণে ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন-নির্যাতন অব্যাহত রইল।

বড় বড় জমিদারদের জমি ভূমিহীনদের মধ্যে আদৌ বণ্টন করা হয়নি। একমাত্র কাউণ্ট ক্যারোলিই তাঁর নিজের জমি বণ্টনের জন্য স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। এদিকে বামপন্থী সরকারের কাছে জমি পাবার আশায় গরীব ও ভূমিহীন কৃষকরা অপেক্ষা করছিল। তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হল। যে-সব জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হল—সে-সব জমিতে প্রকৃত কৃষকদের কোনই অধিকার ছিল না। দেশে বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী নেওয়া হল অথচ উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ প্রশাসক ছিল না। বড় বড় রাষ্ট্রায়ত্ত খামারের কর্তৃত্বভার এল সম্পূর্ণভাবে বড় বড় আমলাদের হাতে। এমন কি বড় বড় ভূম্যধিকারীদের প্রাক্তন অফিসাররাই রাষ্ট্রায়ত্ত খামারের পরিচালনার দায়িত্ব পেল। এক কথায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও খামার পরিচালনার মত উপযুক্ত অফিসারও দেশে ছিল না। প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার পরোয়া না করে কেতাবী কায়দায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের হঠকারিতার পরিণতি কি হতে পারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হাঙ্গেরীর রাজনীতির পালা বদল তার অন্যতম প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সরকারের ভূমি-নীতির ফলে দেশের কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেল—কৃষকরা উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছিল। শিল্প ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ার মুখে। কমিউনিস্ট কায়দায় গ্রাম থেকে, কৃষকদের গোলা থেকে জবরদস্তিমূলক কম মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয় করে সহরে বণ্টনের ব্যবস্থা হল, অথচ গ্রামের কৃষকদের জন্য ভোগ্য-পণ্যের সরবরাহের কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। তার ওপর মুদ্রাস্ফীতি। দ্রব্যমূল্য খুব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। জাতীয় মুদ্রায় দেশের মানুষের আস্থা ছিল না। এই রকম এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হাঙ্গেরীকে যুদ্ধে যেতে হল। যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়া ছাড়া সরকারের বাঁচারও কোন পন্থা ছিল না। ফরাসী সেনাবাহিনী

—যুদ্ধ বিরতি কমিশনের প্রস্তাব হাঙ্গেরী সরকার কর্তৃক নাকচ হবার পর—হাঙ্গেরীর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর ( Szeged ) দখল করে বসল। তখন জেনারেল স্মাটস্—বুদাপেস্ত নগরীতে এলেন আপোষের প্রস্তাব নিয়ে। স্মাটস্-এর প্রস্তাব সরকার প্রত্যাখ্যান করলেন। বেলা কুন যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পক্ষে দৃঢ় মত ব্যক্ত করলেন। তিনি ভাবলেন যুদ্ধেই সঙ্কট চাপা দেওয়া যাবে,—তাঁর জনপ্রিয়তাও রক্ষা পাবে। যুদ্ধপ্রচেষ্টায় কৃষকদের সমর্থন ও সহযোগিতা সুনিশ্চিত করতে গেলে ভূমি ও কৃষি নীতির পরিবর্তন অপরিহার্য ছিল। চাষের ভূমি রাষ্ট্রায়ত্ত করার নীতি কৃষকদের মনে দারুণ হতাশা ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল।

যুদ্ধ সুরু হল। রুমানিয়াও হাঙ্গেরী আক্রমণ করল। হাঙ্গেরীর সেনাবাহিনী আক্রমণের মুখে ভেঙে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। রুমানিয়ার সেনাদল রাজধানী বুদাপেস্ত অভিমুখে এগিয়ে চলল। জাতির এই সঙ্কট মুহূর্তে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল। বুদাপেস্ত নগরীর শ্রমিকরা আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য রুখে দাঁড়াল। হাঙ্গেরী পাল্টা আক্রমণ করল। আর এক বিপদ দেখা দিল। ফরাসী সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে চেকোশ্লোভাক্ সৈন্যরাও বুদাপেস্ত নগরীর দিকে অভিযান সুরু করল। হাঙ্গেরীর প্রতিরোধের মুখে সেই সব আক্রমণ প্রতিহত হল। যুদ্ধে সামরিক সাফল্য হাঙ্গেরীর সরকারকে নূতন মর্যাদা দিল বটে, কিন্তু দেশের অর্থনীতি এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। অর্থনৈতিক ব্যর্থতা—হাঙ্গেরীর সেনাবাহিনীর অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। চারিধারে বিক্ষোভ—অসন্তোষ। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। কারখানায় কারখানায় ধর্মঘট সুরু হয়ে গেল। কমিউনিস্ট নেতাদের কথায় কর্ণপাত না করে রেল শ্রমিকরাও ধর্মঘটের পথে পা বাড়াল।

দানিয়ুব নদীর পশ্চিম তীর বরাবর ছোট ছোট কৃষকদের জোত থেকে জোরপূর্বক খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার জন্য কৃষকরাও খুব ক্ষুব্ধ ছিল। রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট থেকে উৎসাহ পেল কৃষকরা। তারাও বিদ্রোহ ঘোষণা করল সরকারী নীতির বিরুদ্ধে। এ সময় দেশে লেনিন-বয়েজ ( Lenin-Boys ) নামে একটি সংস্থা হত্যা মারধর লুঠতরাজ অত্যাচার সুরু করে দেয়। এই সংস্থা বেলা কুন সরকারের কাছে আর একটি নতুন সমস্যা হয়ে দেখা দিল। এই সংস্থার নেতা ছিলেন জনৈক Czérmy। এই ব্যক্তিই পরে শোনা যায় শ্বেত সন্ত্রাসবাদী দলে ভিড়ে যান। বেলা কুন বিক্ষোভ দমনের দায়িত্ব এমন এক জবরদস্ত ব্যক্তির হাতে তুলে দিলেন ( Szamuely ) যিনি দেশে দমনের নামে অজস্র মানুষের রক্ত ঝরিয়ে ছিলেন। এই

ঠ্যাঙারে বাহিনী বহু মানুষ হত্যা করল—বহু ব্যক্তিকে ফাঁসিতে ঝোলান হল। নির্বিচারে কৃষক হত্যা করা হয়েছিল। এই প্রচণ্ড দমননীতির ফলে কৃষকবিদ্রোহ স্তব্ধ হল বটে, তবে হাঙ্গেরীর সেনাবাহিনীর বিজয় অভিযানের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ল। আবার প্রমাণ হল **An army marches on its belly**। ভাতে মেরে, উৎপাদন ব্যাহত করে কোন দেশের সেনাবাহিনীই সাফল্যের গৌরব অর্জন করতে পারে না। উৎপাদনকারী কৃষকদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

এমন সময় ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেসোঁ (Clemenceau) এক নূতন প্রস্তাব দিলেন হাঙ্গেরীর সোভিয়েট সরকারের কাছেঃ হাঙ্গেরীকে চেকো-শ্লোভাকিয়ার দখলীকৃত অঞ্চল পরিত্যাগ করতে হবে—তার পরিবর্তে রুমানিয়া হাঙ্গেরীর যে-সব অঞ্চল দখলে নিয়েছিল সেগুলো ছেড়ে দেবে। বেলা কুন যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পরিস্থিতি দেখছিলেন না। সমাজতন্ত্রীরা যে-কোন-ভাবে যুদ্ধ মেটাতে ব্যগ্র ছিলেন। জনগণ হাঁপিয়ে উঠেছিল—তারা শান্তি চাইছিল। দেশের মানুষ কমিউনিস্টদের চাইছিল না। সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা আবার জোড়াতালি দিয়ে চলার পক্ষে মত দিল। বেলা কুন ক্লেমেসোঁর প্রস্তাবে সম্মত হলেন। হাঙ্গেরী চেকোশ্লাভাকিয়া অঞ্চল ছেড়ে চলে এল। এর ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিল। হাঙ্গেরী চুক্তির সর্ত মানল, কিন্তু রুমানিয়া হাঙ্গেরীর দখল করা অঞ্চল পরিত্যাগ করে গেল না। "মিত্র পক্ষ"—রুমানিয়ার আচরণ সমর্থন করল। যুদ্ধে শৌর্য-বীর্য ও বড় ত্যাগের মধ্যে যে জয় অর্জিত হয়েছিল—হাঙ্গেরীর সে সবই খোয়াতে হল। সরকার জনসাধারণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সেনাদল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সেনাবাহিনী যখন দেশের হয়ে রণাঙ্গনে লড়াই করছিল তখন তাদের বাড়ীর মেয়েরা রুটির জন্য, নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য-পণ্যের ন্যায্য মূল্যে সরবরাহের জন্য আন্দোলন করছিলেন। শ্রমিকশ্রেণীও সেনাবাহিনীর পেছন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছিল।

এসময় বেলা কুন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা-তে বিপ্লব ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা নিলেন। অস্ট্রিয়ার শ্রমিকশ্রেণী বেশ সুসংগঠিত ছিল ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের নেতৃত্বাধীনে কাজ করত। অস্ট্রিয়ার কিন্তু ভূমি সমস্যার সমাধান অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিল। ১৮৪৮ সালেই সামন্তপ্রথা লোপ পায় সেদেশে। তাই বিপ্লবের পরিবেশ ছিল না। অপরদিকে চেকো-শ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়া—অস্ট্রিয়াকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করছিল। অস্ট্রিয়ার

বিপ্লবীরা হাঙ্গেরী সরকারের কাছে জানতে চাইল—কয়েকমাস অন্তত অস্ট্রিয়াকে হাঙ্গেরী খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে পারবে কিনা। অস্ট্রিয়াতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হল। এই দলের সভ্য ছিল মূলত বেকাররা। শ্রমিকশ্রেণী এই দলকে বড় একটা মদত দেয়নি। কমিউনিস্টদের হাতে প্রচুর অর্থ ছিল। বেলা কুন তড়ি-ঘড়ি কিছু একটা করার জন্য আরনেস্ট্ বেট্লহেম্‌কে (Ernest Bettleheim) ভিয়েনায় পাঠালেন 'বিপ্লব' পরিচালনার জন্য। শ্রমিকশ্রেণীর মতামত না নিয়েই অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্টরা বিপ্লবের পথে পা বাড়ালেন। জায়গায় জায়গায় শ্রমিক ও কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছিল। ১৯১৯ সালের ১৫ই জুন তারিখে বিপুল সমাবেশ ঘটিয়ে 'বিপ্লব' (Putsch) সংগঠিত করার ব্যবস্থা হল। ১৫ই জুন অভ্যুত্থানের দিন ধার্য হয়েছিল। আগের দিনই নেতারা সবাই ধরা পড়লেন। অনেকে বলেন পুলিশকে দলের ভিতরের লোকেরাই খবর দিয়েছিল। পরের দিন ধৃত নেতাদের মুক্তির জন্য জেলখানা অবরোধ করা হল। পুলিশ গুলি চালাল কমিউনিস্ট অবরোধকারীদের ওপর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কারখানার শ্রমিকরা এর প্রতিবাদে দলের পক্ষে সমর্থন জানাতে এগিয়ে এলো না। ডক্টর বেট্লহেম্ পালিয়ে গেলেন। কিছুদিন পরে ধরা পড়লেন ; আবার বিনা বিচারেই মুক্তি পেলেন। ভিয়েনা অভ্যুত্থানের ব্যর্থতায় বেলা কুনের শেষ আশা চূর্ণ হল।

এদিকে ২৪শে জুন একটা প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্ত আত্মপ্রকাশ করল বুদাপেস্ত সহরে। এই প্রতি-বিপ্লবী প্রয়াস ব্যর্থ হল বটে, কিন্তু দেশে ব্যাপক আকারে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিল। সেই বিদ্রোহও চূর্ণ করা হল। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন কিছু হল না। সেনাবাহিনী ছেড়ে সৈন্যরা চলে আসতে লাগল। ছয় ডিভিশন সৈন্যের মধ্যে প্রায় তিন ডিভিশন সৈন্য প্রতি-বিপ্লবীদের সমর্থন জানিয়েছিল। রুমানিয়ার সেনাবাহিনীর কাছে লাল ফৌজ পেরে উঠল না। ১৯১৯ সালের আগস্ট মাসে হাঙ্গেরীর সোভিয়েটের বিশেষ অধিবেশন আহুত হল। এই অধিবেশনে বেলা কুনের স্বীকারোক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি ঘোষণা করলেন :

"The proletarian dictatorship ought to have met a different end if only we had self-conscious and revolutionary proletarian masses at our disposal. I would have wished the proletarians to fight upon the barricades rather than to relinquish its domination. But I considered : shall we, without the masses, go to the barricades alone ?...

The proletariat was dissatisfied with our domination, already it started in the factories in spite of all our agitation : 'down with dictatorship.' Now I realize that we have tried in vain to educate the masses of proletariat of this country to be *self-conscious revolutioneries* "

"হাঙ্গেরীর সর্বহারা শ্রেণীর. এক-নায়কত্বের এই শোচনীয় পরিণতিই হত না যদি আমরা আমাদের আগে ও পেছনে পেতাম আত্ম-সচেতন শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী জনতা। আমি সেক্ষেত্রে আশা করতে পারতাম সচেতন ও বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র ব্যারিকেড রচনা করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে জীবনপণ করে লড়াই করবে কোনমতেই আত্মসমর্পণ না করে। নিজেদের অর্জিত প্রাধান্য খর্ব হত না। কিন্তু আমি বিবেচনা করে দেখলাম জনসাধারণের সমর্থন সুনিশ্চিত না করে শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীকে রক্তাক্ত সংঘর্ষের মুখে ঠেলে দেওয়া ঠিক হবে কি?...অস্বীকার করে লাভ নেই সর্বহারা শ্রেণী আমাদের শাসনে সন্তুষ্ট আদৌ হতে পারেনি। আমাদের আন্দোলন ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও তারা কারখানায়-কারখানায় সভাসমিতি করে আমাদের এক-নায়কত্বকে ধিক্কার দিয়েছে। আমাদের এই শাসনপ্রথার অবসান দাবী করেছে। এখন আমি বেশ অনুভব করছি যে, শ্রমিক সাধারণকে রাজনীতি-সচেতন ও রাজনৈতিক ভাবধারায় শিক্ষিত করার যে কর্মসূচী আমরা নিয়েছিলাম সে সবই বৃথা প্রমাণিত হয়ে গেল আমাদের এক-নায়কত্বের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে।"

এ কথাগুলো কমিউনিস্ট নেতা বেলা কুনের। চরম ব্যর্থতার এত স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আগে অন্য কোন নেতার মুখে শোনা যায়নি কিন্তু।

কেন শ্রমিকশ্রেণী হাঙ্গেরীতে সেদিন তাদের শ্রেণী-শাসনকে ভেঙে চুরমার করতে উদ্যত হল?

হাঙ্গেরীর বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর কমিউনিস্টরা স্বভাবসুলভ আচরণমত সোস্যালিস্টদের দায়ী করল ব্যর্থতার জন্য। সমাজতন্ত্রীরা দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয় দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু কমিউনিস্ট হঠকারিতা ও শাস্ত্রীয় গোঁড়ামিকে ঢাকা দিয়ে সমাজতন্ত্রীদের ওপর দোষ চাপালে ভুল হবে। বেলা কুনের পেছনে আসলে শ্রমিকশ্রেণীই এসে দাঁড়ায়নি। সরকারের পতন হল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অগ্নিগর্ভ ইউরোপে কমিউনিস্ট কায়দায় বিপ্লব সংগঠিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। প্রতি-বিপ্লবী ও দক্ষিণপন্থী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

৫

## পুঁজিবাদী চক্রান্ত ও হ্বাইমার প্রজাতন্ত্রের অবক্ষয়

হ্বাইমার প্রজাতন্ত্রের আয়ু ফুরিয়ে আসছিল। ক্ষমতার পালা-বদলের একবছর আগে থেকেই আসন্ন পতনের সমস্ত লক্ষণ ফুটে উঠছিল। কি ফ্র্যান্‌স ভন্ প্যাপেন ( Franz von Papen ), কি জেনারেল কার্ট ভন্ স্লেচার, গণ তন্ত্রের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পার্লামেণ্টকে উপেক্ষা করে প্রশাসনিক ডিক্রী জারী করেই প্রশাসন চালাচ্ছিলেন। কার্ট স্লেচার ৫৭ দিনের বেশী ক্ষমতাসীন ছিলেন না। ১৯৩৩ সালের ২৮শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্রের প্রবীণ প্রেসিডেণ্ট ভন্ হিন্‌ডেনবুর্গ স্লেচারকে বরখাস্ত করলেন। সেই সময় জার্মানীর সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী নাৎসী দলের ( National Socialist Party ) নেতা এ্যাডলফ্ হিটলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের চ্যান্সেলার হতে চাইলেন। আর এই প্রজাতন্ত্রের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধনই তাঁর মূল লক্ষ্য ও সঙ্কল্প ছিল। একদিকে নাৎসী দলের তৎপরতা চলেছে অপরদিকে স্লেচার তৎকালীন সেনাবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ হ্যামারস্টিমের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে ক্ষমতা দখলের মতলব ভাঁজছিলেন। আবার নাৎসী দলও বসে ছিল না সে সময়। তারাও প্রাসাদ দখলের পরিকল্পনা করছিল। সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়ার কথাও হচ্ছিল। ২৯শে জানুয়ারী প্রায় একলক্ষ শ্রমিক বার্লিন শহরে শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ মিছিল করল হিটলারকে চ্যান্সেলার করার প্রস্তাবের বিরোধিতা জানিয়ে। শ্রমিক দলের নেতারাও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে গোপন আঁতাত রক্ষা করে চলছিলেন হিটলারকে রুখবার জন্য। [ সি. আর. পি., মিলিটারীর দোস্তি ছাড়া কোন দেশের বিপ্লবীদেরই কিছু করার নেই! এদেশেও পশ্চিম বাংলার জ্বলন্ত অঙ্গার-সম মার্কসিস্ট নেতারা সি. আর. পি., মিলিটারীর পাহারায় সি. আর. পি., মিলিটারীর জুলুম, অত্যাচার সরেজমিনে তদন্ত সি. আর. পি, মিলিটারির উপস্থিতিতেই করে থাকেন! ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে এই যা। ]

হিটলার ভন্ প্যাপেন্-গোষ্ঠী ও রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনের চেষ্টা করছিলেন। কেননা একক শক্তির

জোরে নাৎসী দলের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। আর ক্ষমতায় যেতে না পারলে বিরোধীদের খতম করাও যাবে না। এ দেশের মার্কসবাদীদের মত গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ছোট ছোট দলগুলিকে বাগিয়ে পরিষদীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে। ১১ জন নিয়ে মন্ত্রিসভা হবে, তার মধ্যে ৮ জনই নাৎসী দলভুক্ত হবেন না। কিন্তু হিন্‌ডেনবুর্গ হিটলারকে চ্যান্সেলার করতে রাজী নন। তবু বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত হিন্‌ডেনবুর্গ নানা চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হলেন শেষ পর্যন্ত। ৩০শে জানুয়ারী ৪৩ বৎসর বয়স্ক অস্ট্রীয় (জার্মান নন) এ্যাডলফ্ হিটলার জার্মান রাইখের চ্যান্সেলাররূপে শপথ নিলেন। চ্যান্সেলার পদে বৃত হয়েই সর্বপ্রথম তিনি তাঁর সহযোগীদের তথা গোয়েব্‌লস্, গোয়েরিং, রোয়েম ও অন্যান্য ব্রাউনশার্ট নেতাদের সঙ্গে মিলিত হন। এই মুহূর্তটি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে গোয়েব্‌লস্ জানান:

"He (Hitler) says nothing, and all of us say nothing; but his eyes are full of tears." "তিনি এত অভিভূত হয়ে পড়েন যে, কোন কথাই বললেন না কারুর সঙ্গে। আমরাও কেউ কথা বলতে পারলাম না। হিটলারের চোখ ছিল অশ্রুপূর্ণ।"

সেদিন নাৎসী ঝটিকা বাহিনীর সদস্যরা অগণিত সংখ্যায় বিজয় উৎসব পালন করলেন রাস্তায় রাস্তায় প্রজ্বলিত মশাল নিয়ে প্যারেড করে। তাদের উদ্ধত ভারী বুটের পদধ্বনিতে সমস্ত বার্লিন প্রকম্পিত। [পশ্চিম বাংলাতেও মার্কসবাদীরা নির্বাচনে জয়লাভ করে পথে পথে প্রজ্বলিত মশাল নিয়ে প্যারেড করে শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্র-অনুরাগীদের সন্ত্রস্ত করেছিলেন।] হিটলারের মধ্য দিয়ে তৃতীয় জার্মান রাইখের জন্মলাভ ঘটল। হিটলার-অভিষেকে অভিভূত হয়ে গোয়েব্‌লস্ তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন:

"It is almost like a dream..... a fairy tale .. the new Reich has been born. Fourteen years of work have been crowned with victory. The German revolution has begun."

নাৎসীদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলকে একটি "বিপ্লব" বলে নাৎসী নেতা গোয়েব্‌লস্ বর্ণনা করলেন। হিটলার দম্ভ করে বলেছিলেন তৃতীয় রাইখ হাজার বছর টিকে থাকবে। কিন্তু স্থায়িত্বকাল ছিল মাত্র ১২ বছর কয়েক মাস। অবশ্য হিটলার ব্যতিরেকে তৃতীয় রাইখের প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব হত না।

Hitler had no friends, no family, no job, no home. তাঁর কোন বন্ধু ছিল না, পরিবার ছিল না, চাকরী ছিল না, ঘরবাড়িও ছিল না। ১৯১৩ সালে চিরকালের মত ভিয়েনা পরিত্যাগ করে জার্মানীতে চলে আসেন হিটলার। ২৪ বছর বয়স যখন তখনও তিনি ছিলেন বেকার বাউণ্ডুলে (vagabond)। Shirer বলেছেন :

"He had, however, one thing—an unquestionable confidence in himself and a deep-burning sense of mission."

একজন নিষ্কপর্দক বন্ধুহীন বেকার অস্ট্রীয় যুবক জার্মানীকে তাঁর স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন (adopted country)। ১৯১৪ সালের ৩রা আগস্ট তিনি ব্যাভেরিয়ার রাজা লুডউইগ (King Ludwig III of Bavaria)-এর কাছে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার আবেদন করলেন। রাজা তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন। জার্মানীর হয়ে যুদ্ধে লড়াই করার সুযোগ তিনি এই প্রথম পেলেন। তিনি মনে করলেন এটা তাঁর স্বপ্ন রূপায়ণের পথে সবচেয়ে বড় সুযোগ একটা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে হাসপাতালে আহত সৈনিকরূপে দিন কাটাচ্ছিলেন হিটলার। বোমায় তাঁর চোখের দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে যায়; প্রায় অন্ধ হয়েই গিয়েছিলেন। Pasewalk-এর সামরিক হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে জার্মানীর পরাজয়ের গ্লানিকর দুঃসহ সংবাদ শুনলেন তিনি প্রথম। কাইজার পদত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে পলায়ন করেছেন। তার ঠিক আগের দিন এক নূতন প্রজাতন্ত্রের জন্ম হল বার্লিন শহরে। ১১ই নভেম্বর সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। দুর্ধর্ষ জার্মানী পরাজিত, মিত্রপক্ষের করুণা কৃপা ভরসা মাত্র। বালিশে মুখ গুঁজে তিনি কেঁদেছিলেন—তাঁর মনে বাজছিল :

"So it had all been in vain. In vain all the sacrifices and privations······in vain the hours in which with mortal fear clutching at our hearts, we nevertheless did our duty, in vain the death of two millions who died······Had they died for this? Did all this happen only so that a gang of wretched criminals could lay hands on the fatherland?"

[ Mein Kampf, P. 204-205 ]

৩০ বছর বয়স্ক নামগোত্রহীন এই ব্যক্তি পথে পথে বেকারীর দুঃসহ জ্বালা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি নিজের চাকরীর কথা ভাবেননি কোনদিনও, ভাবছিলেনও না—ভাবছিলেন রাজনৈতিক জীবন গড়ে তোলার

কথা। তাঁর সমস্ত স্বপ্ন ছিল জার্মান জাতি ও তার ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করে। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রনায়ক বোধকরি এত ক্ষুধার জ্বালা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেননি। কিন্তু কে তাঁকে গ্রহণ করবে? তিনি গরীব, পেছনে কেউ নেই তাঁর। নভেম্বরের শেষে তিনি মিউনিক শহরে ফিরে এলেন। এখানেও বিপ্লব হয়ে গেছে, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা রাজাকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। Bavarian People's State স্থাপিত হয় Kurt Eisner-এর নেতৃত্বে। তিনি ছিলেন জনপ্রিয় একজন ইহুদী।

ব্যাভেরিয়াতে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে Kurt Eisner-কে দক্ষিণপন্থীরা হত্যা করেন। তারপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গঠিত Soviet Republic-ও খুব ক্ষণস্থায়ী ছিল। এই কমিউনিস্ট সরকারকে সরকারী সেনাবাহিনী ১৯১৯ সালের ১লা মে উৎখাত করে দেয়। এতে বহু কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্ট নিহত হয়। অল্প কিছুদিনের জন্য Johannes Hoffmann-এর নেতৃত্বে মডারেট-পন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক সরকার স্থাপিত হয় বটে, তবে ধীরে ধীরে ব্যাভেরিয়ার শাসনভার প্রকারান্তরে দক্ষিণপন্থীদের হাতে চলে গেল।

প্রশ্ন: এই সময় ব্যাভেরিয়ায় "দক্ষিণপন্থী" কারা ছিলেন? রাজতন্ত্রের সমর্থকরা, জার্মানীর স্থায়ী সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা দপ্তর Reichwehr। বার্লিনে প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী এঁরা ছিলেন। আর ছিল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ঘরে ফিরে আসা সৈন্যদল, যাদের চাকরী ছিল না—যারা সমাজে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে ব্যগ্র ছিল। যুদ্ধ থেমে যাবার পর তাদের সামনে কোনই পথ ছিল না। হিংসার প্রতি তাদের কোন অনীহা ছিল না—হিংসার রাজনীতিতে তারা আকৃষ্ট হল। হিটলারের ভাষায় এরা বিপ্লবের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। Reichwehr গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে এদের কাজে লাগাতে ব্যস্ত তখন। এদের পরবর্তী কালে Reichwehr ব্যবহার করে প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার কাজে। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে Captain El rhardt-এর নেতৃত্বে বার্লিনে অভিযান চালিয়ে বার্লিন থেকে প্রজাতন্ত্রী সরকারকে হটিয়ে দিল এবং সেখানে Dr. Wolfgang Kapp নামে এক চরম দক্ষিণপন্থীকে স্থলাভিষিক্ত করল। প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ও সরকার পশ্চিম জার্মানীতে পালিয়ে বাঁচলেন। তবে কিছুদিনের সাধারণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্র আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক একই সময় মিউনিখ-এও আর একটি প্রাসাদ বিপ্লব (Coup d'etat) হয়ে গেল। ৪ঠা

মার্চ ১৯২০ সালে Hoffmann-এর সমাজতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করল Reichwehr এবং তার জায়গায় Gustav Von Kahr-এর নেতৃত্বে এক দক্ষিণপন্থী সরকার স্থাপনে সাহায্য করল। প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন Ebert এবং Scheidemann প্রথম চ্যান্সেলার। Discharged army free-corps-রা মিলিতভাবে চক্রান্ত করেছিল। রাজনৈতিক হত্যার-ষড়যন্ত্র এখানে হয়। এই উর্বর ক্ষেত্রেই হিটলারের রাজনৈতিক জীবনের অভ্যুদয়।

হিটলার প্রথম German Worker's Party (শ্রমিক দল)-তে যোগ দেন। তবে নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। এই সময় দেশের অভাব-অভিযোগ এত বেশী ছিল যে, কোন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী একটি করে দল তৈরী করছিলেন। German Worker's Party-ও এই ধরনের একটি দল ছিল। এই জার্মান শ্রমিক দলের Anton Drexler ছিলেন কেন্দ্র-বিন্দু। ড্রেক্সলার চেয়েছিলেন শ্রমিকভিত্তিক দল, তবে সে দল হবে কড়া জাতীয়তাবাদী। Social Democrats-দের মতো নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীভিত্তিক দল বা রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। কেননা এই শ্রেণীর আচরণে তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। হিটলারও বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করতেন, কেননা এই শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা নিয়ে ভাবতই না। জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির তিনি হলেন ৭ম সদস্য। কেন তিনি এই অতি ক্ষুদ্র দলে যোগ দিলেন তাও লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর Mein Kampf-এ ('আমার সংগ্রাম')।

Dietrich Echart প্রকৃতপক্ষে National Socialism-এর তাত্ত্বিক প্রবক্তা। তিনি ছিলেন সাংবাদিক ও ছোট-খাটো সাহিত্যিক ও নাট্যকার। হিটলারের মধ্যে তিনি তাঁর মনোমত নেতা আবিষ্কার করলেন। হিটলারকে বিভিন্ন জায়গায় পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাঁকে মনোমত করে তৈরী করার চেষ্টা করেন। Drexler ছিলেন একজন তালা-কুলুপ তৈরীর মিস্ত্রি। রোয়েম-ও এই দলে যোগ দেন। তিনি ছিলেন যোদ্ধা ও S. A. (army of storm troopers)।

১৯১৮ সালের ৯ই নভেম্বর বার্লিনে জার্মান প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কাইজার রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। ফ্রেডারিক এবার্ট ও ফিলিপ শীডম্যান কি করবেন স্থির করতে পারছিলেন না। তাঁরা কোন বিপ্লবের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। রুশ কেরেনস্কীর ভূমিকা নিতে চাননি তাঁরা। অথচ দেশ তখন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। রোজা

লুকসেমবুর্গ ও কার্ল লিব্‌নিখট্‌ বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র স্থাপনের জন্য চেষ্টা করছিলেন। সোভিয়েট রিপাবলিক স্থাপিত হতে চলেছে শুনে এবার্ট ও শীডম্যান আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। ফিলিপ শীডম্যান কোন পরামর্শ না করেই জনতার সামনে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করলেন। এ ব্যাপারে এবার্ট-এর ভিন্ন মত ছিল শোনা যায়। তিনি সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের ( Constitutional monarchy ) পক্ষে ছিলেন।

কোন পরিকল্পনা বা আলোচনার মধ্য দিয়ে এই প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়নি। সামরিক বাহিনীর নেতা লুডেন্‌ডর্ফ ও হিনডেন্‌বুর্গ—সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার রাশ তুলে দিলেন। তাঁরা এই দুর্বল-চেতা নেতাদের ঘাড়েই মিত্রপক্ষের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষর করার দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন। ভার্সাই-চুক্তির গ্লানিকর বোঝা, ক্ষয়-ক্ষতির বোঝা চাপল এদের মাথায়। অথচ এদের কোন দায়িত্ব ছিল না। প্রজাতন্ত্রের ধ্বংসের বীজও তাড়াহুড়া করে প্রজাতন্ত্র স্থাপনের মধ্যে লুকানো ছিল। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই প্রজাতন্ত্রকে শক্ত বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কমিউনিস্ট বিপ্লবকে খতম করার জন্য চাপ এল এবার্টের ওপর। তিনি সম্মত হলেন—নিয়োগ করলেন Gustav Noske-কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তিনি ১৯১৯ সালের ১০ই জানুয়ারী বিপ্লবীদের আঘাত হানলেন। ৭ দিন ধরে 'Bloody week' চলল—রোজা লুকসেমবুর্গ ও লিব্‌নিখট্‌ ধৃত হলেন এবং তাঁদের হত্যা করা হল। বিপ্লব শেষ হল। এর পরই জার্মানীতে সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করা হল। National Assembly-তে নির্বাচনে ( জানুয়ারী ১৯, ১৯১৯ ) সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা পেলেন ১৮৫টি আসন—৪২১টির মধ্যে। অন্যান্য দল পেল ১৬৬টি। এই নির্বাচনের লক্ষ্য ছিল সংবিধান প্রণয়ন। ১৯১৯ সালে ৩১শে জুলাই সংবিধান গৃহীত হল। প্রেসিডেন্ট তা অনুমোদন করলেন সেই বছরই। বিংশ শতাব্দীর এটা ছিল সবচেয়ে সুন্দর গণতান্ত্রিক সংবিধান। ব্রিটিশ ও ফরাসী ব্যবস্থা থেকে গ্রহণ করা হল ক্যাবিনেট-প্রথা, শক্তিশালী জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল আমেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে, সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধান থেকে গণভোটের ব্যবস্থা নেওয়া হল। বলা হল—Political power emanates from people—জনগণই শক্তির উৎস।

২০ বছর বয়স্কদের ভোটাধিকার দেওয়া হল। সকল জার্মান নাগরিকদের সমান অধিকার দেওয়া হল। ঘোষণা করা হল "Personal liberty

is inviolable………every German has a right to express his opinion freely……All Germans have the right to form Associations or societies……All inhabitants of the Reich enjoy complete liberty of belief and conscience……"

এর আগেই ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে হিউগো প্রিয়ুস (Hugo Preuss) নামক এক বাম্‌-চিন্তাসম্পন্ন উদারতন্ত্রী আইনজ্ঞকে খসড়া সংবিধান রচনার ভার দেওয়া হয়েছিল। পরিষদীয় গণতন্ত্র ও কড়া কেন্দ্রীয়করণের নীতির সমন্বয় সাধনের প্রয়াস ছিল এই হ্বাইমার প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানে। জার্মানীর বাম-চিন্তাসম্পন্ন সকলেই একটি শক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ইউনিটারী স্টেট-ব্যবস্থার পক্ষে মত ব্যক্ত করে আসছিলেন। ১৮৭১ সালের রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেশের সার্বভৌমত্ব ২৫টি অঙ্গ রাজ্যের মধ্যেই ছড়ান ছিল। নূতন সংবিধান সে-ব্যবস্থার পরিবর্তে ঘোষণা করল সার্বভৌমত্বের উৎস দেশের আপামর জনসাধারণ। প্রাশিয়ার বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা আর স্বীকার করা হল না। প্রাশিয়াও একটি প্রশাসনিক ইউনিট বলেই গণ্য হল [ Lander =ইংলণ্ডের কাউন্টির সমতুল্য ]। রাইখের প্রাধান্য ঘোষিত হল। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণের নীতিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই সমাজতন্ত্রীরা এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানালেন। দেশের রাষ্ট্রপতির সাধারণ মানুষের ভোটে ৭ বছর অন্তর নির্বাচনের বিধান হল। তিনিই ছিলেন সকল ক্ষমতার অধিকারী। পররাষ্ট্রবিষয়ক নীতি তিনি নির্ধারিত করবেন। তিনি দেশের চ্যান্সেলার নিয়োগ করারও অধিকারী হন। সামরিক বাহিনীর তিনটি বিভাগের সর্বময় কর্তা হন দেশের গণভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট। রাইখস্ট্যাগ আহ্বানের ও ভেঙে দেবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। জরুরীকালীন ব্যাপক ক্ষমতাও তাঁর ছিল। ১৯৩০ সালের পর জরুরীকালীন পরিস্থিতিতে জার্মান সরকারের প্রশাসনিক সকল ক্ষমতার উৎস ছিল রাষ্ট্রপতির অপরিসীম ক্ষমতা। হিটলার এই অবস্থার ও সাংবিধানিক ক্ষমতার সুযোগ নিতে কিন্তু দ্বিধা করেননি।

বিস্‌মার্ক-এর সময়কার সংবিধানে মৌল অধিকারের কোন ঘোষণাই ছিল না (Declaration Of Fundamental Rights)। হ্বাইমার সংবিধানে সেই অপূর্ণতা দূর করা হয়েছিল। গণপরিষদে শ্রমিক সংগঠনগুলির যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব প্রতিফলিত হয়েছিল। আর্থিক ন্যায় বিচারের প্রতি সর্বশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয় নূতন সংবিধানে। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত কল-

কারখানা শিল্পকে রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে প্রয়োজনমত আনার সঙ্কল্পও ঘোষিত হয়। শ্রমিকদের কাজের সময়, মজুরী প্রভৃতি বিষয়ে মালিকশ্রেণীর সঙ্গে সমান অধিকারের ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মৌল নীতি স্বীকৃত হল। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী নেতারা একথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি।

Socialisation could only be effective when industry was healthy and flourishing ; at a time of economic dislocation and chronic raw material shortages it seemed madness to embark upon risky experiments which might retard Germany's economic recovery.. [ A History of Germany 1815-1945 By William Carr ; Arnold, P. 295 ]

দেশে যখন কাঁচামালের সরবরাহে ঘাটতি থাকে—অর্থনৈতিক অচল অবস্থা থাকে তখন ঝট্‌পট্ রাষ্ট্রীয়করণের নীতি এক নিছক পাগলামি। তাতে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ত্বরান্বিত হয় না। শিল্প যতক্ষণ না স্বাবলম্বী সম্প্রসারণধর্মী ও উন্নয়নমুখী হয়ে উঠছে ততক্ষণ সামাজিকীকরণের নীতি ফলপ্রসূ হয় না। তাছাড়া জার্মান নেতাদের আশঙ্কা ছিল যুদ্ধে বিজয়ী ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই নীতিকে হয় বাধা দেবে আর না হয় যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের মোটা টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প থেকে আদায় করার ফন্দি এঁটে জার্মানীর অর্থনৈতিক অগ্রগতি স্তব্ধ করে দিতে পারে। তাই অবস্থার বিচারে শীডম্যান সরকার ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক শিল্প সম্প্রসারণের দিকে ঝুঁকলেন। দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলিও সরকারের পক্ষে পুরোপুরি ছিল। বড় বড় গাল-ভরা বিপ্লবীপনায় তারা অনীহা প্রকাশ করেছিল। অনিশ্চিত সামাজিকীকরণের ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের পার্থিব স্বার্থকে বিপন্ন হতে দিতে চায়নি।

শীডম্যান সরকারের আমলে শ্রমিকশ্রেণীর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। প্রতি কল-কারখানার যেখানেই ২০ জনের বেশী শ্রমিক কাজ করত 'ওয়ার্ক কাউন্সিল' গঠিত হল। এ ছাড়া অর্থনৈতিক মন্ত্রকের অধীনে একটি 'জাতীয় কাউন্সিল' গঠিত হল, তাতে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন জেলাগুলিতেও অনুরূপ ব্যবস্থা হয়। উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ( Economic Council ) হবে যেন একটি অর্থনীতি বিষয়ক পার্লামেন্ট—দেশে কি ধরনের আইন প্রণীত হওয়া উচিত সে সব বিষয়েও এই পরিষদ সরকারকে পরামর্শ দেবে। কিন্তু এই নীতি সফল হল না।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এই কর্মসূচীকে রূপায়িত হতে দিতে আদৌ আগ্রহী ছিলেন না।

কাজ মোটামুটি সন্তোষজনকভাবেই এগুচ্ছিল। কিন্তু ১৯১৯ সালের মাঝামাঝি নূতন সঙ্কট ডেকে আনল ভার্সাই সন্ধি চুক্তির সর্তাবলী। গণপরিষদের প্রত্যাশা ছিল বিজয়ী মিত্রপক্ষ জার্মানীর ওপর বিজয়ীর উদ্ধত তাণ্ডব নৃত্যের পথ পরিহার করে জার্মানীর নূতন গণতান্ত্রিক পরীক্ষাকে ব্যর্থতার পঙ্কে ডুবিয়ে দেবে না। কিন্তু প্রতিহিংসার মন নিয়েই মিত্রপক্ষ সর্তগুলি জার্মানীর ওপর চাপাতে বদ্ধপরিকর হল। শীডম্যান সরকারের মন্ত্রিসভা সন্ধি-চুক্তির সর্তাবলী ৮-৬ ভোটে প্রত্যাখ্যান করে পদত্যাগ করলেন। কিন্তু সন্ধি-চুক্তি প্রত্যাখ্যান করার অর্থই হল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। জার্মানী রণক্লান্ত—যুদ্ধ চালিয়ে যাবার উপায়ও ছিল না। যুদ্ধ চালালে সৈন্যবাহিনীও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিও একমত হতে পারল না কর্মসূচী সম্বন্ধে। সোস্যালিস্ট ( Majority Socialists ) এবং মধ্যপন্থী ( Centrist )-দের সহযোগিতায় একটি নূতন সরকার গঠিত হল সমাজতন্ত্রী গুস্তভ বয়্যারকে ( Gostav Bauer ) চ্যান্সেলার করে। এদিকে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিক্ষোভ—সন্ধি-চুক্তির অপমানজনক সর্তগুলিকে কেন্দ্র করে। সরকার আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য বিকল্প পথ না দেখে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিল। সোস্যালিস্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রী হারম্যান ম্যুলার ( Hermann Mullar ) এবং বিচারমন্ত্রী জোহান্নেস বেল ( Johannes Bell ) ২৮ শে জুন ভার্সাই-তে গিয়ে সন্ধি-চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করে এলেন।

জার্মানীর ভৌগোলিক আয়তন সম্পর্কে ভার্সাই চুক্তিতে যে-সব ধারা সংযোজিত হয়েছিল তার ফলে (১) পশ্চিমে আলসাস্ লোরেন ( Alsas-Lorraine ) অঞ্চলটি ফ্রান্সকে প্রত্যর্পণ করা হল। (২) ফ্রান্সের আশঙ্কা দূর করার জন্য রাইন নদীর দুই তীরবর্তী অঞ্চলকে সম্পূর্ণ সামরিক বাহিনীমুক্ত করার ব্যবস্থা ( demilitarisation ) হল এবং রাইন ভূখণ্ডে মিত্রবাহিনী মোতায়েন থাকবে। (৩) এই সেনাবাহিনীর কলেবর ধীরে ধীরে ৫ বছরে হ্রাস করা হবে—তবে সেটাও নির্ভর করবে জার্মানী চুক্তির বিভিন্ন সর্ত যথাযথ পালন করছে কিনা তার মূল্যায়নের ওপর। অবশ্য ১৯৩৫ সালে এই বিদেশী সেনাবাহিনী প্রত্যাহৃত হবে। (৪) সার-অঞ্চলের কয়লাখনি ও কারখানাগুলি ফরাসী সরকারের এজেন্টরা ব্যবহার করবে। (৫) সার-অঞ্চলকে জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্রসংঘের পরিচালনাধীন ( League of Nations ) একটি কমিশনের

কর্তৃত্বাধীনে থাকবে স্থির হল ১৫ বছরের জন্য। ১৫ বছর পর সার-এর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ গণভোটের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে যাচাই করা হবে। (৬) জার্মানীর কিছু অঞ্চল ডেনমার্ক পেল। (৭) পূর্বাঞ্চলের পোসেন (Posen) পশ্চিম প্রাশিয়া ও পমিরয়ানিয়ার ( Pomerania ) কিছু অংশ নূতন পোলিশ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হল। এর ফলে প্রায় ১০ থেকে ১৫ লক্ষ জার্মান নাগরিক পোল-সরকারের শাসনে চলে গেল। পূর্ব-প্রাশিয়াকে জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল পোলিশ করিডর দ্বারা। জার্মান-অধ্যুষিত ডান্‌জিগ্‌ নগরীকে রাষ্ট্রসংঘের মনোনীত একজন হাইকমিশনারের তত্ত্বাবধানে 'স্বাধীন নগরী'-রূপে ঘোষিত হল। জার্মান-অধ্যুষিত মেমেল নগরীকে একজন ফরাসী হাইকমিশনারের তত্ত্বাবধানে আনা হল। অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত হতে দেওয়া হল না। আপার-সাইলেসিয়ার সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চলকে প্রথমে পোল্যাণ্ডকে ভেট দেওয়া হল। পরে জার্মানীর আবেদন-নিবেদনের ফলে মিত্রপক্ষ গণভোটের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই অঞ্চলের শতকরা ৬০ জন অধিবাসীদের জার্মানীর সঙ্গে যুক্ত থাকার সম্মতি দেয়। এতে পোল্যাণ্ড তীব্র বাধা দেয়। পরে অবশ্য সাইলেশিয়ার বিভক্তিকরণের ( Partition ) সিদ্ধান্ত নিল বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ ( League of Nations ) ১৯২২ সালে। এর ফলেও অবশ্য সাইলেশিয়ার বেশকিছু শিল্প-সম্পদ পোল্যাণ্ডের ভাগে পড়ল। সর্বমোট জার্মানী এই চুক্তির সর্তানুযায়ী ২৫,০০০ বর্গমাইল রাষ্ট্রীয় আয়তন হারাল, প্রায় ৬৫ লক্ষ জার্মান নাগরিক অন্যান্য রাজ্যের নাগরিক হয়ে গেল। জার্মানী তার প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ আকরিক লৌহ, শতকরা ৬৫ ভাগ দস্তা, শতকরা ২৬ ভাগ কয়লা-সম্পদ অন্যের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হল।

জার্মানীকে সামরিক দিক থেকে পঙ্গু করা হল। তার সমস্ত ভারী অস্ত্র ধ্বংস করতে হল—অথবা মিত্রপক্ষের হাতে তুলে দিতে হল। রাইনল্যাণ্ডের সামরিক ঘাঁটি ভেঙে দেওয়া হল। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য সমগ্র জার্মানীকে মাত্র ১ লক্ষ সৈন্য রাখার অনুমতি দেওয়া হল। যুদ্ধের জন্য ভারী কামান, গ্যাস, বিমান তৈরী নিষিদ্ধ করা হল। জার্মানীকে মাত্র ৬টি যুদ্ধজাহাজ ও কয়েকটি ছোট জাহাজ ( Sea craft ) রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। মাত্র ১৫,০০০ নৌ-সেনা রাখার অনুমতি মিলল। এইভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হল একটা দুর্ধর্ষ জাতিকে।

এই পটভূমিতেই হ্বাইমার প্রজাতন্ত্রের পরীক্ষা চলে জার্মানীতে। ১৯২৩ সালের অর্থনৈতিক সঙ্কট জার্মানী ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠল। আন্তর্জাতিক মর্যাদাও

দেশের বাড়ল। বিদেশী পুঁজির আমদানী যথেষ্ট হল। ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে জার্মানীতে ২৫ হাজার মিলিয়ান মার্ক বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের জন্য এল। ইস্পাত, লৌহ, কয়লা, রাসায়নিক শিল্প, বিদ্যুৎশিল্পের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। জাহাজ নির্মাণশিল্পে জার্মানী বিশ্বের চতুর্দশ স্থান থেকে ত্রয়োদশ স্থানে উন্নীত হল। সাধারণ মানুষের জীবনের মান বেশ উন্নত হয়। বামপন্থী চরমপন্থী দক্ষিণপন্থীদের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। নির্বাচনের ফলাফল তাই প্রমাণ করেছিল। ১৯২৪ সালের মে মাসের নির্বাচনে ন্যাশন্যাল সোস্যালিস্টদের পার্লামেণ্টে সদস্যসংখ্যা ছিল ৩২; ১৯২৮ সালে ১৪-তে দাঁড়ায়। ১৯২৪ সালে কমিউনিস্ট ডেপুটিদের সদস্যসংখ্যা ছিল ৬২, ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর নির্বাচনে কমিউনিস্ট ডেপুটিদের সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৪৫-এ। মধ্যপন্থী দলগুলির শক্তি অবশ্য বাড়ছিল। মেজরিটি সোস্যালিস্টদের সদস্যসংখ্যা পার্লামেণ্টে ১৯২৮ সালে সর্বাধিক হয় ১৫৩ জন।

এতদ্‌সত্ত্বেও কিন্তু প্রজাতন্ত্রের অবক্ষয়ের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। বাহ্যিক আপেক্ষিক অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি সত্ত্বেও অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তার একটি মূল কারণ ছিল বহু-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা (**multi-party system**)। এই বহু দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্বকে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। সেই সঙ্গে আনুপাতিক ভোট গ্রহণ প্রথা (**Proportional representation**) এই বহু দলীয় ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। জার্মানীতে ১৯৫৭ সালের আগে পর্যন্ত কোন একটি রাজনৈতিক দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। [১৯৫৭ সালে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটরা ডঃ এ্যাডিনয়ারের নেতৃত্বে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন প্রথম বুন্দস্টাগে। কিন্তু জাতীয় ভিত্তিতে ক্যাথলিকরা দক্ষিণপন্থী দলগুলির সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন।]

গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলির দিকে দেশের যুবশক্তি পিঠ ফিরিয়েছিল। তাদের কর্মসূচী তরুণদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। রাজনৈতিক দলগুলি জনসাধারণকে আস্থায় না নিয়ে গোপনে-গোপনে শীর্ষ বৈঠক, শলাপরামর্শ করে সরকারী নীতির পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল। এতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা হ্রাস পাচ্ছিল। কোয়ালিশন সরকারের সহযোগী দলগুলি ভিন্ন ভিন্ন পথে চলছিল—এমন কি একই 'বিল' বা আইন প্রণয়নের সময় পার্লামেণ্টে দলগুলি একই সরকারের অংশীদার হয়েও তার বিরোধিতা

করেছে, বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। [ ভারতেও পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের প্রশাসন তুলনীয় ] [ Willian Carr : A History of Germany 1815-1945, P. 335-37 ]

প্রজাতন্ত্র চরম দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের প্রচণ্ড বিরোধিদের সম্মুখীন হয়েছিল। দুই পক্ষই গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে গণতন্ত্রকে শেষ করার পথই অবলম্বন করেছিলেন।

একটা কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। সেটা হল সরকারে আসীন ব্যক্তিদের ও সামরিকবাহিনীর একটি শক্তিশালীগোষ্ঠী প্রজাতন্ত্রের যুগে গোপনে ভার্সাই চুক্তির নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত সর্তগুলিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তলে তলে জার্মানীর সামরিক পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যাপারে হ্যানস্ ভন্ সীক্ট (Hans von Seeckt)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি Reichwehr-এর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন ১৯২০ সালে। প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ বা শ্রদ্ধা ছিল না। সেনাবাহিনীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে দেশের সিভিলিয়ান বা রাজনীতিবিদ্‌রা এমনকি পার্লামেণ্টও যাতে মাথা গলাতে না পারে তার ব্যবস্থা ভন্ সীক্ট করেন। এমন কি প্রেসিডেণ্ট হিন্‌ডেনবুর্গ-এর এক্তিয়ারও ছিল না। জার্মান সেনাবাহিনীর গণতন্ত্রীকরণের ( democratization ) বিরোধিতাই তিনি করেন, বামপন্থীদের-সমাজতন্ত্রীদের সকল চাপই তিনি উপেক্ষা করেন। দেশের দক্ষিণপন্থী ও উগ্রজাতীয়তাবাদীরা অবশ্য সামরিক পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ছিল। তাদের রাজনীতি ও মার্কসীয় চিন্তাধারাভিত্তিক কর্মসূচী অনুসরণের অর্থই ছিল দেশকে হীনবীর্য করে রাখা।

আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ( Control Commission ) তদারকির আড়ালে ভন্ সীক্ট জার্মানীর সেনাবাহিনীকে আবার গড়ে তুলতে থাকেন। উপযুক্ত মানসিকতা-সম্পন্ন তরুণদের সেনাবাহিনীতে ভর্তির পরিবেশ তৈরী করা হল। ভার্সাই চুক্তির নিরস্ত্রীকরণের সর্তগুলি এড়িয়ে জার্মান শিল্পপতিদের সহযোগিতায় সেদিনের জার্মান সরকার দেশের বাইরে জার্মানীর সমরোপকরণ উৎপাদনের শিল্প গড়ে তুলছিলেন। ক্রুপ্ ( Krupp ) ও অন্যান্য শিল্পপতি খুব উৎসাহ সহকারে সাড়া দিলেন। জার্মানীর বাইরে ভারী যুদ্ধাস্ত্র নামগোত্রহীন কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে তৈরী হতে লাগল। রাশিয়াতে এই ধরনের বেনামী কোম্পানী স্থাপিত হল জার্মানীর জন্য বিমান ও রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের

জন্য। স্পেনে তৈরী হচ্ছিল ডুবোজাহাজ, সাঁজোয়া গাড়ী ( tank )। কামান তৈরীর ব্যবস্থা হল সুইডেন, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক এ। আর এ ব্যাপারে কমিউনিস্ট রাশিয়া পুরোপুরি সহযোগিতা করেছে জার্মানীর সঙ্গে। জার্মানী তার উন্নত কারিগরি বিদ্যা দ্বারা নানাভাবে রাশিয়াকে সাহায্য করতে থাকে। রাশিয়াতেই জার্মানীর যুদ্ধ বিমানচালকরা শিক্ষা লাভ করতে থাকে। এই সব ব্যাপারে পার্লামেন্টের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিলই।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে জার্মান জাতির চরিত্রও ফুটে ওঠে। দেশের শিল্পপতিরাও জার্মান জাতির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য জাতিস্বার্থবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। নিজেদের মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলার জন্য জাতির মেরুদণ্ড ভাঙার কুৎসিত ষড়যন্ত্রে তাঁরা লিপ্ত হননি। দেশের সম্মান, মর্যাদা ও স্বার্থকে তাঁরাও অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তবেই সামরিক পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছিল। শিল্পপতিদের সাহায্য না পেলে এটা কখনই সম্ভব হত না। [ ভারতের এক শ্রেণীর বড় শিল্পপতি এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জাতিস্বার্থ-বিধ্বংসী দেশাত্মঘাতী আচরণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ] জার্মানীর মার্কসবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা বুঝতেই পারেননি দেশের জনগণ জাতীয় আত্মমর্যাদার প্রতি বিজয়ী শক্তিগোষ্ঠীর অবমাননা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সামরিক পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ বা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সংঘাত তো থাকতে পারে না। একটি দুর্বল হীনবীর্য রাষ্ট্র কখনও শক্তিশালী উন্নত গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ জাতির প্রকৃত আধার হতে পারে না। গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য শক্তির সাধনা প্রয়োজন।

জার্মানীর সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট ও উদারপন্থীরা যখন গোপনে গোপনে সামরিক শক্তিবৃদ্ধির বিরোধিতা করে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের প্রশংসা কুড়োতে ব্যস্ত, তখন কিন্তু খোদ সোভিয়েট রাশিয়া জার্মানীর এই প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। কূটনৈতিক উদ্দেশ্যে জার্মানী ব্রিটেন ও ফ্রান্স-এর বিরুদ্ধে কাজ করুক এটাই রাশিয়া চেয়েছিল—যাতে রাশিয়া জার্মান-শত্রুতার সম্মুখীন কোনদিন না হয়। আর যাতে সেই সুযোগে রাশিয়াকে শক্তিশালী জাতি-রাষ্ট্র (Nation State)-রূপে গড়ে তোলা সম্ভব হয়। আবার Hans von Seeckt-র প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলেও—তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর পুনরুজ্জীবনের জন্য শক্তিশালী এবং শ্রেষ্ঠ জার্মান সেনাবাহিনী ও সামরিক অফিসার-গোষ্ঠী গড়ে তোলা। জাতির চরিত্রের এটি একটি উজ্জ্বল দিক। অফিসারদের মধ্যে দেশপ্রেম না থাকলে দেশ গড়া যায় না। শুধু রাজনীতিবিদ্রা,

তত্ত্ববিশারদরা বক্তৃতা করে, তত্ত্ব-কথা প্রচার করে বড় শক্তিশালী জাতি কখনই গড়ে তুলতে পারেন না। রাজনীতির প্রচার ও নাম-যশের আড়ালে যে সব সিভিল সার্ভিসের অফিসার থাকেন, সামরিক দপ্তরের অফিসার থাকেন, কূটনীতিজ্ঞ থাকেন, তাঁদেরই কর্তব্য বিভিন্ন সরকারের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে দেশের শক্তি, সম্মান ও শ্রীবৃদ্ধি করা। দেশ ও জাতি—প্রেমের সুমহান আদর্শ সামনে রেখে তাঁরা যেমন প্রশাসনকে পরিচালিত করবেন তেমনি রাজনীতিবিদ্ ও মন্ত্রীদের উপযুক্ত পরামর্শও দেবেন।

জার্মানীর সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে জার্মানীর সামরিক অফিসাররা জাতির প্রতি একটা বিরাট কর্তব্য পালন করে গিয়েছিলেন। তাদের 'দক্ষিণপন্থী' বা 'বামপন্থী' কাল্পনিক রাজনৈতিক তকমা চাপিয়ে বিশ্লেষণ করলে ভুল হবে। হিটলার এই অবস্থার সুযোগ নিয়েছিলেন। জার্মানীর তথাকথিত বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রীরা 'দক্ষিণপন্থী'-রূপে তাঁদের দ্বারা চিত্রিত সেনাপতিদের বা অফিসারদের তীব্র নিন্দা করলেও ব্রিটিশ সামরিক বিশেষজ্ঞ মেজর জেনারেল টেম্পারলে (Major General Temperley) জার্মানীর গোপন সমরায়োজনের প্রয়াসকে কিন্তু নিন্দা করতে পারেননি। তিনি মন্তব্য করেছিলেন : "One wondered to what extent other high spirited nations in similar circumstances would have refrained from doing their utmost to circumvent a treaty which had been forced on them at the point of bayonet. [ The Whispering Gallery Of Europe ; London, 1938 P. 222 ] বেয়নেটের মুখে জোর-জবরদস্তি করে চাপিয়ে দেওয়া ভার্সাই চুক্তির সর্ত অনুরূপ পরিস্থিতিতে মেনে নিয়ে নিজের জাতিকে হীনবল ও পদানত রাখার চেষ্টা করতেন অপর কোনো জাতি একথা মনে করার কোনই কারণ নেই। একজন ব্রিটিশ সামরিক বিশেষজ্ঞ যখন উপরোক্ত মনোভাব নিয়েছিলেন তখন সমাজতন্ত্রী কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা নিজের দেশকে দুর্বল করে রাখার রাজনীতিকেই সমর্থন করেছিলেন। [ ভারতে বিভিন্ন মার্কসবাদী ও সোস্যালিস্ট পার্টিগুলিও ভারতকে সামরিক দিক থেকে দুর্বল করে রাখতে আগ্রহী। প্রতিরক্ষাখাতে ভারত সরকারের ব্যয়-বরাদ্দের বিরামহীন তীব্র সমালোচনা করা হয় বামপন্থীদের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে। সেইসব দলগুলিই আবার রাশিয়া, চীন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতির বিপুল প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় ও দেশের সমগ্র প্রশাসনের সামরিকীকরণের ( militarization ) বিন্দুমাত্রও সমালোচনা করেন না। ]

অপমানজনক ভার্সাই চুক্তি জার্মানীর অধিকাংশ মানুষই মেনে নিতে পারেনি। রক্ষণশীল দলগুলি এর বিরোধিতা করে এসেছিল। অথচ চুক্তির সর্ত উপেক্ষা করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ক্ষমতাও জার্মান সেনাবাহিনীর সেদিন ছিল না। দেশের অভ্যন্তরে দারুণ অর্থনৈতিক সংকট, খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। জার্মানী রাশিয়ার কাছে পরাজিত হয়নি, শক্তিশালী ফরাসীবাহিনীর কাছেও পরাজিত হয়নি। তবু যুদ্ধ করে ভার্সাই সন্ধির সর্তগুলি মেনে নিতে হল। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসনের ১৪ দফার ভিত্তিতে সন্ধি হল না। উদ্ধত বিজয়ীর সর্ত অনুযায়ীই জার্মানীকে কাজ করতে হল। রক্ষণশীল এবং জাতীয়তাবাদী দলগুলি একদিকে যেমন চুক্তির বিরোধিতা করে এসেছিল অপরদিকে যে হ্বাইমার প্রজাতন্ত্র এই চুক্তি অনুমোদন করেছিল তারও বিরোধিতা করে এসেছিল।

যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পরও জার্মান সেনাবাহিনীর অফিসার্স্ কোর-কে আগের মতই বাঁচিয়ে রাখা হল। এই সেনাবাহিনীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হল। ক্যাবিনেট ও পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ-নিরপেক্ষ হয়ে গড়ে উঠেছিল সেনাবাহিনী ( not subordinated to civil authority )। জার্মান সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রজাতন্ত্রের ভাবধারার অনুগামী অফিসার ছিলই না বলা যায়। প্রজাতন্ত্রের ভাবধারা সহায়ক করে সেনাবাহিনী পুনর্গঠিত করার চেষ্টাও প্রজাতন্ত্রের নেতারা করলেন না। সেনাবাহিনীর মধ্যে রাজতন্ত্রী ও ক্ষমতাবাদী প্রাশিয়ান ট্র্যাডিশন থেকেই গেল ( authoritarian Prussian tradition )।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী Noske সমাজতন্ত্রী হয়েও একেই সমর্থন করেছিলেন। Scheidemann ও Grzesinski সেনাবাহিনীর গণতন্ত্রীকরণের কথা বলেছিলেন। পুরাতন ভাবধারায় সংগঠিত ও আচ্ছন্ন অফিসারদের হাতে সেনাবাহিনীকে তুলে দেবার বিরুদ্ধে অবশ্য এঁরা ছিলেন ( এঁরাও উদারপন্থী সোস্যালিস্ট )। এঁদের কথা গ্রাহ্য হয়নি কিন্তু।

বিচার বিভাগকেও ঢেলে সাজান হল না। প্রতি-বিপ্লবের কেন্দ্র হয়ে পড়ল আইন ও বিচার দপ্তর। প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সহায়ক হয়ে উঠল বিচার বিভাগ। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মামলা দায়ের হতে থাকল।

১৯২০ সালের Kapp Putsch-এর জন্য ৭০ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হল। কিন্তু কেবলমাত্র ১ জনকে—বার্লিনের পুলিশ প্রেসিডেণ্টকে ৫ বছরের 'honorary confinement'-এর 'শাস্তি' দেওয়া হয়েছিল।

প্রাশিয়ার সরকার যখন তাঁর পেনসন নাকচ করলেন তখন সুপ্রীম কোর্টের আদেশে সেটা পুনর্বহাল হল। ১৯২৬ সালে একটি আদালত Kaap Putsch-এর অন্যতম সামরিক নায়ক জেনারেল ভন লুয়েৎউইৎস্‌কে (Luettwitz) যে সময় তিনি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন সেই সময়ের বেতন দেবারও নির্দেশ দিলেন। [ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্র-বিরোধী কাজের অপরাধে বরখাস্ত পুলিশদের ১৫।২০ বছর পরে যুক্তফ্রণ্টের কমিউনিস্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে কাজে পুনর্বহাল করে বকেয়া বেতন দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন—হাজার হাজার মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন—আদালত ও আইনের শাসনকে তামাশায় পরিণত করেন। ]

অথচ উদারপন্থী শত শত জার্মান নাগরিক আদালত থেকে কঠোর শাস্তি ভোগ করলেন রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে। তাঁদের অপরাধ তাঁরা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কথা বলছিলেন—তাঁরা বলেছিলেন ভার্সাই চুক্তির সর্তের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলা হচ্ছে। [ এই সব কারণেই সোস্যালিস্টরা জনমানসে প্রবেশ করতে পারেনি—এদেশে Socialist-দেরও একই হাল হয়েছে। ] যাঁরা 'প্রজাতন্ত্রের' অনুগামী ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধেই বেপরোয়াভাবে রাষ্ট্রদ্রোহিতা-সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করা হত। অথচ যারা প্রজাতন্ত্রের বিরোধী ছিল তাদের বিরুদ্ধে আদৌ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হত না। এমনকি হত্যাকারীদেরও উদারভাবে দেখা হত—আদালতে বিচারাধীনে থাকাকালে তারা পলায়নও করতে পারত। নরমপন্থী সোস্যালিস্ট, গণতন্ত্রী ও ক্যাথলিক সেন্ট্রিস্টরা ( Catholic Centrists ) এভাবেই কাজ চালাতে লাগলেন। অসওয়াল্ড স্পেংগলার বলেছিলেন "In the heart of the people Weimar Constitution is already doomed." জাতীয়তাবাদী হিটলার দক্ষিণপন্থী ও কড়া জাতীয়তাবাদী মানসিকতার প্রবল স্রোতে তাঁর রাজনৈতিক ভেলা ভাসাতে মনস্থ করে ফেললেন ব্যাভেরিয়াতে বসে।

(১) জার্মান মার্কের মূল্যমান হ্রাস পাচ্ছিল, (২) জার্মানীর রূঢ় অঞ্চল ফরাসী সেনাবাহিনী দখল করে বসেছিল—এ দুটো পরিস্থিতি হিটলারকে খুব সাহায্য করেছিল। ১৯২১ সালে ১ ডলারের মূল্য ছিল ১৫ মার্ক, ১৯২২ সালে এটা দাঁড়ায় ১ ডলার=৪০০ মার্ক, ১৯২৩ সালের প্রথম দিকে মার্কের মূল্য আরও নেমে দাঁড়াল ১ ডলার=৭০০ মার্ক। ১৯২২ সালের যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় টাকা বন্ধ রাখার আবেদন নির্মমভাবে ফরাসী সরকার প্রত্যাখ্যান করলেন ( Poincare )। ভার্সাই চুক্তির সর্ত অনুযায়ী জার্মানী তার দেয় কাষ্ঠ

(timber) ফরাসী সরকারকে দিতে পারল না—সেই অজুহাতে ফরাসী সরকারী বাহিনী শিল্পোন্নত জার্মানীর প্রাণকেন্দ্র রূঢ় অঞ্চল দখল করে বসল। জার্মানীর কয়লা ও ইস্পাত উৎপাদনের ⅘ অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এর আগে জার্মানীর Upper Silesia পোল্যাণ্ডকে ভেট দেওয়া হয়। এই প্রচণ্ড আঘাত জার্মান জাতির মধ্যে নূতন ঐক্যবোধ জাগ্রত করল। এত বেশী ঐক্য আগে পরিলক্ষিত হয়নি। দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার মুখে তখন। রূঢ় অঞ্চলের শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘট করল। বার্লিন সরকার অর্থ দিয়ে ধর্মঘটকে সাহায্য করল। জার্মানরা শান্তিপূর্ণভাবে বাধা দিল। ফরাসী সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করল। কিন্তু ধর্মঘট সম্পূর্ণ সফল হল—কোন কারখানার চাকা ঘোরেনি একটিবারও। ১৯২৩ সালের রূঢ় দখলের পর অবস্থা আরও চরমে পৌঁছায়। মার্কের মূল্য দাঁড়াল ১ ডলার=১,৮০০ মার্ক। ১লা জুলাই আরও নেমে দাঁড়াল ১ ডলার=১,৬০,০০০ মার্ক। হিটলার যখন প্রথম আঘাত হানতে উদ্যত হলেন তখন বাজারে ১ ডলার ক্রয় করতে প্রয়োজন হত ৪ বিলিয়ান মার্ক। কর্মী-শ্রমিকের বেতনের কোনই মূল্য ছিল না। জার্মান মুদ্রা যেন ছেঁড়া কাগজের টুকরোর মত। এ অবস্থায় সমাজব্যবস্থা ও সংবিধান বা প্রজাতন্ত্রের প্রতি কি আস্থা থাকতে পারে?

# ৬

## বুলগেরিয়া : কমিউনিস্ট বিপ্লব ও দক্ষিণপন্থী প্রতি-বিপ্লব

পূর্ব ইউরোপে বুলগেরিয়া ছিল কমিউনিস্টদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি। এখানে কমিউনিস্ট বিপ্লব কি রূপ নিয়েছিল, কমিউনিস্টদের কি ভূমিকা ছিল সেটার পর্যালোচনা সংক্ষেপে করা যাক। বুলগেরিয়া ও জার্মান পরিস্থিতির মধ্যে একটা বড় পার্থক্য ছিল এই যে, জার্মান বিপ্লবের খুঁটিনাটি সবকিছু নির্ধারিত হয়েছে মস্কোতে। বুলগেরিয়ার বিপ্লবে তা হয়নি। এখানকার পার্টি ছিল আত্মনির্ভরশীল।

১৯১৯ সালের শেষে বুলগেরিয়াতে 'কৃষকদলের' ( Peasants' Party ) নেতা স্টাম্‌বুলিস্কি ( Stambuliski ) শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসেন। ১৯১৮ সালে তিনি বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং পরে ক্ষমতায় এসে তিনি বুলগেরিয়াকে একটি প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করার কাজে হাত দেন। কমিউনিস্ট পার্টিকে কাজ করার পূর্ণ সুযোগও দেওয়া হয়েছিল এই সময়। রাজনৈতিক গণতন্ত্র কমিউনিস্ট দলকে এই সুযোগ দিল। এর আগে এই দলের সে সুযোগ ছিল না। ফলে কমিউনিস্ট পার্টি খুব শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। মোট প্রদত্ত ভোটের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এই দল নিয়ন্ত্রণ করত। অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন ও পৌর সংস্থা পরিচালনার কর্তৃত্ব তাদের হাতে ছিল।

বুলগেরিয়ার রাজনীতিতে ১৯১২ সালের বলকান যুদ্ধের পর মেসিডোনিয়ার উদ্বাস্তরা (Macedonian Refugees) একটা উল্লেখযোগ্য শক্তিরূপে পরিগণিত হয়—রাজনৈতিক ভারসাম্য এদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এরা ছিল খুব জঙ্গী-মনোভাবাপন্ন এবং সাহসী। দেশের রাজনীতিতে মেসিডোনিয়াকে বুলগেরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্ন নিয়ে বেলগ্রেড সরকার ও বুলগেরিয়ার সরকারের মধ্যে রেষারেষি চলছিল। স্টাম্‌বুলিস্কি বেলগ্রেড সরকারের সঙ্গে মিটমাট করে নেবার পর এই আন্দোলনে বাধা পড়ল। মেসিডোনিয়ার বিপ্লবীরা সরকারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাতে উদ্যত হলেন দক্ষিণপন্থী দলগুলির

সঙ্গে হাত মিলিয়ে। শেষে কৃষকদলের সরকারের বিরুদ্ধে মেসিডোনিয়ার বিপ্লবীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ১৯২৩ সালের ৯ই জুন। কমিউনিস্টরা এ সবই জানত। দেশের সেনাবাহিনী, পুলিশ মেসিডোনিয়ার উদ্বাস্তুরা বিপ্লবীদের পক্ষে চলে গেল। স্টাম্বুলিস্কি সরকারের শোচনীয় পরাজয় ঘটল মাত্র ক'দিনের গৃহযুদ্ধে।

শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি নীরব দর্শকের ভূমিকা নিল। যে রাজনৈতিক গণতন্ত্র কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্তি সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছিল সেই গণতন্ত্রের মূলে যখন দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি সংঘবদ্ধভাবে আঘাত হানল—তখন তারা দাঁড়িয়ে দেখল শুধু। ছোট ছোট কৃষকরা সরকারের পক্ষে আসেনি, কারণ সরকার তাদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বড় কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় বেশী আগ্রহ দেখিয়েছিল। এই বিদ্রোহ বা Coup d'etat ছিল মূলতঃ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। বুলগেরিয়ার একটি শহর প্লেভ্‌নায় ( Plevne ) কিছু কিছু কমিউনিস্ট প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করল দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহীদের কিন্তু দলের কেন্দ্রীয় কমিটি তা সমর্থন করলেন না। জার্মানীর ক্যাপ্‌ বিদ্রোহও ( Kapp Putsch ) এই ধরনের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ছিল মাত্র। কমিউনিস্টরা শ্রমিকদের বোঝালেন গণতন্ত্র নিয়ে শ্রমিকদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। গণতন্ত্র তো বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র! বুর্জোয়াদের এঁটো পাতা চাটতে যারা চায় তারাই 'গণতন্ত্রকে' বাঁচিয়ে রাখার জন্য হল্লা করবে। মেসিডোনিয়ার প্রতি-বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের যিনি নায়ক সেই জ্যাঙ্‌কভ্‌ ( Zankov ) মনেপ্রাণে শ্রমিকবিরোধী ছিলেন। বরকেন্টো বলেছেন,

' Crucial importance of the fight between democracy and fascism was not understood by an organisation which loathed democracy and regarded it as 'dictatorship of the bourgeoisie' and was at the same time itself nearing toward a political regime as totalitarian as that of fascism". [ The Communist International—Borkenau, P. 239-40 ]

তিনি আরও বলেছেন,

"In Bulgaria this indifference to democracy was driven to an almost incredible extreme. A manifesto of the party issued immediately after the coup called the counter-revolution 'a fight of the cliques of the rural and urban

bourgeoisie for power' and added that the toiling masses in the town and country will not participate in the fight which has broken out between the urban and the rural bourgeoisie because such participation would mean that the exploited fight the battles of their exploiters."

গণতন্ত্র ও ফ্যাসীবাদের মধ্যে ব্যবধানের গুরুত্ব কমিউনিস্ট পার্টি উপলব্ধি করেনি। গণতন্ত্রকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছিল এরা। আর এরা যে-লক্ষ্যের দিকে দেশকে নিয়ে যাচ্ছিল সেটাও ছিল ফ্যাসীবাদের মতই সমগ্রতান্ত্রিক ও সর্বস্ববাদী। বুলগেরিয়ার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির গণতন্ত্রের প্রতি উদাসীনতা একটা অবিশ্বাস্য মাত্রায় পৌঁছেছিল। সামরিক বাহিনী ও পুলিশের সাহায্যে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের এই অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরই বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি একটি ইস্তাহার বিলি করল, তাতে এই প্রতি-বিপ্লবকে শহর ও গ্রামাঞ্চলের বুর্জোয়া শ্রেণীর দুই ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠীর লড়াই বলে বোঝাবার চেষ্টা হল, আরও বলা হল শহর ও গ্রামের শোষিত মানুষের এই সংঘর্ষে কোন অংশ নেবার প্রশ্নই আসে না। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে তাদের অংশ গ্রহণের অর্থ হল শোষক শ্রেণীর পক্ষ নিয়ে তাদের তহবিল রক্ষার জন্য শোষিত শ্রেণীর জীবন-পণ করা। (বরকেন্‌ৌ)

বুলগেরিয়ার পরিস্থিতিতে প্রতি-বিপ্লবী শক্তিকে রুখবার জন্য, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বুনিয়াদ রক্ষার জন্য যুক্তফ্রণ্ট গঠন করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা হল না। কমিউনিস্ট পার্টি—স্টাম্‌বুলিস্কি সরকারের পতনের পর স্টাম্‌বুলিস্কির সমালোচনায় মত্ত হল যেমন জার্মানীতে প্রতি-বিপ্লবী ক্যাপ-সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর সোস্যালিস্ট Noske সরকারের সমালোচনায় কমিউনিস্টরা মেতে ছিলেন। এমনিভাবেই হিটলারের অভ্যুদয়ের পর জার্মানির কমিউনিস্টরা সোস্যাল ডেমোক্রাটদের সমালোচনায় মুখর হয়েছে। কমিউনিস্টরা বুলগেরিয়ার প্রতি-বিপ্লবের সময় জনগণের উদাসীনতার সাফাই গেয়ে ঘোষণা করলেন "Masses in Sofia met the Coup with an open satisfaction।"

প্রতি-বিপ্লবের নায়ক জ্যাঙ্‌কভ্‌ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার দুই সপ্তাহ পরই কমিউনিস্ট নিপীড়ন সুরু করলেন। তার আগে কৃষকদলের মেরুদণ্ড তিনি চূর্ণ করলেন। প্রতি-বিপ্লবীদের কমিউনিস্টদের নির্মূল করার কাজে লাগালেন। কমিউনিস্টরা বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করল। সরকার টের পেয়ে নেতাদের

গ্রেপ্তার করল। শেষে সেই কৃষকদলের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯২৩) সশস্ত্র অভ্যুদয়ের চেষ্টা হল। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। জনগণের কাছ থেকে কোনই সাড়া মিলল না। কমিউনিস্ট বিপ্লব ব্যর্থ হল। কি ডিমট্রভ—কি কালারভ কেউই কোন নেতৃত্ব দিতে পারেননি। সরকারী নিপীড়নের মুখে দল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সমগ্র দল যখন এই শোচনীয় বিপর্যয়ের মুখে তখন একদল কর্মী উগ্রপন্থার দিকে পা বাড়াল। হিংসা, সন্ত্রাসসৃষ্টি ও গুপ্তহত্যা রাজনীতির পথ ধরে তারা এগিয়ে গেল। এ সময় উগ্রপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির নেতৃত্ব দেন মিন্‌কভ ও জেকভ। দেশের জনসাধারণ জ্যাঙকভ-সরকারের পক্ষে ছিল না। তারাও পরিবর্তন চেয়েছিল। দল জনসংযোগের পথ ছেড়ে বেছে বেছে ব্যক্তি হত্যার পক্ষে চলে গেল। এই উপদল একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে। লক্ষ্য ঃ যখন সোফিয়া গীর্জায় ( Cathedral Affair) দেশের মন্ত্রীরা সামরিক ও অন্যান্য অফিসাররা উপাসনায় সমবেত হবেন ঠিক তখন উচ্চশক্তিসম্পন্ন বোমা দিয়ে সেই গীর্জা উড়িয়ে দেওয়া ( ১৯২৫ সালের এপ্রিল )। কর্মসূচী কার্যকরী করা হল বটে তবে যাঁরা লক্ষ্য ছিলেন তাঁদের সকলেই প্রাণে বেঁচে গেলেন। মিন্‌কভ ও জেকভ হাতে-নাতে ধরা পড়লেন। বিনা বিচারেই তাঁদের হত্যা করা হল। কার্যকরী সমিতির কয়েকজন সদস্যকে ফাঁসিতে ঝোলান হল। বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী চরম সুবিধাবাদী রাজনীতি ও দলের চরমপন্থীদের হঠকারিতার নামে বৈপ্লবিক খোকামী বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করে দিল। এতবড় শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টির এই শোচনীয় ব্যর্থতার ব্যাখ্যা কি আছে ?

৭

## জার্মানীর অক্টোবর বিপ্লব
## ( ১৯২৩ )

বুলগেরিয়ার বিপর্যয়ের পরই জার্মানীতে আবার বিপর্যয় ঘটল। মস্কো ও কমিণ্টার্ন খুব বেশী আশা করেছিল জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে। ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে ফরাসী সরকার জার্মানীর রূঢ় অঞ্চল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দখল করে নেয়। জার্মানীর অর্থনৈতিক সঙ্কট তখন চরমে উঠেছে। সমগ্র জর্মানী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ার মুখে। রাশিয়া রূঢ় সঙ্কটে মনে মনে খুশীই হয়েছিল। জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে যে বৈরিতা ছিল— রাশিয়া তার সুযোগ নিতে চেয়েছিল। তাই রূঢ় অঞ্চলে জার্মান প্রতিরোধ জাগিয়ে তুলতে উৎসাহ দেখিয়েছিল রাশিয়া। কিন্তু রূঢ় সঙ্কটের পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেনি সে। মার্ক-এর মূল্য দ্রুত পড়ে যাওয়ায় শ্রমিকশ্রেণী ও সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে হাহাকার দেখা দিল। তারা ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক দলগুলির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলল। শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের জীবনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ফিরে আসবে এ বিশ্বাস ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছিল। সাধারণ মানুষ উগ্র জাতীয়তাবাদী ও রাজতন্ত্র-ভক্তদের দলে ভিড়ছিল। আর সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির একটা অংশ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ভিড় জমাচ্ছিল। নাৎসী দলের দিকে অনেকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। ১৯২৩ সালের আগস্ট মাসে অর্থনৈতিক দাবী নিয়ে একের পর এক ধর্মঘট হয়ে যাচ্ছিল। এর পরই সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হল। এই ধর্মঘট চলল যতদিন না সরকারের পতন ঘটল। সে সময় দেশে একটা কোয়ালিশন সরকার চালু ছিল। অবশ্য সেই সরকারে সোস্যালিস্টরা অংশ নেননি। মোটামুটিভাবে বলা যায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দলগুলির কোয়ালিশন সরকার ছিল সেটা। তার চ্যান্সেলার ছিলেন কুনো (Cuno)। তাঁর পদত্যাগের পর সোস্যালিস্টরা সরকারে অংশ নিলেন। তখন স্ট্রেস্‌ম্যান চ্যান্সেলার হলেন। রূঢ় সঙ্কটের সমাধানের জন্য ফ্রান্সের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া

আর মার্ক-এর মূল্যমান স্থিতিশীল রাখা এই দুটো কাজই প্রাধান্য পেল নতুন সরকারের কাছে। সাধারণ ধর্মঘটের যখন ডাক দেওয়া হয়—তখনও কিন্তু এই দুটি মূল দাবীই সামনে ছিল।

মার্ক-এর মূল্য স্থিতিশীল করতে গেলে সরকারী অফিসার ও কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির পথ ছেড়ে কম বেতন নিতে রাজী হতে হয়—ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের পথ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু অফিসার কর্মচারীরা তাতে রাজী নন (Pay cuts)। দক্ষিণপন্থীরা তার সুযোগ নিতে ছাড়লেন না। জার্মান সোস্যালিস্টরা এক সঙ্কটের মুখে পড়লেন। তাঁদের সামনে দুটো পথ খোলা ছিল সে সময়:

(১) হয় মার্ক-এর মূল্য স্থিতিশীল রাখতে বেতন হ্রাসের কার্যসূচীকে কার্যকরী করা। এটা করলে দক্ষিণপন্থী দলগুলি কর্মচারী ও অফিসারদের বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে সোস্যালিস্টদের বেকায়দায় ফেলবে ভয় ছিল।

(২) নতুবা সরকার থেকে সরে এসে চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করা। দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় এলে শেষ পর্যন্ত আধা-ফ্যাসিস্ট ও মিলিটারী শাসন প্রবর্তিত হবে। সে ঝুঁকি কি নেওয়া চলে?

এই দোটানার মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও চরমপন্থীদের রাজনীতি দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সোস্যালিস্টদের শক্তি ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল। জাতীয়তাবাদীদের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে কমিউনিস্টরা তাদের সঙ্গে সমঝোতা করে কাজ করার প্রস্তাব করেছিলেন। কমিণ্টার্ণ প্রতিনিধি কার্ল র‍্যাডেকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি উল্লেখ্য। তিনি বলেছিলেন:

"There were two ways for Germany: with Russia against France or with France against Russia. If Germany chooses the second alternative the national ideals of the activists of the Right will prove shallow phrases; only if Germany in its fight against the imperialism of the Western Power joins hands with Russia will German nationalism have a chance"

অর্থাৎ—"জার্মানীর দুটো পথ খোলা আছে: হয় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সঙ্গে দোস্তি অথবা রাশিয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী। যদি জার্মানী দ্বিতীয় পথটি বেছে নেয় তাহলে জঙ্গী-কট্টর জাতীয়তাবাদীরা জার্মান-জঙ্গী আদর্শ ও লক্ষ্য বলে যে সব কথা বলে থাকেন সেগুলো নিছক অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা বুলি বলেই পরিগণিত হবে। একমাত্র যদি জার্মানী সাম্রাজ্যবাদী

শক্তিগুলির বিরুদ্ধে তার সংগ্রামে রাশিয়ার সঙ্গে হাত মেলায়—তাহলেই জার্মান জাতীয়তাবাদের সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ থাকবে।"

জার্মান জাতীয়তাবাদকে সুড়সুড়ি দিয়ে চাঙ্গা করার এই কৌশলের মধ্যে বৈপ্লবিক আদর্শবাদী চিন্তাধারা কতটুকু ছিল আর কতটা কূটনীতি—কতটাই বা রাজনীতি—ইতিহাস ও রাজনীতির ছাত্রদের সেইটাই বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। বিশ্বরাজনীতি আবেগের দরিয়া নয়। র‍্যাপালো চুক্তির পটভূমিতে এই উক্তির তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। র‍্যাডেকের উক্তির মধ্যে মার্কসবাদী চেতনার কোন প্রতিফলনই ছিল না। র‍্যাপালো চুক্তি কিন্তু জার্মান কমিউনিস্টদের হতবাক করেছিল। জার্মানীতে যখন বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী ভাবধারা মাথা চাড়া দিচ্ছে তখন র‍্যাডেক এই ফর্মুলা তাঁর রাজনৈতিক ঝুলি থেকে বার করলেন। যেমন কথা তেমনি কাজ। মুলতুবী রইল বিপ্লব প্রস্তুতি—জাতীয়তাবাদী দল হিসাবে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার আয়োজন সুরু হল। জার্মানীতে শ্লেজেটার ক্যামপেন ( Schlagter Campaign ) সুরু হল। নাৎসী দল ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হল—এক পক্ষ অপর পক্ষকে আবিষ্কার করার অভিযানে নামলেন—মূল আলোচ্য বিষয়ঃ আসন্ন জার্মান বিপ্লবের লক্ষ্য। ফ্যাসিস্ট দল তখন গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কমিউনিস্টরা ভেবেছিলেন নাৎসী দলের ভিতরে ঢুকে ক্যাডারদের শ্রেণীসচেতন করে শ্রেণী-বিপ্লবের মধ্যে আকৃষ্ট করতে পারবেন। 'দেশপ্রেম' ও 'জাতীয়তাবাদ' কমিউনিস্ট দর্শনে একটা 'পাপ',—গর্হিত বস্তু। শ্রেণী-বিদ্বেষ ও শ্রেণীসংগ্রাম তাদের মূলমন্ত্র। আর নাৎসী দলের মূলমন্ত্র উগ্র জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম। শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বে তারা আদৌ বিশ্বাসী ছিল না। পরবর্তীকালে অবশ্য নাৎসীরা শ্রেণী-সহযোগিতার ( class collaboration ) কর্মসূচীকে গ্রহণ করেছিল।

কমিউনিস্টদের শক্তি একদিকে যেমন বাড়ছিল—আবার আর একদিক থেকে শ্রমিকরা বাম রাজনীতির প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ছিল। ১৯২৩-২৪ সালে জার্মানীতে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ কমে গিয়েছিল। দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অথচ কমিউনিস্টরা মনে করলেন বিপ্লবের মহালগ্ন আসন্ন। ১৯২৩ সালে নাৎসী দলের নেতা হিটলারের নেতৃত্বে সংগঠিত ব্যর্থ বিপ্লব সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি। এই সময় জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ব্রান্‌ড্‌লার ( Brandler )

ও আরও কয়েকজন জার্মান কমিউনিস্ট নেতার মস্কোয় ডাক পড়ল। নেতারা ছুটলেন সেখানে নির্দেশ নেবার জন্য। মস্কোতে জার্মানীর অক্টোবর বিপ্লবের ব্লু-প্রিণ্ট রচিত হল। ব্রানড্‌লার দেশে ফিরে এলেন। দেশে সামরিক আইন জারী হল। জার্মান প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান জেনারেল ভন সীক্‌ট্‌-এর হাতে সমস্ত জরুরীকালীন ক্ষমতা ন্যস্ত হল। ১৯২০ সালের শ্রমিক আন্দোলনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণপন্থী ক্যাপ-বিদ্রোহ (Kapp-Putsch) হয়েছিল। ১৯২৩ সালের শ্রমিক আন্দোলনের ব্যর্থতা দক্ষিণপন্থী বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল। কমিউনিস্টরা ঠিক উল্টোটা ভেবেছিলেন। এই সময়কার মানুষের দাবী ছিলঃ পরিকল্পিত ব্যাপক গঠনমূলক জনকল্যাণধর্মী অর্থনীতি, জার্মানীর সার্বিক উন্নতি, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার। কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পেছনে জনসাধারণের সমর্থন ছিল না। ব্রানড্‌লার দেশে ফিরে বুঝলেন পর্যাপ্ত অস্ত্র তাঁদের দলের হাতে নেই। কিছু সময় আরও দরকার। বামপন্থী সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করলেন। কমিউনিস্ট পার্টির অতি-বামগোষ্ঠী কিছুতেই এই 'যুক্তফ্রণ্ট' করবেন না। তখন "United Front from below" "নীচ থেকে যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলার" শ্লোগান দেওয়া হল। মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী শাস্ত্রে নেতাদের দিয়ে "ওপর থেকে যুক্তফ্রণ্ট গড়ার" কৌশল কেবলমাত্র নিয়মের ব্যতিক্রমরূপে বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রযুক্ত হতে পারে। নীচে থেকে যুক্তফ্রণ্ট গড়ার উদ্দেশ্য হল যে—দলকে মার্কসবাদীরা টানতে চাইছে তার ক্যাডার ও কর্মীদের দলের নেতাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। নেতাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা নীচের তলার কর্মীদের কাছে গুজ্‌-গুজ্‌ ফিস্‌-ফিস্‌ করে অবিরাম মিথ্যা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অপপ্রচার চালিয়ে সেই দলকে ভেঙে তছনছ করে দেওয়া। অবশ্য এই সময় জার্মানীতে বাম সোস্যালিস্টদের শক্তিও বেশী ছিল না (Saxony ও Thuringia ছাড়া)। এই দুই প্রদেশেই বিপ্লব স্থরু হবে ঠিক ছিল। জার্মান সেনাবাহিনী সাক্‌সন্‌ প্রদেশে ঢুকে পড়ল। আশ্চর্যের বিষয় সেখানে কোন প্রতিরোধই হল না। শ্রমিকরা এ অবস্থা সহজেই মেনে নিল। অনাহার, ভয়াবহ বেকারী, অর্থনৈতিক দুর্দশা তাদের চরম হতাশার মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কমিউনিস্টদের প্রতি শ্রমিকরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। অক্টোবর মাসে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হল। বামপন্থী সোস্যালিস্টরা এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। বিনা অস্ত্রে জার্মান শ্রমিকরা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বে কিভাবে? শেষে সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তাব

প্রত্যাহার করা হল। ৩।৪ দিন বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিরোধ হল। জার্মান সেনাবাহিনী ড্রেসডেন-এ প্রবেশ করে মন্ত্রীদের ক্ষমতাচ্যুত করল। হামবুর্গের শ্রমিকরা চুপচাপ রইল। দেশের সাধারণ মানুষ লড়াই-এর জন্য আদৌ প্রস্তুতই ছিল না।

জার্মানীর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সোস্যালিস্টরা বিতাড়িত হলেন। স্ট্রেস্‌ম্যান গণতন্ত্রকে ফ্যাসীবাদের উদ্যত আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে কৃতসঙ্কল্প। ব্র্যান্‌ডলার ফ্যাসীবাদের তাৎপর্যও উপলব্ধি করতে পারেননি। জার্মানীর তথাকথিত অক্টোবর বিপ্লব চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। দারিদ্র্য-হতাশা মানুষকে সব সময়েই বিপ্লবের পথে উদ্বুদ্ধ করে যে টেনে আনে না (theory of increasing misery) ইতিহাস তা আবার দেখিয়ে দিল। বিপ্লবের জন্য চাই উপযুক্ত বাস্তব ও মানসিক পরিবেশ (Subjective and Objective conditions), জনসমর্থন ও গণসংগঠন, সর্বোপরি আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব। বিপ্লব ফরমাস দিয়ে আসে না। বিপ্লব কোন রাষ্ট্রনেতা বা দলের হাতের খেয়ালের পুতুল নয়। জার্মান কমিউনিস্টরা ভেবেছিলেন ষড়যন্ত্র করে, সরকারের মধ্যে প্রবেশ করে বিপ্লব আনবেন। কিন্তু বিপ্লব ষড়যন্ত্রের বা অন্তর্ঘাতমূলক রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ নয়। জার্মানীতে ১৯২৩ সালে প্রলিটারিয়েট শ্রেণীর বিপ্লবের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। প্রলিটারিয়েট শ্রেণীর ওপর কমিণ্টার্ণ পরিকল্পিত বিপ্লবের ফরমাস চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেদিন।

বিপ্লবের চরম ব্যর্থতার জন্য দায়ী কারা সেই রহস্য আবিষ্কারের কাজ কমিউনিস্ট পার্টিতে শুরু হয়ে গেল। দোষী সাব্যস্ত হলেন বামপন্থী সোস্যালিস্টরা, আর কমিউনিস্ট নেতা ব্রান্‌ড্‌লার। দলের নেতৃত্ব থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল।

## ৮

# জার্মান পটভূমি ও নাৎসী-বিপ্লব

দেশের অবস্থা যতই শোচনীয় হয়ে উঠছিল দেশের সাধারণ মানুষ তার চরম দুর্গতির জন্য মনে মনে এবং প্রকাশ্যে হ্বাইমার প্রজাতন্ত্রকেই দায়ী করছিল। মুদ্রামূল্য হ্রাসের সুযোগ বড় বড় শিল্পপতি, সেনাবাহিনী ও সরকার নিয়েছিল। হিটলার বলতে সুরু করলেন—"We will no longer submit to a State which is built on the swindling idea of the majority. We want a dictatorship --" "আমরা এই রাষ্ট্রের অধীনে থাকতে প্রস্তুত নই—সংখ্যাগরিষ্ঠের জালিয়াতি মানি না। আমরা চাই এক-নায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।" হিটলার ভার্সাই সন্ধির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ধিক্কার জানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে "November Criminals" বলে আক্রমণ চালালেন। তিনি বললেন—দেশের এই অসহনীয় পরিস্থিতির জন্য দায়ী ফরাসীরা নয়—দায়ী কতিপয় জার্মান বিশ্বাসঘাতক। সেই নভেম্বর চক্রান্তের কুৎসিত নায়করা নিপাত যাক। নাৎসী দলের সেই হবে মূল দাবী ও ধ্বনি। ১৯২০ সালের সুরু থেকেই হিটলার তাঁর এই শ্লোগানকে কার্যকরী করার জন্য আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর অসামান্য বাগ্মিতা, সংকল্প, অসমসাহসিকতা এবং একান্ত সহকর্মী রোয়েমের ( Roehm )-এর প্রচণ্ড সাংগঠনিক প্রতিভার জোরে নাৎসী দলের প্রভাব ও শক্তি দুই বাড়ছিল দ্রুত গতিতে। হিটলার জার্মান যুদ্ধের যোদ্ধা সমরনায়ক লুডেন্‌ডর্ফকে তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতে চেষ্টা করলেন। জার্মান সেনাবাহিনী ফ্রী-কোর্-এর যুদ্ধ-প্রত্যাগত সৈনিকদের ওপর লুডেন্‌ডর্ফ-এর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। হিটলার সেটা কাজে লাগাতে দ্বিধা করলেন না।

১৯২৩ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর জার্মান প্রজাতন্ত্রের চ্যান্সেলার গুস্তাভ স্ট্রেস্‌ম্যান ( Stressemann ) ঘোষণা করলেন রূঢ়-এ যে অসহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ আন্দোলন চলছিল ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে, সেটা প্রত্যাহৃত হবে এবং পুনরায় জার্মানী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ফরাসী সরকারকে

দিতে সুরু করবে। এই সিদ্ধান্ত জার্মান জাতীয়তাবাদী জনমানসে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলল। সকল জাতীয়তাবাদীরা এমনকি কমিউনিস্টরা ক্রোধে ফেটে পড়লেন। কমিউনিস্টরাও হ্বাইমার প্রজাতন্ত্রের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন। জার্মান প্রেসিডেন্ট এবার্ট জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেন দেশে। সমস্ত ক্ষমতা আপৎকালীন আইনে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী অটো গ্রেস্‌লার এবং সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারল ভন্ শীকট্-এর ( Von Seeckt ) হাতে অর্পিত হল। ফলে প্রজাতন্ত্রে প্রকারান্তরে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

ব্যাভেরিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের এই সমাধান মেনে নিতে অস্বীকার করল—তারা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে এমন ইঙ্গিতও দিতে ছাড়ল না। ব্যাভেরিয়ার প্রাদেশিক সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করল এবং দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্র অনুরাগী Gustav Von Kahr-কে সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়ে রাষ্ট্র-সচিবের পদে বরণ করল। জেনারল ভন্ শীকট্ জানতেন যে, সেনাবাহিনীর একটি অংশ ব্যাভেরিয়ার বিচ্ছিন্নতাকামীদের সমর্থন করত।

জার্মানীতে ২০ সেপ্টেম্বর ( ১৯২৩ ) মেজর বুচ্‌রুকার ( Buchrucker ) বার্লিনের পূর্ব প্রান্তের তিনটি দুর্গ দখল করে নিলেন তাঁর বে-আইনী—"Black Reichwehr" সংস্থার সাহায্যে। দু'দিন প্রতিরোধের পর মেজর বুচ্‌রুকার আত্মসমর্পণ করলেন। জেনারল ভন্ শীকট্-ই একদিন এই সংস্থাটিকে রূপ দেন। এই বিদ্রোহকে দমন করার সাথে সাথেই এই 'Black Reichwehr'-কে ভেঙে দিলেন। এরপর স্যাকসনী, থুরিঙ্গিয়া, হামবুর্গ-এ কমিউনিস্টরা বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু এইসব প্রচেষ্টা দমন করতে অসুবিধা হল না কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু এইসব ঘটনা সত্ত্বেও ব্যাভেরিয়া সহজে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে মেনে নিল না। ব্যাভেরিয়ার ডিক্টেটর ভন্ কাহ্‌র জেনারল শীকট্-এর নির্দেশ একের পর এক উপেক্ষা করে চলছিলেন। এটা ছিল একটা প্রকাশ্য রাজনৈতিক ও সামরিক বিদ্রোহের সমতুল্য। কেন্দ্রীয় জার্মান সরকার এই বিদ্রোহ দমন করতে বদ্ধপরিকর হল।

হিটলার বুঝে নিলেন এই অরাজক পরিস্থিতির সুযোগ নিতে হবে। জার্মানীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর ও তাঁর দলের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে আর বেশী সময় দিতে প্রস্তুত নন। তিনি ভন্ কাহ্‌র, জেনারল্ ভন্ লসো-কে ( Lossow ) বোঝালেন যে, মিউনিখ্ থেকে সেনাবাহিনী ও ঝটিকাবাহিনী নিয়ে অভিযান চালিয়ে বার্লিন দখল করতে হবে। ভন শীকট্—মিউনিখ্ অভিমুখে জার্মান সেনাবাহিনী

পাঠিয়ে মিউনিখ্ দখলের আগেই এ কাজ করা দরকার। তিনি এই পরিকল্পনার কথা এঁদের জানালেন। হিটলার বুঝেছিলেন ব্যাভেরিয়া সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান ভন কাহ্‌র, জেনারল ভন্ লসো এবং পুলিশ প্রধান কর্নেল হ্যান্স্ ভন্ সীসার (Seisser) এই তিনজনের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে তাঁর পক্ষে বার্লিন দখল করা সম্ভব হবে না। এই সময় রুশ প্রত্যাগত দুই উদ্বাস্তু হিটলারকে পরামর্শ দেন কিভাবে ক্ষমতা দখল পরিকল্পনাকে সফল করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে।

মিউনিখ্ শহরের উপকণ্ঠে একটি পানশালায় (Beer Hall) ৮ই নভেম্বর সন্ধ্যার সময় Von Kahr—একটি সমাবেশে ভাষণ দেবেন—এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। এই আলোচনাচক্রে আলোচ্য বিষয় ছিল "ব্যাভেরিয়া সরকারের কর্মসূচী"। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, সমাবেশে ভন্ লসো, কর্নেল হ্যানস্ সীসারও উপস্থিত থাকবেন। হিটলারের সন্দেহ হয়েছিল ভন্ কাহ্‌র হয়ত এই সমাবেশে তাঁর ভাষণে ব্যাভেরিয়ার "স্বাধীনতা" ঘোষণা করবেন এবং হয়ত সেই সঙ্গে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণাও করবেন। কিন্তু হিটলার রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ছিলেন।

হিটলার তাঁর ঝটিকাবাহিনীকে এবং নাৎসী দলের অন্যান্য নেতা ও কর্মীদের বুয়েরগার ব্রকেলার-এর পানশালার হলঘরে সেই দিনের সভায় হাজির থাকার নির্দেশ দিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে সভা স্বরু হল। সভায় ভন কাহ্‌র বক্তৃতা দিতে উঠবেন এমন সময় হিটলার কয়েক সহস্র ঝটিকাবাহিনীর সভ্যদের নিয়ে সেই হলঘর ঘিরে ফেললেন এবং তিনি নিজে রিভলবার হাতে হলঘরে ঢুকেই একটি টেবিলের ওপর উঠে ফাঁকা পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে সভায় সমবেত জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তৃতা স্বরু করে দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন: "জাতীয় বিপ্লবের" সূচনা হল। তিনি জানালেন ব্যাভেরিয়া ও রাইখ্ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে এবং একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছে। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ অসত্য—ফাঁকা উক্তি—কেননা এরূপ কোন সরকার তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর পরই হিটলার ভন্ কাহ্‌র, ভন্ লসো এবং হ্যান্স সীসারকে তাঁর পিস্তল দেখিয়ে সংলগ্ন পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। হলঘর তখনও শ্রোতৃমণ্ডলীর ভীড়ে ঠাসা। হিটলার এই তিন প্রধানকে পাশের ঘরে নিয়ে বললেন যে, অস্থায়ী সরকারে তাঁরা তিনজনই মন্ত্রী থাকছেন এবং তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত সেনাপতি লুডেন্‌ডর্ফ-ও আছেন। লুডেন্‌ডর্ফ-এর নাম শুনে স্বভাবতই এঁরা তিনজন হকচকিয়ে গেলেন। সেদিন জাতীয়তাবাদী জনমানসে

বহুযুদ্ধে বিজয়ী বীর প্রাক্তন সেনাপতি লুডেন্‌ডর্ফের প্রভাব ছিল অসীম। এদিকে হিটলার সেই সভায় লুডেন্‌ডর্ফকে উপস্থিত করার জন্য তাঁর বিশ্বস্ত চর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আগেই। সময়মত লুডেন্‌ডর্ফ হাজির হলেন। গুলি করে হত্যা করা হবে হিটলারের কথামত কাজ না করলে—এই হুমকী দেওয়া সত্ত্বেও এই তিন দক্ষিণপন্থী প্রশাসক সায় দিলেন না। হিটলার তখন তাঁদের পাশের ঘরে ঐভাবে বসিয়ে রেখে ছুটে গেলেন হলঘরে এবং মিথ্যা ঘোষণা করলেন এই মর্মে যে, ভন্‌ কাহ্‌র, ভন্‌ লসো এবং সীসার তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন জাতীয় সরকার গঠনের কাজে। লুডেন্‌ডর্ফ-কে সভায় দেখে জনতা আনন্দে উৎসাহে যেন ফেটে পড়ল,—হিটলারের ঘোষণায় তারা বিশ্বাস না করে পারল না। এদিকে সভা শেষ হয়ে আসছে দেখে হলঘর আস্তে আস্তে শূন্য হতে লাগল। হিটলার ভন্‌ কাহ্‌র, ভন্‌ লসো ও সীসার-এর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। ঝটিকাবাহিনীর সভ্যরা ব্যাভেরিয়া সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীদের নজরবন্দী করে রেখেছেন। এমন সময় খবর এল ঝটিকাবাহিনীর একটি অংশের সঙ্গে সরকারী সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। হিটলার মীমাংসার জন্য নিজে ছুটলেন। এই সুযোগে কাহ্‌র, লসো ও সীসার গা-ঢাকা দিলেন।

এদিকে মিউনিখ্‌ দখলের যে পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল সে অনুযায়ী কাজ হল না। একমাত্র রোয়েম্‌ প্রতিরক্ষার সদর দপ্তর এবং সেনাবাহিনীর সদর কার্যালয় তাঁর ঝটিকাবাহিনী নিয়ে দখল করলেন। টেলিগ্রাফ অফিস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি দখল করার ব্যবস্থা বানচাল হল। পুলিশের সদর কার্যালয় দখলের চেষ্টা করলেন হিটলার তাঁর অনুগতদের নিয়ে। সেও ব্যর্থ হল। যাঁরা দখল করার জন্য গিয়েছিলেন তাঁদের গ্রেপ্তার করা হল। এদিকে কাহ্‌র, লসো সরকারী প্রশাসনকে খুব কাজে লাগালেন এই প্রাসাদ বিপ্লব (Putsch) দমন করতে। হিটলারের পরিকল্পনা অল্পের জন্য ব্যর্থ হয়ে গেল। যে তিনটি শক্তির সমর্থনের ওপর এই প্রাসাদ বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করছিল, যথা—(১) সরকারী সেনাবাহিনী, (২) পুলিশ বাহিনী (৩) ক্ষমতাসীন কাহ্‌র লসো-সীসার গোষ্ঠীর সক্রিয় সমর্থন তার অভাবে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। এই ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে তাঁর কাছে পরিষ্কার হল সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনীর মোকাবিলা করার মত পুলিশ বা জঙ্গীবাহিনী তাঁর ছিল না। তিনি গৃহযুদ্ধ চাননি—সুতরাং দীর্ঘমেয়াদী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কোন কর্মসূচীও তাঁর ছিল না। গৃহযুদ্ধ করে সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত

হতে তিনি কোনদিনই চাননি। তিনি জানতেন সেনাবাহিনী ও পুলিশের মধ্যে তাঁর মতানুরাগীর সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। তাদের সাহায্যের উপর তিনি বরাবরই আস্থাবান ছিলেন।

এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার সাথে সাথে হিটলার আর একটি মতলব আঁটলেন। পরের দিন ৯ই নভেম্বর প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবসে আবার মিউনিখ্ দখলের অভিযান করবেন লুডেন্‌ডর্ফ-এর সঙ্গে। তাঁরা তিন সহস্র ঝটিকাবাহিনীর পুরোভাগে থাকবেন। নাৎসী দলের নেতারাও মিছিলে থাকবেন। [ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার গাঁদা ফুলের মালা গলায় পরে আন্দোলন করা অথবা পুলিশ মিলিটারীর গুলির মুখে ক্যাডারদের বা গ্রামের সহরের বস্তির বেকার যুবক খেটে-খাওয়া মানুষদের ঠেলে দিয়ে পরের দিন কত রাউণ্ড গুলি চলল বা কাঁদানো গ্যাস ব্যবহার হল,—ক'জন গুলিতে প্রাণ হারাল—জেলে কাদের কোন্ শ্রেণীর বিচারাধীন বন্দী বলে গণ্য করা হবে, এইসব বিষয়ে জ্বালাময়ী বিবৃতি দিয়ে বাজার গরম করার জন্য আন্দোলন - শেষে মীমাংসার সূত্র খুঁজে বার করার জন্য ধুরন্ধর মাথাওয়ালা প্রথম ও দ্বিতীয় সারির কুশলী "লড়াকু" নেতাদের নিরাপদ দূরত্বে থাকার নীতি হিটলারপন্থীরা কিন্তু নেননি!]

সশস্ত্র মিছিল নেতাদের পুরোভাগে নিয়ে এগিয়ে চলল। হিটলার চলেছেন আগেভাগে সামনে উদ্যত পিস্তল নিয়ে। শোভাযাত্রা মাঝপথে বাধা পেল। গোয়েরিং অবরোধকারী পুলিশ প্রধানকে জানিয়ে দিলেন—পুলিশ গুলি চালালে মিছিলের পশ্চাৎভাগে সরকার পক্ষের মন্ত্রীসমেত যাদের আটক করে রাখা হয়েছে তাঁরাও কেউই প্রাণে রক্ষা পাবেন না। হুমকীতে বিশ্বাস করে পুলিশপ্রধান পথ ছেড়ে দিলেন। প্রতিরক্ষা দপ্তর দখল করে আগের রাত্রি থেকে ঝটিকাবাহিনীর প্রধান রোয়েম্ অপেক্ষা করছেন। আর সরকারী সেনাবাহিনী তাঁকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। নাৎসী দলের অভিযানকারীরা সেই প্রতিরক্ষা-ভবনের কার্যালয়ের দিকে এগিয়ে চললেন। উদ্দেশ্য : রোয়েমকে শত্রুদের কবল থেকে ছিনিয়ে আনা। প্রতিরক্ষা দপ্তরের দিকে যে সংকীর্ণ রাস্তা ধরে হিটলার তাঁর দল নিয়ে এগিয়ে আসছিলেন—সেখানে সশস্ত্র সরকারী পুলিশবাহিনী বাধা দিল। সুরু হল সশস্ত্র সংঘর্ষ। অল্পক্ষণের মধ্যে অনেক নাৎসী নেতা গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেলেন। অনেকে হতাহত হলেন। সড়ক-যুদ্ধে নাৎসীরা পর্যুদস্ত হলেন। হিটলারকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হল। দু'দিন পর হিটলার গ্রেপ্তার হলেন। লুডেন্‌ডর্ফ-কেও গ্রেপ্তার করা হল ঘটনার দিন রাস্তার

ওপরই। গোয়েরিং গুলিতে আহত হন। বিদ্রোহীদের অধিকাংশই গ্রেপ্তার হন। নাৎসীদের দ্বিতীয় বিদ্রোহের চেষ্টাও ব্যর্থ হল। সরকার নাৎসী দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিল। দলের আদর্শের আবেদন দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছিল।

এর পর শুরু হল নাৎসী নেতাদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধের বিচার। এটা মিউনিখের বিচার নামেই খ্যাত। দেশ-বিদেশের সাংবাদিকরা ভিড় জমালেন মিউনিখ্-এ। হিটলার এই বিচারকে তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ভাবধারা ও তাঁর বক্তব্য প্রচারের প্ল্যাটফর্মরূপে ব্যবহার করলেন; যেমন ডিমিট্রভ্ হিটলার-আনীত রাইখ্স্ট্যাগে অগ্নিসংযোগের মামলায় ধৃত কমিউনিস্টদের অপরাধীরূপে বিচারের আয়োজনকে নাৎসীচক্রান্তের মুখোস খুলে দেবার কাজে ব্যবহার করেছিলেন।

'মিউনিখ্ বিচার' ১৯২৪ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী সুরু হল। হিটলারের উদ্দেশ্য সফল হল। বিশ্বের দৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ হল। "বুর্জোয়া" বিচার-ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ডিমিট্রভ্ যেমন বিশ্বপরিচিতি অর্জন করেছিলেন এবং নাৎসীদের বিরুদ্ধে তাঁর দলের মতবাদ প্রচার করেছিলেন, হিটলারও সেই একই কৌশল অবলম্বন করলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ: তিনি প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন—এটা আইনের চোখে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ( Treason )।

আদালতে আসামীর কাঠগড়া থেকে হিটলার ঘোষণা করলেন: "I alone bear the responsibility. But I am not a criminal because of that.……There is no such thing as high treason against the traitors of 1918." হিটলার নিজের ওপর সব দায়িত্ব নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমি একাই দায়ী বিপ্লবের জন্য। আর কেউ নয়। কিন্তু তার জন্য অপরাধী আসামী বলে গণ্য হবে কেন? ১৯১৮ সালের বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা? একি সম্ভব? লসো, কাহ্র, সীসার—এই তিন প্রধানকে—যাঁরা অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন হিটলার ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে—তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও তীক্ষ্ণ যুক্তি দিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় যেন দাঁড় করালেন হিটলার। তিনি ফাঁস করে দিলেন যে, যদি তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী বলে গণ্য হন তাহলে তো একই কারণে লসো, কাহ্র, সীসার এঁদেরও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে আগে বিচার করা দরকার কেননা এঁরাও তো প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চক্রান্ত করেছিলেন? এ অভিযোগের কোন জবাবই ছিল না। ভন লসো ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন: তিনি হিটলারের মত

বেকার নিষ্কপর্দক বাউণ্ডুলে নন, তিনি সমাজের সম্মানীয় ব্যক্তি, সর্বোপরি মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে হিটলারের তুলনা? সেনাবাহিনীর ভেরীবাদক, তার সাধ জেগেছিল জার্মান জাতির সর্বময় কর্তা হবে? (From 'drummer' to dictator?) বেঁটে বামনের চাঁদ ধরার শখ? ১লা এপ্রিল (১৯২৪) বিচারে হিটলার দোষী সাব্যস্ত হলেন। শেষ পর্যন্ত ৯ মাস কারাবাসের পর মুক্তি পেয়ে নূতন উদ্যমে কাজে নেমে পড়লেন।

১৯২৩ সালের ৯ই নভেম্বরের সংঘর্ষে যে ১৬ জন নাৎসী পার্টির সভ্য সরকারী পুলিশবাহিনীর গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন হিটলার ১৯২৪ সালে জেলখানায় বসে লেখা তাঁর Mein Kampf (My Struggle) পুস্তকটি উৎসর্গ করলেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর চ্যান্সেলার এ্যাডল্‌ফ হিটলার এই ১৬ জন কম্‌রেডের মৃতদেহগুলিকে প্রাক্তন সমাধিক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনে ফেলডারণ-হ্যাল-এ এক বিশেষ সমাধিক্ষেত্রে শায়িত করে সম্মানিত করেন। এই সমাধিস্থলটি নাৎসীদের কাছে পরবর্তী কয়েক বছর একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে বন্দিত হয়ে এসেছিল। হিটলার প্রতি বছর এই দিনটি স্মরণ করতেন মিউনিখের এক পানশালার হলঘরে ৮ই নভেম্বরের সন্ধ্যাবেলায় দলের প্রবীণ কম্‌রেডদের সাথে মিলিত হয়ে। পানশালা হলে পরিকল্পিত বিপ্লব-প্রস্তুতি ব্যর্থ হল বটে, কিন্তু হিটলার জাতীয় দেশপ্রেমিক নেতারূপে জার্মান জনমানসে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলেন।

হিটলার যখন কারারুদ্ধ তখন নাৎসী দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অনুপস্থিতিতে দলে প্রচণ্ড ভাঙন ধরেছিল। জেল থেকে বের হয়েই তিনি ব্যাভেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডঃ হাইনরীক্ হেল্ড-এর সঙ্গে দেখা করে জানান যে, তিনি আইন ও সংবিধান অনুযায়ী কাজ করবেন আর সে কারণে তাঁর দলের দৈনিক পত্রিকার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা যেন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ব্যাভেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিটলারের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। হিটলারও ঘোষণা করলেন হিংসাত্মক বিপ্লবের পথে নয়, পরিষদীয় পদ্ধতিতেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্যাথলিক ও কমিউনিস্টদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাঁর দল ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবে। কিন্তু সুযোগ পেয়েই তিনি নিজমূর্তি ধরলেন। ব্যাভেরিয়া সরকার আবার দু'বছরের জন্য তাঁর উপর সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া নিষেধ করে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। হিটলার দমলেন না। নূতন সংকল্প নিয়ে "National Socialist German Workers' Party" গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯২৭ সাল থেকে জার্মান অর্থনীতিতে গতিবেগ সঞ্চারিত হতে লাগল। বেকারী কমল। বেশ কিছুটা উন্নয়নমূলক কাজের প্রসারের দিকে সরকার নজর দিল এবং সমাজ-কল্যাণমূলক ( Social Services ) কাজের প্রসার ঘটতে লাগল। আমেরিকার কাছ থেকে বৈদেশিক ঋণ পর্যাপ্ত পরিমাণে আসতে সুরু করল। ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৭ বিলিয়ান ডলার জার্মানী ঋণ করেছিল, আর এই ঋণের বেশির ভাগটাই এসেছিল আমেরিকার পুঁজিপতিদের কাছ থেকে। শিল্পোৎপাদনও বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকল। দেশের বৈষয়িক উন্নতি ও অগ্রগতি নাৎসী দলের প্রভাব বিস্তারের পথে বড় একটা সহায়ক ছিল না। হিটলার ও তাঁর দল চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কেননা নৈরাশ্য-দারিদ্র্য-ক্ষুধা মানুষকে সমগ্রতান্ত্রিক, একপেশে উগ্রপন্থী রাজনীতি ও ভাবধারার প্রেরণা জোগায়।

১৯২৮ সালের ২০শে মে জার্মানীতে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে নাৎসী দল মোট প্রদত্ত ৩ কোটি ১০ লক্ষ ভোটের মধ্যে ৮,১০,০০০ ভোট পেয়েছিল এবং রাইখস্ট্যাগের মোট ৪৯১ জন সদস্যের মধ্যে ৮২ জন নির্বাচিত সদস্য পেল। রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদীদের শক্তিও দেশের পার্লামেন্টে ১৯২৪ সালের তুলনায় অনেক কমে গেল—১০৩ থেকে ৭৩ জন-এ নেমে এল। সোস্যাল ডেমোক্রাটদের শক্তি বাড়ল পার্লামেন্টে। তাদের সদস্য ছিল ১৯২৮ সালের নির্বাচনের পর মোট ১৫৩ জন। তারাই ছিল সেদিন জার্মানীর সর্ববৃহৎ দল। নূতন কৌশল হিসাবে হিটলার "ঘৃণ্য" পরিষদীয় গণতন্ত্রের বাঁধাধরা শান্তিপূর্ণ সাংবিধানিক উপায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পথ ধরলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার রায়-ভিত্তিক রাজনীতিকে ব্যঙ্গ করে তিনি বলতেন: "Swindling idea of the majority"। বিপ্লব সংগঠিত করে ক্ষমতা দখলের থিয়োরী পরিত্যাগ করে তিনি ক্ষমতা দখলের পর "বিপ্লব" সংগঠিত করার কর্মসূচী নিলেন। এখানে একটা অভিনবত্ব ছিল পৃথিবীর মার্কসিস্ট ও অন্যান্য বিপ্লব-তত্ত্ব থেকে।

১৯২৯ সালের আন্তর্জাতিক মন্দার (great depression) ঢেউ জার্মানীকেও প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল। অর্থনীতিতে আবার বিপর্যয়ের সূচনা হল। দারিদ্র্য ও বেকারী বাড়ল, জনমানসে প্রচণ্ড হতাশা, ক্ষোভ দেখা দিল। হিটলারের নাৎসী দলের উগ্র হিংসাত্মক রাজনীতির পালে হাওয়া লাগল। অবস্থার সুযোগ নিতে তিনি বদ্ধপরিকর।

গুস্তাভ স্ট্রেস্‌ম্যান ১৯২৯ সালের ৩রা অক্টোবর মারা যান। প্রজাতান্ত্রিক জার্মানীর পুনরুজ্জীবনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন নিঃসন্দেহে।

মন্দা জার্মান অর্থনীতিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল। আমেরিকা থেকে যে অর্থ সাহায্য ও ঋণের মাধ্যমে জার্মানীতে আসছিল সেটা বন্ধ হয়ে আসছিল। বহু শিল্প কল-কারখানা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ হল। রপ্তানী বাণিজ্য দারুণভাবে ব্যাহত হল। লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হল আবার। ব্যাঙ্কের কারবার পর্যন্ত বন্ধ হতে সুরু করল। এক অসহনীয় পরিস্থিতি। হিটলার দেশবাসীকে বার বার এই চরম বিপর্যয়ের কথা বলে আসছিলেন। তিনি জার্মান জাতিকে বোঝাতে সুরু করলেন: তিনিই দেশকে এই দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। মার্কসবাদীদের ও সোস্যাল ডেমোক্রাটদের ধোঁকাবাজীর মুখোশ তিনি খুলে দিতে সুরু করলেন তাঁর জ্বালাময়ী লেখনী ও বাগ্মিতার দ্বারা [ "Unprecedented swindles, lies and betrayals of the Marxist deceivers of the people" ( Hitler ) ]।

১৯৩০ সালে হারম্যান ম্যুলার ( Hermann Mueller )—সোস্যাল ডেমোক্রাট চ্যান্সেলার পদ ত্যাগ করলেন। তাঁর জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হলেন হেন্‌রিক ব্রুনিং ( Bruening )। তিনি ছিলেন ক্যাথলিক সেণ্টার পার্টির পরিষদীয় নেতা। ব্রুনিং ছিলেন নিষ্টাবান সৎ উদ্যোগী মধ্যপন্থী। গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর নিষ্টা ছিল সন্দেহাতীত। জার্মানীতে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী করার জন্য তিনি উদ্যোগী হলেন। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে এমন পথের আশ্রয় নিলেন যা পরিশেষে হিটলারের অভ্যুদয়কে সুনিশ্চিত করতে সাহায্যই করল। তিনি যখন দেখলেন তাঁর অর্থনৈতিক-বিষয়ক কর্মসূচী পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠকে দিয়ে গ্রহণ করান যাচ্ছে না তখন প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গকে পরামর্শ দিলেন সংবিধানের ৪৮ ধারা প্রয়োগ করে জরুরী-কালীন ক্ষমতার বলে ডিক্রী জারী করে অর্থনৈতিক বিল কার্যকরী করতে। এতে আর পার্লামেণ্টে সংখ্যাধিক্যের সমর্থনের দরকার হত না। পার্লামেণ্ট কিন্তু এই অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিরোধিতা করলেন। ব্রুনিং প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গকে পরামর্শ দিলেন পার্লামেণ্ট ভেঙে দেবার। দেশের জন্য তখন প্রয়োজন শক্তিশালী সরকার।

১৯৩০ সালের জুলাই মাসে পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়া হল। ১৪ই সেপ্টেম্বর নূতন নির্বাচনের দিন স্থির হল। কি করে ব্রুনিং সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পার্লামেণ্টে আবার নির্বাচনের রায়ে ফিরে আসবেন সে সম্বন্ধে কিছুই স্থির না করে এই পথে পা বাড়ালেন। দুর্দশাগ্রস্ত জনগণ এই অসহনীয় যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। দোকানপাট ব্যবসা বন্ধ। এ যেন এক রুদ্ধ দুয়ার

গোলকধাঁধা। নির্বাচনী প্রচার অভিযানে হিটলার শোনালেন তাঁর ভরসা-বাণী, তাঁর প্রতিশ্রুতি জাতির প্রতি। তিনি বললেন: ভার্সাই চুক্তিকে নাকচ করবেন, জার্মানীকে শক্তিশালী ষড়ৈশ্বর্যশালিনী করবেন, দেশ থেকে দুর্নীতি চিরতরে দূর করবেন, পুঁজিবাদীদের টাকার দাপট ও ঔদ্ধত্য স্তব্ধ করবেন, বেকারদের কর্মসংস্থান করবেন, ক্ষুধার্তের জন্য রুটির ব্যবস্থা করবেন, জার্মানী থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ অন্যায়ভাবে যে টাকা আদায় করা হচ্ছিল—যার অন্যতম ফলশ্রুতি এই শোচনীয় সঙ্কট—সেই ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া তিনি বন্ধ করবেন।

এই নির্বাচনে নাৎসী দলের মোট ১০৭ জন সদস্য নির্বাচিত হলেন পার্লামেণ্টে এবং নাৎসী দল সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিষদীয় দল থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হল। নির্বাচনে কমিউনিস্টদেরও শক্তি বৃদ্ধি পেল। পার্লামেণ্টে তাদের সদস্য-সংখ্যা ৫৪ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৭-এ গিয়ে দাঁড়াল। নরমপন্থী মধ্যবিত্ত শ্রেণী-ভিত্তিক দলগুলির শক্তি খুব হ্রাস পেল। মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভোটারদের বিপুলসংখ্যক হিটলারের দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন নির্বাচনে।

ব্রুনিং মুশকিলে পড়লেন। কিভাবে স্থায়ী সরকার গঠন করবেন পার্লামেণ্টে এইরকম দলীয় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে? প্রজাতন্ত্রকে বাঁচান যাবে কিভাবে? দেশের সেনাবাহিনী ও বৃহৎ শিল্পপতিরাও এই প্রজাতন্ত্রকে মনে মনে চায়নি। হিটলার এই দুই শক্তিশালী দল থেকে অর্থাৎ সেনাদল ও শিল্পপতিদের সমর্থন পাবার জন্য ব্যগ্র হলেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে নাৎসী অনুরাগীদের অনুপ্রবেশ খুব বৃদ্ধি পেল। সরকারও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ১৯৩০ সালের পর থেকে হিটলার সুপরিকল্পিতভাবে শিল্পপতি পুঁজিপতিদের সমর্থন পাবার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ছেড়েছেন। পুঁজিপতিদের আস্থা-ভাজন হয়েছেন। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতেই হবে। আধুনিক নির্বাচনে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। সেই অর্থ দেবেন শিল্পপতিরা। (এ দেশের মার্কসবাদীরাও একই পথ অনুসরণ করে চলেছেন। তাঁদের পেছনে এক শ্রেণীর বৃহৎ শিল্পপতি নির্বাচনী তহবিলের টাকা জোগাচ্ছেন। হিটলারের পেছনে যেমন Fritz Thyssen, Albert Voegler ছিলেন একচেটিয়া পুঁজির মালিক, তেমনি ভারতের মার্কসবাদীদের পেছনেও আছেন বিশেষ একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী।)

ব্রুনিং ১৯৩০ সালের মে থেকে ১৯৩২ সালের মে মাস পর্যন্ত জার্মানীর চ্যান্সেলার ছিলেন। ব্রুনিং ছিলেন হ্বাইমার সংবিধানের নিষ্ঠাবান রক্ষক।

কিন্তু এও সত্যি, তিনিই শেষ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রের ধ্বংসের কারণ হলেন। পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়ে ডিক্রী জারী করে ১৯৩০ সালে শাসনকার্য চালাচ্ছিলেন। পরিষদীয় গণতন্ত্রকে তিনিই নস্যাৎ করলেন। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা ব্রুনিং-এর মার্কের মূল্যমান হ্রাসের কর্মসূচী ও শ্রমিকদের বেতন হ্রাসের কর্মসূচী মেনে নিতে অস্বীকার করায় ব্রুনিং জবরদস্তি পার্লামেণ্ট ভেঙে দিলেন। যে রাইখস্ট্যাগকে কেন্দ্র করেই তাঁর মর্যাদা ও ক্ষমতা সেই রাইখস্ট্যাগকেই তিনি উপেক্ষা করলেন। আগামী দিনের বিপজ্জনক নজীর হয়ে রইল এটা। হিটলার এই নজীরের সুযোগ প্রয়োজনমত নেবেন তাতে আর আশ্চর্য কি থাকতে পারে ?

১৯৩২ সালে ব্রুনিং ভন হিণ্ডেনবুর্গের আস্থা হারালেন। 'ব্রাউনশার্ট' নাৎসী দলের এই সংস্থানটিকে ভেঙে দিয়ে তিনি নাৎসীদের ১লা নম্বর শত্রু হলেন। তিনি সোস্যালিস্টদের বিরাগভাজন হলেন, কেননা তিনি Social Service Programme—যা জার্মানীর বৈশিষ্ট্য ছিল, সেগুলো কাট-ছাঁট করলেন, শ্রমিকদের মজুরী কমালেন। ব্রুনিং হিণ্ডেনবুর্গের কাছে আরও ক্ষমতা চাইলেন। হিণ্ডেনবুর্গ না-মঞ্জুরই শুধু করলেন না, ব্রুনিংকে সরিয়ে দিলেন চ্যান্সেলারের পদ থেকে। এরপর চ্যান্সেলার হয়ে এলেন Franz Von Papen ১লা জুন ১৯৩২ সালে। প্যাপেন "সেণ্টার পার্টির" সদস্য ছিলেন। ব্রুনিং-এর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের জন্য তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করে। হিণ্ডেনবুর্গ তাঁকে দলের উর্ধ্বে থেকে প্রশাসন চালাবার পরামর্শ দিলেন। তিনি জার্মান পার্লামেণ্টের সদস্যও ছিলেন না। প্যাপেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বৃদ্ধ হিণ্ডেনবুর্গের পূর্ণ আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হলেন। প্যাপেনের সঙ্গে প্রেসিডেণ্টের খুব হৃদ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আদৌ জনপ্রিয় ছিলেন না। প্যাপেন আবার সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিলেন। নির্বাচনে তিনি পর্যুদস্ত হলেন। নাৎসীরা ১৩,৭০০,০০০ ভোট নির্বাচনে পেল। এই দলই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পরিষদীয় দল হিসাবে পরিগণিত হল। নাৎসী দল নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩৭ ভাগ পেল, বাকী ৬৩ ভাগ তাদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। হিটলার চ্যান্সেলার হবার দাবী জানালেন এবং ডিক্টেটরের সর্বময় ক্ষমতা দাবী করলেন। হিণ্ডেনবুর্গ তাঁর দাবী অগ্রাহ্য করলেন। ক্রুদ্ধ হিটলার পার্লামেণ্টে প্যাপেনকে হটিয়ে দেবেন স্থির করলেন। কিন্তু যেদিন পার্লামেণ্টের অধিবেশন সুরু হল সেইদিনই প্যাপেন পার্লামেণ্ট ভেঙে দিলেন—হিটলারের

প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য। জার্মানীর সর্ববৃহৎ অঙ্গরাজ্য প্রাশিয়া তখন সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের শাসনাধীনে ছিল।

প্যাপেন নাৎসী দলের S. A.-র ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারী ছিল তা প্রত্যাহার করে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীতে হত্যা দাঙ্গা সুরু হয়ে গেল। নাৎসী দলের ও কমিউনিস্টদের মধ্যে পথে-ঘাটে সশস্ত্র সংঘর্ষ সুরু হল। ১লা জুন থেকে ২০শে জুনের মধ্যে প্রাশিয়াতে ৪৬১টি রাস্তায় সংঘর্ষ হয় দুই দলে। জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছিল। এইসব দাঙ্গায় প্রভূত লোক প্রাণ দিল। নাৎসী ও কমিউনিস্ট-সভ্যরা প্রকাশ্য রাস্তায় পরস্পরকে গুলি করে হত্যা করছিল।

প্যাপেন সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে প্রাশিয়ায় সোস্যালিস্ট-পরিচালিত সরকার উৎখাত করলেন—সোস্যালিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করালেন। তিনি নিজেকেই প্রাশিয়ার সর্বময় কর্তা নিয়োগ করলেন। নাৎসীরা এতে খুশীই হলেন। সোস্যালিস্টরা সুবোধ বালকের মত নতি স্বীকার করলেন। প্রাশিয়ায় মার্শাল আইন জারী হল। কোন সাধারণ ধর্মঘট বা প্রতিরোধের আহ্বান জানান হল না। এদিকে প্যাপেন আবার নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিলেন—৬ই নভেম্বর নির্বাচনে আবার পরাজয় বরণ করতে হল। তাঁর নেতৃত্বে প্রথম পার্লামেণ্টের আয়ু ছিল মাত্র ১ দিন। দ্বিতীয় পার্লামেণ্টের আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ৩ দিন। এইভাবে একটার পর একটা নির্বাচন, তারপর নির্বাচনের রায়কে উপেক্ষা করা এবং পরিশেষে পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়া—এই রাজনীতি বেশীদিন চলতে পারে না। জনগণ ভোটের প্রতি বীতরাগ হয়ে পড়ছিলেন—নির্বাচনের প্রতি শ্রদ্ধা হারাতে লাগলেন। কতকাল এইভাবে চলবে আর? হিটলারের গণতন্ত্র-বিধ্বংসী মতবাদ জার্মান জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছিল। নভেম্বর নির্বাচনে অবশ্য নাৎসী দলের সমর্থন কিছু হ্রাস পেল, প্রায় ২০ লক্ষ ভোট কম পড়ল তাদের অনুকূলে। তখন নাৎসী ও কমিউনিস্টরা যৌথভাবে ধর্মঘটের (Berlin traffic strike) পথে পা বাড়ালেন আর সেই সঙ্গে যৌথভাবে সাধারণ ধর্মঘটের হুমকি দিলেন।

১৯৩৩ সালের ৫ই মার্চ আবার নির্বাচন হল। এই নির্বাচনের কয়েকদিন পর জার্মান পার্লামেণ্ট ভবনে অগ্নি-সংযোগের (Reichstag Fire) স্মরণীয় ঘটনাটি ঘটে গেল। পার্লামেণ্ট ভবনের প্রভূত ক্ষতিসাধন হল। পার্লামেণ্ট ভবন পুড়িয়ে দেবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিটলার ও নাৎসী দলের সামগ্রিক রাজনীতির মোড় ঘুরল—এর পেছনে যে বড় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল সেটাও পরিস্ফুট হয়ে উঠল বিশ্বের কাছে।

জার্মান পার্লামেন্ট ভবনে অগ্নি-সংযোগের ব্যাপারটির রহস্য আজও উদ্ঘাটিত হয়নি। কমিউনিস্টরা ব্যাপারটি নাৎসী দলের কাজ বলে প্রচার করলেও প্রকৃত ঘটনা আজও জানা যায়নি। এই রহস্যের গভীরতা বোঝা যাবে একটি ছোট ঘটনা থেকে। রাইখস্ট্যাগ অগ্নিসংক্রান্ত ঐতিহাসিক মামলায় ডিমিট্রভ, টর্গলার (Torgler) নির্দোষ প্রমাণিত হলেন বটে, কিন্তু Torgler-কে বন্দীশিবিরে নিক্ষেপ করা হল; অথচ ডিমিট্রভ ও তাঁর দু'জন বুলগেরিয়ান সহযোগীকে বিমানে করে মস্কো পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এটার ব্যাখ্যা কি হতে পারে? কমিণ্টার্নের ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল Franz Borkenau বা Ruth Fischer বলেছেন যে, ডিমিট্রভ জানতেন G. P. U. বা Gestapo-র সঙ্গে গোপন ব্যবস্থা আগেই হয়েছিল, তিনি জানতেন যে, মামলার ফলাফল যাই হোক না কেন তাঁকে নিরাপদে মস্কো পাঠান হবে। [See: Invisible Writing; Arthur Koestler: Page 203.]

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই নির্বাচন হল। নাৎসী দল অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করলেন। দুটি ঘটনার মধ্যে যোগাযোগও ছিল। এই অগ্নি-সংযোগের জন্য নাৎসীরা কমিউনিস্টদের দায়ী করেছিল। এই নির্বাচনে হিটলার তাঁর দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের গুরুত্ব বুঝে চেষ্টা করছিলেন কিভাবে পার্লামেণ্টে দলের সদস্যসংখ্যা বাড়ান যায়। মার্চের নির্বাচনে পার্লামেণ্টে তাঁর দলের ২৫০ জন সদস্য দাঁড়াবে আশা করেছিলেন মোট ৬০০ জনের মধ্যে। তিনি কমিউনিস্টদের শক্তি খর্ব করতে চাইলেন। তাঁদের দলে প্রায় একশ' জন সদস্য ছিলেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হল। ১০০ জন কমিউনিস্ট ডেপুটিকে গ্রেপ্তার করা হল। হ্বাইমার সংবিধানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার যে-সব মূল্যবান গ্যারাণ্টি ছিল সবই কর্পূরের মত উবে গেল। রাইখস্ট্যাগে অগ্নি-সংযোগের সমগ্র ব্যাপারটি রহস্যাবৃত। সম্পূর্ণ সত্য এ সম্পর্কে আজও উদ্ঘাটিত হয়নি।

জন গানথার লিখেছেন:

"But for the fire the Nazis would never have gained so sweeping and crushing a victory. In the flames of Reichstag fire disappeared the old Germany of Bismarck, William II, and the Weimar Constitution. In its smoke rose Hitler's Third Reich". [Inside Europe: John Gunther, P. 55.]

জার্মান পার্লামেণ্ট ভবনে অগ্নি-সংযোগ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক A. J. P. Taylor তাঁর 'The Origins Of The Second World War' গ্রন্থে লিখেছেন :

"Everyone knows the legend. The Nazis wanted an excuse for introducing Exceptional Laws of political dictatorship and themselves set fire to the Reichstag in order to provide this excuse. Perhaps Goebbles arranged the fire, perhaps Goering ; perhaps Hitler himself did not know about the plan beforehand. At any rate somehow the Nazis did it. This legend has now been shot to pieces by Fritz Tobias, in my opinion, decisively. The Nazis had nothing to do with the burning of the Reichstag. Young Dutchman Van der Lubbe did it all alone exactly as he claimed. Hitler and other Nazis were taken by surprise. They genuinely believed that communists had started the fire and they introduced the Exceptional Laws because they genuinely believed that they were threatened with a communist rising". ( P. 12 )

একজন ডাচ্ যুবক ভ্যানডার ল্যুবে এই অগ্নি-সংযোগের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। হিটলার ও নাৎসীরা ঘটনার দ্বারা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা এই ঘটনা থেকে সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলেন যে, কমিউনিস্টরা অভ্যুত্থান ঘটাবার মতলব করছে এবং তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

উইলিয়াম শিরার-ও তাঁর 'Rise And Fall Of The Third Reich'— সুবৃহৎ গ্রন্থে এই অগ্নি-সংযোগ সম্বন্ধে ঠিক কারা দায়ী বলতে পারেননি। তিনি বলেছেন প্রকৃত ঘটনার ওপর যাঁরা আলোকপাত করতে পারতেন তাঁদের কেউই আর জীবিত নেই। এই আগুনে বিসমার্ক-এর প্রাচীন জার্মানীই শুধু নয়, হ্বাইমার প্রজাতন্ত্র পুড়ে শেষ হল। দগ্ধশেষ ভস্মরাশি থেকে উদ্ভূত কালো ধোঁয়ার মধ্যে থেকে জন্ম নিল হিটলারের 'তৃতীয় রাইখ'।

হিটলার বৃদ্ধ প্রেসিডেণ্টের কাছে জার্মান রাইখের চ্যান্সেলারের সর্বময় ক্ষমতা দাবী করেছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ প্রেসিডেণ্ট প্রত্যাখ্যান করেন নাৎসী দলের হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাবের

জন্য। নিজে একা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবার আগ্রাসী মনোভাবের জন্য হিণ্ডেনবুর্গ হিটলারের প্রতি বিরূপই ছিলেন। হিটলারকে তাঁর আপোষহীন অনমনীয় মনোভাব পরিবর্তনের জন্য তিনি বলেওছিলেন। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না।

ডঃ গেবলস্ "সেণ্টার পার্টির" সঙ্গে হাত মেলালেন গোপনে। রাইখের অধিবেশনের প্রথমদিনে নাৎসী-নেতা গোয়েরিংকে রাইখের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করতে সেণ্টার পার্টি ন্যাশন্যাল সোস্যালিস্ট পার্টির ডেপুটীদের সাথে হাত মেলালেন। অধিবেশন সুরু হবার আগেই ভন প্যাপেন প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গকে দিয়ে একটি ডিক্রী সই করিয়ে নিয়েছিলেন। এই ডিক্রীর বলে নবনির্বাচিত রাইখ আবার ভেঙে দেওয়া হল। এই অধিবেশনে কমিউনিস্ট ও নাৎসী দলের ডেপুটীরা হাত মিলিয়েছিলেন।

৬ই নভেম্বরের নির্বাচনে নাৎসী দলের সদস্যসংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়াল ১৯৬। কমিউনিস্টদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ১০০, সোস্যালিস্টদের শক্তি ১৩৩ থেকে কমে দাঁড়াল ১২১।

ভন প্যাপেন হিটলারকে আলোচনার জন্য আহ্বান জানালেন। হিটলার প্রেসিডেণ্ট-এর সঙ্গে পুনঃপুনঃ দেখা করলেন। হিণ্ডেনবুর্গ তাঁকে জানিয়ে দিলেন যদি তিনি একটি স্থায়ী গ্রহণযোগ্য কোয়ালিশন সরকার কর্মসূচীর ভিত্তিতে তৈরী করতে পারেন তাহলেই তাঁকে চ্যান্সেলার করতে তিনি রাজী। দ্বিতীয় বিকল্প—ভন প্যাপেনের অধীনে ভাইস-চ্যান্সেলার হয়ে তিনি কাজ করতে পারেন। আর প্যাপেন জরুরীকালীন ক্ষমতার ভিত্তিতে কাজ চালাবেন।

ভন প্যাপেনের সহযোগী জেনারল ভন স্লেইচার একটি ষড়যন্ত্র ফাঁদলেন। তিনি নিজেই চ্যান্সেলার হতে চান। প্যাপেন সংবিধান সংশোধন করে রক্ষণশীল শ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি জনগণের কল্যাণ ও স্বার্থের অজুহাতে এই সংশোধন করার প্রস্তাব দেন, কিন্তু স্লেইচার এতে আপত্তি জানান।

প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ কার্ট ভন স্লেইচারকে চ্যান্সেলার নিয়োগ করলেন। তিনি ৫৭ দিন এই পদে ছিলেন। স্লেইচার চাইলেন নাৎসী দল যাতে তাঁর সরকারে অংশ নেন। হিটলার নাকচ করে দিলেন সেই প্রস্তাব। স্লেইচার তখন গ্রেগার স্ট্রেসারকে ভাইস-চ্যান্সেলার পদের লোভ দেখিয়ে নাৎসী দলে ভাঙন ধরাতে চেষ্টা করলেন। হিটলার সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিলেন। স্লেইচারের সঙ্গে কোনরূপ সহযোগিতা করতে রাজী ছিলেন না তিনি।

স্লেইচারের সুবিধা ছিল তিনি সেনাবাহিনীর প্রধানকে তাঁর পক্ষে পেয়েছিলেন। স্লেইচারকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় প্যাপেন-হিটলার মন্ত্রিসভা গঠনের তোড়জোড় চলছিল অতি গোপনে। সেই চক্রান্ত সার্থক রূপ নিল ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী। ব্লমবুর্গকে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন থেকে জরুরী-বার্তা পাঠিয়ে বার্লিনে আনা হল। হিণ্ডেনবুর্গ তাঁকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর শপথ পড়ালেন। যে-কোন সামরিক বিদ্রোহকে দমন করার নির্দেশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে দেওয়া হল। হিটলারকে সেনাবাহিনীর অফিসাররা সহজেই গ্রহণ করেছিলেন। খিড়কির দরজা দিয়ে চক্রান্ত ও গোপন ষড়যন্ত্রের পথে হিটলার-মন্ত্রিসভা গঠিত হল। প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার সার্থক রূপ যিনি নিয়েছিলেন তিনিই প্রজাতন্ত্রের চ্যান্সেলাররূপে শপথ নিলেন। 'ন্যাশনাল সোস্যালিস্টরা' ছিলেন মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু—এগারো জনের মধ্যে মাত্র তিনজন। আর সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই হিণ্ডেনবুর্গ হিটলারকে চ্যান্সেলার পদে বরণ করলেন। চ্যান্সেলার পদে হিটলার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রিক্ এবং গোয়েরিং দপ্তরবিহীন মন্ত্রী। প্যাপেন হলেন ভাইস-চ্যান্সেলার ও প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। প্রশ্ন জাগতে পারে প্যাপেন ভাইস-চ্যান্সেলার পদ নিয়ে সন্তুষ্ট হলেন কি করে? তিনি প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিয়েছিলেন যে, চ্যান্সেলারকে একা তিনি কোন আলোচনায় ডাকবেন না। চ্যান্সেলারকে সব সময়ই ভাইস-চ্যান্সেলারের সঙ্গে আসতে হবে। এছাড়া প্যাপেন-এর সঙ্গে হিণ্ডেনবুর্গের সম্পর্ক ছিল খুব প্রীতি ও শ্রদ্ধার। তাঁর বড় শক্ত খুঁটিই তো প্রেসিডেণ্ট। রক্ষণশীল দলের বাকী মন্ত্রীরা তাঁর পক্ষে। তাই হিটলারকে ভয় করার কোন কারণ থাকবে না এবং প্যাপেনই সরকার চালাবেন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে।

হিণ্ডেনবুর্গ হিটলারকে চ্যান্সেলার করেছিলেন এই সর্তে যে, তিনি পার্লামেণ্টের সমর্থন নিয়েই কাজ করে যাবেন। হিটলার হিসেব করে দেখলেন পার্লামেণ্টের ৫৮৭ জন সদস্যের মধ্যে নাৎসী দল ও জাতীয়তাবাদী দলের মিলিত সংখ্যা মোট ২৪৭। মোট সদস্যসংখ্যার অর্ধেকেরও কম। সেণ্টার পার্টির পক্ষে ছিল ৭০ জন সদস্য। হিটলার সেণ্টার পার্টির নেতা মশিঁয়ে ক্যাস্-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালালেন। সেণ্টার পার্টির নেতা প্রথমেই দাবী করলেন হিটলারকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে সাংবিধানিক উপায়ে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন চালাতে হবে। এটাই হবে তাঁর দলের সমর্থকদের প্রধান সর্ত। হিটলার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে আলোচনা ভেঙে-

দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'সেণ্টার পার্টি' অবাস্তর ও অসম্ভব দাবী পেশ করছে —তা মেনে নেওয়া চলে না। তাই তিনি প্রেসিডেণ্টকে পরামর্শ দিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাই-এর জন্য পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়ে আবার নির্বাচন করা হোক। কিন্তু প্যাপেন কি সমর্থন করবেন? প্যাপেনকে হিটলার বোঝালেন নির্বাচনের রায় যাই হোক এই মন্ত্রিসভাই থাকবে। এই আশ্বাসে প্যাপেন সায় দিলেন। হিটলার ও গোয়েরিং ধরে নিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে থাকার ফলে নির্বাচনী প্রচারকার্য ভালভাবে চালান যাবে। সাধারণ নির্বাচনে দলের সাফল্যের জন্য চাই পর্যাপ্ত অর্থ। ক্ষমতা থাকার ফলে টাকা-পয়সার কোন অভাব হবে না। নির্বাচনের দিন স্থির হয়ে গেল—৫ই মার্চ, ১৯৩৩। পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়া হল।

হিটলার দলের অনুকূলে হাওয়া সৃষ্টির জন্য শিল্পপতিদের নতুন আশ্বাসবাণী শোনালেন। অর্থও আসতে সুরু করল। [ভারতের আগুনখেকো বিপ্লবীদের সঙ্গে শিল্পপতি-প্রভাবশালী ভূম্যধিকারীদের মধুর সম্পর্ক তুলনীয়।]

নাৎসী দল সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের ওপর নিপীড়ন সুরু করে দিল। দুই দলেরই সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হল। নাৎসী দলের ঝটিকাবাহিনী (বেসামরিক আধা-সামরিক বাহিনীর সমতুল্য—S. A. Storm troopers) দিয়ে অন্যান্য দলের সভায় হামলা—গুণ্ডামী করে সভা-সমাবেশ ভেঙে দেওয়া সুরু হল। [ভারতের মার্কসবাদীদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দিয়ে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের ওপর হামলা তুলনীয়।] আশ্চর্যের বিষয় 'লাল বিপ্লবের' সকল হুঙ্কার স্তব্ধ হল। সোস্যালিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হত্যা-হিংসা নিপীড়ন ও জুলুমের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন হল না। সমাজতন্ত্রীদের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র হিটলার নিষিদ্ধ করে দিলেন। মারামারি দু'পক্ষেই হল নির্বাচনী অভিযানে। দু'পক্ষের লোকই এবং বেশকিছু সমর্থক আহত ও নিহত হয়েছিলেন। শ্রেণী সচেতন (!) 'সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী' লড়াকু শ্রমিকশ্রেণী কোনরূপ সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পথে পা বাড়াল না· নাৎসীবাদী হিংসাত্মক রাজনীতিকে রুখবার জন্য। [পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রণ্টের শাসনকালে খুন-জখমের রাজনীতিকে রুখবার জন্য হয়েছে কোন যৌথ শ্রমিক আন্দোলন—হয়েছে কোন সমাবেশ মিছিল প্রতিরোধ—গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য? কিন্তু আর্থিক দাবীর লোভে শ্রমিক ইউনিয়ন নেতারা ঘনঘন বন্‌ধ্‌-হরতালের ডাক দিয়েছিলেন।]

এদিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে গোয়েরিং এক অতিরিক্ত ৫০,০০০ লোকের পুলিশ বাহিনীতে প্রায় ৪০,০০০ নাৎসী সদস্যকে নিয়োগ করে ফেললেন। তারা

S. A. ও S. S.-এর সভ্য ছিল। তাই পুলিশবাহিনী নাৎসীদের হাতেই চলে গেল। [ভারতের পশ্চিমবাংলায় দলীয় অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে মার্কসবাদীরা পুলিশ-বাহিনীকে একপেশে রাজনীতির উদ্দেশ্য সাধনের ভয়াল হাতিয়ার করে তুলেছিল। প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা, ঔচিত্যবোধ, সাংবিধানিক কর্তব্য-পালন এই সব তত্ত্বকথা ঘৃণ্য বস্তা-পচা বুর্জোয়া তত্ত্বরূপে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ১৯৬৯-৭০ সালের দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্টের শাসনকালে।]

২৪শে ফেব্রুয়ারী গোয়েরিং কমিউনিস্টদের কেন্দ্রীয় সদর কার্যালয়ে হানা দিয়ে অনেক নথিপত্র আটক করেন। বহু কমিউনিস্ট নেতা তখন গা-ঢাকা দিয়েছেন—অনেকে মস্কো পালিয়ে গেছেন। এইসব গোপন নথিপত্র পরীক্ষা করে স্বরাষ্ট্রদপ্তরের মন্ত্রী জানালেন কমিউনিস্টরা নাকি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এর পরই ঘটল সেই স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা—রাইখস্ট্যাগ-ভবনে অগ্নি-সংযোগ।

জার্মান পার্লামেণ্ট-ভবনে অগ্নি-সংযোগের ঘটনার পরের দিনই হিটলার প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা করে একটি জরুরী ডিক্রীতে তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নিলেন—"রাষ্ট্রের ও জনগণের নিরাপত্তার জন্য" ("for the protection of the people and the State")। এই ডিক্রীর দ্বারা সংবিধানে সংযোজিত ৭টি মূল ধারাকে নাকচ করা হল সাময়িকভাবে। এই সব ধারায় নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের ও বিনিময়ের স্বাধীনতা, দলবদ্ধ হবার স্বাধীনতা, চিঠিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার সাময়িকভাবে কেড়ে নেওয়া হল।

বিনা পরোয়ানায় যে-কোন নাগরিকের বাড়ি তল্লাশি করা যাবে। টেলিফোনে আইনতঃই আড়ি পাতা যাবে—চিঠিপত্র খুলে পড়ার মত অধিকার পুলিশ বা গোয়েন্দাদের থাকবে—রাষ্ট্রবিরোধী জন-স্বার্থবিরোধী কিছু বলা বা লেখা হচ্ছে কিনা দেখার জন্য।

এই ডিক্রীর জোরে অঙ্গরাজ্যের পূর্ণ প্রশাসনিক কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করতে পারত। সশস্ত্র বা হিংসাত্মক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের কোথাও শান্তি ভঙ্গ করলে সরকার মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারত। পার্লামেণ্টকে ডিঙিয়ে এই রকম ডিক্রী জারীর ব্যবস্থা করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই হিটলার তাঁর বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার অধিকারী হলেন। কমিউনিস্ট বিপ্লবের জুজুর ভয় দেখিয়ে নির্বাচনে শান্তিপ্রিয় মধ্যবিত্ত ও কৃষকসমাজের ভোট পাবার কৌশল তিনি গ্রহণ করলেন। নাৎসীরা দেশের সর্বত্র বিভীষিকা ভীতি সন্ত্রাস সৃষ্টি

করতে লাগল। পথেঘাটে মিছিল ও হল্লা করে ঝটিকাবাহিনীর সদস্যরা জন-জীবনকে ত্রস্ত করে তুলল। উদারপন্থী ও গণতন্ত্রীদের সকল কাগজ-পত্র পত্র-পত্রিকার প্রকাশন বন্ধ করে দেওয়া হল। শিল্পপতিদের অর্থে পুষ্ট হয়ে নাৎসী দল নির্বাচনে ব্যাপক প্রচার চালাল। বড় বড় মিছিল, সমাবেশ, প্রজ্বলিত মশালের প্যারেড দ্বারা জনসাধারণকে প্রভাবান্বিত করার ব্যবস্থা হল। ১৯৩৩ সালের ৫ই মার্চের সাধারণ নির্বাচনে হিটলার এত করেও তাঁর দলের পক্ষে শতকরা ৪৪টি ভোট পেলেন। আগের নির্বাচনের চাইতে অবশ্য এই নির্বাচনে নাৎসী দল প্রায় ৫৫ লক্ষ বেশী ভোট পেল। কমিউনিস্টদের পক্ষে ভোট প্রায় ১০ লক্ষ কম পড়ল আগের বারের তুলনায়। সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হয়ে প্রতিষ্ঠিত হল পার্লামেণ্টে। পার্লামেণ্টে নাৎসী দলের সদস্যসংখ্যা দাঁড়াল ২৮৮। এর সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদলের ৫২ জন সদস্য যোগ করলে পার্লামেণ্টে ১৬ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিটলার একক দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা চাইছিলেন তাঁর কল্পিত একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

পার্লামেণ্ট থেকে ৪ বছরের জন্য হিটলারের মন্ত্রিসভাকে আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা দেবার জন্য একটি প্রস্তাব পাশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হল। এ অদ্ভুত ভূতুড়ে কাণ্ড। পার্লামেণ্ট নিজের মৃত্যু-পরোয়ানায় স্বাক্ষর দিতে নিজেই সম্মতি দিচ্ছে যেন। কিন্তু এই প্রস্তাব পাশ করাতে গেলে পর্যাপ্ত সদস্যের সমর্থন চাই। ঠিক হল ৮১ জন কমিউনিস্ট সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হবে কল্পিত কমিউনিস্ট-বিপ্লবের অজুহাতে। তাছাড়া কিছু সোশ্যালিস্ট সদস্যকে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করতেই দেওয়া হবে না। [ ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের নির্বাচনে রাশিয়ার মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট ডেমোক্রাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। লেনিনের দল সংখ্যায় কম ছিল। নির্বাচিত গণপরিষদকে তিনি কিভাবে বরখাস্ত করলেন এবং কিভাবে সোস্যালিস্ট সদস্যদের পার্লামেণ্টে প্রবেশ রোধ করা হয় ইতিহাসের ছাত্ররা তা জানেন। সামরিক বাহিনীকে দিয়ে প্রবেশপথগুলি অবরোধ করে রাখা হল। পথে পথে যে-সব শ্রমিক মিছিল করে গণপরিষদ চালু করার দাবী জানাল—মিলিটারী গুলির মুখে তাদের প্রাণ দিতে হয়েছিল। ]

হিণ্ডেনবুর্গকে প্রতিশ্রুতি দিলেন হিটলার যে, একান্ত প্রয়োজন হলেই তবে এই জরুরীকালীন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে। এতে পার্লামেণ্টের অস্তিত্ব কিছুমাত্র বিঘ্নিত বা বিপন্ন হবে না। প্রেসিডেণ্টের মর্যাদা ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। জার্মান যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপ করা

হবে না। গীর্জা ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানের ওপর কোন আঘাত হানা হবে না—রাষ্ট্রের সঙ্গে গীর্জার সম্পর্ক আগের মতই থাকবে।

সোস্যাল ডেমোক্রাটরা হিটলারের পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করলেন। গণতন্ত্রের মৌল আদর্শকে যেভাবেই হোক তাঁরা রক্ষা করবেন বলে ঘোষণা করলেন। পরিষদীয় গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হল এইভাবে। পার্লামেন্ট হিটলারের হাতে সর্বময় ক্ষমতা তুলে দিয়ে সর্বনাশ ডেকে আনল। ২৩শে মার্চ (১৯৩৩) থেকে হিটলার জার্মানীর ডিক্টেটর হলেন। অন্যান্য সকল পার্টি বিলোপ করা হল। যে-জাতীয়তাবাদী দলের নেতা হিণ্ডেনবুর্গ হিটলারকে এতভাবে সাহায্য করলেন সর্বময় কর্তৃত্ব নিতে তিনিও সরকার থেকে পদত্যাগ করলেন এবং তাঁর দলও ভেঙে দেওয়া হল। ১৪ই জুলাই এক আইন জারী করা হল।

"The National Socialist German Workers' Party constitutes the only political party in Germany', বলে দেওয়া হল—আর কোন দল সেদেশে থাকতে পারবে না। এবং যদি কেউ অন্য কোন দল গঠন করতে যায় তাহলে আইনে সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। আর সেই অপরাধের জন্য তিনবছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। গণতান্ত্রিক উপায়েই এক-পার্টি শাসনব্যবস্থা সরকারীভাবে চালু হল জার্মানীতে। দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলির আয়ুষ্কাল শেষ হল। শ্রমিকদের 'কালেকটিভ বারগেইনিং'-এর অধিকারও কেড়ে নেওয়া হল। [কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেও শ্রমিক ইউনিয়নগুলির collective bargaining-এর অধিকার স্বীকার করাই হয় না। কমিউনিস্ট দলের বাইরে বা দলের ওপর শ্রমিক ইউনিয়নের কোন পৃথক সত্তা নীতিগতভাবে স্বীকার করাই হয় না। লেনিন তাঁর 'What Is To Be Done'—পুস্তিকায় শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন সচেতনতাকে বৈপ্লবিক বলে আদৌ মনে করেননি।]

হিণ্ডেনবুর্গ ১৯৩৪ সালের ২রা আগস্ট শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তখন তাঁর বয়স ৭৯। তাঁর মৃত্যুর তিনঘণ্টার মধ্যে একটি আইন জারী করে ঘোষণা করা হল এ্যাডল্ফ হিটলার একাধারে জার্মানীর প্রেসিডেণ্ট ও চ্যান্সেলার। তিনি সামরিক বাহিনীরও সর্বময় কর্তৃত্বভার নিলেন। হিণ্ডেনবুর্গের উত্তরাধিকারীরূপে হিটলার নিজেকে জাহির করলেন। সেনা-বাহিনীর সকল অফিসার সৈনিকদের আনুগত্যের শপথ নিতে হল—ব্যক্তিগতভাবে এ্যাডল্ফ হিটলারের কাছে—সংবিধানের প্রতি নয়। ফলে হিটলারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সকল পথও অবরুদ্ধ হল। হিণ্ডেনবুর্গ

মৃত্যুর আগে নাকি উত্তরাধিকার সম্পর্কিত একটি 'রাজনৈতিক উইল' রেখে গিয়েছিলেন। হিণ্ডেনবুর্গের পুত্র কর্নেল ওস্কার ভন হিণ্ডেনবুর্গকে দিয়ে কবুল করালেন হিটলার যে, তাঁর পিতার শেষ উইল-এ হিটলারকেই তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে গেছেন। অনেকেই বলে থাকেন, এই উইল-এর কথাটা সত্য নয়। কেননা মৃত প্রেসিডেন্ট রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা প্রস্তাব করে গিয়েছিলেন। এই উইলটিকে প্রকাশ করা হয়নি কোনদিনই। [ স্তালিনও লেনিনের শেষ 'রাজনৈতিক উইলটি' গোপন করে গিয়েছিলেন। এই উইল-এ লেনিন পার্টির কাছ নির্দেশ দেন স্তালিনকে যেন দেশ শাসনের দায়িত্ব বলশেভিক দলের নেতারূপে না দেওয়া হয়। ]

এর পরই ১৯শে আগস্ট এক গণভোটের মাধ্যমে হিটলারের এই সার্বিক ক্ষমতা অর্জনের ব্যাপারটিকে অনুমোদন করিয়ে নেবার ব্যবস্থা হল। গণভোটে শতকরা ৯৫ জন এই ব্যবস্থা অনুমোদন করলেন। সাংবিধানিক পক্ষে গণতান্ত্রিক উপায়েই—গণতান্ত্রিক সংবিধানকে ব্যবহার করে ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠার অভিনব ঘটনা ঘটল জার্মানীতে। প্রজাতন্ত্রের উপর শেষ যবনিকাপাত ঘটল।

হিটলার যখন তাঁর রাজনীতি শুরু করেন তখন তিনি সমাজতন্ত্রের কথা বলেছিলেন। যতই তিনি ক্ষমতার সিংহাসনের কাছাকাছি হচ্ছিলেন ততই সমাজতন্ত্রের কথা বিস্মৃত হচ্ছিলেন। তিনি প্রথম যখন ক্ষমতা দখলের জন্য বিপজ্জনক পদক্ষেপ নিলেন জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে, তখন তিনি বলেছিলেন "বিপ্লবের" সূচনা হল। নাৎসী দলের একটি বিশেষ অংশ সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁরা, ডঃ গেবলস, রোয়েম ও অন্যান্য র‍্যাডিক্যালপন্থীরা 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' কথা বলছিলেন। তাঁরা কল-কারখানার জাতীয়করণ দাবী করছিলেন। সরকারী সেনাবাহিনী ভেঙে দিয়ে একটি বিপ্লবী সেনাদল করার পক্ষে ছিলেন রোয়েম। S.A. বাহিনী মনে করেছিল ক্ষমতা পাবার পর বড় বড় চাকরি, সুযোগ-সুবিধার অধিকারী তারাই হবে। তারা মুখে পুঁজিবাদ-বিরোধী শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছিল। হিটলার বাদ সাধলেন।

'দ্বিতীয় বিপ্লবের' ( Second Revolution ) প্রয়োজনীয়তা হিটলার আদৌ স্বীকার করলেন না। রোয়েম চেয়েছিলেন জার্মান সেনাবাহিনীর স্থান নেবে তাঁর তৈরী এস. এ.—ঝটিকাবাহিনী। ঝটিকাবাহিনী ও এস.এ.-র সদস্যসংখ্যা যখন ২৫ লক্ষে গিয়ে দাঁড়াল তখন এই তর্ক উঠল। দুটি মূল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে

নাৎসী দলে সঙ্কট দেখা দিল: (১) জার্মান সেনাবাহিনীর সঙ্গে দলের আধা-সামরিক ঝটিকাবাহিনীর (২৫ লক্ষ) সম্পর্ক কি হবে, (২) 'দ্বিতীয় বিপ্লব' কিভাবে সংগঠিত হবে।

জার্মানীর সেনাবাহিনীর স্থান নেবে রোয়েমের ঝটিকাবাহিনীর ন্যায় ক্ষমতা-লিপ্সু উচ্ছৃঙ্খল বাহিনী? এই ঝটিকাবাহিনীকে দিয়ে কি জার্মানীর সেনাবাহিনীর অতীত সামরিক গৌরবের ঐতিহ্য এইভাবে ধ্বংস করা হবে? দেশের ভবিষ্যৎ কি ছেড়ে দেওয়া হবে এই উচ্ছৃঙ্খল শক্তির হাতে? সেনা-বাহিনীর সঙ্গে S. A. বাহিনীর সম্পর্ক ক্রমশই তিক্ত হয়ে উঠছিল। জার্মান মন্ত্রিসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানালেন ঝটিকাবাহিনী যেভাবে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করছে তাতে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এবং ভার্সাই চুক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে গোপনে জার্মানী অস্ত্রসম্ভারে যেভাবে শক্তিশালী করে তুলছিল তাতে বাধা আসবে যদি S. A.-কে এভাবে চলতে দেওয়া হয় আর।

[ পশ্চিম বাংলায় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট ও ঐ আদর্শে বিশ্বাসী দু'একটি দল কিভাবে দলীয় সেনাবাহিনী তৈরী করে বিপুল পরিমাণে বেআইনীভাবে গোপন অর্থ ও অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তুলছিল তার সঙ্গে নাৎসী নেতা গোয়েবলস্-এর এই অপকৌশল তুলনীয়। হিটলার নিজে জানতেন সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ক্ষমতাসীন হয়েছেন, সুতরাং সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট তাঁকে করতেই হবে। তিনি স্থির করলেন রোয়েমের এই আধা-সামরিক বাহিনীকে দমন করবেন। সেনাবাহিনীই কেবলমাত্র অস্ত্র বহন ও ধারণ করতে পারবে, আর কোন সংস্থার সদস্যরা নয়। রোয়েমের বিরুদ্ধে ছিলেন হিমলার ও গোয়েরিং।

ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বেড়েই চলল। হিমলারের নেতৃত্বাধীন S. A. বাহিনীর একটি অংশ যা কালকুর্তাধারী ঝটিকাবাহিনী বলে পরিচিত ছিল তাঁকে গোয়েরিং প্রাশিয়ার গেস্টাপো-প্রধান বলে মনোনীত করে তাঁকে দিয়ে ব্যাপক গোয়েন্দা-বাহিনী গঠনের কাজ শুরু করলেন। এতে ঝটিকাবাহিনীর একটি বৃহৎ অংশকে বিচ্ছিন্ন করে আনা হল এবং এই অংশটির প্রতি আর তাদের আগেকার সেনাবাহিনীর বিরূপতা থাকল না। গোয়েরিং-এর প্রচেষ্টায় পুলিশবাহিনীতে সরকারীভাবে ঝটিকাবাহিনীর একটি অংশকে জড়িয়ে রাখলেন। চারিধারে ষড়যন্ত্র, পাল্টা-ষড়যন্ত্রের কথা ছড়াচ্ছিল। হিটলারের সঙ্গে তাঁর এককালের ঘনিষ্ঠতম সাথীর সংঘাত প্রকট হয়ে উঠল। এর পরই রক্তাক্ত পার্জ সুরু হল জার্মানীতে। তাঁর নিকটতম সঙ্গী, বহু দুর্যোগ ও সংগ্রামের সঙ্গী রোয়েমকে হত্যা করালেন।

[ স্তালিন যেমন ট্রটস্কিকে জহ্লাদ দিয়ে খুন করিয়েছিলেন ] কয়েক শত ( কোন কোন হিসাবে প্রায় ১,০০০) S A.-র নেতাকে হত্যা করা হল বিদ্রোহ বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অজুহাতে। ভন স্লেইচার ও তাঁর স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করা হল। হিটলার দলের মধ্যে বিরোধীগোষ্ঠীকে নির্মূল করে নিজের পথ নিষ্কণ্টক করলেন। [ স্তালিনও রাশিয়াতে লেনিনের লোকান্তরের পর পূর্ণ ক্ষমতা হাতে পেয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করিয়ে নিজের একনায়কত্বকে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ ও বাধামুক্ত করেছিলেন। তিনিও রক্তাক্ত 'পার্জের' পথ নিয়েছিলেন। সকল একনায়কতন্ত্রীরাই এই পথ নিয়ে থাকেন। মাও-সে-তুঙ-ও একই পথ নিয়েছিলেন। বিভিন্ন ডিক্টেটার ও একনায়কতন্ত্রী সমগ্রতান্ত্রিক দল বিভিন্ন তত্ত্বের মোড়কে মুড়ে নিজেদের কাজের সাফাই গেয়ে থাকেন এই যা। ]

হিটলার ও তাঁর নাৎসী দল ( National Socialist Party ) মার্কসবাদী ভাবাপন্ন দল ও গোষ্ঠীর মত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুঁজিবাদ-বিরোধী মানসিকতাকে ( anti-capitalist longing ) কাজে লাগিয়েছিলেন দক্ষতার সঙ্গে। হিটলার সমস্ত জীবন দারুণতম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন—পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ও বিদ্বেষের মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না। কিন্তু তাই বলে সমাজতন্ত্রের রূপরেখা সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণাও তাঁর ছিল না। তাঁর দলে অনেকে ছিলেন যাঁরা শিল্প-জাতীয়করণের পক্ষে ছিলেন। দলের অন্যতম অর্থনীতি-বিশারদ Gottfried Feder দলের মধ্যে জাতীয়করণ ও সমাজতন্ত্রের কড়া প্রবক্তা ছিলেন। হিটলার কিন্তু তাঁর কথায় বা পরামর্শে কর্ণপাত করেননি। হিটলার দলের মধ্যে নিজের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য সুনিশ্চিত করার পর দলের সভা-সমিতি-বৈঠকে অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা-বিতর্ক বন্ধই করে দিয়েছিলেন। তিনি অর্থমন্ত্রীরূপে মন্ত্রিসভায় রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদ Kurt Schmitt-কে নিয়ে এলেন। এ থেকে এ মনে করারও কোন কারণ নেই যে, হিটলার পুঁজিপতিদের হাতের পুতুল হয়েছিলেন।

নাৎসী দলের যাঁরা ব্যাপক জাতীয়করণের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁদের বক্তব্যের জবাবে তিনি বলেছিলেন :

**"...Let them own land or factories as much as they please. The decisive factor is that the State through the party is supreme over them, regardless whether they are owners or workers......our Socialism goes far deeper......it establishes**

the relationship of the individual to the state, the national community……why need we trouble to Socialise banks and factories? We Socialise human beings". [ Quoted from : A History of Germany : 1815-1945' By William Carr ; P. 379 ] William Carr মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন :

"That was the essence of totalitarian creed ; political considerations were paramount ; the economy would be the servant of the state, and industrialists and landowners would be forced like every one else to do the will of the party whatever it happened to be. [ A History of Germany : 1815-1945 : William Carr ; P. 379 ]

সমগ্রতান্ত্রিক মতবাদের এইটাই মূল কথা। রাজনৈতিক বিবেচনাই সকল তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের মূল নিয়ামক। অর্থনীতি হবে রাষ্ট্রের দাস। শিল্পপতি ও বড় বড় ভূমি-মালিকরা রাষ্ট্রের নির্দেশমত কাজ করতে বাধ্য—শাসকদলের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ কার্যকারী করতে তারা বাধ্য থাকবে।

বেকার সমস্যা সমাধানে হিটলার ও তাঁর দল সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দেশজুড়ে ব্যাপক গৃহ-নির্মাণ, সড়ক-নির্মাণ, জার্মানীর বড় বড় বিখ্যাত মোটর চলাচলের রাস্তা ( Autobahn ) হিটলারের আমলেই নির্মিত হয়। প্রায় দশ লক্ষ লোকের এইভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। 'পরিবার-প্রথাকে ও গৃহস্থালি কর্মে উৎসাহ যোগাবার জন্য বিবাহিত দম্পতিদের বোনাস দেবার ( marriage bonus) ব্যবস্থা করে মেয়েদের গৃহস্থালি কাজে নিযুক্ত রেখে পুরুষদের কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ততর করা হয়। নাৎসী দলের একটা স্লোগান ছিল : Kinder, kirche, kuche [ children, church, kitchen : শিশু, গীর্জা, রান্নাঘর ] কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তি-উদ্যোগে ও মালিকানায় কল-কারখানা স্থাপন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়। নাৎসী দলের সম্প্রসারণ ও আমলাবাহিনী প্রসারতার মাধ্যমেও লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান করা হয়। হিটলার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ শ্যাখ্‌ট্-কে ( Hjalmer Schacht ) অর্থমন্ত্রী করে আনেন। বৈষয়িক উন্নয়নের দিকেই হিটলার বেশী নজর দিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা ( national self-sufficiency or autarky ) দলের নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। আমদানী ( import ) কমিয়ে রপ্তানী বাড়ান হল। একাজ করতে গিয়ে বাইরের বাজার দখল করার উদ্দেশে

খুব কম দামে পণ্যদ্রব্য বিক্রী করার নীতি গৃহীত হল (dumping) [মাওবাদী চীনও এই একই নীতি 'dumping' গ্রহণ করে এশিয়া ও আফ্রিকার বাজার থেকে অন্যদেশগুলিকে হটাতে চেষ্টা করেছে।]

১৯৩৬ সালে হিটলার চার-সালা পরিকল্পনা চালু করেন গোয়েরিংকে যোজনা সংস্থার প্রধান করে। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যই ছিল বেকারী দূর করা। এর পর 'দ্বিতীয় পরিকল্পনা' চালু করা হয়। তার লক্ষ্য ছিল যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে দেশের অর্থনীতিকে গড়ে তোলা এবং বিদেশের কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীলতা দূর করা। চার বছরের মধ্যে যুদ্ধের জন্য দেশকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করার গোপন নির্দেশ হিটলার দিয়েছিলেন। হিটলারের এই লক্ষ্য সাধনের পথে সবচেয়ে বড় কীর্তি হল Salzgitter-এ Hermann Goering Steel Works স্থাপন (prestige project)। খুব নিম্নমানের স্থানীয় খনিজ ধাতুর ব্যাপক ব্যবহার এবং সুইডেন থেকে খনিজ ধাতুর আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা। এতে অর্থমন্ত্রী শ্যাক্‌ট্‌ ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝলেন হিটলারের আসল মতলবটা কোথায়। শ্যাক্‌ট্‌ ১৯৩৭ সালে প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করলেন। অর্থমন্ত্রী হিসাবে শ্যাক্‌ট্‌-এর জায়গায় এলেন ওয়ালথার ফাঙ্ক (Walthar Funk)। এটি ছিল রাজনৈতিক নিয়োগ। অর্থমন্ত্রীর গুরুত্ব এতে অনেক কমে গেল। গোয়েরিং-এর বিভিন্ন বক্তৃতায় জঙ্গীভাব ক্রমেই ফুটে উঠছিল। জার্মানী যে আবার যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে বোঝা যাচ্ছিল। গোয়েরিং পরিষ্কারই ঘোষণা করেছিলেন জার্মানী মাখনের চাইতে বন্দুককেই বেশী গুরুত্ব দেয়। দেশে মাখন সরবরাহের চাইতে বেশী প্রয়োজন বন্দুকের (more guns than butter)। ১৯৩৩ সালে জার্মানীতে যেখানে ৬০,০০,০০০ লোক বেকার ছিল, ১৯৩৫ সালে নাৎসী শাসনে বেকারী সংখ্যা নেমে দাঁড়াল দশ লক্ষতে (১০,০০,০০০)। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরুতে জার্মানীতে কর্মক্ষম লোকের ঘাটতি (labour shortage) দেখা যায় কলে-কারখানায়। নাৎসী মতবাদ সম্বন্ধে তত্ত্বগত ন্যায়সঙ্গত বিপুল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না—দেশের সাধারণ মানুষ এই শাসনব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছিল সোস্যালিস্ট কমিউনিস্ট ও উদারতন্ত্রী গণতন্ত্রীদের নৈতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও। ভয় দেখিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেই শুধু সমর্থন আদায় হয়নি। সাধারণ মানুষের কতগুলি সুবিধা-সুযোগ এই শাসনব্যবস্থা এনে দিয়েছিল। বেতন (real wages) না বাড়লেও জিনিসপত্রের দাম ১৯৩০-৩২ সালের পর্যায়েই ছিল। শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার ছিল না—শিল্প-পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের

কোন বক্তব্যকে মর্যাদা দেওয়া হত না। কিন্তু শ্রমিকদের বাড়ি-ভাড়া স্থিতিশীল রাখা হয়, সবেতন ছুটির ব্যবস্থা হয়। তাদের সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। আরও প্রান্তিক সুযোগ-সুবিধা (fringe benefits) অর্পণ করা হয়। অল্প মূল্যে সিনেমা-থিয়েটার, নরওয়ে, ইতালীতে সরকারী ব্যয়ে ছুটির দিনে স্বল্প-মেয়াদী প্রমোদ-ভ্রমণ, আরোগ্য-নিবাসে সরকারী ব্যয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের চিকিৎসা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা (Convalescent houses, subsidized holidays, sports facilities, saving scheme etc ) করা হয়।

কৃষক সমাজেরও কতগুলি বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। তারা সরকারী নীতিতে খুশীই হয়েছিল। ক্ষেত-খামারের কাজকে বিশেষ মর্যাদা দেয় নাৎসী সরকার। নাৎসী দলের বিদ্বেষপ্রসূত মারাত্মক জাতি-নীতি ( Racial policy ) গ্রামের মানুষের মনে একটা উন্মাদনা এনেছিল। জার্মানীতে উৎপন্ন শস্য কৃষি পণ্য মাংস, মাখন, ডিম প্রভৃতির দাম ১৯৩৩ সালে যা ছিল তার দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে যায়। কৃষক সমাজ এতে যথেষ্ট লাভবান হয়। দেশের বুদ্ধিজীবিরাও নাৎসী দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন—তাঁরা হিটলারের উগ্র সমর্থক হয়ে পড়েন। সমাজবিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদরাও হিটলারের অনুরাগী হয়ে পড়লেন। তাছাড়া ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে একটার পর একটা কূটনৈতিক সাফল্য দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করল যেমন, তেমনি হিটলারেরও মর্যাদা বহুভাবে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করল। [ A History of Germany, 1815—1945 : By Willam Carr ; Chapter 13 ]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকেই সমগ্রতান্ত্রিক একনায়কত্বের কি মারাত্মক রূপ হতে পারে তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। জার্মান জনগণ যুদ্ধের ধাক্কা প্রথমদিকে পায়নি। ১৯৪১ সালের শেষভাগ থেকেই জনগণ এর ভয়াল পরিণতি আঁচ করতে পেরেছিল।

যুদ্ধের গতি যেমন বাড়তে লাগল নাৎসী দলের শক্তিও তত বাড়তে লাগল। ঝটিকাবাহিনীর ক্ষমতা সাংঘাতিকভাবে বৃদ্ধি পেল। দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কাজের ভারও এই ঝটিকাবাহিনী ও গোয়েন্দাবাহিনী ( Gestapo ) ক্রমে ক্রমে নিয়ে নেয়। ঝটিকাবাহিনীর শক্তি ১৯৩৯ সালে যেখানে তিন ডিভিশন ছিল, সেটা ১৯৪৫ সালে পাঁচ ডিভিশনে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে এই ঝটিকাবাহিনীকে সেনাবাহিনীর স্থলাভিষিক্ত করতে হবে এই মতলব ছিল। এই বাহিনীর প্রধান ছিলেন হিমলার ( Himmler )। তাঁর

ক্ষমতাও বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। এই বাহিনীই আবার যুদ্ধবন্দী বা সরকার-বিরোধীদের বন্দী-শিবিরের পরিচালনার ভার পান। ১৯৪৫ সালে এই বাহিনীর অধীনে ৬টি বন্দী-শিবিরে ( concentration camps ) প্রায় ৮ লক্ষ বন্দীদের বন্দী করে রাখা হয়। হিটলারের নির্দেশে এই সব বন্দীদের কল-কারখানায় কাজে লাগিয়ে জার্মানীর কর্মক্ষম শ্রমিকদের সংখ্যাল্পতাজনিত সঙ্কট দূর করে এই বাহিনী। নির্মম শোষণ ও নিপীড়ন সুরু হয়ে গেল। যুদ্ধে কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য সরবরাহের প্রচণ্ড সঙ্কট জার্মানীকে কাবু করে ফেলে। কাঁচামাল সঙ্কট দূর করার জন্য জোর-জবরদস্তি-জুলুম করে অধিকৃত দেশগুলি থেকে জার্মান সেনাবাহিনী মালপত্র কাঁচামাল রসদ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে লাগল। অধিকৃত দেশগুলিতে নির্মম নিপীড়ন শোষণ চলতে থাকে। এই নাৎসী শাসনে নাৎসীরা ইতিহাসের এক কুৎসিত কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করে লক্ষ লক্ষ ইহুদীদের নির্বিচারে হত্যা করে। একটি হিসাব অনুযায়ী ৪০ থেকে ৪৫ লক্ষ ইহুদীকে নিশ্চিহ্ন করা হয়।

[ রাশিয়াতেও স্তালিনের আমলে লক্ষ লক্ষ বিরোধীদের হত্যা করা হয়েছে —নির্বিচারে কৃষকদের হত্যা করা হয়েছে খামার রাষ্ট্রায়ত্তকরণের কর্মসূচী যখন গ্রহণ করা হয়। হিটলারের মত স্তালিনও চরম ইহুদী-বিদ্বেষী ছিলেন। বিপুলসংখ্যক ইহুদীদের তাঁর জহ্লাদরা হত্যা করেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষকে দাস-শিবিরে বন্দী করে তাদের দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। ]

দেশের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কেন্দ্রায়িত হল ( centralised planning )। দেশের উৎপাদন ১৯৪২ সাল থেকে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। মিত্রপক্ষের সকল বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত হদিস করতে পারেননি কি করে বোমাবর্ষণের মধ্যেও এই উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হতে পারে। অস্ত্র উৎপাদনে ১৯৪৪ সালে জার্মানী রেকর্ড স্থাপন করে। বিমান নির্মাণেও রেকর্ড স্থাপন করে জার্মানী ১৯৪৪ সালে। অধিকৃত ইউরোপ থেকে খাদ্যশস্য জোরপূর্বক ছিনিয়ে এনে নিজের দেশের সরবরাহ জীবিকার মান অব্যাহত রাখা হয়েছিল। বিদেশী শ্রমিকদের নির্মমভাবে শোষণ করা হয়েছে। ২০ লক্ষ রুশ যুদ্ধবন্দীদের বাধ্যতামূলকভাবে উৎপাদনের কাজে লাগান হয়েছিল। [ কমিউনিস্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পেছনে তত্ত্বকথা যতই থাকুক না কেন তারও গোটা পরিকল্পনাই চরমভাবে কেন্দ্রায়িত 'centralised and militarized' ]।

১৯৪৩ সাল থেকেই জার্মানীতে নাৎসী শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। কিন্তু গেস্টাপো ও ঝটিকাবাহিনীর ভয়াল ভ্রূকুটীর

সামনে সবই স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রকাশ্য বিদ্রোহের (Coup d' etat) পরিকল্পনাও তৈরী হয়েছিল। কিন্তু এই বিক্ষুব্ধ দল গোষ্ঠী ও ব্যক্তিরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য আদর্শ সম্বন্ধে আদৌ একমত ছিলেন না। কেউ চেয়েছিলেন কেন্দ্রায়িত পরিকল্পিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে দেশ গড়তে। কেউ চেয়েছিলেন পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিতে (Free enterprise)। কেউ চেয়েছিলেন রাজতন্ত্রের প্রবর্তন—তাঁরা ১৯১৪ সালের রাজনৈতিক পরিস্থিতির যুগে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কেউ আবার নাৎসীবাদকে বিচ্যুতি থেকে বাঁচিয়ে সেই মতবাদের ভিত্তিতে দেশকে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছিলেন। বেক (Beck), হালডার (Halder), উইৎসেলবেন (Witzleben), ভাইজেকার (Weizsacker) প্রভৃতিরা হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার মতলবে। লণ্ডনের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগও করেন এঁরা। এমন কি হিটলারকে হত্যা করার চক্রান্তও হয়েছিল।

দেশে ধীরে ধীরে একটা ধারণা জন্মাতে লাগল যুদ্ধে জার্মানী জয়লাভ করতে পারবে না। আর হিটলারও মরণপণ করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন, ফলে দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। তাই কোনক্রমে হিটলার ও তাঁর গোষ্ঠীকে সরাতে পারলে মিত্রপক্ষের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সম্মানজনক সর্তে সন্ধি করা সম্ভব হবে। ষড়যন্ত্র হয়েছিল হিটলারকে হত্যা করে তাঁর জায়গায় একটি বিকল্প অস্থায়ী সরকার স্থাপন করা বেক (Beck) এবং গোয়েরডেলারের (Goerdeler) নেতৃত্বে। আর এই সরকারই শান্তির জন্য চেষ্টা করবে। একটি বোমা ফাটিয়ে এই হত্যার চক্রান্তকে সফল করার চেষ্টাও হয়েছিল। বোমাটি নির্দিষ্ট দিনে ফাটল বটে, তবে হিটলার রেহাই পেলেন। সেনাবাহিনীর মধ্যেও ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। সেটিও ব্যর্থ হয়। বেক আত্মহত্যা করলেন। হাজার হাজার ব্যক্তি কারারুদ্ধ হলেন ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত হয়েছিলেন বলে। হিটলারও 'জনগণের আদালত' (Peoples' Court) বসিয়ে আদালতের রায়ের ভিত্তিতে চক্রান্তকারীদের নিশ্চিহ্ন করলেন। [স্তালিন, মাও-সে-তুঙ এঁরাও 'জনগণের আদালতের'-মাধ্যমে অসংখ্য মানুষকে বিরুদ্ধবাদী বলে যাদেরই সন্দেহ করা হয়েছে খতম করেছেন ('liquidation')], এইভাবে বহু ব্যক্তিকে নাৎসীরা পরবর্তী কয়েকমাসে নিশ্চিহ্ন করে।

কমিউনিস্ট ও নাৎসী বা জার্মান ফ্যাসিস্টদের কৌশলের মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে—তা তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলেই বোঝা যায়। কমিউনিস্টরা যেমন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম সমালোচনা করেন—হিটলার, মুসোলিনিও

তাই করেছিলেন। ব্যক্তিজীবনে হিটলার, মুসোলিনির মত দারিদ্র্য পৃথিবীর কয়জন কমিউনিস্ট নেতা ভোগ করেছেন? হিটলার সমাজের কাছে চাকরি ভিক্ষা চাননি। সবসময় তাঁর অন্তরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলত। দেশের বেইমান বিশ্বাসঘাতকদের চরম আঘাত হেনে তিনি দেশকে গড়তে চেয়েছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি চেয়েছিলেন জার্মান সেনাবাহিনীতে একজন সৈনিক (Corporal) হয়ে দেশের জন্য লড়াই করতে। ক'জন কমিউনিস্ট নেতা তাঁর মত দারিদ্র্য-জর্জর ভবঘুরের জীবন যাপন করেছেন? পুঁজিপতিদের হাতের পুতুল তিনি ছিলেন একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। সাতজন সদস্য নিয়ে গঠিত দল একদিন গোটা জার্মানীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছিল। কি অপরাজেয় সঙ্কল্প—কি অসামান্য আত্মবিশ্বাস—চরিত্রবল ও দেশপ্রেম থাকলে একজন নেতা সাতজন সদস্য-বিশিষ্ট দল নিয়ে শুরু করে গোটা জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা-সম্পন্ন শক্তিশালী দল সৃষ্টি করতে পারেন সেটা বুঝে নিতে হবে—রাজনীতির ছাত্রদের। চালাকি, ফাঁকি বা ধাপ্পা দিয়ে সেটা কখনই করা সম্ভব হয় না।

হিটলারের অতি সাদাসিধে জীবনযাত্রা, তাঁর নির্লোভ নিঃস্বার্থ আচরণ—দেশ ও দলের কাছে তাঁকে বরণীয় করেছিল। আহার, বেশভূষা ছিল অতি সাধারণ। তিনি মদ্যপান করতেন না—নিরামিষাশী ছিলেন। চ্যান্সেলার হিসাবে এ্যাডল্‌ফ হিটলার রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কোন বেতন নিতেন না। বেতনের টাকাটা পুরাই তিনি একটি বিশেষ তহবিলে দান করতেন। সেই তহবিলের অর্থ থেকে সাহায্য করা হত কল-কারখানায় দুর্ঘটনায় বিপন্ন শ্রমিকদের। তাঁর নিজের কোন ব্যক্তিগত সঞ্চয়, সম্পত্তি-ঘরবাড়ি-সংসার কিছুই ছিল না। তিনি ইচ্ছা করলে প্রভূত সম্পদের অধিকারী হতে পারতেন। তাঁর আত্মজীবনী—"আমার সংগ্রাম" (Mein Kampf)—এই ঐতিহাসিক পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ যাবতীয় অর্থ তিনি নিজের জন্য রাখেননি। সবটাই তাঁর দল—নাৎসী পার্টিকে দান করেছিলেন। লেখক জন গানথার লিখেছিলেন, ১৯৩৫ সালের শেষে Mein Kampf প্রায় ১৯,৩০,০০০ কপি বিক্রী হয় এবং এই বইয়ের রয়্যাল্‌টী বাবদ এই সময় কমপক্ষে তাঁর ব্যক্তিগত আয় হতে পারত ১ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড। [Inside Europe; John Gunther; P. 22: "Hitler's total proceeds from this source at the end of 1935 should have been about £ 1,60,000."] একজন রাজনৈতিক নেতার চরিত্রের এইসব গুণগুলি কি খুবই আকর্ষণীয় নয় তাঁর

দেশবাসীর কাছে? পৃথিবীর যে-কোন দেশের যে-কোন রাজনৈতিক দলের নেতার চরিত্রের মধ্যে এইসব গুণগুলি বা তার কয়েকটি প্রতিফলিত হতে দেখতে চাইবে দলের কর্মী ও দেশের সাধারণ মানুষ। হিটলারের সামনে ছিল না কোন সুমহান জাতীয় আদর্শ। তাঁর উৎকট উদ্ভট ধ্বংসাত্মক 'racial theory' আর্য-অনার্য জাতি সংঘর্ষ-তত্ত্ব এবং 'খাঁটি' তথাকথিত 'আর্যজাতির' প্রতীক জার্মান জাতি কর্তৃক বিশ্বশাসন পরিকল্পনা তাঁকে ও জার্মানীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু নিজের দেশকে ও জাতিকে গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর নিশ্ছিদ্র আন্তরিকতাকে কেউই অস্বীকার করতে পারেন না।

পুঁজিবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে কঠোর ও তিক্ত মন্তব্য বর্ষণকে যদি পুঁজিবাদ বিরোধিতার ও প্রগতিশীলতার চরম মাপকাঠি বলে ধরা হয় তাহলে হিটলার মাও-সে-তুঙ-এর বা ফিডেল ক্যাস্ট্রোর পেছনে থাকবেন না। রুজভেল্ট প্রশাসনের বিরুদ্ধে তিনি বহু চোখা-চোখা সমালোচনা করেছিলেন। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর সঙ্গে নিজের জীবনের তুলনা করতে গিয়ে বলেছিলেন:

"Roosevelt was rich, I was poor, Roosevelt did business in the world war, I bled Roosevelt speculated and made millions, I lay in a hospital ; Roosevelt relied on the power of a capitalist party, I led a popular movement" [ The Swaztika And The Eagle ;· James V. Compton : Houghton MIFFLIN Company, Boston ]

অর্থাৎ: রুজভেল্ট ছিলেন ধনী—আর আমি ছিলাম দরিদ্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রুজভেল্ট যখন ব্যবসা করেছিলেন—আমি তখন যুদ্ধরত একজন সৈনিক,—যুদ্ধক্ষেত্রে আমার তখন রক্ত ঝরছে। রুজভেল্ট সে সময় ফাটকাবাজি করে লক্ষ লক্ষ ডলার রোজগার করেছেন। আর আমি? আমি তখন হাসপাতালে আহত সৈনিক হয়ে দিন গুনছি। রুজভেল্ট একটি পুঁজিবাদী দলের শক্তির ওপর নির্ভর করেছিলেন, আর আমি একটি গণ-আন্দোলন পরিচালিত করেছি—তাকে নেতৃত্ব দিয়েছি।

হিটলারের এই কথাগুলোর মধ্যে মিথ্যার ছোঁয়াও ছিল না। সাধারণ দেশবাসীর কাছে—দেশের যুব সমাজের কাছে এই সহজ সাদামাঠা ভাষায় তাঁর জীবনের এই অন্তরঙ্গ বিবরণ শোনালে দেশবাসী তথা যুব সমাজ অভিভূত না হয়ে পারে? তিনি তাঁর রাজনৈতিক হঠকারিতার ও ভুলের চরম মাশুল

তো জীবনে দিয়েছেনই। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে নেতৃত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে—দেশবাসীর মনে জলন্ত বিশ্বাস উৎপাদনের ব্যাপারে হিটলারের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখকষ্ট-বরণ নিঃস্বার্থপরতা ও ত্যাগের কাহিনী যে সাহায্য করেছিল তাতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। ইঙ্গ-মার্কিন-গোষ্ঠীর ভাতা ও অনুগ্রহপুষ্ট বুদ্ধিজীবিরা—কমিউনিস্ট ও মার্কসিস্টরা কুৎসা-নিন্দার দুন্দুভি বাজিয়ে জার্মান-জনগণের জীবনের বঞ্চনা শোষণ-অপমানের প্রতিকারে জার্মানীর বামপন্থীদল কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট, সোস্যাল ডেমোক্রাট, উদারতন্ত্রী, গণতন্ত্রীদের ক্ষমাহীন ব্যর্থতা ও ক্লেদাক্ত রাজনীতির সমালোচনার মুখ বন্ধ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরই সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না'—এই অসহনীয় ব্রিটিশ ঔদ্ধত্য—'ব্রিটেন সাত সমুদ্রের কর্ত্রী'—এই অহংকারকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন হিটলার ও তাঁর তৃতীয় রাইখ্। হিটলার ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের দম্ভও চূর্ণ করে দিয়েছিলেন। জার্মানীর সীমান্ত সম্প্রসারণের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত 'তৃতীয় রাইখের' চিতাশয্যা রচনা করল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী হিটলারের কয়েকটি বক্তব্য উদ্ধৃত করে শেষ করা যাক:

"A monied clique rules the country under the fiction of democracy . a mass of corruption and legal venality."

"He incites wars, falsifies the causes, odiously wraps himself in the cloak of Christian hypocrisy, and slowly but surely leads mankind to war . Roosevelt's policy is one of world domination and dictatorship." (Hitler). রুজভেল্টকে হিটলার বলেছেন—"Old Cheat" বুড়ো প্রতারক—"he is without doubt the chief gangster in the whole coterie which opposes us"; "Greatest war criminal of all time."

আমেরিকা সম্বন্ধে তিনি এক মন্তব্যে বলেন:

"A decayed country, with problem of race and inequality, of no ideas···My feelings against America are those of hatred and repugnance···with everything built on the dollar". (1942). জার্মান-মার্কিন সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন: "Whose friendship? The friendship of the

Jewish robbers and money bags or that of the American people ?"...

"What is America, but millionaries, beauty queens, stupid records and Hollywood ?"—মার্কিন সরকার সম্বন্ধে একটি মন্তব্যে তিনি বলেন—"the last disgusting death rattle of a corrupt and outworn system which is a blot on the history of this people"; "a Jews rubbish heap". মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মৃত্যুর পর হিটলার একটি মন্তব্যে বলেছিলেন—এ এক ঈশ্বরের আশীর্বাদ। "...Now that fate has removed from the earth the greatest war criminal of all time .." (April 1945). [ See Swaztika And Eagle. ]

এই ধরনের আরও অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। হিটলার যখন পুঁজিবাদী দুনিয়া ও তার মুখ্য নায়কের বিরুদ্ধে চোখা চোখা গালি বর্ষণ করেন তখন সেগুলোকে মৌখিক মূল্যে গ্রহণ করা হয় না, অথচ মাও-সে-তুঙ ও তাঁর দলের নেতারা যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ আক্রমণ করেন তখন সেইসব সমালোচনাত্মক মন্তব্যগুলিকে বিপ্লবী প্রগতিশীলতার উজ্জ্বল প্রতীক বলে ধরে নেবার প্রবণতা দেখা যায়। অথচ সেই কমিউনিস্ট চীনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন-প্রশাসনের সঙ্গে গোটা দুনিয়াকে বোকা বানিয়ে দিয়ে সবচেয়ে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে দ্বিধা করেনি। চীন ও রাশিয়ার আজ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন-প্রশাসন। [ ১৯৭৩ সালে চীনদেশে মে দিবসের অনুষ্ঠানে বিপ্লবীয়ানার কোন ছোঁয়াচও ছিল না। ছিল না কোন নেতার বা চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙ-এর বৈপ্লবিক উদ্গিরণ, আন্তর্জাতিক শ্রেণী সংগ্রামের মাহাত্ম্য কীর্তন বা বিশ্ববিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুতির আহ্বান। 'পিকিং ডেইলী' পত্রিকায় কোন বিপ্লবী সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়নি এবছর। পথে-ঘাটে নাচগান হাল্কা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়। আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হয়েছে বিশ্ববিপ্লববাদী কমিউনিস্ট চীনের যে! মে দিবসে (১৯৭৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিত্রতারকা শার্লি ম্যাক লেইন (Shirley Mac Laine) চীনের প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লে-র পত্নী মাদাম টেঙ ইঙ চাও (Madam Teng Ying Chao)-এর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে পিকিং-এর রাজপথে ঘুরেছেন। [ See News Week—May 14, 1973. ]

[ ওয়াটারগেট আড়িপাতার কেলেঙ্কারী গণতান্ত্রিক দুনিয়াকে স্তম্ভিত করেছে যখন—তখন পিকিং ও মস্কো নিক্সন সাহেবকে বেকায়দায় পড়তে দেখে খুবই

বিব্রত। আশ্চর্যের বিষয়, এই চাঞ্চল্যকর কেলেঙ্কারীর কাহিনী কিন্তু কমিউনিস্ট চীন ও রাশিয়ার পত্র-পত্রিকায় চেপে যাওয়া হচ্ছে।]

পাশ্চাত্য দেশে তুনিয়ার উদারতন্ত্রী গণতন্ত্রী ও তথাকথিত প্রগতিবাদীরা তাঁদের নিজ নিজ জাতি-রাষ্ট্রের স্বার্থ ও সুবিধা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন নিরীখে ইতিহাসের ঘটনা ও তথ্যের বিচার করেন। ভারতে তাঁদেরই কিছু তল্পী-বাহকরা সেই বিদেশী বাঁশীওয়ালাদের সুরের তালে তালেই নেচে থাকেন। যেমন হিটলারের ইহুদী নিপীড়ন ও ব্যাপক গণহত্যাকাণ্ডের ঘটনা ধরা যাক। এই কুৎসিততম অপরাধের বিরুদ্ধে পশ্চিমী তুনিয়া কঠোর রায় দিলেন। যুদ্ধাপরাধীরূপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে ধৃত নাৎসী নেতাদের বিচার হল—বিশ্বের ধিক্কার বর্ষিত হল। কিন্তু একই নিরীখে কি স্তালিনের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে? হিটলারের নাৎসী দল ও প্রশাসন যত রক্ত ঝরিয়েছে জার্মানীতে—স্তালিন ও তাঁর প্রশাসন তার চাইতে বেশী রক্ত ঝরিয়েছে রাশিয়াতে। কই, সে-সব কাহিনী চাপা পড়ে গেল কেন? ইঙ্গ-রুশ; মার্কিন-রুশ সমঝোতার তাগিদে? হিটলার গণতন্ত্রকে খতম করেছেন সত্য, স্তালিন কি গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেননি? লেনিন কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত গণপরিষদ ভেঙে দেননি, যখনই তিনি দেখলেন ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে তাঁর সমর্থকদের সংখ্যা কম? লেনিন কি ক্রন্দস্তাদ-এর ১৬ হাজার নৌ-বিদ্রোহীদের—যারা বিপ্লবের সমর্থক ছিল—নির্মমভাবে দমন করেননি? হাজার হাজার মুক্তি সৌভ্রাতৃত্ব ও গণতন্ত্রকামী বিদ্রোহী সৈনিকদের দেহ কি লাল ফৌজের আক্রমণের মুখে সেদিন লুটিয়ে পড়েনি? ট্রট্স্কী ও সেনাপতি টুকাচভস্কী কি সেই নির্মম আক্রমণাত্মক অভিযানের নেতৃত্ব দেননি? মহামতি লেনিনের সে-সব কাহিনী কেন ঢাকা পড়ে থাকবে কালো পিচ্ছিল কূটনীতির আবরণে?

হিটলার ইহুদী হত্যার ঘৃণ্য নায়ক ছিলেন। স্তালিনও কম যাননি। আবার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে নির্বিচারে হত্যা করল (১৯৭১) পাকিস্তানের খান-সেনাবাহিনী। সে এক ইতিহাসের কুৎসিততম লোমহর্ষক কাহিনী। কই, নিক্সন-প্রশাসন—চীনের কমিউনিস্ট প্রশাসন তো তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হল না? গণতান্ত্রিক ইউরোপ কেনই বা ধিক্কার না জানিয়ে নীরব রইল? এই বাংলাদেশের নরমেধ যজ্ঞ 'পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার' বলে বিবেচিত হল নিক্সন ও মাও-সে-তুঙ-এর কাছে। পাকিস্তান প্রত্যক্ষ সাহায্য পেল চীন ও আমেরিকার কাছ থেকে। কই, তাহলে বিচারের মানদণ্ড

সমান নয় কেন? কেন আন্তর্জাতিক আদালতে পাকিস্তান ধিকৃত হয় না? বিপন্ন মানবতার পাশে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত দাঁড়াবার জন্য কেন বিশ্বের অকুণ্ঠ বাহবা পায় না? ইতিহাস কি তাহলে বিজয়ীদেরই ( victors ) জয়ধ্বনি দিয়ে যায়? বিজয়ীদের চূড়ান্ত সাফল্যই কি তাদের শেষ বিচারের মাপকাঠি? ইতিহাস-লেখক, রাজনীতির ছাত্র কি তবে বিজয়ীদের স্তাবক মাত্র? তাঁরা কি শুধু সফলকামীদেরই ভেরীবাদক? ন্যায়-নীতি-আদর্শ—প্রমূল্য বা মূল্যবোধ কি ইতিহাস-লেখক, অনুসন্ধিৎসু রাজনীতির ছাত্রদের বিশ্লেষণ থেকে চিরনির্বাসিত হয়ে থাকবে?

## ৯

## ইতালীর বামপন্থী রাজনীতির স্বরূপ ও ফ্যাসীবাদের অভ্যুত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মুখে মার্কসীয় আদর্শে বিশ্বাসী ইতালীর সোশ্যালিস্ট পার্টি যুদ্ধে যোগদানের বিরুদ্ধে ছিল। ইতালীর প্রজাতন্ত্রী ও র‍্যাডিক্যাল-পন্থীরা 'মিত্রপক্ষে' যোগ দিয়ে যুদ্ধে অংশ নেবার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু সোশ্যালিস্ট দলের নেতারা যুদ্ধে যোগদানের বিপক্ষে ছিলেন। Turati Treves, Lazzari, Mussolini সবাই নিরপেক্ষ থাকার পক্ষে ছিলেন। এদিকে জার্মানীর সোশ্যালিস্ট পার্টি খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল যুদ্ধে সরকার পক্ষকে সমর্থন করার। এই ঘটনা আবার প্রথম পর্যায়ে ইতালীর সোশ্যালিস্ট পার্টির ঐক্য দৃঢ়তর করল। নেতারা এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন যে, যখন জার্মান সোশ্যালিস্টরা আন্তর্জাতিকতার আদর্শ বিসর্জন দিয়ে জাতীয়তাবাদের স্রোতে গা ভাসিয়েছেন তখন তাঁরাই আন্তর্জাতিকতার পতাকা তুলে ধরেছেন। মুসোলিনি কিন্তু এই ভাবধারা বেশীদিন আঁকড়িয়ে থাকতে পারেননি। তিনি সোশ্যালিস্ট পত্রিকা Avanti-তে অক্টোবর মাসের এক সংখ্যায় লিখলেন যে, সমাজতন্ত্রীরা 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' কখনই বরদাস্ত করে না, কিন্তু যুদ্ধ চিরতরে শেষ করার জন্য যে-যুদ্ধ ( War to end war ) সেটা একটা অন্য জিনিস। এই ধরনের যুদ্ধে সামিল হবার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া যুদ্ধ-শেষে যারা যুদ্ধ সুরু করার জন্য ইতালীতে দায়ী তাদেরও উৎখাত করা যাবে যদি সোশ্যালিস্টরা যুদ্ধে যোগ দেন। ইতালীর সিণ্ডিক্যালিস্টরা এই ধরনের বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁরা বলতেন যুদ্ধে যোগ দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী অস্ত্র-শিক্ষা পাবে—হাতে তাদের যে অস্ত্র-শস্ত্র আসবে যুদ্ধ-শেষে বা প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সেগুলো বিপ্লবের কাজে ব্যবহার করা যাবে। যুদ্ধে অংশগ্রহণ বিপ্লবীদের একটা বড় সুযোগ দেবে। কিন্তু মুসোলিনির এই বক্তব্যে সোশ্যালিস্ট পার্টি বিক্ষুব্ধ হল—তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হল—দলের জরুরী সভা ডেকে, তাঁকে সোশ্যালিস্ট পত্রিকা 'আভান্তি'র সম্পাদকীয় পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। মুসোলিনি নিজেই মিলান শহরে 'People of Italy' ( Popolo d'

Italia) বা 'ইতালীর জনগণ' এই শিরোনামায় দৈনিক পত্রিকা চালু করলেন। তাঁর নতুন দৈনিকের প্রথম সংখ্যাতেই সোস্যালিস্টদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন :

"It is not against the proletariat that I shall fight. The proletariat knows......that I have spent myself in an indomitable impulse to action, without caring for danger or counting any fatigue. But you, Sirs, you who are the leaders of the party......you shall pass through the toils .....I am here to spoil your game. The case of Mussolini is not finished as you think. It is beginning now, it is growing larger all the time."

অর্থাৎ "আমার লড়াই প্রলিটারিয়েট শ্রেণীর বিরুদ্ধে নয়—কেননা শ্রমিকরা জানে আমি তাদের জন্যই লড়াই করেছি—কোন বিপদকেই কখনও গ্রাহ্য করিনি—অক্লান্তভাবে প্রলিটারিয়েট শ্রেণীর জন্য আমি কাজ করে এসেছি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক নেতারা সাবধান হোন—তাঁদের মতলব আমি ব্যর্থ করবই করব। যাঁরা মনে করেছিলেন আমাকে দল থেকে বহিষ্কার করে দিয়ে আমাকে শেষ করবেন—তাঁরা ভুল করেছেন। আমি শেষ হইনি। আমার রাজনীতির সবে সুরু। আমার শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।"

মুসোলিনি তাঁর সঙ্গে কিছু চরমপন্থী বামপন্থীদের নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। চরম দক্ষিণপন্থী ও চরম বামপন্থীদের মধ্যে এখানে একটা জায়গায় বড় মিল ছিল—"......the common ground being the irresponsible impulse to domination, action, self-assertion, noise and violence, and the revulsion from agreement, debate, compromise, procedure, and tactics". [ The Italian Left ; P. 79 ]

মুসোলিনি এই গোষ্ঠীকে নিয়ে জঙ্গীদল তৈরী করলেন। এই গোষ্ঠী সভা-সমিতি-আন্দোলনের মাধ্যমে যুদ্ধে যোগদানের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করতে লাগলেন। তখনও তাঁরা নিজেদের সোস্যালিস্ট বলে পরিচয় দিচ্ছিলেন। যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় তাঁদের দলের শক্তি ও প্রভাব বাড়ল। যুদ্ধ-শেষে তাঁরা নিজেদের 'ফ্যাসিস্ট' বলে জাহির করলেন। দলের নাম ও কর্মসূচী পালটিয়ে গেল।

১৯১৫ সালের ২৪শে মে ইতালী যুদ্ধে যোগদান করল ( Treaty of London )। সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা Lazzari এক জরুরী বিজ্ঞপ্তি দলের সকল ইউনিট ও সেলের কাছে পাঠালেন, তাতে যুদ্ধে দলের মনোভাব ব্যক্ত করা হল এইভাবে: 'No collaboration, no sabotage'— 'যুদ্ধে কোনরকম সহযোগিতাও নয় আবার অন্তর্ঘাতমূলক যুদ্ধবিরোধী কোন কাজও নয়'। কিন্তু যুদ্ধ যেমন গড়িয়ে চলল সোস্যালিস্ট পার্টির বেশির ভাগ সভ্যই যুদ্ধে সহযোগিতা করার নীতি গ্রহণ করল। বাস্তব পরিস্থিতির চাপেই তা করতে হয়েছিল। একমাত্র এই দলের চরম বামপন্থীরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছিলেন। ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল। ইতালী জার্মানীর সঙ্গেও যুদ্ধ ঘোষণা করল। এতদিন পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষ সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লব আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা Caporetto-তে ইতালীর বিপুল সেনাবাহিনীর চরমতম বিপর্যয়। গোটা বাহিনী নিশ্চিহ্ন হবার মুখোমুখি হয়েছিল। হাজার হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাচ্ছিল। গোটা সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা প্রচণ্ড হতাশা এসে গেল। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের পুনর্গঠন করেও এই বিপর্যয়ের শোচনীয় পরিণতি তার প্রভাব ছড়িয়েছিল পূর্ণমাত্রায়। এর মধ্যে দিয়ে সাধারণের মনে যুদ্ধ সম্বন্ধে চরম বীতরাগ জন্ম নিল;—আর এই মানসিকতা ইতালীতে ১৯১৯-২০ সালের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনা করেছিল। যুদ্ধে ইতালী পরাজয়ের সম্মুখীন হল। নতুন সরকার Signo Orlando ও Signor Nitti নতুন রণপতি জেনারেল ডিয়াজের নেতৃত্বে Caporetto-র পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য নতুন যুদ্ধকালীন কর্মসূচী নিল। তখন সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা টুরাতি ( Turati ) দেশের চরম বিপদের কথা ভেবে পার্লামেন্টে যুদ্ধে সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার কথা ঘোষণা করলেন। নিজের দেশকে 'Fatherland' বলে ঘোষণা করলেন। সুতরাং সোস্যালিস্টদের কল্পিত আন্তর্জাতিকতার ট্রাডিশন থেকে তিনি সরে এলেন।

এই ঘটনার পটভূমি বুঝতে হলে রাশিয়ার ঐ সময়ে 'অক্টোবর বিপ্লবের' কথাও উপলব্ধি করতে হবে। সোস্যালিস্ট পার্টির অতি-বাম অংশটির মনোভাব ছিল কিন্তু অন্য। এঁদের নেতা Romagnole Nicole Bombacci এবং Lazzari-র মনে রাশিয়ার 'অক্টোবর বিপ্লব' এই ধারণা সৃষ্টি করল যে, ইতালীতেও বিপ্লবের

লগ্ন সমুপস্থিত। Caporetto বিপর্যয়ে তাঁরা উৎসাহিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, ইতালীর সৈন্তরা অস্ত্র নিয়ে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে আসবে। তারা বিপ্লবী সোভিয়েট স্থাপন করবে এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবে। কিন্তু এই বামপন্থী সমাজতন্ত্রীরা কি জানতেন না যে, সেদিন ইতালীর সৈন্যদের মধ্যে কোন বিপ্লবী ভাবধারার বীজ বপন করাই হয়নি? Caporetto-বিপর্যয় ইতালীর গোটা সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন ঘৃণা, বিদ্বেষ বা বিক্ষোভ জাগায়নি। দীর্ঘদিন ধরে একস্থানে আবদ্ধ যুদ্ধের একঘেয়েমি, অর্থহীন শৃঙ্খলার নামে সামরিক কর্তৃপক্ষের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে গিয়েছিল সেদিন সাধারণ সৈনিকরা। রাশিয়া ও ইতালীর পরিস্থিতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল সেদিন। তাছাড়া অরল্যাণ্ডো-নিট্টির মন্ত্রিসভা রাশিয়ার কেরেনস্কি-সরকারের ভূমিকাও নেয়নি। যাই হোক, এই দুই বামপন্থী উগ্র সোস্যালিস্ট নেতা গ্রেপ্তার হলেন। যুদ্ধে ইতালীর শক্তিশালী সোস্যালিস্ট পার্টি ভেঙে খান্ খান্ হয়ে পড়ল। যুদ্ধের পর বিবদমান দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল পার্টি। দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট পার্টিতে ছিলেন টুরাতি, ট্রীভ্‌স্ ইত্যাদি। এঁরা দেশাত্মবোধক বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রকল্পের কথা ঘোষণা করছিলেন। আর বামপন্থী সোস্যালিস্টরা জেলে থেকেও সৈন্যবাহিনীকে উস্কানি দিচ্ছিলেন—জাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে রাইফেল ব্যবহার না করে সামরিক অফিসার ও সরকারের বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করার জন্য।

যুদ্ধের শেষে লণ্ডনের সন্ধিসর্ত (Treaty of London) কেন্দ্র করে ইতালীর রাজনীতি নূতন মোড় নিল। একদল এই চুক্তির ফলে যুদ্ধে বিজয়ী ইতালীর প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাখ্যান করার দাবী তুললেন—এঁদের বলা হত 'Renouncers'। অপর দল শাইলকের মত প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে আদায় করতে বদ্ধপরিকর। সরকারের মধ্যেও দুটো পরস্পর-বিরোধী মতই ছিল। প্রধানমন্ত্রী অরল্যাণ্ডো চুক্তির সর্ত যাতে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় সেটাই চেয়েছিলেন। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসনের ১৪-দফা প্রস্তাব Renouncers-দের পালে নতুন হাওয়া সঞ্চার করল। বলকানের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ইতালীর শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন এই রিনাউন্সাররা। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে অরল্যাণ্ডো তাঁর দাবী আদায় করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু উইলসন, লয়েড জর্জ, ক্লেমেসোঁ এই দাবী নাকচ করে দিলেন। মুসোলিনি এই Renouncer-দের দলে ছিলেন এবং

'লণ্ডনের চুক্তি—যার ভিত্তিতে ইতালী মিত্রপক্ষের হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল—নাকচ হওয়াতে তিনি খুশিই হলেন। আবার দেশের আর এক দল অরল্যাণ্ডোর নেতৃত্বে আস্থা হারালেন চুক্তির সর্ত অনুযায়ী ইতালীর প্রাপ্য আদায়ে ব্যর্থ হওয়াতে। তাঁরা বলতে লাগলেন ব্রিটেন ও ফ্রান্স আফ্রিকার জার্মানীর উপনিবেশগুলি গ্রাস করে নিল যুদ্ধে জয়ী হয়ে, আর ইতালীর বেলাতেই যত নীতির কারসাজি! অরল্যাণ্ডো মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বাঁধছিল দ্রুত। দেশের অর্থনীতিও সঙ্কটের আবর্তে পড়েছিল।

দেশে এই সময় দুটি বড় রাজনৈতিক দল ছিল: (১) সোস্যালিস্ট পার্টি, (২) পপুলার পার্টি। পপুলার পার্টির তখন সবে জন্ম হয়েছে। অনেকে আশা করেছিলেন এই দুই দলের সহযোগিতায় নতুন যুদ্ধোত্তর ইতালীর জাতীয় সরকার গঠিত হলে দেশের কল্যাণ সাধিত হবে। কিন্তু সে আশা বাস্তব রূপ পায়নি। সোস্যালিস্ট পার্টির ডান-বামের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বই এর জন্য মূলত দায়ী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে হ্যাপসবুর্গ ও হোহেনজোলার্ন রাজতন্ত্রের পতন, সফল বলশেভিক রুশ-বিপ্লব, হাঙ্গেরীতে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব স্থাপন, ব্যাভেরিয়ায় সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনা ইতালীর বামপন্থী চিন্তাধারাতে প্রচণ্ড প্রভাব ছড়ায়। প্রায় ১,৫০,০০০ ইতালীয় সৈন্য সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে মামলা ঝুলছিল সামরিক আদালতে। সোস্যালিস্টরা ভাবলেন এরাই বিপ্লবের পুরোভাগে আসবে। বিপ্লবের সময় এসে গেছে। এই ধারণাটি ছিল সম্পূর্ণ ভুল। সোস্যালিস্টদের লক্ষ্য 'ডিক্টেটারশিপ অব দি প্রলিটেরিয়েট' স্থাপন করা।

এর আগে সোস্যালিস্টরা গণপরিষদ গঠন ( Constituent Assembly ) প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান, রাজনৈতিক গুপ্ত-পুলিশের বিলোপ, গণভোট প্রভৃতির দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু পার্টির পরিষদীয় গোষ্ঠী ভোটে এই সব প্রস্তাবও নাকচ করে দেন। রাশিয়ার শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের সোভিয়েট স্থাপনে বেশী আস্থাবান ছিলেন। গোটা ১৯১৯ সালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে সোস্যালিস্টরা আত্মকলহে ও আন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। এদিকে দেশে দারুণ মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটেছিল। ঘন ঘন ধর্মঘট হচ্ছিল যুদ্ধের পরই। সৈন্যরা ছোট ছোট দলে বিদ্রোহ করছিল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বন্ধ করার মানসে খাদ্যদ্রব্য জোর করে কেড়ে নিয়ে অল্প দামে বণ্টনের জন্য ব্যাঙের ছাতার মত সোভিয়েট গজিয়ে উঠছিল। সোস্যালিস্ট পার্টির সরকারী

পত্রিকা আভান্তি ( Avanti )-তে এই ধরনের কর্মসূচীর বিরোধিতা করা হয়। এতে বলা হয় এই ধরনের কর্মসূচী সঙ্কটকে বাড়াতেই সাহায্য করবে, জনগণের দুর্গতি তাতে বাড়বে। একদিকে বাজারে ঘাটতি দেখা দেবে খাদ্যদ্রব্যের—অন্যদিকে মজুতদারী বাড়বে। গরীব ও অল্প আয়ের লোকেরাই তার শিকার হবে। দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ক্যাথলিকদের রাজনৈতিক প্রভাব খুব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মুসোলিনি ঘটনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করছিলেন।

এদিকে ১৯১৯ সালের নভেম্বরে দেশে সাধারণ নির্বাচনের দিন স্থির হয়ে আছে। সোস্যালিস্টরা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ( Proportional representation ) দাবী করেছিলেন। অক্টোবর মাসে দলের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হল—প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হবে এই কংগ্রেসে। রুশ-বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতি এই সম্মেলনের কার্যবিধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই সম্মেলনে বামপন্থীরা নির্বাচন বয়কট করার প্রস্তাব রাখেন। দক্ষিণপন্থীরা পার্লামেণ্টারী প্রথায় সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনার আস্থা জ্ঞাপন করেন। এই দুই শক্তির মাঝামাঝি যাঁরা ছিলেন তাঁরা যে প্রস্তাব দেন সেটাই বেশী ভোটে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব মামুলী মার্কসীয় শাস্ত্রের মোক্ষম মোক্ষম শানান শব্দে পূর্ণ ছিল, যেমন : 'বৈপ্লবিক হিংসার প্রয়োজনীয়তা', 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব', 'হিংসাত্মক পদ্ধতিতে বলপূর্বক ক্ষমতা দখল', বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পুলিশ, সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে উন্নয়নমূলক বা শোষিত শ্রেণীর কল্যাণকর কোন প্রকল্প কার্যকরী করার অবাস্তবতা ইত্যাদি। এত তত্বকথা বলেই মধ্যপন্থীদের প্রস্তাবে নির্বাচনে অংশ নেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

এই সম্মেলনে 'তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের' সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ও তারই নীতি অনুসরণের প্রস্তাবও গৃহীত হয়। নির্বাচনে অংশ গ্রহণের প্রশ্নে 'বিপ্লববাদী' ও 'সংস্কারবাদী'দের মধ্যে একটা নতুন আপোষ হয়ে গেল। 'কাস্তে হাতুড়ী'-এই প্রতীক চিহ্ন নিয়ে প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নিল—১৫৬ জন প্রার্থী নির্বাচনে জয়ী হয়। পপুলার পার্টির ১০০ জন জয়ী হয়। বাকী ২৫২টি আসন আটটি উপদলের মধ্যে ভাগাভাগি হয়।

দেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে পড়ছিল। ধর্মঘটের হিড়িক পড়েছিল—ধর্মঘটের কেউ আর বিরোধিতা করত না। ডাক দিলেই সফল হত। প্রশাসন ব্যবস্থায় অরাজকতার লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। সরকারী কর্মচারীরাও ধর্মঘটে অংশ নিচ্ছিলেন। রেল ও ডাক-কর্মীদের ধর্মঘট

বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সমাজতন্ত্রীরা—বামেরা বিশেষ করে ভাবছিলেন এই-ভাবেই বিপ্লব এসে যাবে। এই সময় দেশের শিল্পপতিদের এক সম্মেলনে শক্তিশালী সরকার গঠনের ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে দক্ষতা ও শৃঙ্খলাভিত্তিক করার দাবী উঠল। তাঁরা দাবী করলেন শক্ত হাতে অবস্থার মোকাবিলা করা দরকার।

লণ্ডন চুক্তির (Treaty of London) সর্ত অনুযায়ী ইতালী তার প্রাপ্য পাওনা আদায় করতে না পেরে দেশে ফিরে এসে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে—শেষপর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। এরপর সিনর নিট্টি (Signor Nitti) প্রধানমন্ত্রী হলেন। তিনিও দেশের অস্থির পরিস্থিতির চাপে হু'বার মন্ত্রিসভা ভেঙে তৃতীয় বারের মত মন্ত্রিসভা গঠন করলেন, দক্ষিণপন্থীদের সমর্থন সুনিশ্চিত করার আশায় তিনি রুটীর দামের ক্ষেত্রে যে সরকারী ভরতুকি দেওয়া হচ্ছিল—সেটা কমিয়ে দিলেন অর্ডিন্যান্স জারী করে। পার্লামেণ্টকে এড়িয়েই এই কাজ করতে হল তাঁকে। ফলে সোস্যালিস্টরা নানারকম আন্দোলন স্বরু করলেন। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন কর্মীরা কাজে 'ধীরে চলো' (go slow) নীতি চালু করে দিল। চাপে পড়ে নিট্টি তাঁর তৃতীয় মন্ত্রিসভাও ভেঙে দিলেন। তাঁর আমলে দেশের দুরবস্থা আরও বেড়ে গিয়েছিল। তিনি ধনীদের ওপর বেশী করের বোঝা চাপাতে রাজী হননি। যুদ্ধে বিপুল লাভ তারা করেছিল। তাদের সেই বাড়তি মুনাফার ওপরও কোন বাড়তি কর বসান হয়নি।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস নাগাদ সোস্তালিস্ট পার্টির হাঁক-ডাক খুব জোর। এই দলেরই শক্তি ছিল সবচেয়ে বেশী। শ্রমিকরা কলকারখানা দখলের কর্মসূচীকে নিজেরাই রূপ দেবার জন্য এগিয়ে এল—নেতারা ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। ধাতব শিল্প-শ্রমিকরা (metal industries) প্রথম হাত লাগাল। তারা মনে করল কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার গঠনমূলক আন্দোলন বুঝি এইভাবেই দেশে স্বরু হল। ইতালীর কমিউনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠাতা Antonio Gramsci-এর চিন্তাধারা ছিল গঠনমূলক—Bombacci-এর মত ধ্বংসাত্মক নয়। টুরিননগরীর ফিয়েট মোটর গাড়ি তৈরীর কারখানায় এই আন্দোলন বেশ জোরদার হল। এই কারখানার শ্রমিকদের বেতনহার ছিল অপেক্ষাকৃত অনেক উন্নত। সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান্তরালভাবে চলছিল এই আন্দোলন (state within the state)। প্রশ্ন দাঁড়াল—এই আন্দোলন কতদূর এগুতে পারবে? কত ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

হবে এই কারখানা দখলের লড়াইকে? শুধুমাত্র ধাতব শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থেকে এই আন্দোলন বাঁচতে পারে না। কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থা General Confederation of Labour—এই প্রতিষ্ঠানের সামনে তিনটি বিকল্প ছিল সেদিন: (১) ধাতব শিল্পের মধ্যেই এই আন্দোলনকে আপাতত সীমাবদ্ধ রেখে তাকে আরও সুসংহত করা, (২) গোটা দেশেই এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়া, (৩) এই আন্দোলনকে একটি 'বিপ্লবে' রূপান্তরিত করা।

সোস্যালিস্ট পার্টি শ্রমিক সংস্থার হাত থেকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব নিতে চাইল। পার্লামেন্টের অধিবেশন সুরু করার দাবী জানান হল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী Giolitti-এই সময় অধিবেশন ডাকতে রাজী হলেন না।

গিওলিট্টি বিশ্বাস করতেন এই কারখানা দখলের আন্দোলন ব্যর্থ হবেই। এভাবে আর কিছু কাল আন্দোলন চললে শ্রমিকরাই বুঝতে পারবে এই কর্মসূচীর অবাস্তবতা। তখন আর নেতাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ব্যর্থতার গ্লানি এড়াতে সক্ষম হবে না। আর 'বিপ্লব'? তার কোন সম্ভাবনাই নেই দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে। প্রধানমন্ত্রী কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা চালালেন, সভা-সমিতিতে তাঁর বক্তব্য রাখলেন এবং সর্বশেষে কারখানায় মালিকদের শিল্পপুনর্গঠনের জন্য কারিগর বিশেষজ্ঞ শ্রমিক প্রতিনিধি ও মালিক প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিশন গঠনের এক সিদ্ধান্তের কথাও জানালেন। এই কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য হবে শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি দেওয়া। ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯২০) এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হল। কিন্তু কমিশনের বৈঠকে গোলমাল সুরু হল কারখানাগুলি দখলের কালে—শ্রমিকদের বেতন দানের প্রশ্নে কমিশন ঐক্যমত হতে পারল না, প্রধানমন্ত্রী আকার এ ক্ষেত্রেও কোন মধ্যস্থতা করলেন না। তিনি ভেবেছিলেন চুপচাপ থাকা যাক। শেষে মালিক ও শ্রমিক-শ্রেণী বুঝবে দুইয়ের সমঝোতা ছাড়া কাজ হতে পারে না। কারখানা দখলের অভিযান-পর্বেও তিনি এই রকম নিষ্ক্রিয়তার নীতি অবলম্বন করেছিলেন। শিল্পকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টাও করেছিলেন। তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন তাদের, যে বিষয়টি অত সহজ ও সরল নয়। তাঁর এই প্রচেষ্টা হিংসাত্মক ধ্বংসাত্মক মনোভাবের ওপর ঠাণ্ডা জল ছিটোবার মতই হয়েছিল। কিন্তু ইতালীর শক্তিশালী সোস্যালিস্ট পার্টি, শ্রমিক-শ্রেণী গিওলিট্টিকে অপসারণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে নিশ্চয় পারত

এবং তাদের আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লব দেশে সংগঠিত হতে পারত। সমাজতন্ত্রীরা ছিলেন বহুধাবিভক্ত। সেই পুরাতন তর্ক উঠল : পরিষদীয় গণতন্ত্র দিয়ে কিছু হবে না, চাই বিপ্লব—বলশেভিক ধাঁচের। 'পরিষদীয় গণতন্ত্র বনাম বিপ্লব।' এই সময় মস্কো থেকে কমিণ্টার্নের ২১-দফা সর্ত-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত (Twenty-one Points) ইতালীর পার্টির কাছে এসে পৌঁছল। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সংযুক্ত হবার সিদ্ধান্তের দ্বারা ইতালীর সোস্যালিস্ট পার্টিকে এমন মনোভাব নিতে হল, শেষ পর্যন্ত যার অনিবার্য পরিণতি হল দলের ভাঙন। সোস্যালিস্ট পার্টির নামও পরিবর্তন করা হল। তার নাম হল কমিউনিস্ট পার্টি। দ্বিতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যুক্ত সোস্যালিস্টদের থেকে নিজেদের পার্থক্য তুলে ধরার জন্যও এই নাম পরিবর্তন দ্রুত করা হল।

মস্কোর নির্দেশমত সোস্যালিস্ট পার্টি কমিণ্টার্নের '২১-দফা সর্ত' ৯-৭ ভোটে পাশ করিয়ে নেয়। কিন্তু এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পার্টির সাধারণ অধিবেশনে মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া দরকার। তাই ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে লেগ্‌হর্ন কংগ্রেসে এই প্রস্তাবটি আলোচনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য এল। ১৯২০ সালই সোস্যালিস্ট পার্টির শক্তি ও জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ সময় ছিল। লেগ্‌হর্ন কংগ্রেসে দলের সামনে তিনটি প্রস্তাব এল : (১) 'সাচ্চা কমিউনিস্ট' গোষ্ঠীর প্রস্তাব—('Pure Communist'): এই প্রস্তাবে ঐক্যের প্রস্তাবকে নাকচ করার আহ্বান জানান হয়। সাচ্চা কমিউনিস্টরা কখনই কমিউনিস্ট বিরোধীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারে না। 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের' সঙ্গে যারা যুক্ত হতে চায় তারা ঐক্য-প্রস্তাব মানতে পারে না। এটা ছিল কমিণ্টার্নের নির্দেশ।

['The unity of the Party is an *equivocal* formula : it means the unity of Communists with the enemies of Communism. There is no plan for this unity in the ranks of the Third International.'] এই গোষ্ঠী ২১-দফা শর্তকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নেবার পক্ষে ছিলেন।

(২) দ্বিতীয় প্রস্তাব এসেছিল ঐক্যপন্থীদের পক্ষ থেকে (Unitarian Communists)। 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের' প্রতি এই গোষ্ঠী আনুগত্য প্রকাশ করে বটে, তবে দলের ভাঙন রোধ করতে এই গোষ্ঠী ছিল বদ্ধপরিকর। বাইরে থেকে সর্ত চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে তাঁরা ছিলেন।

(৩) তৃতীয় গোষ্ঠীর (concentrationists) মধ্যে দক্ষিণপন্থীরা ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল ইতালীর সোস্তালিস্ট পার্টির আলাদা মর্যাদা আছে। মস্কোর নির্দেশে কাজ করে দলের ভাঙন ডেকে আনার বিরুদ্ধে ছিলেন এঁরা।

প্রথম প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ৫৪,৭৮৩ ভোট, দ্বিতীয় প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ৯২,০২৮ ভোট, আর তৃতীয় গোষ্ঠীর প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ১৪,৬৯৫ ভোট। প্রায় ১,০০,০০০ ভোট কোন পক্ষেই পড়েনি।

সম্মেলনের ফলাফল দেখে 'সাচ্চা কমিউনিস্টরা' সোস্যালিস্ট পার্টি পরিত্যাগ করে। এর পরও প্রায় ১৮ মাস 'মধ্যপন্থী' ও 'দক্ষিণপন্থীরা' একসঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন। 'সাচ্চা কমিউনিস্টরা' কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করলেন। ২১-দফা সর্তের ভিত্তিতেই দলটি গড়ে উঠল। গোটা সোস্যালিস্ট পার্টি ভাঙতে শুরু করল। লেগ্‌হর্ন কংগ্রেসের আগে জিনোভিয়েভ এক চিঠিতে জানালেন ইতালীর কমরেডদের: "The Congress of your Party meets at a moment when the proletraian revolution is knocking on the doors of Italy." [ অর্থাৎ "যখন সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লব ইতালীর দুয়ারে ধাক্কা দিচ্ছে তখন আপনাদের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।" ]

আসলে ১৯২০ সালেই বিপ্লবের ব্রাহ্মমুহূর্ত উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রীরা নিজেরাই আত্মকলহে লিপ্ত থেকে সেই সুযোগ হেলায় হারিয়েছে। যখন লেগ্‌হর্ন কংগ্রেস বসে তখন উগ্র-জাতীয়তাবাদী ও ফ্যাসিস্টদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটতে শুরু করেছে। মুসোলিনির জনপ্রিয়তাও দিন দিন বাড়ছে তখন।

ইতালীতে ১৯২০ সালে সোস্যালিস্ট পার্টির সর্বাধিক শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল। পার্টির সদস্যসংখ্যা তখন প্রায় আড়াই লক্ষ। দলের কাগজ Avanti তখন ৩ লক্ষ কপি বিক্রী হচ্ছিল। পার্লামেন্টে ১৫৬ জন দলের সদস্য। দেশের মোট ৮০ লক্ষ ভোটারের মধ্যে সাধারণ নির্বাচনে এই দল ১৮ লক্ষ ভোট পেয়েছিল। দলের সঙ্গে যুক্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে সংগঠিত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ। এই পরিস্থিতিতেও ইতালীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সোস্যালিস্ট পার্টির সদর দরজায় ধাক্কা দিয়ে গেলেও পার্টির দরজা খোলেনি। বিপ্লব শ্লোগানেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। লেগ্‌হর্ন কংগ্রেসের পর দলের সর্বস্তরে এমনকি প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়নে ভাঙন দেখা দিল। ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে ফ্যাসিস্টদের কাছ থেকে প্রচণ্ড আঘাত খেয়েও সোস্যালিস্ট ও সোস্যালিস্ট দল থেকে বিচ্ছিন্ন-হয়ে-আসা মস্কো ও

'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের' অনুগত কমিউনিস্টরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন।

গত কয়েক বছর ইতালীর সোস্যালিস্ট-বামেরা একটানা বিপ্লবী তত্ত্ব প্রচারের নামে হিংসা ও বিদ্বেষের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন দেশের জনমানসে। তাঁরা বিপ্লবের নামে দেশবাসীকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আইনগুলিকে অশ্রদ্ধা ও অমান্য করতে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কৌশল ও কার্যকলাপ দেখে শিক্ষা নিয়ে ইতালীর ফ্যাসিস্টরা যখন আরও জোরালভাবে হিংসার তত্ত্ব ও হিংসা-সন্ত্রাসের রাজনীতি অবলম্বন করলেন সোস্যালিস্টদের বিরুদ্ধে, তখন এইসব আগুন-হজম-করা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীরা বিপ্লবী পাল্টা হিংসার ( Revolutionary violence ) কথা একেবারে ভুলে গিয়ে সেইসব বস্তাপচা 'বুর্জোয়া' আইনের আশ্রয় খুঁজলেন।

[ পশ্চিমবাংলায় যে মার্কসবাদীরা যে-গণতন্ত্র, সংবিধান, আইন-আদালত "জ্বালিয়ে ফেলো পুড়িয়ে ফেলো"—"মানি না—মানছি না—মানব না" বলে অবিরাম হুঙ্কার করে এসেছেন—নির্বিচারে লুণ্ঠন হত্যা হিংসা—ব্যক্তিগত খুন, সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি প্রয়োগ করে গণতান্ত্রিক শক্তি ও ছোট ছোট দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে মত্ত হয়েছিলেন, তাঁদের আক্রমণে আক্রান্ত ও রক্তাক্ত নাগরিকের দল—গোষ্ঠী ও ছোট ছোট দলগুলি আইন-আদালতের আশ্রয় নিলে এবং আদালত আইন অনুযায়ী সেই আশ্রয় দিলে—'বুর্জোয়া আদালত'কে ধিক্কার জানিয়ে রাস্তার 'জনতার আদালতের' ( People's court ) রায়ই 'শেষ' ও 'আসল' রায় বলে আকাশ-ফাটান চীৎকার করে এসেছেন। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যাবার পর আবার সেই বুর্জোয়া সংবিধান, বুর্জোয়া গণতন্ত্র, বুর্জোয়া আদালতের মাহাত্ম্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সেই মার্কসবাদীরাই নতুন আন্দোলনের নকল অভিনয় শুরু করে দিয়েছেন। 'যুক্তফ্রন্ট সরকার'—জনতার বিশ্বাস ও আস্থার পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করে স্বরাষ্ট্র-পুলিশ-সাধারণ প্রশাসন হাতে নিয়ে পুলিশ সিভিলিয়ান ও পেটোয়া একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী অফিসার কর্মচারীদের দিয়ে সমস্ত শোভনতা, শালীনতা, ন্যায়নীতি, ঔচিত্যবোধ, মূল্যবোধ পদদলিত করে দলীয় হিংসাত্মক আগ্রাসী সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি কার্যকরী করার কর্মকাণ্ডে হাত দিয়েছিলেন—তাঁরা আজ সেই 'বুর্জোয়া' পুলিশ ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে 'নিরপেক্ষ' ( neutral ) থাকার তত্ত্বকথা প্রচার করতে শুরু করেছেন ক্ষমতাচ্যুত হবার পর—বেকায়দায় পড়ে। গোটা সমাজটাই যদি শ্রেণীভিত্তিক ( Class-

oriented) হয়, তাহলে পুলিশ প্রশাসন, আদালত সবই তো শাসকশ্রেণীরই তল্পিবাহক হবে! মার্কসীয় তত্ত্ব বিচারে শ্রেণী-ভিত্তিক সমাজে তাহলে এইসব প্রতিষ্ঠান 'নিরপেক্ষ' হবে কোন্ যুক্তিতে? গরজ বড় বালাই। গরজ তো তত্ত্বের চাপরাশিগিরি করবে না। সেই 'ঘৃণ্য' 'শ্রেণীশত্রু' বুর্জোয়া শ্রেণীকেই সুড়সুড়ি দিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে যে! 'জনগণতান্ত্রিক জালভোটের' বিপ্লব সফল করতেই হবে। বিশ্বের বামপন্থী আন্দোলনের আরশিতে মার্কসবাদীরা যেন নিজেদের মুখটা মধ্যে মধ্যে দেখে নেন।]

হিলটন ইয়ঙ্ ইতালীর এই বিপ্লবী সোস্যালিস্টদের এই রাজনৈতিক কৌশল সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন :

" · After two years of its own hair-raising revolutionary propaganda and of action which, if not revolutionary, was undeniably violent and illegal the Party decided that its best defence against the yet more violent and more illegal action of the fascists was to take refuge behind the laws which it had formerly despised A catch-word was launched by the new Secretary of the party : 'Back to the bosom of civilisation !' The Socialists no longer as proud, unflinching rebels but as decent law-abiding folk subjected to the brutal and unwarranted attack of an illegal minority. This was a perfectly defensible position ; but as to law abdidingness they had burnt their boats in the past two years ······" ( The Italian Left—P. 122-23 )

ইতালীর নূতন প্রধানমন্ত্রী গিওলিট্টি ভাবলেন সোস্যালিস্টদের দর্প বেশ খানিকটা চূর্ণ হয়েছে—প্রভাব ও দাপটও কমেছে—এই সুযোগে সাধারণ নির্বাচন ডেকে জনতার রায় নিয়ে নেওয়া যাক। তিনি ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিলেন ভিতরে ভিতরে।

গিওলিট্টি নিজের সম্ভাব্য অনুগামী ও সমর্থকদের নিয়ে একটা 'ন্যাশন্যাল ব্লক' গঠন করলেন। এই ব্লকে ছিলেন উদারপন্থী, নরমপন্থী রক্ষণশীল গোষ্ঠী, এবং ফ্যাসিস্ট দল। মুসোলিনি দেশের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মোকাবিলা করতে সক্ষম এই ধারণা তিনি জনমানসে ছড়িয়ে দিতে তখন বিশেষ ব্যগ্র। তিনিই জাতির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভেদাভেদ বিচ্ছিন্নতা দূর করে গোটা দেশ ও জাতিকে

ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধতে পারেন সেই বিশ্বাসটিও ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করছিলেন। গিওলিট্টি নিজেকে ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সোস্যালিস্টদের প্রতিনিধি সংখ্যা নির্বাচন কিভাবে কমিয়ে আনা যায় সেই কথাই ভাবছিলেন।

নূতন নির্বাচনে দলীয় পরিস্থিতি ছিল এইরূপ :

সোস্যালিস্ট পার্টি—১২৮, নব গঠিত কমিউনিস্ট পার্টি—১৩, পপুলার পার্টি—১০৬, ফ্যাসিস্ট পার্টি—৩৩। ফ্যাসিস্টদের নিয়ে নবগঠিত ন্যাশন্যাল ব্লক পেল—২৫৩টি আসন। কিভাবে এই সরকার চলতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। গিওলিট্টি কখনও সোস্যালিস্টদের কখনও বা পপুলার পার্টির সমর্থন পাচ্ছিলেন। কোন নিশ্চয়তা ছিল না এ ব্যাপারে। পপুলার পার্টির অর্থমন্ত্রী মেডাকে মন্ত্রিসভা থেকে তাঁর দল পদত্যাগ করালেন গিওলিট্টির অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ব্যাপারে মতপার্থক্য হওয়ায়। এর পর জুন মাসে মুসোলিনি ও তাঁর দলের সমর্থন প্রত্যাহার করায় সরকারের পতন হল। এর পর রাজা ইমানুয়েল প্রাক্তন সোস্যালিস্ট আইভ্যানো বোনোমিকে ( Ivanoe Bonomi ) সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি ন্যাশন্যাল ব্লকেরই সদস্য ছিলেন। তাঁর পেছনে পপুলার পার্টির সমর্থন ছিল। মুসোলিনি বিরোধী দলের ভূমিকা নিলেন। তাঁর ব্ল্যাকশার্ট—( কালোকুর্তা পরিহিত জঙ্গী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ) সংগঠন বেশ ধীরে ধীরে জোরদার হয়ে উঠেছিল। পার্লামেণ্টে তাঁর প্রভাবও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অসংগঠিত বিশৃঙ্খল খিচুড়ি—পাঁচ-মিশালী সদস্যদের মধ্যে সুসংগঠিত সুশৃঙ্খল জঙ্গী ফ্যাসিস্ট সদস্যরা পার্লামেণ্টে প্রভাব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে। মুসোলিনি সোস্যালিস্টদের সঙ্গে সন্ধি করলেন 'Pact of conciliation' : সোস্যালিস্টদের উপর আর ফ্যাসিস্টরা আক্রমণ করবে না। [ যেমন ক্ষমতাচ্যুত হবার পর পশ্চিমবাংলার মার্কসিস্টরা অহিংসার মাহাত্ম্য প্রচার করে মাভৈ বাণী শোনালেন গণতান্ত্রিক শান্তিবাদী দল, ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলিকে ] সোস্যালিস্টরাও প্রতিশ্রুতি দিলেন তারা আর ফ্যাসিস্টদের কোন প্রকারেই প্ররোচনা দেবে না। অবশ্য অচিরেই মুসোলিনি এই চুক্তির কথা বেমালুম বিস্মৃত হলেন। সোস্যালিস্টদের মধ্যে আবার 'সংস্কারপন্থী' ও 'বিপ্লববাদীদের' সংঘাত পুরোদমে সুরু হয়ে গেল। পার্লামেণ্টারী দলের প্রধান সোস্যালিস্ট নেতা টুরাতি ( Turati ) এই সঙ্কটময় পরিস্থিতি বুঝে কর্তব্য নির্ধারণের আবেদন জানালেন। কিন্তু তা ব্যর্থ হল। পার্টি ঘোষণা করল : পার্লামেণ্ট সোস্যালিজম প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়।

১৯২০ সালে ও তার পরও ইতালীকে ফ্যাসীবাদের হাত থেকে রক্ষা করার প্রশস্ত উপায় ছিল যে, দেশে এক যৌথ কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা সোস্যালিস্টদের সক্রিয় সহযোগিতায়। কমিণ্টার্নই কিন্তু তা হতে দেয়নি। তখনও ফ্যাসিস্টরা অত শক্তিশালী ছিল না। সোস্যালিস্ট প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সেস্কো নিট্টি, রাজা ও সামরিক বাহিনীর দিক থেকে যে বিপদ আসতে পারে তা আশঙ্কা করে রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধন করে সে দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রেখেছিলেন সোস্যালিস্ট পার্টির কাছে। তখন এই দলে তিনটি উপদল ছিল :

(১) টুরাতির নেতৃত্যাধীন দক্ষিণপন্থীরা, (২) ম্যাক্সিম্যালিস্ট গোষ্ঠী, তার নেতা ছিলেন সেরাট্টি ( Seratti ) ও (৩) কমিউনিস্ট গোষ্ঠী। নিট্টি এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন। টুরাতি—সেরাট্টি গোষ্ঠী দ্বিধাগ্রস্থ। কিন্তু কমিউনিস্টরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করলেন। সোস্যালিস্ট পার্টির সেক্রেটারী তখন বম্ব্যাকসি ( Bombacci )। লেলিনের কাছ থেকে তাঁর ব্যক্তিগত দূত ভ্লাডিমির ডিওগট ( Vladimir Diogot ) ইতালীতে এলেন পরামর্শ দিতে। তাদের কাছে Bombacci বললেন :

"Nitti has proposed the deposition of the King and the proclamation of a Republic. Seratti almost agrees. To-morrow the question must be decided at the central committee. I would like your opinion to convey to the committee."

অর্থাৎ "বম্ব্যাকসি ডিওগটকে জানালেন যে, নিট্টি রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চান। সেরাট্টি প্রায় মত দিয়েই দিয়েছেন। আগামী কাল কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আপনার মতামত জেনে নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে সেটা জানাতে চাই।"

লেলিনের ব্যক্তিগত দূতের উত্তরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন :

"In the name of the Comintern you can tell the central committee of the party that participation in such a coup d'etat represents the betrayal of the working class···It matters little who is on the throne—Nitti or the King. We must rather stir up the revolution from below more energetically so as to destroy both the King and Nitti···Then

we shall proclaim the dictatorship of the proletariat."
( Vladimir Diogot )

অর্থাৎ "এই ধরনের বিপ্লবে অংশ গ্রহণের অর্থ হবে শ্রমিক-শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কমিণ্টার্নের নামেই আমি এক কথা বলছি। আর সেটা যেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের পরিষ্কারভাবেই বলে দেওয়া হয়। নিট্টি, কি রাজা—কে সিংহাসনে আরূঢ় হচ্ছেন সেটা বড় কথা নয়। আমাদের নীচের তলা থেকে বিপ্লব সৃষ্টি করতে হবে আরও উদ্যমের সঙ্গে—যাতে রাজা ও নিট্টি দু'জনকেই খতম করা যায়। তখন আমরা সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করব।"

এই ধরনের তত্ত্বকথা কোন অ-কমিউনিস্ট জাতীয়তাবাদী নেতা উচ্চারণ করলে তার জন্য কি ধরনের বিশেষণ বর্ষিত হত কমিউনিস্ট শিবির থেকে সেটা পাঠকরা সহজেই অনুমান করতে পারেন। কমিউনিস্টরা ইতালীর বিপ্লবের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে ফ্যাসীবাদের উদ্ভব ও ফ্যাসিস্টদের ক্ষমতা দখলকে সুনিশ্চিত করেছিলেন। ১৯১৮ সাল থেকে একটানা চার বছর ধরে মার্কসবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী সোসালিস্টরা দেশে সরকার গঠনের কোন দায়িত্ব নিতে রাজী হননি। এই দলের এই নেতিবাচক আচরণ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির রাজনীতিকে বিপ্লবের সহায়ক মনে করে শেষ পর্যন্ত মুসোলিনিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিল। ১৯২১ সালের সোস্যালিস্ট পার্টির মিলান কংগ্রেসে টুরাতি-পন্থীদের নিন্দা করা হল এবং সরকারী দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে সহযোগিতার মনোভাবেরও তীব্র সমালোচনা করা হল। মিলান কংগ্রেসে সোস্যালিস্ট দলের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে মুসোলিনি তাঁর পত্রিকায় ( Popolo d' Italia ) লিখলেন:

"The result of the Socialist Congress will be an increase in the numerical and moral stature of the National Right. It means that the National Right, in which the fascists are the majority, can be the arbiter of the life and death of governments, and that no government can govern without it. We therefore declare ourselves quite particularly pleased Fascism has now before it a vast field of possibilities; it can do great things—things—not gesture, deeds, not words."

অর্থাৎ সোশ্যালিস্ট কংগ্রেসের ফলশ্রুতি হবে ফ্যাসিস্টদের জাতীয়তাবাদী দক্ষিণপন্থীদের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি। দেশের ভাগ্য ফ্যাসিস্টরা নিয়ন্ত্রণ করবে। তাদের বাদ দিয়ে কোন সরকারই চলতে পারবে না। সোশ্যালিস্ট রাজনীতি তাঁর দলের সামনে বিপুল সম্ভাবনার দ্বারোদ্ঘাটন করল মাত্র। ফ্যাসিস্টরা সোশ্যালিস্টদের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত দেখে খুশিই হয়েছে।

সোশ্যালিস্টদের নেতিবাচক রাজনীতি পার্লামেন্টের ১২২ জন সোস্যালিস্ট ডেপুটিকে ৩৩ জন ফ্যাসিস্ট-দলভুক্ত ডেপুটির ফ্যাসিস্ট দলের রাজনীতি চরিতার্থ করার পথ করে দিল। সোস্যালিস্টরা গণতান্ত্রিক উদারপন্থী ও র‍্যাডিক্যালদের সঙ্গে সমঝোতা করলে ইতালীতে ফ্যাসীবাদের উদ্ভব কখনই সম্ভব হত না। শুধু কি তাই! মার্কসীয় ভাবধারায় বিশ্বাসী সোস্যালিস্ট দল থেকে যে অতিবামেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে কমিণ্টার্নের অনুগত পার্টিরূপে ইতালীতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করল—সেই কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিস্টদের চাইতেও সোস্যালিস্টদের বেশী বড় দুশমন মনে করে—তাদেরই বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাল। বলশেভিক মতবাদে অবস্থাবান সোস্যালিস্ট পার্টি তখন দু'দিক থেকে আক্রমণের সম্মুখীন হলেন : (১) কমিউনিস্ট পার্টি, (২) ফ্যাসিস্ট পার্টি।

মুসোলিনি চাইছিলেন সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের আচরণে গোটা পার্লামেণ্ট তথা পরিষদীয় গণতন্ত্র যেন উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। আর উগ্র সোস্যালিস্টরা (Intransigents) ও কমিউনিস্টরা তো প্রকাশ্যেই বলেছিলেন পার্লামেণ্টারী প্রথায় কিছু হবে না। সোসালিস্ট ও ফ্যাসিস্টদের সংঘর্ষ দেশে ক্রমেই বেড়ে চলছিল। পার্লামেণ্টে সিনর বোনোমি ( Signor Bonomi ) ঘোষণা করলেন :

"সরকার মনে করে সোসালিস্ট পার্টির কার্যকলাপ ও প্রচার ন্যায়সঙ্গত। সর্বপ্রকার হিংসার ও আক্রমণের হাত থেকে ফ্যাসীবাদের ঔদ্ধত্য থেকে তাদের রক্ষা করতে সরকার কৃতসঙ্কল্প। যাঁরা হিংসার আশ্রয় নেবেন সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রয়োগ করবে।"

এই বক্তব্য রেখে বোনোমি পার্লামেণ্টের কাছ থেকে আস্থাজ্ঞাপক ভোট চাইলেন ( Vote of confidence )। মিলান কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোস্যালিস্ট ডেপুটিরা আস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিলেন। আর ফ্যাসিস্টরা ভোটদানে বিরত রইলেন। বোনোমি সরকারের পতন ঘটল। এই অস্থির অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে দেশকে রক্ষার চাবিকাঠি তখনও সোস্যালিস্টদের হাতে। গোটা দেশ এই দলের দিকে চেয়ে আছে তখন।

সোস্যালিস্ট নেতা টুরাতি ছিলেন বরাবরই সমঝোতাবাদী। তিনি গণতন্ত্রীদের সঙ্গে হাত মেলাবার পক্ষেই ছিলেন—অতীতে সেজন্যে 'Collaborationist' বলে নিন্দিতও হয়েছিলেন। এই সঙ্কট মুহূর্তে টুরাতি বললেন যে, কাউৎস্কীর চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি একমত। কোন বুর্জোয়া দলের সঙ্গে সরকার গঠন করতে গেলে অংশগ্রহণকারী সমাজতন্ত্রী দলের সমর্থক শ্রমিক-শ্রেণীর অটুট ঐক্য ( Proletarian unity ) একান্তই প্রয়োজন। সমগ্র শ্রমিক-শ্রেণীর ঐক্য সুনিশ্চিত না করে দল যদি কোয়ালিশন সরকারের অংশীদার হয় তাহলে কাউৎস্কীর ভাবধারা অনুযায়ী সোস্যালিস্ট পার্টি ও বুর্জোয়া পার্টির মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকবে না। [ পশ্চিমবাংলায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠনের পূর্ব মুহূর্তে মার্কসবাদী নেতারা ও তাত্ত্বিকরা সার কথা বুঝে নিয়েছিলেন: সরকার যে কোন দলের সঙ্গেই গঠন করা যায়, তবে পুলিশ-প্রশাসন স্বরাষ্ট্র-দপ্তর হাতে থাকা চাই, সেই সঙ্গে চাই-ই এমন এমন দপ্তর যেগুলো হাতে থাকলে দলের প্রভাব বাড়ান যাবে দ্রুত এবং দল গড়ার আসল রসদ যে-সব দপ্তর করায়ত্ব করলে আসবে সেইসব দপ্তরগুলিও চাই-ই। শ্রমিক-শ্রেণীর ঐক্য ( Proletarian unity )? সে তো পেটোয়া 'মার্কসিস্ট' পুলিশ ( "নিরপেক্ষতা" তখন বুর্জোয়া ভণ্ডামি ও শোধনবাদী অক্ষমনীয় অপরাধ! ) ও সশস্ত্র লাল রুমাল-পড়া গুণ্ডাবাহিনীর ডাণ্ডা ও ভ্রূকুটি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবেই। তার ওপর 'পাইয়ে দেবার রাজনীতি' তো রয়েছেই। রাজনৈতিক বঁড়শিতে নগদ বাড়তি প্রাপ্তিযোগের টোপ ধরিয়ে গেঁথে টেনে তো আনা যাবেই।] টুরাতি ইতালিতে এই সঙ্কটমুহূর্তে যে শ্রমিক ঐক্যতত্ত্বের কথা বললেন—সেটা ছিল সম্পূর্ণ অলীক ও অবাস্তব। একটা মস্ত সুযোগ আবার সোস্যালিস্টদের হাতছাড়া হয়ে গেল। আর কমিউনিস্ট পার্টি? ডেভিড শাব্—লিখেছেন:

"...the Communists concentrated all their attacks on the other Socialists factions. In May they completely dismissed the Fascist menace, asserting that a temporary white reaction was necessary to destroy the influence of Social democrats. The elections held that month they called a 'trial of the Socialists'. In October 1922 Benito Mussolini provided the Communists with their 'temporary white reaction,' which lasted a generation." ( Lenin—By David Shub, P. 394 ).

কমিউনিস্টরা সোস্যালিস্টদের উপরেই আক্রমণ চালিয়ে গেছে। উঠতি ফ্যাসীবাদের দিক থেকে যে কোন বিপদ আসতে পারে তা তাঁরা মনেই করেননি। সে সম্ভাবনাকে কোনরকম আমলই দেওয়া হয়নি। কমিউনিস্টরা মনে করতেন এবং বলতেন যে, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের প্রভাব নির্মূল করার জন্য সাময়িকভাবে ফ্যাসীবাদের মত দক্ষিণপন্থী 'শ্বেত-প্রতিক্রিয়া'র প্রয়োজনীয়তা আছে। ১৯২২ সালে বেনিটো মুসোলিনি কমিউনিস্টদের আকাঙ্ক্ষিত সাময়িক 'শ্বেত-প্রতিক্রিয়া'র বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে দিয়েছিলেন। আর সেটা খুব সাময়িকও ছিল না।

যে কথা হচ্ছিল। 'ন্যাশন্যাল ব্লক' থেকে এবার সবচেয়ে বড় অংশ গণতন্ত্রীরা বার হয়ে এসে বিরোধী পক্ষের আসন নিলেন। সিনর বোনোমি আস্থাসূচক ভোটে হেরে গিয়ে পদত্যাগ করলেন। সোস্যালিস্ট ডেপুটিরা কাউকেই সমর্থন জানালেন না। ফ্যাসিস্টপন্থীরা তার সুযোগ নিল। গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা লোপ পাচ্ছিল। লোকে চাইছিল একজন ডিক্টেটার। দেশে কোন সাংবিধানিক সরকারই গঠন করা যাচ্ছিল না। ফ্যাসিস্টরা তাদের উদ্যত মুষ্টির আস্ফালন দেখিয়ে—ভয়-হুমকী দিয়ে নিজেদের শক্তি জাহির করতে লাগল সারা দেশে।

রাজা ফ্যাক্টা মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য ডাকলেন। প্রতিবাদে শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিল। মুসোলিনি পার্লামেন্টে ২৪ ঘণ্টার চরম পত্র দিয়ে জানালেন-এর—মধ্যে ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে হবে। ফ্যাক্টা কিছুই করতে পারলেন না। তখন মুসোলিনি তাঁর 'ব্ল্যাক শার্ট' বাহিনীকে কাজে লাগালেন। ধর্মঘট ভেঙে গেল—অনেক শ্রমিক কাজে যোগ দিল—রেল-শ্রমিকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিলেন। এদিকে সোস্যালিস্ট পার্টি ১৯২২ সালের রোম কংগ্রেসে দলের প্রবীণ নেতা টুরাতিকে দল থেকে বহিষ্কার করল। ঐ বছরই ২৪শে অক্টোবর ফ্যাসিস্ট দলের নেপল্‌স অধিবেশনে মুসোলিনি নিজেকে রাজতন্ত্রী ( Monarchist ) বলে ঘোষণা করলেন। ২৬শে অক্টোবর ফ্যাসিস্টরা টেলিফোন একস্‌চেঞ্জ দখল করল—হাজার হাজার কালো কুর্তা ( Blackshirts ) পরিহিত স্বেচ্ছাসেবক রোম সহরে পথে পথে মিছিল করে বেড়াল। ফ্যাক্টা ( Facta ) একটি আপৎকালীন ঘোষণা করে সারা দেশে সামরিক আইন জারী করার প্রস্তাব রাখলেন। কিন্তু রাজা তাতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলেন। ২৪শে অক্টোবর লক্ষাধিক সুশৃঙ্খল ফ্যাসিস্ট স্বেচ্ছাসেবক শান্তিপূর্ণভাবে রোম অবরোধ করে রাখল। রাজা মুসোলিনিকে আমন্ত্রণ জানালেন সরকার গঠন করার জন্য।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই মুসোলিনি পার্লামেণ্টকে পাশ কাটিয়ে ডিক্রী জারী করে দেশশাসনের ক্ষমতা ভয় ও হুমকী দেখিয়ে ও বাগ্মিতার জোরে ডেপুটিদের কাছ থেকে সমর্থন আদায় করে নিলেন। ব্ল্যাকশার্ট বাহিনীকে সরকারী সংস্থায় রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা—রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকার—কাগজ-কলমেই রয়ে গেল। ফ্যাসিস্ট ভ্রূকুটির সামনে সোস্যালিস্ট দল ও কমিউনিস্ট পার্টি—পরিচালিত শ্রমিক সংগঠনগুলি বোবা বনে গেল। এসব দেখেও কমিউনিস্টরা মনে করলেন—এটা একটা নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার। ইতিহাসের ধারা তো ফ্যাসিস্ট পাল্টাতে কখনই পারবে না। তাই ফ্যাসীবাদকে দেখে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই।

"The Communist Party still turned most of its great journalist talent against the herotics rather than the infidels, and strove to convert the socialists rather than to disconcert the Fascists." ( W. Hilton Young : The Italian Left—P. 134 ).

১৯২৩ সালে দক্ষিণপন্থী 'পপুলার পার্টি' মুসোলিনি-সরকার থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল। মুসোলিনি নির্বাচনের ডাক দিলেন ১৯২৪ সালে। কিন্তু তার আগে একটি আইন পার্লামেণ্টকে দিয়ে তিনি পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। তার নাম 'Two-thirds Act' অর্থাৎ এই আইনের দ্বারা নির্বাচন সংক্রান্ত আইনই পাল্টিয়ে গেল। এই নতুন আইনের বলে যে দল বা ব্লক নির্বাচনে সর্বাধিক ভোট পাবে সেই দলকেই সেই দাবীতেই দুই-তৃতীয়াংশ আসন পার্লামেণ্টে দিতে হবে। ১৯১৪ সালের নির্বাচনে ভয় হিংসা সন্ত্রাস জুলুম-বাজী করে ফ্যাসিস্টরা ও তাদের ব্লকভুক্তকের সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে নিল। ফলে ফ্যাসিস্ট দল ও তাদের ব্লকভুক্ত দলগুলিকে নতুন আইন অনুযায়ী দুই-তৃতীয়াংশ আসন ছেড়ে দিতে হবে। আইন অনুযায়ীই হল,—গৃহযুদ্ধ করে নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইতালীর রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা শেষ করার আগে ইতালীর ফ্যাসিস্টদলের নেতৃত্বে ১৯২২ সালের রোম অভিযান ( March on Rome ) ও মুসোলিনির সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যাক।

১৯২২ সালের প্রচণ্ড শীতে বর্ষণমুখর অক্টোবরের রাত্রে ইতালীর ফ্যাসিস্ট-দলের ৩ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক মুসোলিনির নেতৃত্বে ইতালীর রাজধানী রোম নগরীর মুখে অভিযান করে সমগ্র নগরী অবরোধ করে ফেলে। এ অভিযান অহিংস নিরস্ত্র অভিযান ছিল না। ইতালীর রাজা ইমানুয়েল (King Vittorio Emanuele III ) বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। প্রধানমন্ত্রী ও লুইগি ফ্যাক্টা

ভাবতেই পারেননি ফ্যাসিস্ট দল এইরূপ অভিযান আদৌ করতে পারে। কী-ই তাদের শক্তি বা প্রভাব? তাছাড়া সেনাবাহিনী তো আছেই মোকাবিলা করার জন্য। ফ্যাক্টা রাজাকে বুঝিয়েছিলেন, ভয় পাবার কিছু নেই—কেননা সবই ফ্যাসিস্ট দলের ফাঁকা হুমকী, নিছক বাগাড়ম্বর। রাজা ইমানুয়েল ২২ বছরের শাসনকালে অন্তত ২০ জন প্রধানমন্ত্রীকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন। এই ৬৩ বছরের প্রবীণ প্রধানমন্ত্রী রাজাকে শুনিয়েছিলেন:

"A march on Rome? But I am in Rome with troops and artillery······I have ordered guns to be greased."

রাজা দেশের সোস্যালিস্ট ডেপুটিদের সম্বন্ধেও বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তিনি ভুলতে পারেননি ১৯১৯ সালের ১লা ডিসেম্বর পার্লামেন্টের প্রারম্ভিক অধিবেশনে সোস্যালিস্ট সদস্যদের অপমানজনক আচরণের কথা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরই এই অধিবেশন বসেছিল। সোস্যালিস্ট সদস্যরা দাঁড়িয়ে উঠে রাজার নামে নিন্দা সুরু করেন (Down with King)। তারপরই লাল ঝাণ্ডার (The Red Flag) জয়গান গেয়ে পার্লামেণ্ট ভবন পরিত্যাগ করে চলে যান। রাজা এই অপমানের কথা ভুলতে পারেননি।

রোম অভিমুখে ট্রেনে-ট্রাকে চড়ে দলে দলে ফ্যাসিস্টরা রওনা হয়েছে। তাদের দাবী—নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করুন এবং বেনিটো মুসোলিনিকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান যেন জানান সরাসরি। রাজা প্রথমে রাজী নন। এদিকে ফ্যাক্টার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা সারারাত ধরে বৈঠক চালালেন। মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিলেন:

"Council of Ministers has decided proclamation of state of siege in all provinces of the kingdom from midday today. Relative decree will be published immediately. Meanwhile, use all possible means to maintain public order and security of persons and property."

সামরিক বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হল—জরুরী অবস্থা জারী করে। তবে রাজার সঙ্গে পরামর্শ না করে এ কাজ করার জন্য এবং সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দেবার জন্য রাজা ক্ষুব্ধ হলেন। [ "You evidently ignore constitutional law to instruct the military before consulting me" See: Rise and Fall of Benito Mussolini; By Richard Collier. P. 21—22: Collins. ]

মুসোলিনির নিজের দলের নেতাদের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ততার ভাব দেখা গেল। তাদের অন্যতম নেতা De Vecchi ও Dino Grandi সমঝোতার টোপ গেলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রস্তাব এল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী Antonio Salandra-কে প্রধানমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভায় ৬ জন ফ্যাসিস্ট সদস্য রাখার এবং তার পরই সাধারণ নির্বাচন করার। De Vecchi ও Dino Grandi-র দৃঢ় বিশ্বাস সাধারণ নির্বাচনে শতকরা ৬০ ভাগ ভোট ফ্যাসিস্টরা পাবে। মুসোলিনি এ প্রস্তাবকে আদৌ আমল দিলেন না। তিনি এঁদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনলেন। [ "You are a traitor to the revolution", "I won't go to power through the servant's entrance" ; Mussolini : See : Rise and Fall of Benito Mussolini : P. 29. ] মুসোলিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন হাজার হাজার কালোকুর্তাধারী ফ্যাসিস্ট সভ্যরা রোম শহর পরিত্যাগ করে যখন ঘরে ফিরে যাবে তখন তারা "বিজয়ীর" মর্যাদা ও গর্ববোধ নিয়েই যাবে।

"But don't forget all the Blackshirts must be down there in Rome, because they must leave the city with the physical sensation that they came in with flags flying as victors." (Mussolini)

যতক্ষণ পর্যন্ত মুসোলিনিকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান না জানান হচ্ছে—ততক্ষণ ব্ল্যাকসার্ট ও ফ্যাসিস্ট সমর্থকরা রাজধানী অবরোধ করেই থাকবে। এদিকে কাতারে কাতারে মানুষের দল চলেছে রোম নগরী অভিমুখে। মুসোলিনি তখন মিলান নগরীতে অপেক্ষা করে আছেন—রাজা ইমানুয়েলের কাছ থেকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ পাবার আশায়। শেষে অবস্থার চাপে রাজার কাছ থেকে টেলিগ্রাম এল মুসোলিনির কাছে সরকার গঠনের প্রস্তাব বহন করে। [ "The King begs you to proceed to Rome as soon as possible as he wishes to entrust you with the task of forming a Cabinet" ] এই টেলিগ্রাম পাবার পরই তিনি ট্রেনে রোম অভিমুখে রওনা হয়ে যান। রোম নগরী বিপুল অভিবাদন ও অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উদ্‌গ্রীব তখন। মুসোলিনি রোম নগরীতে পৌছেই রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এই সমগ্র অভিযানের, আন্দোলন ও সংগ্রাম-কৌশলের মূল নায়ক কিন্তু একজনই—মুসোলিনি। একজন দরিদ্র কর্মকারের ( Blacksmith ) পুত্র—১৯১২ সালের মিলান শহরের মানুষ তাঁকে চিনতই

না। তখনও তিনি সমাজতান্ত্রিক দলের পত্রিকা Avanti-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ১৯১৪ সালে সোস্যালিস্ট পার্টি তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করে দেয়। ১৯১৯ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট দল নির্বাচনে ৫,০০০ হাজারেরও কম ভোট পেয়েছিল; তিন বছর পরে ১৯২২ সালে সেই দল রাজধানী রোম নগরী অবরোধ করল। একটি রাজনৈতিক দলের ইতিহাসে এ এক অসামান্য কৃতিত্ব বলেই গণ্য হবে।

মুসোলিনি জন্মগ্রহণ করেন এক অতি দরিদ্র পরিবারে। পিতা ছিলেন কর্মকার। কামারশালার হাপরের সামনে বসে পিতার কাছে সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের আদর্শের কথা শুনতেন। পিতা-মাতার প্রভাব তাঁর জীবনে ছিল অসীম। পিতা-মাতার প্রতি বালক মুসোলিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। জীবনে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রাম তিনি করেছিলেন। মা ছিলেন শিক্ষিকা। পরিবারের আয় ছিল মাসে ১০০ লায়ার (Lire)। তাঁর পিতা নাস্তিক ছিলেন। গীর্জা-পাদরিদের ওপর অবিশ্বাসী ছিলেন। যেদিন মুসোলিনিকে ভাল শিক্ষার জন্য দূরের এক স্কুলে ভর্তির জন্য পাঠান হল, গাধায় ঠেলা গাড়িতে রওনা করার আগে পিতা Alessandro চালকের পাশে বসে পুত্রের কানে কানে বললেন—স্কুলে মাস্টার মহাশয়রা যা শিক্ষা দেন তা ভালভাবে গ্রহণ করবে—বিশেষ ইতিহাস, ভূগোল শিক্ষার ওপর বেশী মনোযোগ দেবে। তবে মাস্টার মহাশয়রা তোমার মাথায় ঈশ্বর ও সাধুসন্তদের সম্বন্ধে যে-সব আজগুবি মন্ত্র ঠুসবার চেষ্টা করবেন সেগুলোর প্রতি কর্ণপাত করবে না। [ "Pay attention to what they teach you especially the geography and history, but do not let them stuff your head with nonsense about God and saints". ] কিন্তু মুসোলিনি মায়ের প্রভাবে ধর্ম ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। [ See : Autobiography : Benito Mussolini ] বাল্যজীবনে বঞ্চনা-দুঃখ-ব্যথার প্রতিশোধ নেবার জন্য সারা জীবন তিনি কাজ করেছিলেন। সবাইকে এক ছাঁচে ঢালবার স্বপ্নই তাঁর সামনে ছিল। [ লেনিনের বড় ভাই—যিনি গুপ্তসমিতির সঙ্গে যুক্ত থেকে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব করার দীক্ষা নিয়েছিলেন, সেই তরুণ প্রতিভাবান যুবককে যেদিন বোমা নিক্ষেপের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে নিষ্ঠুরভাবে জারতন্ত্রের ফাঁসিতে লটকানো হল—কিশোর লেনিনের মনে সেই মুহূর্ত থেকেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠেছিল। ] বিদ্যালয়ে মুসোলিনি লক্ষ্য করলেন, ছাত্রদের—তাদের পারিবারিক ঐশ্বর্যের ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তিনি গরীব বলে তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীতে

ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। বড় লোকদের ছেলেদের ভাল খাবার সরবরাহ করে রান্নাঘরের উচ্ছিষ্ট যা কিছু পড়ে থাকত তাই জুটত তার মত গরীব ছেলেদের ভাগ্যে। একজন লেখক লিখেছেন :

"From this moment until the very end Benito Mussolini was a man in quest of an equaliser, seeking to annul the bitterness of childhood hurts." [ Rise and Fall of Benito Mussolini : By Richard Collier, P. 57 : Collins. ]

মুসোলিনি ছাত্র-জীবনে বিদ্রোহ করলেন। মাস্টারমশাই বেত্রাঘাত করেছেন, তিনি পাল্টা দোয়াত নিক্ষেপ করেছিলেন। কঠোর শাস্তি দিলেন স্কুলের পাদরিরা। তবু তিনি মার্জনা ভিক্ষা করলেন না। দমানো তাঁকে গেল না। কুকুরদের সঙ্গে আস্তাবলে রাখার নির্দেশ দেওয়া হল। উপর্যুপরি শৃঙ্খলা-ভঙ্গের দায়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হল চিরতরে। ১৩ বছর বয়সে তিনি তাঁর বাড়িতে বক্তৃতার রিহার্সেল দিচ্ছিলেন। তাঁর মা পুত্রের প্রগল্‌ভতা দেখে ঘাবড়িয়ে গিয়ে ঘরে গিয়ে দেখেন ছেলে আপন মনে কথা বলে চলেছে। জিজ্ঞেস করতেই পুত্র বললেন—"Preparing for a day when all Italy trembles at my words." বালককালে ভিকটর হিউগোর "লে মিজারেব্‌ল" এই বিখ্যাত উপন্যাস তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। মুসোলিনি কিছুদিন শিক্ষক তার কাজও করেন—সপ্তাহে ১২ শিলিং ( ১২ টাকার সমতুল্য ) বেতনে। কিন্তু সে কাজও তাঁর মনঃপূত হল না। তিনি সে কাজ ছেড়ে সুইজারল্যাণ্ড-এ চলে আসেন। তাঁর পিতা বলেছিলেন : "Your place is not in this village, boy, go out in the world, take your place in the great fight."

সুইজারল্যাণ্ডে রাজমিস্ত্রির যোগাড়ের কাজ করেছেন। ইটের ভারী বোঝা কাঁধে, মাথায় নিয়ে একতলা থেকে ওপরতলায় ভারা বেয়ে ১২১ বার করে দিনে ওঠানামা করেছিলেন। জীবিকা রোজগারের জন্য এই অমানুষিক পরিশ্রম তাঁকে করতে হয়েছে। শেষে এই কাজও তিনি ছেড়ে দিলেন। মার্কসীয় ভাবধারা এই সময় থেকে তাঁর মনে বেশ রেখাপাত করে। অসম্ভব দারিদ্র্য-যন্ত্রণা তিনি প্রতিনিয়ত ভোগ করেছেন। তিনি ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভেঙে পড়েননি। তাঁর উদ্যম ও সঙ্কল্পকে তা আরও শানিত করেছিল। মুসোলিনি নিজেই বলেছেন : "Hunger is a good teacher almost as good as prison and a man's enemies." বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ

করেছে এই ব্যক্তির জীবন। সাংবাদিকতার পথে এসে একজন খুব শক্তিশালী সাংবাদিকরূপে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি খ্যাতি লাভ করেন। সমাজতান্ত্রিক সাপ্তাহিক পত্রিকা [ La Lotta di C lasse ( The Class Struggle ) ] সম্পাদনার দায়িত্ব নেন ২৬ বছর বয়সে—মাসিক ৫ পাউণ্ড বেতনে। সারা জীবন তিনি অর্থের প্রতি উদাসীন ছিলেন। এই তরুণ সমাজতন্ত্রীর বিবাহিত জীবনে প্রথম দিকের অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের নমুনা একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে। যখন তাঁর প্রথম কন্যা এড্ডা [ Edda ] জন্মগ্রহণ করে তখন মুসোলিনির হাতে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৫ লায়ার—তাই দিয়ে সদ্যোজাত শিশুর জন্য খুব সস্তার একটি কাঠের গ্রামীণ দোলনা ক্রয় করেছিলেন। পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর জরুরী বৈঠকের জন্য বিশিষ্ট বন্ধু ও সহযোগীরা দেখা করতে এলে ঘরের বাইরে বার হয়ে দেখা করতে আসার মত পোশাকও জুটত না। [ "And once, when a colleague called for an urgent conference, Mussolini was constrained to hold it from his bed. Rachele ( his wife ) had washed his own pair of trousers and they were drying off in a local bakery." See : Rise and Fall of Benito Mussolini : P. 45. ]

মুসোলিনির চরিত্রে বহু দোষ ছিল। কিন্তু তাঁর সংগ্রামী জীবনে এমন বহু দিক আছে যা যে-কোন দেশসেবকের ও রাজনৈতিক কর্মীর কাছে গভীর শ্রদ্ধার ভাবও জাগাবে। পশ্চিমের পণ্ডিতরা মুসোলিনির ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর বহু গবেষণা করে কালির পোঁচ বুরুশ দিয়ে বুলিয়েছেন। পশ্চিমের গণতান্ত্রিক শিবিরের নেতারা যেন সব ধোয়া তুলসীপাতা! শুধু "গণতান্ত্রিক শিবির"ভুক্ত বলেই তাঁদের সব দোষ ঢাকা পড়ে থাকবে—আর তাঁরাই তাঁদের ভাড়াটে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে হিটলার, মুসোলিনির চরিত্র চিত্রণ করবেন নর্দমার কালো দুর্গন্ধ রং দিয়ে! [ পশ্চিমবাংলার একজন সাংবাদিক—তাঁর ওপর তিনি নাকি মার্কসবাদী! কিছুকাল আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে যে বই লিখেছেন—তাতে ইতালীর আলোচনা করতে গিয়ে মুসোলিনির নারী-লোলুপতা—তাঁর কে রক্ষিতা ছিল—তাই নিয়ে রসাল বর্ণনা করেছেন। সেই সাংবাদিকের ব্যক্তিগত জীবনের বিচার তাঁকে যাঁরা জানেন তাঁরাই করতে পারেন। অদৃষ্টের পরিহাস—তিনি মুসোলিনির ব্যক্তি-চরিত্রের বিচার করলেন। তথাকথিত এই বামপন্থী অগ্নিবর্ষণকারী সাংবাদিক, জন্মলগ্ন থেকেই বিপ্লবকামী অথচ কোটিপতিদের পোষমানা সাংবাদিক কি কখনও এই 'কুৎসিৎ'

মুসোলিনির ব্যক্তিজীবনের অসহনীয় দারিদ্র্যের এক ভগ্নাংশও জীবনে ভোগ করেছেন? উদ্দেশ্য-প্রণোদিত রাজনৈতিক রচনা সম্বন্ধে রাজনীতির নিষ্ঠাবান ছাত্রদের সব সময়ই সজাগ থাকতে হবে।]

মুসোলিনি নিজের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার জোরেই ইতালীর সোস্যালিস্ট পার্টির জাতীয় কার্যকরী সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন। সোস্যালিস্ট দৈনিক পত্রিকা Avanti-র সম্পাদনার দায়িত্ব ১৯১২ সালে তাঁর হাতে এসে পড়ে। এই রুগ্ন স্বল্প প্রচলিত পত্রিকার প্রচলন ৪ গুণ বৃদ্ধি পেল। তাঁর গরম গরম সম্পাদকীয় পত্রিকার মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালী যোগ দেবে কিনা এই প্রশ্নে মুসোলিনির সঙ্গে কমিউনিস্ট-ভাবাপন্ন সোস্যালিস্ট পার্টির চরম মতভেদ দেখা দিল। মুসোলিনি, আগেই বলেছি, যুদ্ধে যোগ দেবার পক্ষে—সোস্যালিস্টরা বিপক্ষে। মুসোলিনিকে দল থেকে বহিষ্কার করা হল। মুসোলিনি তখন প্রায় একা। যে বিরাট দলের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন—Avanti-দৈনিকের সম্পাদক ছিলেন—সবকিছু ছেড়ে আসতে হল। পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে ৫০০ লায়ার মাসিক বেতন তাঁর জীবনে খুব বড় অঙ্ক ছিল। নীতি নিয়ে যখন মতভেদ হল তিনি সবকিছু ছেড়ে এলেন—পুনরায় অসহনীয় দারিদ্র্য বরণ করে নিলেন। একটি মফঃস্বল শহরে এসে একটি অখ্যাতনামা কাগজের সম্পাদকের কাজ নিলেন। এই কাগজই পরে 'Il Popolo d' Italia' বলে খ্যাতি লাভ করে। এই কাগজ ছিল যুদ্ধের সমর্থক। পত্রিকার প্রচলন দেখতে দেখতে লক্ষাধিক হয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ সমর্থক জুটে গেল মুসোলিনির ভাবধারার। পত্রিকাকেই তিনি তাঁর প্রধান বাহন করলেন। একাজে তিনি সফল হলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মুসোলিনি সৈনিক হিসাবে যোগ দেন এবং পরিখায় দিনের পর দিন থেকে যুদ্ধ করেছেন। গোলার বিস্ফোরণে তিনি গুরুতররূপে আহতও হন। পরিখার কয়েকজন সৈন্য ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এ সম্বন্ধে তাঁর আত্ম-জীবনীতে বিবরণ আছে (My Autobiography, P. 56)। তখন Lance Sergeant পদে প্রোমোশন পেয়েছেন সবে। সর্বাঙ্গে অসংখ্য বোমার ও লোহার ৪৪টি টুকরো ঢুকে গিয়েছিল। হাসপাতালে চিকিৎসকরা ২৭টি অস্ত্রোপচার করেন তাঁর শরীরে। মনের জোর ছিল তাঁর অসাধারণ। ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠে—সৈনিকের জীবন ছেড়ে আবার সাংবাদিকতার বৃত্তি অবলম্বন করলেন।

১৯১৯ সালের নির্বাচনে ফ্যাসিস্ট দলের শোচনীয় পরাজয় সোস্যালিস্টদের মনে ধারণা জাগাল যে, মুসোলিনির প্রভাব বোধহয় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। তারা

তাঁর পত্রিকার অফিস অবরোধ করে ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করে (এক-একজন গুণ্ডাকে ২০ লায়ার করে দেওয়া হয়েছিল)। সোস্যালিস্টরা পথেঘাটে তাঁকে অপমান ও আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মুসোলিনির সাহসিকতা ও দৃঢ় সঙ্কল্পের কাছে তারা পরাজিত হয়েছে। তাঁর কাগজ যখন খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তখন পত্রিকার ম্যানেজার তাঁর ভাই—তাঁর জন্য একটা ভাল আরাম কেদারা অফিসঘরে আমদানী করেছিলেন। ক্রুদ্ধ মুসোলিনি তাকে সেই আরাম কেদারা সরিয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে বললেন: "Take it away, d'you hear me? Armchairs and slippers are the abomination of mankind." যুদ্ধোত্তর কালের অসহনীয় অরাজকতা, কমিউনিজম-এর বিভীষিকা, বিগত ৩ বছরের মধ্যে ৬টি সরকারের উত্থান-পতন, সোস্যালিস্টদের হিংসাশ্রয়ী অগণতান্ত্রিক রাজনীতি মুসোলিনির সহায়ক হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইতালীয় ও জার্মান পরিস্থিতির মধ্যে একটা বড় পার্থক্য এই ছিল যে, জার্মানী "মিত্রপক্ষ" বলে পরিচিত জোটের বিরুদ্ধে লড়াই করে পরাজয় বরণ করে। জার্মানীর ওপর ভার্সাই সন্ধিচুক্তির অপমানকর সর্তাবলী চাপান হয়। আর ইতালী যুদ্ধে "মিত্রপক্ষে"র সামিল হয়ে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু জয়ী হয়েও বখরা গোছানোর ব্যাপারে ইতালীর ভাগ্যে কিছু জুটল না। জাতির মানসে এক হতাশা সঞ্চারিত হয়েছিল। যুদ্ধে প্রায় ৬ লক্ষ ইতালীয় সৈন্য প্রাণ দিয়েছিল। জার্মানীর ক্ষেত্রে ছিল পরাজয়ের গ্লানি আর ভার্সাই এর অপমান। ইতালীর জনমানসে আত্মবিশ্বাসের প্রচণ্ড অভাব দেখা দিয়েছিল—দেশের সার্বিক স্বার্থ ও কল্যাণচিন্তা যেন রাজনীতি থেকে নির্বাসিত হয়েছিল মনে হবে। সরকারও সম্পূর্ণ উদাসীন। জাতীয় স্বার্থের এই অমার্জনীয় অবহেলা দেশের জাতীয়তাবাদীদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। গোটা জাতি আত্মকলহে লিপ্ত থেকে দেশকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছিল। এই সম্বন্ধে তৎকালীন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে মুসোলিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন:

"Politicians and philosophers; profiteers and losers. for at least many had lost their illusions; sharks trying to save themselves, promoters of the war trying to be pardoned, demagogues seeking popularity; spies and instigators of trouble waiting for the price of their treason; agents paid by foreign money; in a few months threw the Nation into an awful spiritual crisis. I saw before me with awe the

gathering dusk of our end as a nation and a people." (My Autobiography : P. 67.)

দেশের রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক—যাঁরা বেশ কিছু কামিয়েছেন আর যাঁরা খুইয়েছেন—সহাবস্থান করে চলেছিলেন; অনেকেরই মোহ ভেঙেছিল দেশের পরিস্থিতি দেখে। সামাজিক হাঙর ও প্রবঞ্চকের দল নিজেদের গা বাঁচিয়ে চলছিল, যুদ্ধ যাঁরা বাধিয়েছিলেন—তাঁরা নিজেদের দোষ ঢাকার ফন্দিফিকির নিয়ে মত্ত। হাততালি-লোভী রাজনৈতিক উত্তেজনাসঞ্চারকারী দায়িত্বহীন গণবক্তারা সস্তা বাহাদুরী ও জনপ্রিয়তার লোভে বেসামাল, গুপ্তচর—অসৎকর্মের প্ররোচক দুষ্কৃতকারীর দল তাদের দুষ্কর্ম ও বিশ্বাসঘাতকতার বকশিস আদায়ের ধান্দায় মশগুল। বিদেশীশক্তির দালাল ও অনুচররা বিদেশের অর্থে পুষ্ট হয়ে দেশের মধ্যে অবলীলাক্রমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এককথায় কয়েক মাসের মধ্যে সমগ্র জাতি যেন এক ভয়ঙ্কর নৈতিক সঙ্কটের পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত হল। আমি স্পষ্টই লক্ষ্য করলাম সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎকে ধ্বংসের করাল অন্ধকার যেন গ্রাস করতে উদ্যত।

মুসোলিনি আরও দেখলেন নৈতিক অধঃপতনের প্রচণ্ড ঢল নেমেছে। সেই ঢল যেন সব কিছুকে ভাসিয়ে নিতে উদ্যত। কেন্দ্রীয় সরকার অক্ষম পঙ্গু। শুধু প্রশাসনের বাঁধ দিয়ে এই ভয়াল অবক্ষয়ের ঢল প্রতিরোধ করা অসম্ভব। চাই নূতন দর্শন যেখানে রাষ্ট্র-স্বার্থ পাবে সর্বাধিক অগ্রাধিকার—কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থ যেখানে কোন বাধা রচনা করতে পারবে না।

মুসোলিনি যেকথা বললেন সেকথা ইতালীর সঙ্কটের মুহূর্তে যে-কোন দেশভক্তই উপলব্ধি করবেন। জাতির সামগ্রিক অবক্ষয়ের ধসকে রুখতে হলে নূতন বিশ্বাস, আদর্শবাদ ও নূতন মূল্যবোধের বাঁধ নির্মাণ করা দরকার হয়। মুসোলিনি কিন্তু সেই মূল্যবোধের ভিৎ স্থাপন করতে পারেননি। তাঁর দল সে ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। মুসোলিনি তাঁর আত্মজীবনীতে এক জায়গায় লিখেছেন :

"Men must live in harmony with the faith by which they are pushed on ; they must be inspired to the most absolute disinterestedness. True men in politics, must be animated by the humane and devout sense. They must have a regard, a love and a deep vision toward their own fellow creatures. And all these qualities must not be defiled by dissimulations

or rhetoric or flatteries or compromises, or servile concessions..." ( My Autobiography : P. 97 )

নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে পূর্ণ সংগতি রেখেই আমাদের জীবন যাপন করতে হবে। যে-বিশ্বাস বা জীবনদর্শন মানুষকে তার লক্ষ্যের অভিমুখে ঠেলে নিয়ে যায় সেই বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে জীবনযাত্রা ও জীবনের সামঞ্জস্য থাকা চাই। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। যাঁরা জীবনে সত্যি সত্যি রাজনীতিতে টিকে থাকতে চাইবেন তাঁদের মন হওয়া চাই সংবেদনশীল এবং সন্ন্যাসীর মত নিরাসক্ত। দেশবাসীর প্রতি হতে হবে পরম সহানুভূতিশীল। রাজনৈতিক কর্মী বা নেতার জীবনে এই গুণগুলি প্রতিফলিত হওয়া চাই। আপোষ করে প্রতি পদে আত্মসমর্পণ করে—আদর্শকে কলুষিত হতে দেওয়া কখনই উচিত নয়। তোষামোদ, গালভরা বক্তৃতার ফুলঝুরি ঝরিয়ে সস্তায় বাজিমাৎ করার প্রবণতা—রাজনীতিবিদের আদর্শবিচ্যুতি ঘটিয়ে থাকে।

মুসোলিনি বড় আদর্শের গালভরা কথা শোনালেন—নূতন নৈতিকতার—আত্মবিশ্বাস—জনতার প্রতি আবেগ ও দরদের কথা বললেন—কিন্তু তিনিই তো নিজে পরবর্তীকালের আচরণ দিয়ে নিজের সুন্দর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা—আত্মোপলব্ধিকে নস্যাৎ করেছিলেন। তিনি পররাজ্যগ্রাসে প্রবৃত্ত হলেন—উপনিবেশ স্থাপনের ঘৃণ্য পথে পা বাড়ালেন। অসহায় আবিসিনিয়ার ধর্ষণকে সভ্য সমাজ চিরদিন ঘৃণার চোখে দেখবে। তাঁর ফ্যাসিস্টদল কমিউনিস্টদের মতই হিংসার কুটিল রাজনীতিকেই অবলম্বন করল এবং হিংসা-হত্যার-নিপীড়নের পথ ধরে সর্বনাশ ডেকে আনল। জাতির জীবনে সুমহান আদর্শের অভাব ঘটলে একটি শক্তিশালী মদমত্ত দল বিপ্লবোত্তরকালে কি বিপর্যয় জাতির জীবনে ডেকে আনে তার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিয়ে গেল ফ্যাসিস্ট ইতালী।

গোটা ১৯২৩ সাল ইতালীতে হিংসার তাণ্ডব চলল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হল, নানা রকম কঠিন আইনের শিকল দিয়ে সমাজকে বাঁধবার চেষ্টা চলছিল। বিরোধীদল, শ্রমিক সংগঠনগুলির স্বাধীনতা কাগজ-কলমেই ছিল বলা যেতে পারে। সোস্যালিস্টরা তখন বহুভাগে বিভক্ত। কমিউনিস্টরা সোস্যালিস্ট-বিরোধী অভিযানে ব্যস্ত। পুরাতন সোস্যালিস্ট পার্টির নূতন নামকরণ হল Maximalist Socialist Party [ Partito Socilista Massimalista ]। এই দলটিও 'কমিণ্টার্ণের' প্রতি আনুগত্য রেখেই কাজ করছিল। ধীরে ধীরে এই দলের বেশির ভাগ সদস্যই কমিউনিস্টদের

সঙ্গে চলে গেলেন। আদর্শ ও চিন্তাধারার গোঁজামিল, কর্মসূচীর অস্পষ্টতা এই দলের সঙ্কট ডেকে এনেছিল। এই দল ছিল সোস্যালিস্ট শক্তির মধ্যপন্থী ( centre ) শক্তি। Italian Workers' Socialist Party—ছিল দক্ষিণ-পন্থী অংশ। তার নেতা ছিলেন টুরাতি ( Turati )। আর তার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন Giacomo Matteotti। তিনি ছিলেন অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান এবং পার্লামেণ্টের একজন শক্তিশালী বক্তা। পরিষদে তিনিই ছিলেন ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে একনিষ্ঠ সংগ্রামী পরিষদীয় নেতা। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী স্পষ্ট ভাষণের জন্য ফ্যাসিস্টরা তাঁকে হত্যা করল। তাঁর এই আত্মদান আদর্শবাদী মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল। মুসোলিনি ও তাঁর দলের গঠনতান্ত্রিক হিংসাত্মক সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপের প্রতিবাদে এবং উদারপন্থী সোস্যালিস্ট নেতা মাত্তিয়োত্তির নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে টুরাতির নেতৃত্বে প্রায় ১৫০ জন ইতালীয় চেম্বারের সদস্য পরিষদ বয়কট করলেন। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সোস্যালিস্ট নেতা মাত্তিয়োত্তির হত্যা সম্পর্কে ধৃত ফ্যাসিস্ট সহযোগী রোসি ( Rossi ) এই হত্যা সম্পর্কে বহু তথ্যপূর্ণ একটি স্মারকলিপি দাখিল করলেন। তাতে অনেক তথ্য ফাঁস হয়ে গেল। সোস্যালিস্ট ডেপুটীরা মাত্তিয়োত্তির হত্যার প্রতিবাদে চেম্বার বয়কটের যে সিদ্ধান্ত নিলেন তা 'Aventine Secession' বলে পরিচিত। [ রোম-এর ইতিহাসে সংগ্রামরত অবহেলিত প্লেবীয়ানরা ( Plebs ) রোম নগরী পরিত্যাগ করে যেমন চলে গিয়েছিল তেমনি যেন সোস্যালিস্ট ডেপুটীরা পার্লামেণ্ট পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। সেইজন্যই একে Aventine Secession বলা হয়। ] মুসোলিনিও এই সুযোগে চেম্বারে এই বিপুলসংখ্যক সোস্যালিস্টদের সদস্যপদ খারিজ করে দিলেন। সমস্ত বাধাই দূরীভূত হল। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করলেন। ইতিহাসে সংসদীয় গণতন্ত্রই যে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করতে পারে—তারই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করল ইতালীতে ফ্যাসীবাদের উদ্ভবে।

'রোসি মেমোরাণ্ডাম'-কে কেন্দ্র করে বিচার-বিভাগীয় তদন্তে মুসোলিনিও হয়ত জড়িয়ে পড়তেন। মুসোলিনি মন্ত্রিসভার কয়েকজন নরমপন্থী সদস্যও প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন ২রা জানুয়ারী। 'রোসি মেমোরাণ্ডামে' উল্লিখিত বহু চাঞ্চল্যকর তথ্যকে কেন্দ্র করে অভিযোগ এনে মুসোলিনি ও তাঁর সহযোগীদের বিচার দাবী করে পার্লামেণ্টে ( চেম্বার ) প্রস্তাব আনার সংসদীয় বিধান ছিল। কিন্তু বিরোধীদের সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। কেননা মুসোলিনি তো

আগেই তাঁর 'Two-thirds Act' আইন পাশ করিয়ে নিজের শক্তি কায়েম করে নিয়েছিলেন। বিরোধী-পক্ষও ভোটে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে যাবেন এই জেনে আর চেম্বারের অধিবেশনে হাজির হলেন না। এ-ও আর এক মারাত্মক ভুল তাঁরা করলেন। তাঁরা মস্ত সুযোগ হারালেন। ৩রা জানুয়ারী ( ১৯২৫ ) চেম্বারের এক ঐতিহাসিক ভাষণে মুসোলিনি বললেন :

"Article 47 of the Constitution say : The Chamber of Deputies has the right of impeaching the ministers of the Crown before the High Court of Justice. I solemnly ask whether there is anybody in this Chamber or out of it who wishes to avail himself of Article 47 ?

অর্থাৎ চেম্বারের ডেপুটীদের সংবিধানের ৪৭ ধারা অনুযায়ী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অভিযুক্ত করে বিচার দাবী করার অধিকার আছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমি জানতে চাইছি চেম্বারের ভিতরে বা বাইরে এমন কোন সদস্য আছেন যিনি সংবিধানের এই ৪৭ ধারার সুযোগ নিতে চান ?

মুসোলিনির এই চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার মত সদস্য কেউ ছিলেন না। সোস্যালিস্ট ডেপুটি মাত্তিয়োত্তি একদিন পার্লামেণ্টে নির্ভীক সৈনিকের মত মুসোলিনিকে চ্যালেঞ্জ করার পরই গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দেন। কোন কমিউনিস্ট এত সততা নিষ্ঠা ও সাহস দেখাননি। ডিক্টেটরদের ভয়াল ভ্রূকুটির কাছে, উদ্যত মেসিনগানের কাছে ইতিহাসে বহুবার গণতন্ত্রের ও মানবিকতার পরাজয় ঘটেছে, অবশ্য সাময়িকভাবেই। ইতালীতেও তাই হল। মুসোলিনি প্রকাশ্যেই পার্লামেণ্টে দম্ভ করে ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস ও হিংসার দায়িত্ব নিজেই নিলেন। তবে তিনি মাত্তিয়োত্তির হত্যার দায়িত্ব অস্বীকার করলেন। রোসি ছাড়া পেলেন। ইতালীতে ফ্যাসিস্ত একনায়কতন্ত্র-রথের সারথিরূপে মুসোলিনি দুর্বার গতিতে গণতন্ত্র-স্বাধীনতা মানবিক অধিকার ও মূল্যবোধ-গুলিকে দলিত পিষ্ট করে তাঁর অপ্রমত্ত ক্ষমতার রথ ছোটালেন।

ইতালীর রাজনৈতিক পটভূমির বিশ্লেষণ থেকে একটা জিনিস খুব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় : কমিউনিস্ট ও মার্কসিস্ট সোস্যালিস্টরাই সেদেশে ফ্যাসী-বাদের অভ্যুদয়ের জন্য মুখ্যত দায়ী। মার্কসীয় চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত হয় সেদেশের সোস্যালিস্টদের ভ্রান্ত রাজনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী। ইতালীর মার্কসীয় ও লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন গোঁড়া সোস্যালিস্টরা হিংসা ও গণতান্ত্রিক আচরণ ও সন্ত্রাসের ক্ষেত্র রচনা করেছে। আর ফ্যাসিস্টরা তার সুযোগ

নিয়েছে। মুসোলিনি এই হিংসাবাদীদের নিজের নেতৃত্বে শৃঙ্খলার বন্ধনে বেঁধেছিলেন।

মুসোলিনির চরিত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে W. Hilton Young বলেছেন:

"The formation of the political character of Mussolini himself is perhaps in the last resort the gravest charge that can be brought against the socialist movement in Italy, for he was in effect no more than a bundle of socialist attitudes slightly rearranged and informed with a powerful and brutal character. He had from Socialism class hatred, corporativism, the will to revolution, a contempt of democracy, and intolerance of political ideas other than his own; he showed how easy it was for a socialist to fall over the edge, to go bad. He was able to turn into nationalist hatred the technique of class hatred which he had learnt from the Socialist Party……."

সমাজতন্ত্রীদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা পরিবর্তন করে নিজের মতন করে নেন মুসোলিনি। মুসোলিনির নির্দয় জবরদস্ত চরিত্রের সংমিশ্রণ ঘটেছিল এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে—এই যা। সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন 'শ্রেণীবিদ্বেষ', 'করপোরেট' রাষ্ট্র-ব্যবস্থার চিন্তাধারা, বিপ্লব সংগঠিত করার স্পৃহা, গণতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা। তিনি সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে পরমত-অসহিষ্ণুতার মনোভাব গ্রহণ করেন। নিজের মত ছাড়া ভিন্ন মতকে তিনি বরদাস্ত করতেন না। মুসোলিনি 'বলশেভিক বিপ্লব' চাননি। তিনি চেয়েছিলেন ইতালীতে ইতালীয় বিপ্লব ("Revoluzione I-TA-LIA-N-A".) The [Italian Left: W. Hilton Young: Longman, Green & Co.]। মার্কসিস্ট সোস্যালিস্টরা এবং ফ্যাসিস্টরা উভয়েই পার্লামেণ্ট ও সাংবিধানিক গণতন্ত্রের শ্বাসরোধ করে অপমৃত্যু ঘটিয়েছে।

গণতান্ত্রিক কাঠামোর সুযোগ নিয়ে কমিউনিস্ট ও মার্কসিস্ট ভাবাপন্ন সমাজতন্ত্রীদের আত্মঘাতী হিংসাত্মক-সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিকে কাজে লাগিয়ে দেশের যুব-সমাজের সমর্থন নিয়ে মুসোলিনি ইতালীর ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯২২ সালেও পার্লামেণ্টে তাঁর দলে ছিল মাত্র ৩৬

জন ফ্যাসিস্ট ডেপুটী, সমস্ত পার্লামেণ্টের সদস্যসংখ্যার শতকরা ৭ ভাগ। পার্লামেণ্টারী প্রথায় ক্ষমতা দখল করে পার্লামেণ্টকেই শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালেন তিনি। সেনেটের সভায় তিনি সদম্ভে ঘোষণা করলেন :

"Who could have stopped me from proclaiming an open dictatorship? Who could have resisted a movement that represented not just 3,00,000 party ticket holders but 3,00,000 rifles?" [Italy—by Denis Mack Smith; Ann Arbor : The University of Michigan Press : P. 374] প্রকাশ্যে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমাকে বাধা দেবে কে? আমার পেছনে শুধুমাত্র ৩ লক্ষ পার্টি সদস্যই আছে, তাই নয়—আরও আছে ৩ লক্ষ রাইফেল। মাও-সে-তুঙ-ও তো বলেছেন "বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস"। ফ্যাসিস্ট ও কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গীজনিত কৌশলগত ঐক্য লক্ষ্যণীয়।

মুসোলিনি ১৯২৬ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়াও স্বরাষ্ট্রদপ্তর, নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী, বিমানবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, তাঁর দলের দলীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, বিভিন্ন করপোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং সর্বোপরি কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট-ও রয়ে গেলেন। এককথায় সমস্ত ক্ষমতাই তিনি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন।

ইতালীয় ফ্যাসীবাদের কোন সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক নীতি বা পরিকল্পনা ছিল না। ব্যক্তিগত পুঁজির ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তবে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বাড়তে থাকে শিল্পের ওপর। ১৯৩০ সাল থেকে মুসোলিনি বলতে সুরু করেন দেশের অর্থনৈতিক লক্ষ্য : স্বয়ম্ভরতা (Economic self-sufficiency)। "Laissez faire is out of date"—অবাধ পুঁজিবাদ এ যুগে একেবারেই অচল। কোন শ্রমিককে কোন কলে-কারখানায় কাজ পেতে হলে সর্বত্র তাকে একটা 'পাশ' ('Worker's pass') নিতে হত। আর সেই পাশবই-এ সেই শ্রমিকের রাজনৈতিক অতীত এবং কল-কারখানায় কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশিত করার বাধ্যবাধকতা ছিল। [রাশিয়ায়ও ট্রট্স্কীর চিন্তাধারা অনুযায়ী কুখ্যাত 'লেবার বুক'-প্রথা চালু আছে। স্তালিন এই ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।] মুসোলিনি গণতন্ত্রকে নির্বাসিত করলেন। তাঁর অনুগামীরা দিকে দিকে প্রচার করলেন "Mussolini is always right"—'মুসোলিনি কখনও ভুল করেন না'। [কমিউনিস্টরাও নিজেদের দল ও নেতাদের সম্বন্ধে অনুরূপ কথাই বলে থাকেন—'Moscow

can do no wrong', 'Peiking can do no wrong'। স্তালিন, মাও সে-তুঙ হো চি মিন, ক্যাষ্ট্রো—'অভ্রান্ত'; মার্কস-এঙ্গেল্‌স্‌-লেনিন—'অভ্রান্ত'।] ফ্যাসিস্টরা ঘোষণা করলেন:

"Fascism is the purest kind of democracy, so long as people are counted qualitatively and not quantitatively."

"The ideals of democracy are exploded, beginning with that of 'progress'. Ours is an aristocratic country; the State of all will end by becoming the State of a few."

এসব তত্ত্বকথা স্বয়ং মুসোলিনির। ধৃতাস্ত্র জাতিরাষ্ট্রের প্রতি সকল নাগরিকের চরম ও শেষ আনুগত্য থাকবে। সেই জাতিরাষ্ট্রের (Nation-state) নিজস্ব নীতি-বোধ সামাজিক মূল্য-বোধ থাকবে।

"The fascist conception of the state is all-embracing, and outside of the state no human or spiritual value can exist, let alone be desirable."

ফ্যাসীবাদ বলে: রাষ্ট্রই সব—তার বাইরে কিছু নেই –থাকা উচিতও নয়। সেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই সর্বপ্রকার মানবিক ও আত্মিক মূল্যবোধের আধার। কমিউনিস্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকেও কমিউনিস্টরা এই দৃষ্টিতে দেখেন। মুখে সর্বহারার আন্তর্জাতিক বিপ্লবের কথা বললেও কমিউনিস্টরাও আসলে পাকা জবরদস্ত জাতীয়তাবাদী। [অবশ্য ভারতের কমিউনিস্ট বা মার্কসিস্টরা দেশপ্রেমের ধার ধারেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই মগজ ধোলাই করেছেন সুপরিকল্পিত উপায়ে।]

ফ্যাসিস্টদের কয়েকটি স্লোগান উল্লেখযোগ্য: "He who has steel has bread"; "Better to live one day as a lion than a hundred year as a sheep"—একশত বছর ভেড়ার মত ক্লীবের জীবন যাপন করার চাইতে—একদিন বীর সিংহের জীবন যাপন করা শ্রেয়, "Nothing against the state, nothing outside the state"—রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনকিছুই নয়, রাষ্ট্রের বাইরেও কোন কিছু নয়। 'Nothing is ever won in history without bloodshed"—বিনা রক্তপাতে পৃথিবীতে কোনকিছুই জয় করা যায় না। এইসব স্লোগানের সঙ্গে মাও-সে-তুঙ-কর্তৃক প্রদত্ত অনুরূপ স্লোগানের কোন তফাৎ নেই। মাও-সে-তুঙ চান আণবিক যুদ্ধ করে বিশ্ব ধ্বংস হোক—কেননা ঐ ধ্বংসের পর যারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে তারা 'স্বাধীনভাবে'

শান্তিতে বাস করতে পারবে। তারাই নাকি কমিউনিস্ট স্বর্গ গড়ে তুলতে পারবে।

কমিউনিস্ট বা মার্কসিস্ট পার্টিকে যে ধাঁচে গড়ে তোলা হয়, মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট পার্টিকেও সেই ধাঁচে গড়ে তুলেছিলেন। নেতা ও অনুগামী সদস্যদের মধ্যে ব্যবধান ছিল দুস্তর। পার্টি ব্যুরোক্র্যাটদের দাপট ছিল প্রচণ্ড। ফ্যাসিস্ট দর্শনের তাত্ত্বিক খোরাক জুগিয়েছিলেন সিসিলির দার্শনিক Giovanni Gentile। দার্শনিক ক্রোচ-ও উদারপন্থীদের সম্পর্কচ্ছেদ করে চলে আসেন ফ্যাসিস্ট শিবিরে ১৯২১-২২ সালে। ১৯২৫ সালে তিনি দলের ম্যানিফেস্টো রচনা করেন। সে যুগের অনেক বড় বড় পণ্ডিতরা এই কর্মসূচীতে সামিল হয়েছিলেন। মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রীও হয়েছিলেন জেন্টিল্। বিখ্যাত দার্শনিক ক্রোচ-ও (Croce) প্রথমদিকে শক্তিশালী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পক্ষে মত প্রচার করে ফ্যাসিস্ট মতবাদ প্রচারে সহায়তা করেছিলেন। ফ্যাসীবাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুসোলিনির মন্তব্যকে ভিত্তি করে দার্শনিক জেন্টিল্ বলেছিলেন: "Authority of the state and liberty of the subject are counterparts and inseparable…Fascism does not oppose authority to liberty but sets a system of real and concrete freedom against an abstract and false parody… a strong state was necessary in the interest of liberty itself…" [See: Italy—A Modern History: P. 413]

অর্থাৎ স্বাধীনতা ও প্রাধিকার, জনগণের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। দুটো তত্ত্ব একই বস্তুর দুই পিঠ মাত্র। ফ্যাসিবাদ কাল্পনিক স্বাধীনতা বিকৃত স্বাধীনতা বর্জন করে। তা আসল বাস্তব ও মূর্ত স্বাধীনতার প্রতীক। জেন্টিলের মতে…"Corporate State by stressing identification of liberty with authority…is actually more liberal than the old." স্বাধীনতা ও প্রভুত্ব-রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বপনা দুই-ই এক জিনিস। আর ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র নাকি আরও উদারতন্ত্রী।

পরবর্তীকালে জেন্টিলের সঙ্গে মুসোলিনির মতভেদ দেখা দেয়। ফ্যাসিবাদ ছিল ধর্মযাজক শ্রেণী-বিরোধী (anti-clerical)। গীর্জার কর্তৃত্বকে না মেনেছিলেন হিটলার, না মেনেছিলেন মুসোলিনি। [কমিউনিস্টরাও তো সকল কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে ধর্মীয় সম্প্রদায় বিদ্বেষী। ভারতের কমিউনিস্টরাও ধর্মবিরোধী। তবে ভোটে জিতবার জন্যে মন্দিরে-মসজিদে লুকিয়ে[illegible]কিয়ে মানত করতে যান,

গণৎকার দিয়ে কোষ্ঠী বিচার করান—ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনার কথা মনে রেখে বগলামুখী কবচ ধারণ, ধাতু ধারণ, পুজো-পার্বণ সব কিছুরই আশ্রয় নিয়ে থাকেন ! ] অবশ্য মুসোলিনি ১৯২৯ সালের পর গীর্জার পাদরিদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় এসেছিলেন। এ বিষয়কে নিয়ে জেন্টিল্ ও মুসোলিনির মধ্যে মতভেদ হয়। ১৯৪৪ সালে ফ্যাসিস্ট-বিরোধীদের হাতে অধ্যাপক জেন্টিল্ প্রাণ দেন।

ইতালীর ফ্যাসিবাদের পেছনে কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ববাদী রাজনৈতিক ভাবধারার ট্রাডিশন ছিল। গ্যারিবল্ডি, ম্যাৎসিনির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। গ্যারিবল্ডি একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। ম্যাৎসিনি অতিরিক্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। সমগ্রতন্ত্রবাদের দিকে তাঁর সুস্পষ্ট ঝোঁক ছিল বলা যেতে পারে। [ Totalitarian theocracy—তাঁর 'ideal State'-এর কল্পনা ছিল। ] তিনি শ্রেণী-সংগ্রামের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। আবার এও ঠিক, গ্যারিবল্ডি ও ম্যাৎসিনি প্রগতিশীল বাম মার্গ-পন্থী ছিলেন। ইতালীর ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জাতীয়তাবাদীরা এই দুই নেতার আদর্শ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। ফ্যাসিস্টরা তো বটেই। ইতালীর সোশ্যালিস্ট পার্টি উদারপন্থী গণতান্ত্রিক দলগুলির সঙ্গে মিলেমিশে কোয়ালিশন সরকার গঠনের দায়িত্ব ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত এড়িয়ে গিয়েছে। এতে সমাজতন্ত্রীদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ১৯০৩ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে জিয়োলিত্তির ( Giolitti ) সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছে এই দল। ১৯১৯ সালে সোশ্যালিস্টদের কাছে নির্বাচনের পর দেশশাসনের সুযোগ এসেছিল। কিন্তু তারা সেদিনও দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। এই দল বামপন্থীর নামে মার্কসীয়-ভাবধারায় আচ্ছন্ন হয়ে বড় বড় কথা কপ্‌চিয়েছে মাত্র—বামপন্থী খোকামির আশ্রয় নিয়ে নিজেদেরই ক্ষতি করেছে। ১৯১৯-২১ সালে সোস্যালিস্ট পার্টির সাংগঠনিক শক্তি ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু দলের অন্তঃসারশূন্য রাজনীতি বামপন্থী খোকামি—দেশের মানুষকে মুসোলিনির দিকেই ঠেলে দিয়েছিল। সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা ফ্যাসিবাদের পথ করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কি কমিউনিস্ট পার্টি কি সোস্যালিস্ট পার্টি—ক্ষমতায় আসার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত দুই দলের কেউই ক্ষমতায় আসতে পারেনি। আজও সোস্যালিস্টরা দুই ভাগে বিভক্ত—দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী আর বামপন্থী সমাজতন্ত্রী (Nenni Socialists)। প্রথম দলটি ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক

দলের লেজুড়। আর বাম সমাজতন্ত্রীরা কমিউনিস্টদের অনুগ্রহপ্রার্থী—উপাঙ্গ। ইতিহাস সুযোগ বার বার দেয় না। ইতিহাস উপর্যুপরি কয়েকবার সোস্যালিস্টদের সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করায় সোস্যালিস্টদের প্রচুর মাশুল দিতে হয়েছে। প্রকৃতি শূন্যতা বরদাস্ত করে না। ইতালীর রাজনীতিতে সৃষ্ট শূন্যস্থান ইতিহাসের এক মোড় নেবার মুখে অন্যেরা পূর্ণ করেছে। ইতালীর বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের রাজনৈতিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যে কোন রাজনীতির ছাত্রের কাছে সর্বপ্রথম সমাজ-তন্ত্রীদের আত্মকলহ, আদর্শবাদ, আত্মবিশ্বাস ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির একান্ত অভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। বার বার সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে দল ভাঙা-চোরা হয়েছে। দেশের বিহ্বল জনগণ বুঝতেই পারেনি সমাজতন্ত্রীরা আদৌ কি চায়। ইতালীর সোস্যালিস্ট পার্টির জন্মলগ্ন ১৮৯২ সাল। নৈরাজ্যবাদীদের (anarchist) মতবাদের প্রতিবাদেই এই দলের জন্ম। ১৯০৮ সালে সিণ্ডিক্যালিস্ট ও ১৯১২ সালে সংস্কারপন্থী (Reformists)-দের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে দলের কি ভূমিকা তাই নিয়ে আবার দ্বন্দ্ব দেখা দিল। মুসোলিনি ও তাঁর জঙ্গীগোষ্ঠী দল থেকে চলে এলেন। ১৯২১ সালে কমিউনিস্টরা দল ছেড়ে চলে এলেন (Bombacci and Gramsci)। আবার ১৯২২ সালে আর এক দল সংস্কারপন্থী সমাজতন্ত্রীদের দল থেকে বহিষ্কার করা হল (Turati)। ১৯৩৪ সালে পুনরায় সংস্কারপন্থী সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে ঐক্য সাধিত হল। ১৯৩৪ সালে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা সংঘাতের পথ পরিহার করে আবার সমঝোতা করে নিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭-১৯৪৮ সালে দুই দফায় দলের ভাঙন দেখা গেল।

# ১০

## চীন পরিস্থিতি ও কমিণ্টার্ণ

রুশ-চীনের মধ্যে যখন রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে প্রকাশ্য বৈরিতা সুরু হল তখন পিকিং-এর মাওপন্থী কমিউনিস্ট নেতারা প্রকাশ্যেই ক্রুশ্চভকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন বিংশতিতম রুশ কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনে স্তালিনের নিন্দা করায়। চীনের নেতারা সেদিন প্রকাশ্যেই—যে-স্তালিন তাঁদের সর্বনাশা পরামর্শ দিয়ে, বিপ্লবের প্রথম ও পরের পর্যায়ে বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দিয়েছিলেন —তাঁরই বন্দনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। এরও কোন নৈতিক বা তাত্ত্বিক কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

রুশ-কমিউনিস্ট নীতির সমালোচনার অনেক সঙ্গত কারণ চীনের দিকে ছিল, আছে ও থাকতে পারে। কিন্তু স্তালিন-বন্দনার কোনই কারণ ছিল না। তবে হাল আমলে চীনে স্তালিন-বন্দনায় কিছুটা ভাঁটা পড়েছে। স্তালিনবাদ ও মাওবাদ পাশাপাশি সহ-অবস্থান করতে পারে না। সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্তালিন-বন্দনা এক জিনিস, আর প্রয়োজন মিটে গেলেও সেই স্তালিনের বন্দনা সম্পূর্ণ আর এক জিনিস। তাতে মাও-সে-তুঙ-এর নিজের ভাবধারার তাত্ত্বিক অস্তিত্বের ভিত্তিই বিপন্ন হবে একদিন। মাও-সে-তুঙ সে সম্বন্ধে সচেতন। রাজনীতির ছাত্ররা আশ্চর্য হবেন না যদি কমিউনিস্ট চীনে অদূর ভবিষ্যতে স্তালিনবাদীদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করে—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন থেকে নির্মূল করার চেষ্টা করেন মাও-সে-তুঙ অথবা তাঁর অবর্তমানে তাঁর উত্তরাধিকারীরা।

মাও-সে-তুঙ ও তাঁর অনুগামীরা এবং রাজনীতির ছাত্ররা জানেন "শোধনবাদী" মস্কো-নেতৃত্ব স্তালিনের কয়েকটি কার্যকলাপ ও নীতির তীব্র সমালোচনা করলেও যে-পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের ফলে স্তালিন "সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমির" ভৌগোলিক আয়তন ও শক্তি বৃদ্ধি ঘটাতে পেরেছেন তার কোন নিন্দা কোনদিনই করেননি। মস্কোর "শোধনবাদীরা" পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পাকা স্তালিনবাদী সম্প্রসারণবাদী। যেমন চীনের মাওবাদীরা পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পাকা সুবিধাবাদী ও সম্প্রসারণবাদী।

স্তালিন মহামতি লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর শবাধারের পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্ব-বিপ্লব ত্বরান্বিত করার শপথ নিয়েছিলেন। স্তালিন সেই শপথের কোন মর্যাদাই দেননি। বরং লেনিন-নিন্দিত "ন্যাশন্যাল শভিনিস্ট"-এর উগ্র সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা-বাদীর ভূমিকায়—পররাজ্য গ্রাস করে—হত্যা-যুদ্ধ-লুণ্ঠনের পথ ধরে নিজের দেশের (অতএব পৃথিবীর সকল দেশের!)—কমিউনিস্টদের "পিতৃভূমির" ভৌগোলিক আয়তন, জনসংখ্যা, সম্পদ বৃদ্ধি করেছিলেন। স্তালিনের সেই উগ্র সম্প্রসারণবাদী জঙ্গী রাজনীতি সম্বন্ধে ভারতের সমাজতন্ত্রী ও দেশভক্তদের অবহিত থাকা প্রয়োজন।

পৃথিবীর কোন দেশের বিপ্লবকেই স্বাগত জানিয়ে স্তালিন তথা মস্কো সে রকম কোন মদত দেননি। কোন বিপ্লবী আন্দোলনেই সেই রকম সক্রিয় অর্থপূর্ণ মদত না দেবার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই যে, স্তালিন সহযোগী সকল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকেই দুর্বল ও চির রুশ-নির্ভর দেখতে চেয়েছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্র নীতির এক নূতন মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন—প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, ভারত চায় শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্র, দুর্বল রাষ্ট্র নয়। মহাপ্রাণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁর মন্ত্রশিষ্য নেতাজী সুভাষও সেই আদর্শের কথা একদিন ঘোষণা করেছিলেন ( Asian co-prosperity sphere )। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পররাষ্ট্র নীতির ভূমিকার প্রকৃত মূল্যায়ণ দেশের ছাত্র ও যুব-সমাজকে করতে হবে।

একেবারে রুশ-সীমান্ত সংলগ্ন কাছাকাছি দেশ ছাড়া অন্য দেশ বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করুক এটা স্তালিন চাননি। রুশ-সীমান্ত সংলগ্ন দেশের শাসন-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে মস্কো থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ও অতি সহজ। যেমন, ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড ও বালটিক রাজ্যগুলি। অন্য কমিউনিস্ট দেশগুলি শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠলে রাশিয়ার কর্তৃত্বের বলগা শিথিল হয়ে যাবে এটা তিনি সম্যক বুঝেছিলেন।

দ্বি-মুখী পথ স্তালিন নিয়েছিলেন অন্যান্য দেশগুলির কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে: (১) সেই দেশগুলিকে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ও বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক শিবিরে "বড় ভাই"-এর ওপর চির-নির্ভর করে রাখা; (২) সেইসব বিপ্লব-পন্থী কমিউনিস্ট দল, সোস্যালিস্ট দল ও দেশগুলির মধ্যে বিভেদপন্থী রাজনীতি চালু করে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে রুশ-কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বকে জিইয়ে রাখা। এ ব্যাপারে স্তালিন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সম্পর্কেও এই একই নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া

আক্রান্ত হবার আগে পর্যন্ত স্তালিনের নীতি ছিল—একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে আর একটির বিরুদ্ধে লড়িয়ে দাও। এ নীতি অবশ্য স্তালিনবাদীদের কোন নিজস্ব আবিষ্কার নয়।

রাশিয়া নিজেকে এশীয় শক্তি (Asian Power) বলে দবী করে। এশিয়ার বিশেষ করে চীন দেশের বিপ্লব সম্বন্ধে স্তালিনের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা সংক্ষেপে করা যেতে পারে। রুশ-সীমান্ত সংলগ্ন সিংকিয়াং, বহিঃমঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে রাশিয়ার ভাবনা আজকের নয়—এ ভাবনার বোঝা রাশিয়া বয়ে আসছে জার সম্রাটদের আমল থেকে। সেই একই ট্র্যাডিশন্ চলে আসছে। এশিয়ায় অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাব যাতে আদৌ না বাড়ে এই ছিল রাশিয়ার চিন্তা।

১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লবের পর রুশ নেতারা পুনঃপুনঃ ঘোষণা করেছিলেন যে, চীন সম্বন্ধে জার সম্রাটরা যে-সব অসম অন্যায় চুক্তি করেছিলেন সেই সব চুক্তির ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া তার চীন সম্পর্কিত নীতি অনুসরণ কখনই করবে না—জারতন্ত্রী রাশিয়ার বিগত দিনের প্রভু-সুলভ মনোভাব বর্জন করবে। ১৯১৯-১৯২০ সালে নানা বক্তৃতায়, ঘোষণায় এইসব অন্যায় অসম চুক্তির (unequal treaties) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করা হয়। কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা রাশিয়া দাবী করবে না একথাও বলা হয়েছিল। চীনকে চীনের পূর্ব-রেল (Chinese Eastern Railway) যা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল—রাশিয়া প্রত্যর্পণ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল।

মাঞ্চুরিয়ায় অধিষ্ঠিত জাপ তাঁবেদার সরকারকে রাশিয়া চীনের পূর্ব-রেল ১৯৫৩ সালে বিক্রী করেছিল—জাপানকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য। বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশ দশকে "সমাজতান্ত্রিক" রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার মধ্যে জাপ-প্রভাব সীমাবদ্ধ রাখতেই ব্যস্ত ছিল। বহিঃমঙ্গোলিয়া ( Outer Mongolia ) রুশ-বিপ্লবের পূর্বে একটি রুশ-আশ্রিত রাষ্ট্র ( Russian protectorate ) ছিল। রুশ-বিপ্লবের পর রাশিয়া চীনের অন্তর্বিরোধ ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সেখানে একটি রুশ তাঁবেদার সরকার স্থাপন করে এবং সর্বতোভাবে সামরিক সাহায্য দিয়ে সেই সরকারকে সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিপ্লবের আগে ও পরে বহিঃমঙ্গোলিয়ার অবস্থা একই রকম রয়ে গেল।

চীনে 'কমিউনিস্ট' সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর—রাশিয়া ও চীনের মধ্যে তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে যে-সব বিষয় নিয়ে তার মধ্যে একটি হল

রাশিয়ার সঙ্গে বহিঃমঙ্গোলিয়ার সম্পর্ক। চীন এই দেশের ওপর রুশ-প্রভুত্ব স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়। চীন তো আর এখন দুর্বল রাষ্ট্র নয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে কেন স্তালিন সহযোগী সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে দেখতে চাননি। চীন যতদিন দুর্বল ছিল ততদিন বহিঃমঙ্গোলিয়া নিয়ে সে রাশিয়ার ওপর কোন চাপ সৃষ্টি করতে পারেনি। এখন চীন শক্তিশালী হবার সাথে সাথে রাশিয়া বহিঃমঙ্গোলিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিব্রত বোধ করছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে চীনের রাজনৈতিক শক্তি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল—বিবদমান শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল একটানা বৈরিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব। এই বিভিন্ন শক্তির মধ্যে মূলত দু'টি শক্তি ছিল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দিক থেকে। একটির কর্মকেন্দ্র ছিল ক্যান্টনে, অপরটির ছিল পিকিং-এ। দু'পক্ষই নিজেদের চীনের রাজশক্তির মূল প্রতিনিধিরূপে দাবী করে আসছিল। স্থানীয় বড় বড় ভূম্যধিকারী ও যুদ্ধবাজ নেতাদের সহযোগিতায় পিকিং রাজগোষ্ঠী শাসন পরিচালনা করছিলেন। চীনের দক্ষিণাঞ্চলে ক্যান্টনে সান ইয়াৎ সেন-এর নেতৃত্বে চালু ছিল কুয়োমিন্টাঙ্ সরকার। সে সরকারও এই একই পদ্ধতিতে স্থানীয় জঙ্গী যুদ্ধবাজ নেতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সহযোগিতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিল ক্ষমতায়।

মস্কো নেতৃত্ব কিন্তু সমানভাবে দু'পক্ষের সঙ্গেই তাল দিয়ে চলেছিল। এক অদ্ভুত সুবিধাবাদী নীতি নিয়েছিল সেদিন রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতৃত্ব। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত মস্কো পিকিং সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভের জন্য বিরামহীন চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে পিকিং মন্ত্রীদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে। মনে রাখা দরকার, লেনিন পরলোক গমন করেন ১৯২৪ সালে। তাই লেনিনের জীবদ্দশাতেই পিকিং-এর শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা হয়েছে। স্তালিন সেই সূত্র ধরে এগিয়েছিলেন কূটনৈতিক স্বীকৃতি লাভের ব্যাপারে।

১৯২৪ সালের শেষভাগে পিকিং সরকার রুশ কমিউনিস্ট সরকারকে পূর্ণ স্বীকৃতি দান করল। ১৯২৪ সালে সাম্রাজ্যবাদী গ্রেট ব্রিটেনের দেখাদেখি পিকিং সরকারও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের নীতি গ্রহণ করেছিল। মস্কো কিন্তু পিকিং-এ অবস্থিত চীন সরকারকে প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দোসর বলেই মনে করত। তবু তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সখ্যতা স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। মস্কো সান ইয়াৎ সেন-এর সরকারকে

জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল বলে মনে করত এবং কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ সরকারের মাধ্যমেই কমিউনিস্ট প্রভাব ছড়াবার পরিকল্পনা ছিল সোভিয়েট নেতাদের। এই উদ্দেশ্যেই রাশিয়া ১৯২৩ সালে মাইকেল বোরোদিনকে সান ইয়াৎ সেন-এর দরবারে রুশ উপদেষ্টারূপে পাঠিয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ দল ছাড়া চীনে আরও একটি দল ছিল, সেটা হল চীনের কমিউনিস্ট দল। ১৯২০ সালে এই দলের প্রতিষ্ঠা হয়। চীনের কমিউনিস্টরা 'কমিণ্টার্ণের' শৃঙ্খলা নির্দেশ মেনে চলতেন মস্কোর অনুসরণকারীরূপে। ধীরে ধীরে এই দল শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। স্তালিন কিন্তু তখন চীনের 'কমিউনিস্ট' বিপ্লবে আদৌ উৎসাহী ছিলেন না; তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল : চীন থেকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব হটে যাক—চীন ভূখণ্ডে যেন এমন কোন সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবিত শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠিত না হয়, যে সরকার রাশিয়ার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সৈন্যবাহিনী নিয়ে অনুপ্রবেশ করতে পারে, চীনের পূর্ব-রেল ফেরৎ পাবার দাবী নিয়ে হৈ-চৈ সৃষ্টি করতে পারে, বহিঃমঙ্গোলিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে রাশিয়াকে বিব্রত করতে পারে। দুর্বল গৃহবিবাদে আত্মকলহে লিপ্ত সরকার গদিতে অধিষ্ঠিত থাকলেই সুবিধা। স্তালিন তাই চীনের কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইকে জোরদার করার হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। স্বতন্ত্র আত্মনির্ভর শক্তিশালী দলরূপে চীনের কমিউনিস্ট দল গড়ে উঠুক এটা তিনি কখনই চাননি।

[ভারত ও তার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের অনন্য-সাধারণ গণবিপ্লবে সর্বতোভাবে সাহায্যই শুধু করেননি; ভারত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীরা আত্মনির্ভর, শক্তিশালী দলরূপে বিশ্বের মর্যাদা অর্জন করুক সেটাও আন্তরিকভাবে চেয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে যে ঔদার্য, উজ্জ্বল আদর্শগত সাহসিকতা, অবিকম্প নিষ্ঠা প্রশ্নাতীতভাবে পরিস্ফুট হয়েছে, ভারতের দেশভক্ত সমাজতন্ত্রীদের স্তালিনবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার মূল্যায়ণ করতে গিয়ে পররাষ্ট্রনীতিতে ভারতের এই মহৎ নজীর ও উজ্জ্বল আদর্শের ও উদারনৈতিকতা সম্বন্ধে সম্যকরূপে সচেতন হতে হবে।]

তাই বোরোদিন ক্যাণ্টনে আসার পূর্বেই চীনের কমিউনিস্ট দলের কাছে নির্দেশ এল কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ দলের মধ্যে ঢুকে পড়ার এবং সেই দলের সঙ্গে মিশে যাবার (merge)। এই নির্দেশনামাকে কেন্দ্র করেও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট

আন্দোলনে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। কোন কোন লেনিনবাদী বলেছিলেন যে, স্তালিন এই নির্দেশ দিয়ে লেনিনের অন্যতম মূল নির্দেশই নাকি লঙ্ঘন করেছিলেন। লেনিনের নির্দেশ ছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলন চালিয়ে যাবার যুগে কমিউনিস্ট দল তার নিজের স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে কখনই বিলুপ্ত করবে না। কিন্তু লেনিনের নিজের অসংখ্য বক্তৃতা ও বিবৃতির মধ্যে ভূরি ভূরি স্ব-বিরোধী উক্তি আবিষ্কার করা যাবে। কেননা তিনি নিজেই এক সময় ব্রিটিশ শ্রমিক দলকে ( Labour Party ) ভিতর থেকে ধ্বংস করার জন্য ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টিকে শ্রমিক দলের মধ্যে প্রবেশ করে বিলীন হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

১৯২৫ সালে সান ইয়াৎ সেন-এর মৃত্যুতে কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ দলের মধ্যে এক দারুণ শূন্যতা দেখা দিয়েছিল। তখনও স্তালিন কমিউনিস্টদের কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর নেতৃত্বাধীনে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল মস্কোর নির্দেশে: ক্যাণ্টন সরকারকেও একটি স্থায়ী শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই সেনাবাহিনীকে দিয়েই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিকে জোরদার করতে হবে,—সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। দ্রুত গড়ে উঠল চীনের কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর এই সেনাবাহিনী, আর অচিরেই চিয়াং কাইশেক এই সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন। চীনের কমিউনিস্ট নেতারা বার বার মস্কোর কাছে আবেদন জানাতে লাগলেন চিয়াং কাইশেকের কমিউনিস্ট-বিরোধী মনোভাব সম্বন্ধে এবং কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ দল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনুমতি চাইছিলেন। স্তালিন কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। তিনি চীনা কমিউনিস্ট নেতাদের আবেদন অনুরোধের উত্তরে জানিয়ে দিলেন: চীনের কমিউনিস্ট দলকে কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর ভিতরে থেকেই কাজ করতে হবে।

"Repeatedly the answer went back to China that the Communists must continue to try to collaborate with the Kuomintang. It was made clear—if we may use a contemporary expression—that there was to be no—treason to Chiang Kai Shek" [ Russia And West Under Lenin And Stalin : George Kenan : P. 271. ]

১৯২৬ সালের শেষভাগে কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর শিবিরে ফাটল সুস্পষ্ট হয়েছে—উদারপন্থী ও উগ্রপন্থীদের মধ্যে। এই রকম এক আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির মধ্যে

চীনের উত্তরে ইয়াংসি (Yangtze) অভিমুখে এক সামরিক অভিযানের (military expedition) সিদ্ধান্ত নিলেন কুয়োমিন্‌টাঙ্‌। অভিযান সফল হয়েছিল। এই সামরিক অভিযানের সাফল্যে কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ শক্তি প্রকাশ্যেই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বে একদল চলে গেলেন সাংহাই নগরী দখলের উদ্দেশ্যে—অপর অংশটি—উদারপন্থী অংশটি—য়ুহাম (Wuham) বন্দরগুলি দখল করল। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন অকমিউনিস্ট সেনাপতিরা। এদিকে চিয়াং কাইশেক সাংহাই নগরীর উপকণ্ঠে তাঁর সামরিক বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলেন। সাংহাই-এর অভ্যন্তরে স্থরু হল কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-বিরোধী শক্তির সঙ্গে কমিউনিস্টদের সংঘর্ষ। চিয়াং কিন্তু তখনও তাঁর বাহিনী নিয়ে শহরের ভিতরে প্রবেশ করলেন না। যুদ্ধে যখন কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-বিরোধী শক্তি পর্যুদস্ত হয়ে পড়ল এবং কমিউনিস্টরাও রণক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ঠিক সেই সময় চিয়াং কাইশেক তাঁর বিপুল বাহিনী নিয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন। তাঁর প্রথম কাজই হয়েছিল কমিউনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করা। এইভাবে যখন কমিউনিস্ট শক্তি প্রায় নির্মূল হয়ে গেল তখন চিয়াং কাইশেক পূর্ণ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করলেন। কমিউনিস্টরা মস্কো তথা স্তালিনের নির্দেশে সম্পূর্ণ-ভাবে কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ দলের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। কমিউনিস্টদের এই চরম বিপর্যয়ে কমিণ্টার্ণের মধ্যে দারুণ মতভেদ দেখা দিয়েছিল। মস্কোর মর্যাদার বেলুনও চুপসিয়ে গিয়েছিল। ওদিকে আবার য়ুহাম কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ শক্তির অকমিউনিস্ট সেনাপতিদের হাতেও কমিউনিস্টরা নাজেহাল হলেন। এই বিপর্যয়ের মুখে মাও-সে-তুঙ তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আত্মগোপন করে চলে গেলেন এবং তিনিই প্রকৃত কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

স্তালিনের গায়ের জোরে চাপান অবাস্তব নীতিই চীনের প্রথম যুগের কমিউনিস্ট বিপর্যয়ের মুখ্য কারণ। মস্কো নিজের জাতীয় স্বার্থেই চীনকে দুর্বল করে রাখার নীতি বরাবর অনুসরণ করে এসেছিল। স্তালিনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার বাগাড়ম্বর ছিল একটা মুখোস মাত্র; রাজনৈতিক ঘটনাগুলি ভালভাবে বিশ্লেষণ করলেই সেটা বোঝা যাবে। যে-মুহূর্তে কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-শক্তি সামরিক দিক থেকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠল—তখনই সে মস্কো-নিয়ন্ত্রণ নিরপেক্ষ হতে প্রয়াস পেয়েছে। সেটা মস্কো কখনই চায়নি। আবার যে-মুহূর্তে মাও-সে-তুঙবাদী চীন শক্তিশালী হয়ে উঠল তখনই মস্কো রাশ টেনে ধরতে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি শেষ পর্যন্ত। চীনের কমিউনিস্ট দল যেদিন মাও-সে-তুঙ্‌-

এর আত্মনির্ভরশীলতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হল—প্রকৃতপক্ষে সেইদিন থেকেই মস্কো-পিকিং-এর মধ্যে নতুন করে এক 'চীনের প্রাচীর' গড়ে উঠতে থাকে। বিদেশী রাষ্ট্র-নির্ভর 'বিপ্লব' করার সঙ্কল্প আর পরের অধীনে 'স্বাধীন' হবার ও থাকার রাজনীতিটা সমগোত্রীয়ই। স্তালিন চীনের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার কথা শুধু ভেবেছিলেন রাশিয়ার ভৌগোলিক আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও অখণ্ডতার স্বার্থে—চীনের জনগণের স্বার্থে নয়। চীনের কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে সফল কমিউনিস্ট বিপ্লবের কথা তিনি ভাবেনও নি—বা তার জন্য কোন চেষ্টাও করেননি। কেননা অখণ্ড শক্তিশালী কমিউনিস্ট চীন—মস্কোর খবরদারী ও মাতব্বরী মুখ বুজে যে মেনে নেবে না সেটা রাষ্ট্রনীতিবিদ চতুর স্তালিন খুব ভালভাবেই বুঝেছিলেন। পরবর্তীকালেও স্তালিন কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর প্রতি তাঁর নীতি পাল্‌টাননি।

মার্কসবাদী স্তালিনের চীন-নীতি (China Policy) চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলেছিল। কমিণ্টার্ণ (তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক)—সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তথা জাতীয় স্বার্থ পরিপূরণের হাতিয়ার হয়েই কাজ করে এসেছে, আন্তর্জাতিক বিপ্লবের হাতিয়াররূপে আদৌ নয়। স্তালিনের অযৌক্তিক বিপ্লব-বিধ্বংসী চীন-নীতির বিরুদ্ধে 'কমিণ্টার্ণ' প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি কেন? কেন সেই ভ্রান্তনীতি পরিবর্তনের জন্য কমিণ্টার্ণের নেতারা স্তালিনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেননি? উত্তর শাশ্বত সনাতন—বাঁশিওয়ালাকে মোটা বায়না দিয়ে যিনি আনেন—বাঁশির বাজনার সুরও তিনিই ফরমাস্‌ দেন—বাঁশিওয়ালা বায়না মাফিকই সুর বাজায়।

রুশ অনুরাগী লেখক ডেভিড হরোউইৎস বলেছেন:

"...Even after the war when it was clear to most observers that Chiang was finished, Stalin did not think much of the prospects of Chinese Communism. When the Chinese Communists sent representatives to Moscow shortly after Japan's defeat Stalin 'told them bluntly that (he) considered that the development of the uprising in China had no prospect.' (Vladimir Dedijer : Tito Speaks, 1953, P. 322).

He advised the Chinese Communists to join Chiang's government and dissolve their army. They agreed to do so, went back to China and 'acted quite otherwise'

Throughout the war moreover, the Russians had sent war aid to China to the Kuomintang, not to communists, and the Kuomintang used this material in their war aganist the communists. After the war the Russians looted Manchuria, China's industrial heartland, creating deep grievances and arousing a storm of protest among the Chinese populace."
(From Yalta To Vietnam : David Horowitz, P. 107-108 ).

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন অধিকাংশ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, চিয়াং কাইশেকের জমানা খতম হয়ে গেছে, চিয়াং-এর আর কোনই ভবিষ্যৎ নেই—তখনও স্তালিন চীনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোন বিশেষ ভবিষ্যৎ আছে বলে মনে করেননি। জাপানের আত্মসমর্পণের পর চীনের কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা যখন মস্কোতে স্তালিনের সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন উক্ত প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময় স্তালিন খোলাখুলিই বলেছিলেন যে, চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লবের কোন সম্ভাবনা আছে বলে তিনি মনে করেন না। তাই স্তালিন চীনের কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের চিয়াং সরকারে সামিল হবার এবং কমিউনিস্ট সেনাবাহিনী ভেঙে দেবার পরামর্শ দেন। চীনের নেতারা তাঁর পরামর্শ মত কাজ করতে সম্মতও হয়েছিলেন। কিন্তু স্বদেশে ফিরে এসে স্তালিনের পরামর্শের ঠিক বিপরীত কাজই করেছিলেন।

সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে রাশিয়া যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সাহায্য পাঠিয়েছে কুয়োমিন্‌টাঙ্‌কে, তার ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্টদের নয়। আর কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ সেগুলো ব্যবহার করেছিল কমিউনিস্টদেরই বিরুদ্ধে। যুদ্ধশেষে রুশরা মাঞ্চুরিয়ায় ব্যাপক লুণ্ঠন চালিয়েছিল—এই মাঞ্চুরিয়া ছিল শিল্পপ্রধান চীন অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র। স্তালিনের এই লুণ্ঠন নীতি চীনের বাসিন্দাদের মনে দারুণ বিক্ষোভ জাগিয়েছিল। ইতিহাসে এক দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের সন্ধিক্ষণে এক কমিউনিস্ট রাষ্ট্র আর এক কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী সরকারকে অস্ত্র-রসদ সাহায্য পাঠাচ্ছে জেনেশুনে যে, সেইসব অস্ত্র-রসদ-সাহায্য সেই সাহায্য-গ্রহণকারী রাষ্ট্রের বিপ্লববাদী কমিউনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

চীনের কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-কমিউনিস্ট গৃহযুদ্ধে স্তালিন যেমন কুয়োমিন্‌টাঙ্‌কেই পছন্দ করেছিলেন কৌশলগত কূটনৈতিক ও রুশ জাতীয় স্বার্থপরিবর্ধনজনিত

কারণে, তেমনি আবার উগ্র বিপ্লবীরূপে চিহ্নিত ও প্রচারিত চীনের কমিউনিস্ট নেতা মাও-সে-তুঙ ও চু-এন-লে নিছক বাস্তবতাবোধের তাগিদে এশিয়ার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যবনিকা পতনের প্রাক্কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কমিউনিস্ট তত্ত্ব দিয়ে যেমন আদৌ স্তালিনের আচরণ ব্যাখ্যা করা যায় না—ঠিক তেমনি বৈপ্লবিক আদর্শবাদ ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার আদর্শের মানদণ্ড দিয়েও মাও-সে-তুঙের এই আচরণের সাফাই গাওয়া যায় না। এখন জানা গেছে, ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে মাও-সে-তুঙ ও চু-এন-লে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন-এ তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলেন। চীনের মূল ভূখণ্ডের সার্বিক কর্তৃত্ব লাভের সাড়ে চার বছর আগে একটা আলোচনার সূত্র খুঁজে বার করতে আগ্রহী হন চীনের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব। এই গুরুত্বপূর্ণ ও পরিহাসজনক তথ্যটি ফাঁস করেছেন বারবারা টুচ্‌ম্যান (Barbara W. Tuchman) 'ফরেন এ্যাফেয়ার্স' (Foreign Affairs—October 1952, Vol. 51, No. 1—Fiftieth Anniversary Issue) পত্রিকায়। লেখক বিভিন্ন তথ্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, চীনের ইয়েনান প্রদেশে অবস্থিত মার্কিন সামরিক পর্যবেক্ষণকারী মিশনের (Acting Chief of the American Military Observers, Mission in Yenan) অধিকর্তা মেজর রে ক্রমলী (Major Ray Cromley) চুং কিং-এ জেনারেল ওয়েডিমায়ার-এর (General Wedemeyer) কার্যালয়ে প্রেরণ করেন চীনের কমিউনিস্ট নেতাদের এই অভিলাষের কথা :

"Mao and Chou will be immediately available either singly or together for exploratory conference at Washington should President Roosevelt express desire to receive them at White House as heads of a Primary Chinese Party" [ Foreign Affairs—October Issue, 1952, P. 44. ]

চীনের নেতারা বিমানযোগে ওয়াশিংটন যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁদের গোপনবার্তায় একথাও তাঁরা জানিয়েছিলেন, যদি মার্কিন প্রেসিডেণ্ট তাঁদের আমন্ত্রণ না জানান—তাহলে যেন তাঁদের এই অভিপ্রায়ের কথাটি গোপন রাখা হয়। কেননা তাঁরা চাননি চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে কমিউনিস্ট দলের যে আর এক দফা আপোষ-আলোচনার কথা চলছিল সেটার সম্ভাবনাও নষ্ট হয়।

এই ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি কিন্তু রহস্যজনক কারণে প্রেসিডেন্টের কাছে অথবা স্বরাষ্ট্র-দপ্তরে ( State Department ) বা যুদ্ধ-দপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি। চুং কিং-এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ( Ambassador Patrick J. Hurtly ) এটি গোপন করে যান জেনারেল ওয়েডিমেয়ারের যোগসাজসে।

চীনের কমিউনিস্ট নেতারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চাননি। তাঁরা মার্কিন সহযোগিতায় চিয়াং কাইশেকের উপর চাপ সৃষ্টি করে সমগ্র চীনে একটি কমিউনিস্ট-কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ কোয়ালিশন সরকার গড়তে চেয়েছিলেন চূড়ান্ত কমিউনিস্ট বিজয়ের লক্ষ্যে পৌঁছোবার একটি ধাপরূপে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ কমিউনিস্টদের আছে—এটা জানতে পারলে চিয়াং-এর প্রতিরোধ শক্তিও খর্ব হবে এবং কমিউনিস্ট বিজয় আরও ত্বরান্বিত হবে। চীনের নেতারা বোঝাতে চেয়েছিলেন চীনের মুখ্য রাজনৈতিক শক্তি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি—কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ দল নয়। তাছাড়া চীনা কমিউনিস্টরা মস্কো থেকে অস্ত্র পাচ্ছিল না। তাদের প্রয়োজন ছিল মার্কিন অস্ত্র-সাহায্যের। মার্কিন রাষ্ট্রদূত হার্টলি এবং সেনাপতি ওয়েডিমেয়ার চিয়াং কাইশেকের প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁকে বাদ দিয়ে চীনের চিন্তা তাঁরা করতে পারতেন না। তাঁরা কমিউনিস্টদের সঙ্গে পাঁচ-দফা পরিকল্পনার ভিত্তিতে ( Five Points Plan ) দুই যুধ্যমান দলের কোয়ালিশন সরকার গড়ার প্রস্তাব করেন। এই ফরমুলায় কমিউনিস্টদের কোয়ালিশনের শরিক হয়েও আপেক্ষিক রাজনৈতিক কার্যকলাপের স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব করা হয় এবং দেশের দুই দলের সামরিক বাহিনীর ওপর দুই দলেরই কর্তৃত্ব থাকবে তাও বলা হয়। সর্বোপরি দেশে চিয়াং-এর নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে। কিন্তু চিয়াং কাইশেক এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন। চিয়াং একটি বিকল্প প্রস্তাব রেখেছিলেন—তাতে বলা হয় কমিউনিস্ট সেনাবাহিনীকে জাতীয়তাবাদী সরকারের কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে। তবেই চিয়াং কমিউনিস্ট দলকে সরাসরি স্বীকৃতি দেবেন।

হার্টলি তাঁর পাঁচ-দফা পরিকল্পনা নিয়ে মাও-সে-তুঙ-এর সঙ্গে আলাপ করে কমিউনিস্ট দলের সম্মতি পেয়েছিলেন। এখন তিনি সে প্রস্তাব নস্যাৎ করে চিয়াং কাইশেকের প্রস্তাবটাই অনুমোদন করলেন। কমিউনিস্টরা বুঝলেন এটা কোয়ালিশনের বা যুক্তফ্রন্টের প্রস্তাব নয়—পরন্তু কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব। তাঁরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

কমিউনিস্ট নেতারা রুজভেল্টকে বোঝাতে চেয়েছিলেন চীনের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আগামী দিনের মুখ্য উত্তরাধিকারী তাঁরাই—চিয়াং কাইশেক নন। স্তালিনকে একথা বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে তাঁরা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে একথা বোঝাতে চেয়েছিলেন। রহস্যজনক কারণে প্রস্তাবটি গোপন রইল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানতেও পারলেন না। ২৭ বছর পর—দুটো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট নিকসন নিজেই ছুটে গেলেন চীন পরিদর্শনে—মাও-সে-তুঙ ও চু-এন-লের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্য। প্রকৃতির পরিশোধই একে বলা চলে। কোরিয়া ও ভিয়েৎনামের যুদ্ধের পাশবিকতা ও ধ্বংসের হাত থেকে পৃথিবী রেহাই পেত যদি ১৯৪৫ সালের প্রস্তাবিত সমঝোতার সূত্র ধরে মার্কিন রাষ্ট্রনায়করা এগিয়ে আসতেন।

বারবারা টুচ্ম্যান তাঁর প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন, শেষ পর্যন্ত মাও-সে-তুঙ-এর প্রস্তাব প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে এমন সময় এবং এমন বিতর্কিতভাবে বিলম্বে পৌঁছুল যে, তিনি চিয়াংকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে কোন রাজনৈতিক অশান্তির ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। রাষ্ট্রদূত হার্টলি জানান: "The plan for military co-operation with Yenan, would constitute recognition of the Communist Party as an armed belligerent and lead to destruction of the National Government…chaos and civil war and a defeat of America's policy in China" [ Foreign Affairs—Oct. 1952, P. 55 ] তখন ইয়ালটা সম্মেলনের প্রস্তুতি চলেছে—বিজয়োৎসবের সূচনা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গ, জার্মানীর ভবিষ্যৎ, গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়ার গৃহযুদ্ধ, পোল্যাণ্ডের সীমানা-সম্পর্কিত সঙ্কট, ইরাণ সরকারের পতন—নানাবিধ জটিল আন্তর্জাতিক প্রশ্ন নিয়ে রুজভেল্ট খুবই বিব্রত। তার ওপর তাঁর রাষ্ট্রদূত হার্টলির উপরোক্ত মন্তব্য। তাই তিনি ঝুঁকি নিলেন না। …"All these in the thirteenth year of a crisis-filled Presidency did not leave Roosevelt eager to precipitate a new crisis with unmanageable Chiang Kai Shek." [ Barbara W. Tuchman. ]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সচিব উইলিয়াম রোজার্স মার্কিন কংগ্রেসে ১৯১৩ সালের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত রিপোর্টে বলেছেন:

"গত বছর আঁতাত এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের যে ভিত্তি হয়েছে চীন ও আমেরিকা তাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।…

আমাদের লক্ষ্য শুধু শত্রুতা থেকে আঁতাতে পৌছান নয়, আঁতাত থেকে সহযোগিতায় পৌছান।"

স্থতরাং কমিউজম—ক্যাপিট্যালিজম-এর মধ্যেকার বহু-প্রচারিত ও বিজ্ঞাপিত বৈরিতা দূর করে শত্রুতা থেকে আঁতাত—আঁতাত থেকে সহযোগিতায় পৌছানর নূতন সাধনা স্থরু হয়েছে এখন।

একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং কাইশেকের তাইওয়ান সরকার থেকে নিঃসর্ত সমর্থন ও সহযোগিতা সরিয়ে নিয়ে কমিউনিস্ট চীনের দিকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে – অপরদিকে রাশিয়া চিয়াং কাইশেকের সরকারকে সমর্থনের জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছে। স্তালিনের—ক্রুশ্চভ ও কোসিগিনের কূটনীতির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা রয়ে গেছে। কমিউনিস্ট রাশিয়া কমিউনিস্ট-বিরোধী চিয়াং কাইশেকের কাছাকাছি হতে চাইছে। আবার পুঁজিবাদী আমেরিকা কমিউনিস্ট চীনের মিত্র হতে চলেছে।

আর ভারত—পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র—যেখানে গত ২৫ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে গণতন্ত্র ও মৌল মানবিক গণতান্ত্রিক অধিকার অব্যাহত রাখার চেষ্টা চলেছে—প্রাচ্য—দূর ও নিকটের কোন সামরিক চক্রান্তের বা সমগ্রতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের দমকা হাওয়াই আজও পর্যন্ত সেই প্রজ্বলন্ত সাংবিধানিক গণতন্ত্রের শিখাটিকে নিভিয়ে দিতে পারেনি—গণতন্ত্রের 'রক্ষাকর্তা' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই ভারতকে যত প্রকারে পারছে দুর্বল করার চেষ্টা করে চলেছে। প্রেসিডেণ্ট জন কেনেডি, রবার্ট কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং-এর উদারনৈতিকতা ও আমেরিকার উদারনৈতিক গণতন্ত্রী মানুষের রাজনৈতিক সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ চাপা পড়ে থাকল নয়া মার্কিন জাত্যভিমানের ঔদ্ধত্যের সামনে। ভারত দুর্বল হয়ে থাকলে এশিয়ায় মার্কিন-চীন-রুশ মাতব্বরির স্থযোগ অব্যাহত থাকবে যে! গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মার্কিন প্রশাসন এগিয়ে আসেনি পৃথিবীর ও এশিয়া ভূখণ্ডের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক পরীক্ষাকে সর্বতোভাবে বন্ধুর মন নিয়ে সাহায্য করতে। জাতিস্বার্থ-সর্বস্বতা ও কূটনীতিকে কেন্দ্র করেই আন্তর্জাতিক রাজনীতি যে আবর্তিত হচ্ছে। তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের আচরণে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। তাই দুই সমাজতান্ত্রিক দেশ—রাশিয়া ও চীনের সীমান্ত বরাবর দুই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাষ্ট্র লক্ষ লক্ষ সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছে। এক রাশিয়াই দশ লক্ষ সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছে। রাশিয়া বা চীন দুই দেশই একই সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী হয়েও পরস্পরকে দুশমন বলে মনে করছে কেন? কেন স্তালিন, ক্রুশ্চভ, কোসিগিন,

ব্রেজনভ্—মাও-সে-তুঙ, চু-এন-লে-কে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি? কেন কমিউনিস্ট চীন ভারত ও বাংলাদেশের প্রতি শত্রুতা করে চলেছে? কেন 'কাগুজে বাঘ' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রক্ষক মার্কিন সেনাবাহিনীর এশিয়া ভূখণ্ড থেকে তথা ভিয়েৎনাম থেকে আশু প্রত্যাবর্তনের মার্কিন ঘোষণায় চীনের বিপ্লবী কমিউনিস্টরা উদ্বিগ্ন হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেনাবাহিনী সরিয়ে দিয়ে এশিয়ায় শূন্যতা (Power Vacuum) সৃষ্টি না করার জন্য অনুরোধ করছেন?

ভারতের মার্কসবাদীরা জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেমকে পরিহাসই শুধু করেনি—তাকে উপেক্ষা করে এসেছে। তাদের এই আত্মঘাতী রাজনীতির সুযোগ নিয়েছে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন। এই সব রাষ্ট্র কিন্তু নিজ নিজ 'জাতীয়তাবাদী' স্বার্থ সংরক্ষণ করেই চলেছে।

'বিপ্লবী' আদর্শ বা 'গণতন্ত্রের' আদর্শকে ঠাণ্ডা ঘরে রেখে পরস্পর-বিরোধী শিবিরের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধার আপাত অবিশ্বাস্য ঘটনা আমরা লক্ষ্য করি। মহাবিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই জাতীয়তাবাদকে ভারতের রাজনীতির অন্যতম মৌল ভিত্তিরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর উল্লেখযোগ্য এক প্রবন্ধে—"India and the World"-এ লিখেছেন:

"It is a sense of Indianness which unites our people despite ethnic, linguistic and religious diversity. Most conflicts and tensions in the World originate in the failure to take note of the importance of nationalism". [ Foreign Affairs, October, 1952, P. 66, 50th Anniversary Issue ] অর্থাৎ 'ভারতীয়তাবোধই' আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির মূল উৎস। ধর্ম, জাতি, ভাষা রক্তসূত্র নয়। এই জাতীয়তাবাদের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারাটাই বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ সংঘাত ও উত্তেজনার মূলে।

মাও-সে-তুঙ এবং চু-এন-লে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে আপোষের সূত্র খুঁজবার প্রস্তাব করতে পারেন—তাতে কোন আদর্শগত বা নৈতিক বাধা নেই—প্রেসিডেণ্ট নিকসনকে ২৭ বছর রক্তাক্ত যুদ্ধের পর—চীন ভূখণ্ডে বিশেষ অতিথিরূপে আমন্ত্রণ করে মার্কিন সৌহার্দ্য গড়ে তুলতে চীনের বাধা নেই। তাতে কোন 'বিপ্লবী' ক্ষুব্ধ হবেন না। আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য—সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও লুণ্ঠন বন্ধ করার মন

নিয়ে জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সখ্যতা সাময়িকভাবে স্থাপন করলে সেটা সমালোচিত হবে কেন? সুভাষচন্দ্র ছিলেন দ্রষ্টা—অনেক দূরপাল্লার দৃষ্টি নিয়ে রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা বিশ্লেষণ করে পথনির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ছিলেন খাঁটি জাতীয়তাবাদী—খাঁটি আদর্শবাদী—পুরাণ পুরুষ। "ভারতীয়তাবাদ"-ই ছিল তাঁর চিন্তার মৌল উৎস। তাই তাঁকে ছলনার বা চালাকীর আশ্রয় নিতে হয়নি। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা মুখে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার কথা বললেও—জাতীয়তাবাদকেই আশ্রয় করেন—কৌশল হিসাবে।

## ১১

## ফরাসী দেশে পপুলার ফ্রণ্ট রাজনীতির প্রবর্তন ও কমিণ্টার্ণ

[ 'পপুলার ফ্রণ্ট' রাজনীতি—মার্কসীয় বামপন্থী চিন্তা ও কর্মসূচীর মৌলিক রূপান্তর এনে দেয় বলা যেতে পারে। কমিউনিজম-এর মূল বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে উল্টো পথে চলে আসারই সূচনা এই রাজনীতির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শ্রেণী-সংগ্রামের স্থান নিল বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা, সোভিয়েট-প্রথার জায়গায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসাকীর্তন সুরু হল। সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের স্থান নিল জাতীয়তাবাদ। বিপ্লবী জঙ্গী আদর্শবাদ কোথায় যেন উবে গেল। কয়েক মাস আগেও যাঁরা সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে সহযোগিতা এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করার প্রয়োজনীতার কথা বলতেন—কমিউনিস্ট ও স্তালিনবাদীরা তাঁদেরই 'বিশ্বাসঘাতক' 'ট্রট্স্কীপন্থী' বলে ধিক্কার জানালেন। অথচ 'পপুলার ফ্রণ্ট'-এর নামে যখন এই সব দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শ-জনিত মৌল পরিবর্তনের কথা বলা হল তখন কমিউনিস্ট বা স্তালিনপন্থী জঙ্গীদের মধ্যে কোন গুঞ্জনও উঠল না। আসল কথা রুশ-কূটনীতির মৌল স্বার্থেই এই রাজনৈতিক ডিগবাজিকে মেনে এবং মানিয়ে নেওয়া হল। বিপ্লবী আদর্শ কল্পনালোকের কল্পিত আদর্শ হয়ে মার্কসীয় শাস্ত্রে বন্দী হয়ে রইল। কূটনীতির জয়জয়কার হল। ইতিহাসে এমনটি ঘটেছে বহুবার। ]

ফরাসী দেশে ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের 'দক্ষিণপন্থী' শক্তির বিদ্রোহ সে দেশের রাজনীতিতে প্রগতিশীল ও বিভিন্ন বামশক্তিগুলিকে মিলে-মিশে এক-যোগে কাজ করতে উৎসাহিত করেছিল। কমিউনিস্টরাও তাদের ধ্বংসাত্মক সঙ্কীর্ণতাবাদী রাজনীতি পরিহার করলেন সাময়িকভাবে। সোস্তালিস্টরা কমিউনিস্টদের 'পয়লা নম্বর শত্রু'—এই প্রচার থেকে কমিউনিস্টরা সরে এল কৌশলগত কারণেই বলতে হয়। পরবর্তী আচরণও সেটা প্রমাণ করে। ১৯৩৪ সালের পর থেকে বামপন্থী দলগুলি উদার কর্মসূচীর ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করে। অপরদিকে দক্ষিণপন্থী দল ও শক্তিগুলি আরও কাছাকাছি এসে যায়। তারা সামাজিক—অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ( Social Reforms ) দিকে

আদৌ দৃষ্টি দেয়নি। পপুলার ফ্রন্টের রাজনীতির যুগে কমিউনিস্টরা বাম শক্তিগুলিকে একত্রিত করার জন্য যথেষ্ট খোশামোদ করেছে। আবার কিছুদিন যেতে না যেতেই তাদের নিন্দায় মুখর হয়েছে। ফরাসী দেশ পপুলার ফ্রন্টের বড় অংশীদাররূপে স্লোগান রেখেছিল: 'Bread, Peace and Liberty' —রুটি, শান্তি ও স্বাধীনতা। দক্ষিণপন্থীরা লাভালের নেতৃত্বে তার জনস্বার্থ-বিরোধী চরম ভ্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশকে বাম শক্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। দেশে মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে বহুলোক বেকার হল, কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন কমে গেল। দেশে দেখা দিল চরম অর্থনৈতিক হতাশা। ছোট ছোট ব্যবসাদার ও অল্প সম্পত্তির মালিকরাও সরকারের বিরুদ্ধে চলে গেল। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসের সাধারণ নির্বাচনে বামফ্রন্টের অনুকূলে বেশি ভোট পড়ল। চেম্বারে পপুলার ফ্রন্টের ডেপুটীদের সংখ্যা দাঁড়াল ৩৮০ এবং দক্ষিণপন্থীদের সদস্যসংখ্যা দাঁড়াল ২৩৭। এই নির্বাচনে অবশ্য কমিউনিস্টরাই সর্বাধিক লাভ করেছিল—তারা ৬২টি বেশি আসন পেয়েছিল; সমাজতন্ত্রীরা ৩৯টি বেশি আসন পেল, স্বতন্ত্র সমাজতন্ত্রীরা অতিরিক্ত ১২টি আসন লাভ করেছিল। দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি নির্বাচনে কিছুটা কোণঠাসা হয়ে এবং বাম-পন্থীদের দিকে জনগণের ঝোঁক দেখে চরমপন্থী কর্মসূচীর দিকে ঝুঁকে পড়ল,—সংবিধান ও গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থার ভাব প্রকাশ করতে লাগল। গুপ্তসমিতির অন্ধকারের রাজনীতির আশ্রয় চরম দক্ষিণপন্থীরা নিতে থাকে। জুন মাসে বামপন্থী সরকার গঠিত হবার পরই এই সব সংস্থা নিষিদ্ধ করে ডিক্রী জারী করা হল। একটা সংস্থা ( Mouvement Social Francais ) নিষিদ্ধ হলে আর একটা অনুরূপ সংস্থা রাতারাতি গড়ে উঠল ( Parti Social Francais সংক্ষেপে P. S. F. )। ১৯৩৮ সালে তার সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ।

এদিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। কৃষি-পণ্যের দাম পড়ে যেতে থাকে—কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভ জমতে থাকে। ১৯৩৫ সালে 'Front Paysan' নামে একটি সংগ্রামী সংস্থা গড়ে ওঠে। আবার যেই কৃষিপণ্যের দাম কিছুটা বাড়ল—কৃষক-সমাজ চরমপন্থী দক্ষিণপন্থী ভাবধারা থেকে সরে এল। তারা হিংসার রাজনীতিতে শ্রদ্ধাবান ছিল না। ঘড়ির কাঁটার দোলকের মত ফরাসী রাজনীতি এক প্রান্তসীমা থেকে আর প্রান্তসীমার মধ্যে দুলতে লাগল। এই অস্থির অনিশ্চয়তার মধ্যে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার হয়ে উঠছিল: পরিষদীয় গণতন্ত্র বা তার কার্যকারিতার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা হ্রাস পাচ্ছিল। পরিষদীয়

গণতন্ত্রের প্রতি বিদ্রূপ করে বেশ কিছু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল এই সময়। চরম দক্ষিণপন্থীরা যেমন এই ধরনের প্রচারে মেতে ছিলেন—বামপন্থীরাও অনুরূপ প্রচারে নেমেছিলেন। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে একদল বামপন্থী নেতা বীতশ্রদ্ধ হয়ে মার্কসবাদী চিন্তাধারার অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন। যেমন, Marcel Deat, Adrien Marquet ইত্যাদি এঁরা নিজেদের নয়া সমাজতন্ত্রী ( Neo-Socialist ) বলে প্রচার করলেন। তাঁরা জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করলেন—পরিষদীয় রাজনীতির বিরুদ্ধেই মত প্রচার সুরু করে দিলেন। এঁদের ভাবধারা, কার্যকলাপ ফ্যাসিস্ত ও নাৎসীদের খুব কাছাকাছি ছিল। আগেই বলেছি, জ্যাকুই ডোরিয়ট্ ( Jacques Doriot ) কমিউনিস্ট দলের খুব প্রিয় উদীয়মান নেতার সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা থোরেজ-এর প্রচণ্ড মতভেদ দেখা দিল। ডোরিয়ট্ সকল ব্যাপারে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ ও নির্দেশ মেনে চলার বিরুদ্ধে ছিলেন না। তিনি কমিউনিস্ট পার্টি থেকে মস্কোর নির্দেশে বহিষ্কৃত হলেন। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে, চেম্বারে ১০ জন বিক্ষুব্ধ কমিউনিস্ট ডেপুটী নিয়ে একটা দল গঠন করলেন ( Parti Populaire Francais )। ২৬ জন নয়া সমাজতন্ত্রীও জয়ী হয়েছিলেন নির্বাচনে।

যে বাম-সরকার যুক্তফ্রন্টের ভিত্তিতে গঠিত হল তার নেতা নির্বাচিত হলেন লিঁয় ব্লুম। পপুলার ফ্রন্ট ( বা যুক্তফ্রন্ট ) সরকার দেশের মনে প্রচণ্ড প্রত্যাশা সঞ্চারিত করল—সকলে আশা করলেন এতদিন পরে দেশে সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হবে। নির্বাচনে সাফল্যের অব্যবহিত পরেই দেশে ধর্মঘটের যেন হিড়িক পড়ে গেল। যদিও কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের পেছনে মূল চালক-শক্তি ছিল—তবু মন্ত্রিসভায় তারা অংশ নিল না। কমিউনিস্টরা বিব্রত বোধ করল। কিন্তু ধর্মঘট স্তব্ধ করতে সাহসী হল না। দীর্ঘদিনের কমিউনিস্ট প্রচারের ফলে শ্রমিক-শ্রেণীর মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, বামপন্থী সরকার গঠিত হলে কল-কারখানার পরিচালনার ভার তাদেরই ওপর দেওয়া হবে। শ্রমিকরা একটার পর একটা কারখানার ভেতরে অবরোধ রচনা করে বসে থাকল ( sit down strike )। সমগ্র দেশের অর্থনীতিতে একটা আচলাবস্থা এসে গেল। [ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বহুদলীয় সরকার এবং পশ্চিম বাংলায় চৌদ্দ দলের যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্লেদাক্ত পরিণতি—পশ্চিম বাংলার অরাজকতা—হিংসার রাজনীতি—ফরাসী দেশের 'পপুলার ফ্রন্ট'-রাজনীতির সঙ্গে ও সেই সময়কার ফরাসী দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির তুলনা করবেন পাঠকরা। ] চাপ দিয়ে

শ্রমিক-শ্রেণী বিপ্লবের নামে মালিক-শ্রেণীর কাছ থেকে যতটা পারল আদায় করার ব্যবস্থা করল। শ্রমিকদের সঙ্গে বড় বড় মালিকদের চুক্তি হল—শতকরা ১২ ভাগ মজুরী বৃদ্ধির প্রস্তাবে বড় বড় শিল্পপতিরা রাজী হয়ে গেলেন। সরকারী কর্মচারীদেরও অনুরূপভাবে বেতন বৃদ্ধি ঘটল। অস্ত্র কারখানার জাতীয়করণ হল, 'ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স' রাষ্ট্রায়ত্ব হল। শ্রমিকদের জন্য ৪০ ঘণ্টার সপ্তাহ চালু হল। সবেতন ছুটির ব্যবস্থাও প্রথম প্রবর্তিত হল দেশে। এটি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ লাভ ও অধিকারের স্বীকৃতি ফরাসী দেশের ইতিহাসে। শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন ও 'কালেক্টিভ বারগেনিং'-এর নীতি মেনে নিল মালিক-শ্রেণী। ম্যাটিগ্‌নন—মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের মধ্যে এই ঐতিহাসিক চুক্তি হয়েছিল বলে ইতিহাসে এই চুক্তি ম্যাটিগ্‌নন চুক্তি নামে পরিচিত ( Matignon agreement )। এই চুক্তির ফলে প্রধানমন্ত্রী ব্লুমের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল।

নূতন নূতন সংস্কার কার্যকরী হতে লাগল। কিন্তু এর জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন ছিল। এত রাজস্বের ব্যবস্থা কিভাবে হবে? সরকারী ঋণ-গ্রহণের ( Public borrowing ) কর্মসূচী ব্যাপকভাবে নেওয়া হল। দেশে মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি খুব ঘটেছিল। [ History of Modern France, Vol. 3, By Alfred Collan. ]

বুলগেরিয়ার বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা ডিমিট্রভ ১৯৩৫ সালে অনুষ্ঠিত 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের' ( Comintern ) সপ্তম কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। এই সম্মেলন অবশ্য হবার কথা ছিল সংবিধান অনুযায়ী ১৯৩০ সালে। এই সম্মেলনে, প্রথমত, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হল বিনা বিতর্কে, বিনা বাধায়—সর্বসম্মতিক্রমেই। ডিমিট্রভ নিজ দেশে ১৯২৩ সালে দক্ষিণপন্থী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে দাঁড়াননি; ১৯২৩ সালে যে ব্যর্থ কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান হল তার দায়িত্বও তিনি এড়াতে পারেন না। এমনকি ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে রাজধানী সোফিয়া গির্জার ঘটনা প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। দেশের চরম বামপন্থীরা তাঁকে বিশ্বাসঘাতক মনে করত। তিনি খুব রুশ অনুগত ছিলেন। স্তালিন বেছে বেছে এঁকেই কমিণ্টার্ণের নেতৃত্বে আনেন।

কমিণ্টার্ণের গোটা ইতিহাসে ১৯৩৪ সাল একটি নূতন যুগের সূচনা-পর্ব বলা যায়। অতিবাম-নীতি ( Left adventurism ) ছেড়ে বুঝে-সুঝে ধীরে চলার নীতি নেওয়া হল। যৌথভাবে সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার নীতি গৃহীত হল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট দলের

সভ্যরা বা ট্রেড ইউনিয়নগুলিও সোস্যালিস্ট ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে ভিড়ে যেতে লাগল।

"It implied a wholesale overthrow of the basic principles of Communism. Instead of class struggle co-operation with the bourgeoisie, instead of the Soviet system, eulogy of democracy, instead of internationalism, nationalism. The revolutionary ideals had failed conspicuously.

...Hundreds of responsible Communist leaders, a few months before, had denounced everybody as a Trotskyist traitor who spoke of co-operation with the socialists and the necessity of defending democracy ; now not a single one of these leaders rose against the change. In France the reversal of policy was carried out with particular speed. At the end of 1933, J. Doriot, a leading Communist, had left because he was no longer willing to follow the policy of the Comintern and began wildly to denounce left extremism. Six months later the French Communists did exactly the thing for which they expelled J. Doriot who was about to become a fascist in the meantime".

১৯৩৩ সালে যাঁরা 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের ও গণতন্ত্র রক্ষার অনুকূলে মত দিয়েছিলেন তাঁদের 'ট্রট্স্কীপন্থী', 'সোস্যাল ফ্যাসিস্ট', 'বিশ্বাসঘাতক', 'পাগলা কুকুর', 'হায়েনা' বলে গালি দেওয়া হত। কিন্তু ১৯৩৪ সালের পরিবর্তনের সাথে সাথে যাঁরা সোস্যালিস্টদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার বিরোধিতা করতেন তাঁদের ওপর বর্ষিত হত এইসব গালিগালাজ। কি অদ্ভুত রাজনীতি ! কি চমৎকার কূটনীতি !

"Since 1928 the fight against the danger of war against Russia, then entirely imaginary, had been one of the chief tasks of the Comintern. At that time Moscow pretended to feel itself menaced by Britain, France and U. S. A". ( F Borkenau )

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, যখন এইরূপ আক্রমণ সম্পূর্ণ অবাস্তবই

ছিল তখন কমিণ্টার্ণের এই স্লোগানকে রুশ স্বার্থের বাহক বলে মনে করার কি কারণ থাকতে পারে? আসল কথাটা হল এই, যুদ্ধের আশঙ্কার কথা ছড়িয়ে রাশিয়া নিজের দেশের বিরোধীদের নির্মূল করার জন্য দলের মধ্যে ও সমগ্রদেশে একনায়কত্বকে নিরঙ্কুশ করার পথ খুঁজে নিল। সুতরাং কমিণ্টার্ণকে ব্যবহার করা হল রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির হাতিয়ার রূপে—বিশ্ব-বিপ্লবের হাতিয়াররূপে আদৌ নয়।

[…"Since 1923 (Comintern) had been made an instrument not so much of Russian foreign policy, as of the dominating Russian faction in its struggle with other factions." Borkenau's—The Communist International, P. 388 ]

১৯৩৪ সালে যখন রাশিয়া বুঝল হিটলারের কাছে থেকেই প্রকৃত বিপদ আসবে তখন থেকেই কমিউনিস্টদের নীতি বদলাতে সুরু করল।

ট্রট্স্কীর মতবাদের বিরুদ্ধে নকল জেহাদ ঘোষণা করে স্টালিন পুঁজিবাদী দুনিয়াকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলেন যে, রাশিয়া আর 'বিশ্ব-বিপ্লবে' (World revolution) বিশ্বাসী নয়। কেননা ওটা ছিল ট্রট্স্কীরই চিন্তাধারা। তাই ট্রট্স্কীর বিরুদ্ধে নাকি এই সংগ্রাম স্বদেশে। এটা ছিল তুরুপের তাস রাশিয়ার হাতে। সুরুতে কমিণ্টার্ণ বিশ্ব-বিপ্লবের হাতিয়ার ছিল। বিপ্লবের স্বপ্ন যখন বিলীন হল তখন তা রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের হাতিয়ার হয়ে পড়ল।

[ "It became essentially an instrument of Russian foreign policy ; and the first aim of this policy was : break Russia's isolation ; the principal means : inspire confidence, wipe out Russia's past." P 388 ]

রাশিয়া জার্মানী ও জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মিত্রতা খুঁজছিল। ব্রিটেন ও আমেরিকাকে এর মধ্যে আনতে চেয়েছিল রাশিয়া। ফ্রান্স ও চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হল ; রাশিয়া League of Nations-এ যোগদান করল। এ অবস্থায় কমিণ্টার্ণকে বাঁচিয়ে রাখার তো মানেই ছিল না। কেননা বিপ্লবী ভাবধারা যখন বর্জিত হল তখন আর এর প্রয়োজনই বা কি ছিল?

রাশিয়া ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলি গণতন্ত্রের চ্যাম্পিয়ান সাজল জার্মান ও ইতালীয় ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে।

ফরাসী দেশে ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ সালের ধর্মঘটে সহযোগিতার মধ্য দিয়েই এই কর্মসূচীর সূচনা হয়েছিল। প্রথমে এই যুক্তফ্রণ্টের রাজনীতিকে

সন্দেহের চোখে সমাজতন্ত্রীরা দেখেছিল। পরে কমিউনিস্টদের প্রতিশ্রুতিতে আস্থাবান হয়ে সোস্যালিস্টরা যুক্তফ্রণ্টের রাজনীতি গ্রহণ করল। ফরাসী দেশে এই নতুন কৌশল খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল অচিরেই। ১৯৩৪ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী দক্ষিণপন্থী Coup-এ কমিউনিস্টরা ও বামপন্থীরা ভীত হয়ে পড়েছিল। স্পেনের আন্দোলন এই ফরাসী দেশের যুক্তফ্রণ্টীয় কৌশলকে সঞ্জীবিত করল। কমিউনিস্টরা ফরাসী দেশে সোস্যালিস্টদের সঙ্গে মিলনের প্রস্তাব করল। একটা কমিশনও বসল এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। Socialist ও Communist Youth Associations মিলে গেল—যেমন, ট্রেড ইউনিয়নগুলি, যথা, C. G. T. (Socialist) ও C G. T. U. (Com.) মিলে গেল। এর পর 'Front Popularie' গড়ে তোলার চেষ্টা হল সে দেশে। এদের যৌথ আন্দোলনের চাপে আধা ফ্যাসিস্ট সরকার (Doumergue-এর Cabinet) পদত্যাগ করল এবং একটি নরমপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হল ফরাসী দেশে।

খুব সাফল্য অর্জন করল পপুলার ফ্রণ্ট ফরাসী রাজনীতিতে। ফরাসী দেশের সোস্যালিস্টরা কমিউনিস্টদের সঙ্গে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করেছিল এই সময় আন্তরিকতার সঙ্গে। তারা একটু বাম-ঘেঁষা নীতি নিয়ে চলত সে সময়।

এই সময়ে সার-এর গণভোট একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। (Saar plebiscite or referrendum)। সার-এ সোস্যালিস্ট কমিউনিস্টরা যৌথভাবে আন্দোলন ও মিলেমিশে কাজ করা সত্ত্বেও—নাৎসীদের বিপুল জয়লাভ হল। তারা শতকরা ৯০টি ভোট পেল। এই নির্বাচনের রায় বামতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ওপর জাতীয়তাবাদের বিজয় সূচিত করল। জাতীয়তাবাদের প্রচণ্ড প্রভাব আবার প্রমাণিত হল।

কিন্তু Saar-এর নির্বাচনের ফলে 'কমিণ্টার্ণের' নীতি পাল্‌টায়নি—কেননা বিভিন্ন দেশে তখন গণতন্ত্রের জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল, যেমন—ফরাসী দেশে পপুলার ফ্রণ্ট। বেলজিয়ামে ফ্যাসিস্টদের প্রয়াস (Rexists) ব্যর্থ হল। আমেরিকায় রুজভেল্ট পুনর্নির্বাচিত হলেন প্রেসিডেন্ট, সেটা অনেকেই আশা করেননি।

১৯৩৪ সালে রাশিয়ায় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়েছে—অবস্থা তখন থমথমে। এই সময় কিছুটা উদারপন্থী, লেনিনগ্রাড এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নেতা Kirov-কে একজন তরুণ হত্যা করে। এই অজুহাতে পুনরায় স্তালিন নির্মম হত্যা ও নিপীড়নের কার্যসূচী চালু করলেন নিজের দেশে। ট্রট্স্কীবাদের বিভীষিকা তুলে নির্বিচারে নিপীড়ন ও হত্যা সুরু হল।

নেতা-পুজোর যুগ সুরু হল বিভিন্ন দেশে। কমিউনিস্টদের মধ্যে যেমন, ফরাসী দেশে Thorez, স্পেনে Josi Diaz, ব্রিটেনে Harry Pollitt, আমেরিকায় Earl Browder—এঁদের কেউই খুব প্রতিভাবান নেতা ছিলেন না। তবু এঁদের hero বানান হল, যেমন, রাশিয়ায় স্তালিনকে Superman সাজান হল। জার্মানীতে Thaelmann-কে তাই করা হল, যদিও তিনি তখন কারাগারে। এই সময় কমিউনিস্টরা মস্কোর প্রেরণায় ক্ষেত্রবিশেষে জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। যেমন সেই সময় ফরাসী কমিউনিস্টরা বলতে সুরু করলেন নিজেদের সম্বন্ধে "a true people's party, flesh of the French people, the party of youth and future, the party of a free prosperous healthy France." Britain-এ ( G. B. C P. ) ফ্যাসিস্ট Mosley group থেকে নিজেদের পৃথক করতে গিয়ে বললেন ব্রিটিশ ফ্যাসিস্ট পার্টি 'ইংরেজ-সুলভই' নয়—'অব্রিটিশ' ( "un-British" )। অস্ট্রিয়াতে তারা অস্ট্রিয় জাতির আত্মরক্ষার ( defence of Austrian nation ) স্লোগান তুলেছিলেন। চীন দেশেও তাই করা হল। ( ব্যতিক্রম অবশ্য ভারতবর্ষ ! ) স্পেন এ স্লোগান ছিল বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের কথা, আমেরিকায়ও কমিউনিস্টরা নিজেদের 'আমেরিকান জাতীয়তাবাদী' বলে প্রচার করতে লাগলেন। নেতা ভজনা-উপাসনা ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদ এই দুটো ছিল সেদিনের কমিউনিজমের রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের স্তম্ভ।

বামপন্থী সমাজতন্ত্রীরা 'পপুলার ফ্রণ্ট' রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা 'শ্রেণী-সংগ্রামে', 'বিপ্লবে', 'আন্তর্জাতিকতাবাদে' বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু রাশিয়া ও 'কমিণ্টার্ণের' নয়া দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁরা নিরাশ হলেন। আবার সমাজতন্ত্রীদের মোহভঙ্গ হল। তাঁরা কমিউনিস্টদের কাছ থেকে সরে গেলেন।

# ১২

## স্পেনের গৃহযুদ্ধ : কল্পনা বনাম বাস্তব

স্পেনে গণতন্ত্র ছিল না—ছিল রাজতন্ত্র। ইউরোপের অন্যতম পিছিয়ে-পড়া দেশ ছিল স্পেন। জার-শাসিত রাশিয়ার মতোই ছিল স্পেনের অবস্থা। নিরক্ষরতা ছিল সর্বব্যাপী—একটা অভিশাপের মতো। শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন নিরক্ষর—বিংশ শতাব্দীর ইউরোপের আর কোনো দেশে নিরক্ষরতার হার এত বেশি ছিল না। দুর্নীতি ছিল পরিব্যাপ্ত—অবক্ষয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল স্পেনের সারা সমাজদেহে। তিনশ' বছর ধরে স্পেনের সমাজ ও রাষ্ট্রে ভাঙনের পালা চলছিল। রাজতন্ত্র এমনকি বিচ্ছিন্নতাকামী প্রবণতাগুলিকেও রুখতে পারেনি।

রাজতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভ ছিল—(১) সৈন্যবাহিনী, (২) ভূম্যধিকারী অভিজাতবৃন্দ, (৩) গির্জা। শেষ রাজা ছিলেন অ্যালফোন্সো (১৩)। দেশের মোট জমির শতকরা ৪৫ ভাগ দেশের, শতকরা ১ ভাগ লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। সারা স্পেনে মাত্র ১৫ থেকে ২০ হাজার জনের ২৫০ হেক্টর করে জমি ছিল। শতকরা ৭২ ভাগ লোকই ছিল ভূমিহীন। শতকরা ৪০ জন লোকের কোনো জমিই ছিল না। একা Grandee Duke of Alba-র হাতেই ছিল ৫৫টি গ্রামের সমস্ত জমি। ঐ জমির আয়তন ছিল বেলজিয়াম রাষ্ট্রের আয়তনের সমান। ভূম্যধিকারীরা থাকতেন শহরে—গ্রামের সঙ্গে যোগ থাকত না তাঁদের। Absentee Landlordism ছিল সে দেশের অন্যতম অভিশাপ।

স্পেনের সেনাবাহিনী ছিল দেশের তুলনায় খুব মাথা-ভারী। ৭০০ জন সেনাপতি ছিল, ২১,০০০ জন ছিল সামরিক অফিসার। ১৯৩৪ সালে জার্মান সেনাবাহিনীতেও এত বেশি অফিসার ছিল না। জাতীয় বাজেটের এক-চতুর্থাংশ ব্যয় হত সেনাবাহিনীর জন্য। তার ওপর তাদের জন্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা। ১৯৩১ সাল অবধি অসামরিক ব্যক্তিদের বিচার করা যেত সামরিক আদালতে। গির্জার ছিল প্রভূত ক্ষমতা, অর্থ ও দেশের ওপর অসাধারণ প্রভাব। ৪০ হাজার পাদরি ও

যাজক ছিলেন স্পেনে—তাঁদের সকল ব্যয়ভার বহন করত রাষ্ট্র। তাঁদের ঘনিষ্ঠ ও অচ্ছেদ্য যোগ ছিল সেনাবাহিনী ও জমিদার-শ্রেণীর সঙ্গে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত গির্জা। খনিজ সম্পদ, কল-কারখানা, শিল্প, ব্যবসা, জমিদারী ইত্যাদি ছিল গির্জার হাতে। গির্জাগুলি যেমন ছিল প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী, তেমনি দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিকেও প্রভাবিত করত তারা বিপুলভাবে।

স্পেনের রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছিল ১৩৯১ সালে। কোন বিপ্লব হয়নি, কোন বন্দুকের গর্জন হয়নি, রক্তপাত হয়নি এক ফোঁটাও। সুদীর্ঘকালের কু-শাসনের খেসারত দিতে হয়েছিল রাজা অ্যালফোন্সোকেই—সিংহাসন পরিত্যাগ করে—রাজধানী মাদ্রিদ ছেড়ে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন নিরাপদ স্থান কার্টাজেনায়। তাঁর ওপর কোন হামলাও হয়নি। তাঁর জন্য বিন্দুমাত্র সমবেদনা প্রকাশ করেনি সেনাবাহিনী, গির্জা বা ভূম্যধিকারী অভিজাতবৃন্দ। যে রাজবংশ পাঁচশ' বছর ধরে স্পেন শাসন করেছিল এমনিভাবে সেদিন সে রাজবংশ ইতিহাসের অতীত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কিন্তু রাজার পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে যে-সব শক্তি এতদিন তাঁর দুষ্কর্মের সহায়ক ছিল তারা লুপ্ত হয়ে গেল না। তারা থাকল, হয়তো বা অবগুণ্ঠনের আড়ালে—কিন্তু তারা শান দিতে লাগল তাদের অস্ত্র।

১৯৩১ সালে প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠিত হল। নতুন উদারনৈতিক শাসনের সম্ভাবনায় আশান্বিত হল সবাই। বিশ্ববাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল স্পেনের ওপর। এই প্রজাতন্ত্রের স্রষ্টা ছিলেন কেবল রাজনীতিকরাই নন—মিগুয়েল ডি উনামুনো, জোসে ওর্টেগা গ্যাসেট, ম্যানুয়েল আজানে, অধ্যাপক ফার্নাণ্ডো ডি লস রিওস—প্রভৃতির মতো বৈজ্ঞানিক, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, মনীষী এবং লার্গো কাবা উয়েরো-র মতো শ্রমিকনেতা—এঁরাই ছিলেন স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রের নায়ক।

এই প্রথম একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার দেশের দার্শনিক ও মনীষীদের বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়েছিল। যেমন, জেনেভায় স্পেনের রাষ্ট্রদূত হয়ে গিয়েছিলেন অধ্যাপক-সাংবাদিক সালভাডর ডি ম্যাডরিয়াগা, লণ্ডনে রাষ্ট্রদূত হয়ে গিয়েছিলেন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক র‍্যামন পেরেজ ডি আয়ালা, রোমে গিয়েছিলেন একজন কবি, জার্মানীতে গিয়েছিলেন সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবী লুইস আরাকুইস্টেন। এইরকম রাষ্ট্রদূতরাই নিযুক্ত হয়েছিলেন সেদিন দেশে দেশে স্পেনের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। সত্যই এ ছিল এক অভিনব প্রয়াস।

নতুন সরকার দেশের জন্য একটি নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন করেছিল। একটি স্মরণীয় দলিল হয়ে আছে সেই সংবিধান। এই সংবিধান রাষ্ট্র ও ধর্মকে পৃথক করে দিয়েছিল—সেদিন তা ছিল একটি অভাবনীয় বিষয়। স্পেনকে ঘোষণা করা হল—a workers' republic of all classes। অবৈধ কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হল। শিল্পের লাভের অংশীদার করা হল শ্রমিকদের। পৃথিবীর এই প্রথম রাষ্ট্র যা League of Nations-এর কর্তৃত্ব প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়েছিল—এবং নিষিদ্ধ করেছিল যুদ্ধ। কেবলমাত্র League of Nations যে যে পরিস্থিতিতে যুদ্ধ ঘোষণা করার নীতি স্বীকার করেছিল স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানে কেবলমাত্র সেই সেই পরিস্থিতিতেই যুদ্ধ ঘোষণার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

অবশ্য এই সংবিধান কার্যকর হয়নি। তত্ত্বের প্রতি বেশি ঝোঁক থাকার ফলে ব্যবহারিক দিকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি এই সংবিধানে। ব্যক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিশ্রুতিগুলিকে রূপ দেবার সঠিক বাস্তব কোন চেষ্টাই হয়নি বলতে গেলে। যেমন, প্রজাতন্ত্রের যারা শত্রু তাদের খর্ব করার কোন চেষ্টাই হয়নি। পণ্ডিত, আদর্শবাদী ও উদারনৈতিক তাত্ত্বিকদের সমাবেশ ঘটেছিল রাষ্ট্র-পরিচালনার কাজে—কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞান তাঁদের ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভাঙবার কোন ব্যবস্থাই হয়নি।

১৯৩২ সালে নতুন প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন জেনারাল সঞ্জুরজো ( General Sanjurjo )। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী আজানা গির্জাগুলির ক্ষমতাও খর্ব করতে পারেননি। ১৯৩৩ সালের Religious Orders Bill ( ১৯৩৩-এর জুন )-এর ক্ষমতাবলে গির্জাগুলির সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল। এই সব সম্পত্তির দাম ছিল ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। কিন্তু সমস্ত সম্পত্তি কার্যত থেকে গেল গির্জাগুলির হাতেই। আজানা জেস্যুইট অর্ডারকেও বাতিল করেছিলেন, কিন্তু জেস্যুইটদের বহিষ্কার করেননি। তাঁদের ধর্মপ্রচারেও কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। গির্জাগুলি ধীরে ধীরে আবার ফিরে পেয়েছিল তাদের পুরোনো ক্ষমতা ও প্রভাব।

তবে আজানা সরকার কৃতিত্বপূর্ণ কাজও করেছিলেন কয়েকটি। যেমন :

এক, স্পেনের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত করা হয়েছিল। বহির্বিশ্বের সঙ্গে স্পেনের যোগাযোগ সাধন করা হয়েছিল। আধুনিক ভাবধারার হাওয়া বইতে সুরু করেছিল স্পেনে।

দুই, সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছিল।

তিন, আজানা সরকার ক্যাটালোনিয়াকে স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিল। চারশ' বছর ধরে ক্যাটালোনিয়াকে নিয়ে একটা দুর্ভাবনা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়ে আসছিল। Basques-দেরও স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিল আজানা সরকার।

চার, সামন্তপ্রথার কিছু কিছু গলদ দূর করতেও সক্ষম হয়েছিল এই সরকার।

তবু ১৯৩৩ সালের শীতকালে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন আজানা। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত বামপন্থী সরকারের আয়ু ছিল মাত্র আড়াই বছর। তারপর দক্ষিণপন্থীদের নিয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল। তারা অবশ্য প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের চাপে সুরু হয়ে গেল প্রতি-বিপ্লবের পালা।

১৯৩৪ সালে এই প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে সোস্যালিস্টরা বিদ্রোহ করল। কিন্তু তাদের স্তব্ধ করে দেওয়া হল গুলির জোরে। প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল সেদিন। অ্যাস্টুরিয়াসে খনি-শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমিকদের প্রতিরোধকে চূর্ণ করে দিয়েছিল দক্ষিণপন্থীরা। অথচ মুখে তারা প্রজাতন্ত্রকেই সমর্থন করত। ভাড়াটে সৈন্য-বাহিনী দিয়ে ১,৪০০ জনকে তারা খুন করেছিল। সারা স্পেনে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক, বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৩৫ সালের শেষ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রী স্পেনের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল প্রায় ৩৫,০০০ জন সমাজতন্ত্রী। সারা ইউরোপ নীরব সাক্ষী মাত্র হয়েছিল সেদিন।

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে আবার সাধারণ নির্বাচন হল। প্রগতিশীল প্রজাতন্ত্রের সমর্থক দলগুলি একত্রিত হল—গঠিত হল পপুলার ফ্রণ্ট, ফ্রান্সের নজীর অনুসরণ করে। ভোটে তারা কোনমতে জিতেছিল সামান্য সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পেয়ে। পপুলার ফ্রণ্ট ও বাস্কস ( Basques ) একত্রে ভোট পেয়ে-ছিল ৪,৮৩৮,৪৪৯টি; আর দক্ষিণপন্থীরা পেয়েছিল ৩,৯৯৬,৯৩১টি। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর স্পেনে গঠিত হল পপুলার ফ্রণ্ট-নিয়ন্ত্রিত যুক্তফ্রণ্ট সরকার। কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টরা এই সরকারকে সমর্থন করলেও সরকারে যোগ দেননি। ১৯৩১ সালের বামপন্থী সরকারকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করা হয়েছিল এইভাবে।

আবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ডন ম্যানুয়েল আজানা ( Don Manuel Azana )। পরে অবশ্য তাঁকে রাষ্ট্রপতির পদে উন্নীত করে তাঁর কাজের গুরুত্ব ও দায়িত্ব হাল্‌কা করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও দার্শনিক। একসময় তিনি সরকারী অফিসারও ছিলেন। তিনি মনে-প্রাণে

ছিলেন গণতন্ত্রী। জন গান্থার আজানা সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি একজন "Intellectual, democrat and bourgeois'. তাঁর বিরোধী, কিন্তু প্রজাতন্ত্রের সমর্থক দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে ছিলেন Don Alejandro Lerroux এবং Don Jose Maria Gil Robes.

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে সরকার গঠিত হবার পর দেশে পর্যাপ্ত শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল না। অনিশ্চয়তার ভাব ছিল সারা দেশে। ফ্যাসিস্টরা ইচ্ছা করেই অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল বিশৃঙ্খলা বাড়ুক—তারপর তারাই একদিন নিয়ে আসবে শৃঙ্খলা।

কিন্তু স্পেনের গৃহযুদ্ধের বর্ণনার আগে সে দেশের রাজনৈতিক শক্তিবিন্যাসের চিত্রটি একটু লক্ষ্য করা যাক। গৃহযুদ্ধে একপক্ষে ছিল গরীব জনতা, আর এক-পক্ষে ধনীগোষ্ঠী; একদিকে শ্রমিক-শ্রেণী, আর একদিকে সৈন্যবাহিনী; একদিকে স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, আর একদিকে ভাড়াটে সৈন্য; একদিকে কৃষক-শ্রেণী, আর একদিকে ভূম্যধিকারিগণ; একদিকে ক্ষেতমজুর আর একদিকে জোতদার; একদিকে গণতন্ত্র, আর একদিকে ফ্যাসিবাদ। স্পেনের গৃহযুদ্ধে এই ছিল পক্ষ ও প্রতিপক্ষের চিত্র। ( John Gunther : Inside Europe, P. 172, Chap. XII )। সত্যই স্পেনের গৃহযুদ্ধ ছিল দুটি ভিন্ন আদর্শের সংঘাত।

গান্থার বলেছেন, স্পেনে Red Revolution বলে কিছু ছিল না। ওটা প্রচার করা হয়েছে মাত্র। যে প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে জেনারেল ফ্রাঙ্কো ( General Franco ) ও তাঁর বন্ধুরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন সেই সরকারে সোস্যালিস্ট বা কমিউনিস্টরা ছিল না। তারা পরে যোগ দিয়েছিল। দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহীরা যে গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছিল তাকে মোটামুটি বাম-ঘেঁষা উদারপন্থী প্রগতিশীল সরকার বলা যেত। কোন মার্কসবাদী ঐ সরকারে ছিলেন না।

গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যও আগে আসেনি। কিন্তু দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহীদের বিপুল পরিমাণ সাহায্য পাঠিয়েছিল জার্মানী ও ইতালী। প্রজাতন্ত্রীদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করার জন্য কোন সৈন্যই রাশিয়া পাঠায়নি। কিন্তু ইতালী ফ্রাঙ্কোর পক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বহু সৈন্য পাঠিয়েছিল।

ফ্রাঙ্কোপন্থীরা নিজেদের বলত জাতীয়তাবাদী। ফ্রাঙ্কোর পক্ষে ছিল অফিসার-শ্রেণী, রাজনৈতিক ভাবাপন্ন রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়, রাজতন্ত্রীরা, ভূম্যধিকারীরা, একশ্রেণীর শিল্পপতি, পুলিশবাহিনী ও সিভিল গার্ডদের একাংশ ও

Falangistas বা ফ্যাসিস্তরা। স্প্যানিশ মরক্কোর মুররা, ইতালীয় ও জার্মানরা এবং কার্টিস্টগণ ( Cartists ) ফ্রাঙ্কোর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল।

আর প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে ছিল সকল বামপন্থীরা—প্রজাতন্ত্রী, উদারপন্থী, গণতন্ত্রী, সোস্যালিস্ট, কমিউনিস্ট, সিণ্ডিক্যালিস্ট ও এ্যানারকিস্টরা। তাছাড়া ছিল ক্যাটালোনিয়ার অধিবাসীরা ও বাস্কস স্বশাসকপন্থীদের মতো রোমান ক্যাথলিকরা। ভূমিহীন কৃষক ও দরিদ্র জনসাধারণ ছিল সরকারের পক্ষে। লড়াইটা সত্যই ছিল গৃহযুদ্ধ—দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ। স্পেনের জনগণ দুর্বল প্রজাতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য পাঁচ বছর ধরে মরণপণ করে লড়েছিল। আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে স্পেনের গৃহযুদ্ধ সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

স্পেনের বামপন্থী সংগঠনগুলির মধ্যে ছিল P O U. M., P. S. U. C, F. A. I., C. N. T, U. G. T., J. C. I., J. S. U. ও A. I. T.

P O U M-এর পুরা নাম Partido Obrero de Unification Mırxists অর্থাৎ Party of Marxist Unification। এই পউমের যুব-সংস্থা ছিল J. C. I., স্পেনের সোস্যালিস্ট পার্টির নাম ছিল P. S. U. C. আর তার যুবসংস্থা ছিল J. S. U.।

গৃহযুদ্ধ বেধেছিল ১৯৩৬ সালের ১৮ই জুলাই। দিনটি ছিল শনিবার। উগ্রপন্থী সামরিক কিছু অফিসারগোষ্ঠী গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল—নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেনারেল ফ্রাঙ্কো। সামরিক ক্যু' দেতা বা অভ্যুত্থানরূপে যার সূচনা হয়েছিল, ক্রমে তা একটি আদর্শের লড়াইয়ের রূপ ধারণ করেছিল এবং স্পেনের এই গৃহযুদ্ধে কয়েকটি রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়েছিল। জার্মানী ও ইতালি ফ্রাঙ্কোর পক্ষে এবং রাশিয়া ও ফ্রান্স প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে সাহায্য পাঠিয়েছিল। যুদ্ধের প্রথম বছরেই নিহত হয়েছিল ৫০০,০০০ জন। এত রক্তপাত সত্ত্বেও সারা ইউরোপ মাসের পর মাস নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল। তবে কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা ইউরোপের নানা দেশ থেকে এসে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে যুদ্ধে সামিল হয়েছিলেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধ তাই বিশাল আন্তর্জাতিক তাৎপর্য লাভ করেছিল।

ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল এইভাবে। একজন বামপন্থী অফিসার লেফটেন্যান্ট ক্যাস্টিলোকে ( Castillo ) হত্যা করা হয়। তিনি ছিলেন পুলিশবাহিনীর Assault বিভাগের অফিসার। হত্যা করেছিল দক্ষিণপন্থীরা। বামপন্থীরা

এই হত্যার বদলা নিয়েছিল Senor Calvo Sotelo-কে হত্যা করে। তিনি ছিলেন Primo de Rivera-র প্রাদেশিক সরকারের অর্থমন্ত্রী। এই দুটি হত্যাকে কেন্দ্র করেই জ্বলে উঠেছিল স্পেনের গৃহযুদ্ধের ব্যাপক আগুন।

ক্যালভো সটেলোর হত্যার প্রতিবাদে সমস্ত দুর্গের সৈন্য ও অফিসাররা বিদ্রোহ করেছিল। তাদের এই বিদ্রোহ সফল হয়েছিল কয়েকটি শহরে, যেমন—স্যালামাঙ্কা, সেভাইল ও টোলেডোয়। কিন্তু মাদ্রিদ, বার্সিলোনা, ভ্যালেন্সিয়া, মালাগা ও বিলবাওয়ে প্রজাতন্ত্রীদের ও জনসাধারণের সম্মিলিত প্রতিরোধের সামনে তাদের বিদ্রোহ ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। জনগণ খালিহাতে লড়াই করে গ্যারিসন পর্যন্ত অবরোধ করেছিল। এই শহরগুলিতে সামরিক অভ্যুত্থান তথা ক্যু' দেতা ব্যর্থ হয়েছিল। ফ্রাঙ্কোর দল ভাবতেই পারেনি যে, জনগণ এভাবে প্রতিরোধ করতে পারে।

জেনারেল ফ্রান্সিস্কো ফ্রাঙ্কো ছিলেন Canary Islands-এর গভর্ণর। তিনি বিমানে মরক্কো চলে যান এবং ইতালীয় বৈমানিকদের সাহায্যে জিব্রাল্টার অবরোধ চূর্ণ করে দেন। তিনি মুর সৈন্যদের সাহায্যে যুদ্ধ-চালনার ব্যবস্থাও করেছিলেন। মুর সৈন্যে স্পেন ছেয়ে গেল। অদৃষ্টের পরিহাস! ইতিহাসে কতবার স্পেন মরক্কোকে আক্রমণ করেছে। এবার সেই মরক্কোই যেন স্পেনকে বাঁচাতে এল গণতন্ত্রীদের হাত থেকে।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগেই ইতালীয় বিমানবাহিনী ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর ১৯৩৬ সালের আগস্টের মাঝামাঝি জার্মান বিমানবাহিনী সক্রিয়ভাবে ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করতে সুরু করে।

১৯৩৬ সালের অক্টোবরের প্রথমভাগে মাদ্রিদের উপকণ্ঠে ফ্রাঙ্কোর বাহিনী এসে পৌঁছেছিল। অবরোধ সুরু হল। সরকারের অনুগত পক্ষ তাদের প্রতিরোধ দুর্জয় করে তুলেছিল অভাবনীয়ভাবে। ৭ই নভেম্বর মাদ্রিদের শহরগুলিতে ফ্রাঙ্কো বাহিনী এসে পৌঁছল। সরকার পিছু হঠে চলে গেল ভ্যালেন্সিয়ায়।

বোমা-বর্ষণে ও কামানের গোলায় বিধ্বস্ত হয়েছিল মাদ্রিদ নগরী। নগরীর এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্রাণ হারিয়েছিল হাজার হাজার নাগরিক। কয়েক মাস ধরে চলেছিল মাদ্রিদ অবরোধ। ফ্রাঙ্কোর পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল জার্মান ও ইতালীয় বিমানবহর। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি জার্মান যুদ্ধ-জাহাজ Cetua-র কাছে দেখা দিল। স্পেনের দরিয়ায় দেখা দিল জার্মান সাবমেরিন। ফ্রাঙ্কোর পক্ষে বিদেশী সাহায্য আসত সমুদ্রপথে অথবা

পোর্তুগালের মধ্য দিয়ে। পোর্তুগাল এইভাবে অন্তত পরোক্ষভাবেও লঙ্ঘন করেছিল তার তথাকথিত নিরপেক্ষতা।

স্পেনের গৃহযুদ্ধকে বর্ণনা করা হয়েছিল ফ্যাসিবাদ বনাম কমিউনিজমের লড়াই বলে। হিটলার ও মুসোলিনি মনে করেছিলেন ফ্যাসিস্ত স্পেন বহুলাংশে ফ্রান্সের ক্ষমতা খর্ব করবে। তাই তাঁরা প্রকাশ্যে মদত দিয়েছিলেন ফ্রাঙ্কোকে। তখন স্তালিনের ভূমিকা ছিল অদ্ভুত। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে জার্মানী ও ইতালী ফ্রাঙ্কোর সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার ইতালীয় সৈন্য স্পেনে এসেছিল যুদ্ধে অংশ নিতে। ১০ হাজার জার্মান কারিগর ও কলাকুশলী এসেছিল ফ্রাঙ্কোর পক্ষকে সাহায্য করতে।

তখন প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পক্ষেও এসে গেল পাল্টা আন্তর্জাতিক সাহায্য। এই সাহায্য এসেছিল দুই আকারে: (১) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে যোগ দিতে এসেছিল স্বেচ্ছাসেবকের দল। এরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এদের উদ্দেশ্য ছিল ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করা ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করা। ১৯৩৬ সালে মাদ্রিদ নগরীকে রক্ষা করতে এরা ছুটে এসেছিল। মাদ্রিদকে তারা রক্ষা করতে সক্ষমও হয়েছিল।

১৯৩৬ সালের অক্টোবরে রুশ বিমান, ট্যাঙ্ক, খাদ্য ও কূটনৈতিক সাহায্য আসা সুরু হয়েছিল। তবে তাদের সাহায্য আসার আগেই মাদ্রিদ্র নগরীর এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তার ক'দিন আগে রুশ-সাহায্য এসে পৌঁছলে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেত মাদ্রিদ নগরী। দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহীরা ১৯৩৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী দখল করেছিল মালাগা, ১৯শে জুন দখল করেছিল বিলবাও। সরকারপক্ষও তেমনি জয়লাভ করেছিল গুয়াদেলেজারায়। এখানে ইতালীয় বাহিনী সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়েছিল। সারা আবিসিনিয়ার যুদ্ধে যত ইতালীয় সৈন্য প্রাণ হারিয়েছিল তার চেয়েও বেশি ইতালীয় সৈন্য নিহত হয়েছিল এই ফ্রন্টের যুদ্ধে। প্রত্যুত্তরে জার্মান বৈমানিকরা বাস্কের পবিত্র শহর গুয়ের্নিকা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল বোমা বর্ষণ করে।

১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধের অচল অবস্থা ছিল। তারপর ফ্রাঙ্কোর অনুকূলেই পরিস্থিতি ঘুরতে সুরু করে। প্রজাতন্ত্রী সরকার পর্যাপ্ত বিদেশী সাহায্য পায়নি—কিন্তু ফ্রাঙ্কোর পক্ষে জার্মান, ইতালীয় ও মুর সৈন্য দলে দলে এসে যোগ দিয়েছিল। সবার মনেই তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া কতদিন প্রজাতন্ত্রী সরকার পক্ষ লড়তে পারবে?

যুদ্ধে দু'পক্ষই বর্বরতা করেছে—কিন্তু ফ্যাসিস্ত বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রজাতন্ত্রী পক্ষের ধৃতদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। পপুলার ফ্রন্টের সমর্থক হলেই তার আর রেহাই ছিল না। কারডোবা (Cardoba) গ্রামে ২,০০০ নরনারীকে হত্যা করা হয়েছিল, তারা প্রজাতন্ত্রের সমর্থক এই সন্দেহে। সারাগোয়ও ঐ একই কারণে ১,৮০০ লোককে হত্যা করা হয়েছিল। সেভাইলে ৯,০০০ লোককে গুলি করে মারা হয়; প্যামপ্লুয়ায় (Pamploua) গুলি করা হয়েছিল ৩,০০০ জনকে। গ্রানাডায় গুলি করে মারা হয়েছিল ৬,০০০ জনকে। অবরোধের কালে মাদ্রিদ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল ১৫০,০০০ নরনারী।

কেন প্রজাতন্ত্রী সরকারের পক্ষ পরাজিত হয়েছিল? তার একটি কারণ বামপন্থী শক্তির অনৈক্য। বহু দলে বিভক্ত ছিল বামপন্থীরা। যেমন:

(১) Syndicalists—১৯৩৬ সালের আগে পর্যন্ত এরা রাজনীতি ও ভোটে বিশ্বাসী ছিল না। এরা ছিল নীতিগতভাবে a-political—অরাজনৈতিক। এদের মধ্যে মিশে ছিল নৈরাজ্যবাদীরা। তার বিপদের কারণও ছিল। কেন না তারা কোন সরকারেই আস্থাবান ছিল না। দক্ষিণপন্থীরা এই Anarcho-Syndicalists-দের দিয়ে বামপন্থীদের কোণঠাসা করার চেষ্টা করত। এরা উচ্ছৃঙ্খল ও উস্কানিমূলক কাজ করত, এলোপাথাড়ি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাত (আমাদের দেশের নকশালপন্থী ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মতো)। তার সুযোগ নিয়ে জবরদস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করত দক্ষিণপন্থীরা। বিশেষভাবে সোস্যালিস্টদের ওপর আক্রমণ করার অজুহাত সৃষ্টি করে দিত অ্যানার্কো-সিণ্ডিক্যালিস্টরা। তার সুযোগ নিতে বিশেষ পাকাপোক্ত ছিল দক্ষিণপন্থী Lerroux.

ধীরে ধীরে সিণ্ডিক্যালিস্টরা রাজনীতিতে উৎসাহ নিতে লাগল। স্পেনে ফ্যাসিবাদের উদ্ভবে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। তারা ফ্যাসিস্তদের মদত দিতে চায়নি। তারা দেখল উদারপন্থী বামশক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করা দরকার। তাদের ইতিহাসে তারা প্রথম ১৯৩৬ সালের সাধারণ নির্বাচনেই অংশ নিয়েছিল। পপুলার ফ্রন্টের সঙ্গে তারা হাত মিলিয়েছিল। ১৯৩৬ সালে বামপন্থীরা যে জয়লাভ করেছিল সেজন্য অ্যানার্কো-সিণ্ডিক্যালিস্টদের দান কম নয়। ক্যাটালোনিয়া ও বাস্কে তাদের বিশেষ প্রভাব ছিল। ১৮৭২ সাল থেকে বাকুনিনপন্থীদের প্রভাব এই অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছিল। তারাই ছিল সিণ্ডিক্যালিস্ট। তাদের শ্রমিক সংগঠনের নাম ছিল CNT (Con-

federation Nacional de Trabajo) ক্যাটালোনিয়া ও আণ্ডালুসিয়ার (Andalusia) CNT-র শক্ত ঘাঁটি ছিল। বার্সিলোনায় ছিল এদের মূল কেন্দ্র।

(২) Anarchists—এদের সংগঠনের নাম ছিল FAI (Federacion Anarquista Ibera)। সদস্য ছিল ৮,০০০ জন। এরা প্রথমে সিণ্ডিক্যালিস্টদের সঙ্গে ছিল, তাদের শ্রমিক সংগঠনকেও শক্তি যোগাত। পরে CNT থেকে তারা বেরিয়ে আসে।

(৩) সোস্যালিস্ট—নরমপন্থী মার্কসবাদীরাই সোস্যালিস্ট নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু সোস্যালিস্টদের আবার দুটি উপদল ছিল। এক উপদলের নেতা Indelacio Prieto ছিলেন নরমপন্থী। তিনি ছিলেন বাস্কের শিল্পপতি ও একটি পত্রিকার মালিক। তিনি আজানা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন এবং সরকারে অংশ নিতেও চেয়েছিলেন। এই বিষয় নিয়ে সোস্যালিস্টদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছিল।

বিভেদের আরও কারণ এই যে, সোস্যালিস্টদের একটি উপদল উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী ছিল। এদের নেতা Largo Caballero ছিলেন উগ্রপন্থী। তাঁর তুলনায় কমিউনিস্টদেরও মনে হত নরমপন্থী। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে তাই লোকে বলত *Vote Communists to save Spain from Marxists*—'মার্কসবাদীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে কমিউনিস্টদের ভোট দাও।' আগেই বলেছি, স্পেনে সোস্যালিস্টরা ছিল মার্কসবাদী।

(৪) কমিউনিস্ট—স্পেনে কমিউনিস্টরাই ছিল সবচেয়ে দুর্বল পার্টি। স্পেনের Cortes বা পার্লামেণ্টে তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৬ জন। সোস্যালিস্টদের মধ্যে ভাঙনের ফলেই কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছিল। বার্সিলোনার কিছু সমাজতন্ত্রী মার্কসবাদে আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসে ভিড়েছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহে বার বার ভেঙে পড়ে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। জনগণের ওপর এই দলের কোন প্রভাবই ছিল না। তাছাড়া প্রথম দিকে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় সবাই স্তালিন-ট্রট্স্কীর দ্বন্দ্বে ট্রট্স্কীর পক্ষ নিয়েছিলেন। ফলে পার্টি থেকে তাঁদের বহিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি এত নগণ্য একটি দল ছিল যে, সামরিক ডিক্টেটর Primo de Rivera ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত স্পেনের শাসক থাকাকালে এই দলকে নিষিদ্ধ করেননি। নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনও অনুভব করেননি। সে সময় কমিউনিস্টরা খোলাখুলি

তাদের পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করত—সামরিক ডিক্টেটরের শিরঃপীড়ার কারণ তারা হয়নি, খুবই আশ্চর্য এ ঘটনা। প্রাইমোর পতনের পর ১৯৩১ সালে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্পেনে। এই সময় কমিণ্টার্ণ উগ্র বামপন্থী পথ অনুসরণ করে চলছিল। তার ফলে স্পেনের কমিউনিস্টরা ভাবলেন শ্রমিক-শ্রেণীর কাছে রাজতন্ত্র ও রিপাবলিকের কোনই তফাৎ নেই। জার্মানী ও বুলগেরিয়ায়ও কমিউনিস্টরা একই কথা ভেবেছিল। গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি যখন প্রজাতন্ত্রের পক্ষ নিয়েছিল কমিউনিস্টরা তখন প্রচণ্ড উদ্যম ও শক্তি নিয়ে তাদের বিরোধিতাই করেছিল। সোস্যালিস্টরা কিন্তু গণতন্ত্রীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।

Imprecor-এর ২৫নং সংখ্যায় ( ১৯৩০ ) বলা হয়েছিল : National conference of the Communist Party of Spain "put special emphasis upon the fight against illusions created by the liberal and republican bourgeoisie—naturally their social fascist allies support them to the best of their ability and try to create the impression that it is possible in Spain, to create a bourgeois democratic regime. The conference resolved to fight with utmost energy the attempts of the right-and-left wing social fascists who, with the support of important sections of the anarchist movement ( Pestana ), attempt to form a united front with the liberal and republican bourgeoisie." The principal slogan of the party, the resolution continues, is and remains "a workers' and peasants' Federative Socialist Republic of the Peninsula ...based upon workers' peasants' and soldiers' Soviets."

(৫) POUM—ট্রট্স্কীর নির্দেশে Andres Nin-এর নেতৃত্বে একটি গোষ্ঠী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং সোস্যালিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতায় সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৩০ সালে রিপাবলিক বনাম রাজতন্ত্রের সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিল। এইভাবে আর একটি গোষ্ঠী, যাঁরা ট্রট্স্কীপন্থী ছিলেন না,—তাঁরাও কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। Joaquim Maurim ছিলেন তাঁদের নেতা। এঁদের দল থেকে বিধিমত বহিষ্কৃত বলে ঘোষণাও করা হয়েছিল।

নিন ও মরিমের সমর্থনে পুষ্ট POUM ( Marxist Party of Working Class Unity ) বিশেষভাবে বার্সিলোনায় একটা শক্তিশালী দলরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। ঐ দলও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দাবী সমর্থন করেছিল। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র তারা চায়নি। ট্রট্স্কী-পন্থীদের এই মত পরিবর্তন যেমন বিস্ময়কর, তার চেয়েও বেশি বিস্ময়কর স্পেনীয় কমিউনিস্টদের এই সময়কার আচরণ। তারা তখন শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর। তারা ভাবছিল প্রচণ্ড রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটবে স্পেনে, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করবে তারা। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আঘাতে যখন শ্রমিক আন্দোলন বিপর্যস্ত হবার মুখে, প্রতি-বিপ্লবী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তখন কমিউনিস্টরা ঘোষণা করল : বিপ্লবের মহালগ্ন ঐ এলো, ঐ এলো :

"Revolutions of workers and peasants has not yet unfolded all its forms...very likely the next explosion will open the period of decisive battles...and lead to the capture of power ( Randschau—No. 12, 1933 )

Randschau-র পরবর্তী সংখ্যায় ট্রট্স্কী-পন্থীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বলা হল : ট্রট্স্কী-পন্থীরা নাকি চাইছে : Unconditional united front of all working class organisations.

বরকেন্যো ( Borkenau ) বলেছেন : It is interesting to note that in 1930 Trotskyism was what Communism is today—and Communism then was what is today called Trotskyism. ( The Communist International—Borkenau. P. 404 )

১৯৩৪ সালের গ্রীষ্মকালে নতুন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। 'কমিণ্টার্ণ' গণতন্ত্র সম্পর্কে হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠল। উত্তর-স্পেনের খনি এলাকা Asturias-এ ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে সোস্যালিস্টরা বিদ্রোহ করে বসল। এই বিদ্রোহের পিছনে ছিল সত্যিকারের গণ-সমর্থন। প্রায় ১৫ দিন ধরে অ্যাস্টুরিয়াসে সোভিয়েত সরকার চালু ছিল। কিন্তু এই অভ্যুত্থানের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করা। অ্যানার্কিস্টরা এই বিদ্রোহে অংশ নেয়নি—তারা ছিল নিরপেক্ষ। কমিউনিস্টরা কিন্তু যোগ দিয়েছিল বিদ্রোহে। তবে সমাজতন্ত্রীরাই প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল—তাদের আন্তরিকতা, দৃঢ় সঙ্কল্প ও প্রজাতন্ত্রের আদর্শে গভীর বিশ্বাস অ্যাস্টুরিয়াসের বিদ্রোহে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল অবশ্য।

এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন একজন মহিলা, Dolores Ibarruri। তিনি শ্রমিকের মেয়ে। অসামান্য ছিল তাঁর বাগ্মিতা। ডিমিট্রভের পরই ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর নাম।

ফ্রান্সের Front Populaire বা 'পপুলার ফ্রন্ট' স্পেনের কাছে এক নতুন মডেলরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। ১৯৩৪-৩৫ সালে কমিউনিস্টরা তাদের আগের সঙ্কীর্ণ নীতি পরিত্যাগ করে গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী ও বুর্জোয়া রিপাবলিকানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। অথচ এর আগে এই সহযোগিতার কথা কেউ বললেই তাকে 'ট্রট্স্কীপন্থী' বলে গাল দেওয়া হত—পার্টি থেকে তাকে বহিষ্কার করা হত। কমিউনিস্টদের শক্তি POUM-এর চেয়ে কম ছিল। ১৯৩৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে পপুলার ফ্রন্ট জয়ী হল এবং কমিউনিস্টরা কয়েকটি আসনও পেয়েছিল। নতুন বুর্জোয়া রিপাবলিকান সরকারকে কমিউনিস্টরা অন্য বামপন্থীদের মত সমর্থন করেছিল তখন।

বামপন্থীদের প্রথম সরকারে (১৯৩১-৩৩) সোস্যালিস্টরা অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ায় তাঁদের নেতা ফ্রান্সিস্কো লার্গো ক্যাবালারো গণতন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অতি-বাম নীতির দিকে ঝুঁকেছিলেন। দলের দক্ষিণপন্থী অংশ এ বিষয়ে তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। আগেই বলেছি, ক্যাবালারো-পন্থীরা কমিউনিস্টদের চেয়েও নিজেদের বেশি র‍্যাডিকাল প্রতিপন্ন করতে চাইতেন। কিন্তু সত্যই যখন গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লবের সময় এল তখন তাদের মতটা গেল পাল্‌টে। তারা তখন বলল, বিপ্লবের কোন প্রয়োজন নেই, সব কিছু হোক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এমনকি তারা ফ্রাঙ্কো বাহিনী ও বিদ্রোহী জনসাধারণের মধ্যে মধ্যস্থতা করার ভূমিকাও নিতে চেয়েছিল।

১৯৩৬ সালের জুলাইয়ে ফ্রাঙ্কোর অভ্যুত্থানের ফলে স্পেনের বামপন্থী রাজনীতিতে আরও কয়েকটি পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। যেমন, ক্যাটালান সোস্যালিস্টদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের মিলন। ক্যাটালান সোস্যালিস্টরা ছিলেন ডান-ঘেঁষা। বার্সিলোনায় শ্রমিক আন্দোলন অ্যানার্কিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত হত—ক্যাটালান সোস্যালিস্টরা তাই অ্যানার্কিস্টদের বিপদস্বরূপ মনে করতেন। তাঁরা অ্যানার্কিস্টদের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। হাত মেলানোর পরিণতিতে ঘটল উভয় পক্ষের মিলন ও ক্যাটালোনিয়ায় সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা একটি দলে পরিণত হয়ে গেল। এই দলের নাম হল P. S. U. C. ( Catalan United Socialist

Party )। সোস্থালিস্ট ও কমিউনিস্টদের এহেন মিলনের এটাই প্রথম বড় দৃষ্টান্ত। এই মিলনের ফলে লাভবান হয়েছিল কমিউনিস্টরা। সারা ক্যাটালোনিয়া প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্ত ছিল ২০০ জনের কম। কিন্তু মিলনের অব্যবহিত পরই হাজার হাজার অন্য দেশের লোক, যেমন—জার্মান রুশ, মার্কিন, ইতালীয়, ব্রিটিশ, ফরাসী কমিউনিস্ট P. S. U. C.-তে এসে যোগ দিয়েছিল। অচিরেই P. S. U. C কমিউনিস্টদের দখলে চলে গেল। অ্যানার্কো-সিণ্ডিক্যালিস্টদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের যে চিরকালীন লড়াই তাতে কমিউনিস্টদের হাতিয়ারে পরিণত হল P. S U. C.

ক্যাটালোনিয়ায় অ্যানার্কিস্টরা ছিল খুবই শক্তিশালী। অন্যান্য রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা দলগুলিকে তারা ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখত। তাদের ভয়ে জনসাধারণও ভীত-ত্রস্ত ছিল। এদের তুলনায় P S. U. C.-র শক্তি কমই ছিল বলতে হয়। দোকানদার, বুদ্ধিজীবী, ধনী, কৃষক, সরকারী ও বেসরকারী চাকুরে প্রভৃতিরাও আতঙ্কিত ছিল অ্যানার্কিস্টদের দাপটে। তার ফলে এরা ধীরে ধীরে P. S. U. C.-র দিকে আকৃষ্ট হল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে কমিউনিস্টরা জড়িয়ে পড়ুক রাশিয়া তা চায়নি। গৃহযুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসে রাশিয়া স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন জানায়নি। কারণটা খুবই স্পষ্ট: মস্কো পশ্চিমের দেশগুলিকে বোঝাতে ব্যস্ত ছিল যে, সে আর বিশ্ব-বিপ্লবে বিশ্বাসী বা উৎসাহী নয়, তাকে এখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য, বাঞ্ছিত বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে।

স্পেনের কমিউনিস্টরা ছিল মস্কোর অনুগত; তারা মস্কোর মতলব সিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত করেছিল নিজেদের। তাই মস্কোর নির্দেশে তারা স্পেনে যে-কোন রকম বৈপ্লবিক কর্মপন্থার বিরোধিতা করেছিল। সোস্থালিস্ট ও অ্যানার্কিস্টরা স্পেনে সোভিয়েতের মতো কমিটি শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল, নানা স্থানে কমিউনিস্টরা তার বিরোধিতা করে। ভূস্বামীদের জমি নিয়ে নেবার বিরোধিতাও তারা করেছিল, শ্রমিকদের সামরিক বাহিনী গঠন, দক্ষিণপন্থী শক্তিদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা—এ সবেরও তারা বিরোধিতা করেছিল। আজানা তাঁর রাষ্ট্রপতি ভবনে একা বসে থাকতেন, অসহায়, কর্তৃত্ব-হীন, গণআন্দোলনের দুর্বার জোয়ারে প্রায় ভেসে যাবার মতো। কমিউনিস্টরা চেয়েছিল তাঁকে তাঁর পুরনো কর্তৃত্ব ও দাপট ফিরে পাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে,—তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অফিসার-শ্রেণী, পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সাবেক দাপটও ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী ছিল তারা।

কিন্তু ঘটনা প্রবাহের চাপে মস্কোর মত পরিবর্তিত হয়েছিল, নিরপেক্ষ সেজে পুরোপুরি হাত গুটিয়ে বসে থাকা যে সম্ভব নয় তা তারা বুঝেছিল। রাশিয়া তার বৈপ্লবিক ঐতিহ্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে চাইলেও তা পারেনি। এও রুশ সরকারের অন্যতম ট্রাজেডি। ইউরোপে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে হাত না মিলিয়ে রাশিয়ার উপায় ছিল না; ফ্রান্সের বামপন্থী শক্তির পরাজয় রাশিয়া ধারণা করতে পারেনি। কারণ ইউরোপে দক্ষিণপন্থীরা দেশে দেশে ক্ষমতায় এলে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারে তা স্তালিন জানতেন। তিনি এও বুঝেছিলেন যে, ফ্রান্সে বামপন্থী শক্তিগুলি পরাজিত হলে ফ্রান্স-সোভিয়েত চুক্তিও বাতিল হয়ে যেতে পারে এবং স্তালিন সে সময় সেটা চাননি। এমনকি বামপন্থী শক্তিদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলির সঙ্গে রাশিয়া হাত মেলালে 'কমিণ্টার্ণ'ও ভেঙে যেতে পারত। রাশিয়া তখন ইউরোপের ফ্যাসিস্ত শক্তিদের দ্বারা সরাসরি আক্রান্ত হত। স্তালিন বুঝতে পেরেছিলেন যে, জার্মানী ও ইতালির পর স্পেন ও ফ্রান্স যদি ফ্যাসিস্ত শাসনের অধীন হয়—তাহলে ইউরোপে ফ্যাসিস্তরা দুর্বার হয়ে উঠবে, তারা রাশিয়াকে আক্রমণ করলে রাশিয়া পরাজিত হবে। স্তালিন বুঝেছিলেন যে, স্পেনের পরাজয় শেষ পর্যন্ত ডেকে আনবে রাশিয়ারও পরাজয়।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো তখন মাদ্রিদের অভিমুখে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন। মস্কো দেখল, আর বিলম্ব করলে সর্বনাশ ঘটবে। তখন স্তালিন পাঠালেন বিমান ও বৈমানিক, বন্দুক, নির্দেশ ও আন্তর্জাতিক ব্রিগেড। এই আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে রুশ-নাগরিক অল্পই ছিল; বেশি সংখ্যায় ছিল অন্যান্য দেশের কমিউনিস্টরা। ১৯৩৬ সালের ৮ই নভেম্বর এই আন্তর্জাতিক ব্রিগেডই মাদ্রিদ নগরীকে বাঁচিয়েছিল। স্তালিন যদি এই সাহায্য আর ক'দিন আগে পাঠাতেন তাহলে বোমার আঘাতে মাদ্রিদ নগরী ধ্বংস হওয়ার শোচনীয় পরিণাম থেকে রক্ষা পেত।

স্তালিন সাহায্য পাঠিয়েছিলেন কিন্তু একটি শর্তে। শর্তটি এই যে, প্রজাতন্ত্রী সরকারকে বাম-ঘেঁষা নীতি পরিত্যাগ করে দক্ষিণ-ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করতে হবে—দক্ষিণপন্থী হতে হবে সরকারকে।

স্পেনে কমিউনিস্টরা শক্তিশালী ছিল না। আন্তর্জাতিক ব্রিগেড এসে পৌঁছলে পরিস্থিতি পাল্‌টে গেল। আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠিত হয়েছিল পৃথিবীর বহু দেশের কমিউনিস্টদের নিয়ে। তারা স্পেনে এসে স্থানীয় কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মেলাল; কমিউনিস্ট সংগঠনের সদস্য হয়ে গেল—

রাতারাতি ফুলে-ফেঁপে উঠল স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি। অ্যানার্কিস্টরা হয়ে পড়ল তাদের তুলনায় হীনবল। স্পেনে যারা সেদিন কমিউনিস্টদের অনুসৃত নীতির সঙ্গে একমত হতে পারেনি তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার কাজে লেগে গেল আন্তর্জাতিক ব্রিগেড। প্রজাতন্ত্রী সরকার বা প্রজাতন্ত্রের সমর্থকরা যদি কখনো কমিউনিস্টদের নীতি মেনে নিতে দ্বিধা দেখাত কমিউনিস্টরা তখনই হুমকী দিত এই বলে যে, মস্কো তাহলে তার সমর্থন ও সাহায্য প্রত্যাহার করে নেবে। পরিস্থিতিটা তখন এমনই দাঁড়াল যে, যারা ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় তাদেরই মেনে নিতে হবে কমিউনিস্টদের নির্দেশ। অনন্যোপায় হয়ে গেল সবাই। কমিউনিস্টরা শক্তি সঞ্চয় করে ফেলল এইভাবে। তখন কমিউনিস্টরা ফ্রাঙ্কো বাহিনীকে রুখবার চেয়েও বেশি মন দিল বামপন্থীদের সাবাড় করার কাজে। সোস্যালিস্টদেরও কোণঠাসা করে দিতে লাগল তারা। সুরু হল P O U M-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ। P O U M ক্যাটালোনিয়ার প্রাদেশিক সরকারের অংশীদার হয়েছিল কিছুদিন। কমিউনিস্টরা হুমকী দিল যে, তারা যদি ঐ সরকার থেকে বেরিয়ে না আসে তাহলে কমিউনিস্টরা ঐ সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন, সহযোগিতা ও সাহায্য প্রত্যাহার করে নেবে। P O U M বাধ্য হল সরকার থেকে বেরিয়ে আসতে। এই একইভাবে হুমকী ও চাপ দিয়ে সোভিয়েত তথা কমিটি শাসনগুলিকে ভেঙে দিল কমিউনিস্টরা। এমনকি তারা ভেঙে দিল Peoples' Militia বা গণ-বাহিনীকেও। জমির কালেক্টিভাইজেশন বা জমির ওপর সরকারী মালিকানা প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধেও কমিউনিস্টরা প্রচার অভিযান সুরু করল। আশ্চর্য বটে!

স্পেনের বামপন্থীরা এত কমিউনিস্ট দৌরাত্ম্য মেনে নেওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া বিশেষ সাহায্য পাঠাল না। জার্মানী ও ইতালি ফ্রাঙ্কোকে অঢেল সাহায্য দিয়েছিল—হাজার হাজার জার্মান ও ইতালীয় সৈন্যও পাঠিয়েছিল যুদ্ধে অংশ নিতে। রাশিয়া সামরিক বাহিনীর লোক পাঠাল নামমাত্র। কিছু পাইলট, ট্রেনিং-দাতা ও প্রশাসনিক অফিসার পাঠিয়েছিল রাশিয়া—কিন্তু তার সঙ্গে পাঠিয়েছিল বহুসংখ্যক পুলিশ এজেন্ট। এই রুশ-পুলিশ (G P U) এজেন্টরা স্পেনের পুলিশবাহিনী চালনার প্রায় সমস্ত ভার নিয়েছিল। তারা তদন্ত, গ্রেপ্তার এমনকি মৃত্যুদণ্ড দেবার অধিকার পর্যন্ত রাখত। রুশ-পুলিশদের কার্যকলাপ সমর্থন করত স্পেনের কমিউনিস্টরা ও সামরিক বাহিনী। ধীরে ধীরে একটা প্রশাসনিক সংকট ঘনীভূত হল। যারাই একমত না হত কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাদেরই নির্মূল করে দেওয়া হতে লাগল।

খড়্গ নেমে এল P O U M-এর উপর। এদের নেতা মরিমকে (Maurim) গুলি করে হত্যা করা হল। P O U M-এর মধ্যে ছিল একটি ক্ষুদ্র ট্রট্স্কীপন্থী-গোষ্ঠী। ১৯৩০ সালে কমিউনিস্টরা যে কার্যক্রম সমর্থন করত, ১৯৩৬ সালে P O U M সেই একই কার্যক্রমকে সমর্থন করেছিল—এটাই ছিল তাদের অপরাধ। তাদের আরও অপরাধ এই যে, তারা স্তালিনের কথা অন্ধভাবে মানার পক্ষপাতী ছিল না, রাশিয়ার তাঁবেদার হতেও তারা রাজি ছিল না। নৈষ্ঠিক সাবেকী কমিউনিস্টদের মতই এরা জঙ্গী বৈপ্লবিক মতে বিশ্বাসী ছিল। তারা ছিল আন্তরিক, তবে হয়তো বা সঙ্কীর্ণতাবাদী। স্তালিনবাদী P O U M-এর সদস্যদের হত্যা করার আয়োজন করেছিল। ক্যাবেলারো উপলব্ধি করেছিলেন কমিউনিস্টদের আসল মতলব কী।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে মার্কসবাদী দলগুলির মধ্যে ঐক্যই ছিল প্রত্যাশিত, কিন্তু বাস্তবে ঘটেছিল তার বিপরীত। তাদের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত চরম রূপ নিয়েছিল। Anarchists, PSUC, POUM, CNT, FAI, MGT এই সব বামপন্থী দলগুলির মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সংঘাত শুধু বামশক্তির পরাজয়ই সুনিশ্চিত করেনি, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে মার্কসীয় বা সমাজতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন, শ্রেণীভিত্তিক বা 'পেশাদারী বিপ্লবী' পরিচালিত দলগুলি বিপ্লবের স্বার্থকেই সব সময় বড করে দেখে না, গণশত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের চেয়েও তাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে নিজেদের পারস্পরিক বিরোধ ও শত্রুতা। দলের সামাজিক ভিত্তি, মার্কসীয় শাস্ত্র উচ্চারণ বা বাম তকমা আঁটার মধ্যেই নিহিত থাকে না কোন দলের সঠিক পথে আদর্শ অনুযায়ী চলার গ্যারান্টি।

ট্রট্স্কীপন্থীদের শক্তি খুব একটা বেশি ছিল না। কিন্তু তাঁরা এমন সব দাবী ও শ্লোগান রেখেছিলেন যা অন্য মার্কসবাদী দলগুলি মেনে নিতে পারেনি।

নৈরাজ্যবাদীরা গৃহযুদ্ধের সময় নিজেদের প্রভাবাধীন এলাকাগুলিতে যাবতীয় ক্ষেত-খামার গ্রামীণ পঞ্চায়েত কমিটির হাতে ছেড়ে দেবার পক্ষে ছিলেন। গ্রামের সব মানুষ যৌথভাবে এই সব ক্ষেত-খামারে কাজ করবে, উৎপন্ন শস্য গ্রামীণ শস্যভাণ্ডারে মজুত থাকবে এবং তা থেকে সকলের মধ্যে বণ্টন করা হবে—এই ছিল তাঁদের মত। এঁরা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রা-ব্যবস্থা বিলোপ করার পক্ষে ছিলেন। এটা একটা বহুকালের কাল্পনিক আদর্শ—স্বপ্নরাজ্যের পরিকল্পনা। পৃথিবীর কোন সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট রাষ্ট্র

অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক বিনিময় ও প্রাত্যহিক জীবনের বেচাকেনা-লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে অর্থ বা টাকা-প্রথাকে বিলুপ্ত করতে পারেনি। আবার স্তালিনবাদীরা (PSUC) নৈরাজ্যবাদীদের এই স্বপ্নবিলাস (utopia) পরিত্যাগ করার জন্য পাল্টা-প্রচারে নেমেছিলেন। স্তালিনবাদীরা ব্যক্তিগত মালিকানা-ভিত্তিক চাষপ্রথার পক্ষে ছিলেন। শুধু তাঁরা বড় বড় জমিদারের কাছে আবেদন-নিবেদন করে, তাদের বুঝিয়ে তাদের উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের সম্ভাব্যতার কথাও বলতে লাগলেন। অনেক মার্কসবাদী আবার ধনী জমিদারদের স্বেচ্ছায় জমি ছেড়ে দেবার বা হৃদয় পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা তত্ত্বকে স্বপ্নবিলাস বা ইউটোপিয়া বলে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি।

আবার গৃহযুদ্ধে বিপ্লবীদের সামরিক সংস্থা কী ধাঁচের হবে তা নিয়েও প্রচণ্ড মতবিরোধ ছিল। PSUC—সামরিক বাহিনী ধাঁচের (Army system) সংস্থার পক্ষে ছিল। স্তালিনবাদী ও সমাজতন্ত্রীরাও এর পক্ষে ছিলেন—কারণ তাঁরা কেন্দ্রীয়করণের সমর্থক। নৈরাজ্যবাদীরা কিন্তু সামরিক বাহিনী ধাঁচের বিরোধী ছিলেন, কারণ তাঁরা আদর্শগতভাবে সকল কেন্দ্রীকরণের বিপক্ষে। তাঁরা চেয়েছিলেন গণবাহিনী (militia system) গঠন করতে। এক পক্ষ মনে করতেন, সামরিক বাহিনী (army system) ধাঁচে বাহিনী গড়তে পারলে ভবিষ্যতে সেটা হবে প্রজাতন্ত্রের সহায়ক। তাতে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা যাবে। কিন্তু অপর পক্ষ মনে করতেন সেনাবাহিনী গঠন করলে সেটা সামাজিক বিপ্লবের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়েই সামাজিক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চাইতেন তাঁরা। সে কাজে গণফৌজই বেশি উপযোগী হবে বলে তাঁরা মনে করতেন। নিয়মিত সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে গড়া হয় না—কমিউনিস্ট দেশেও নয়। সামরিক প্রয়োজনের ভিত্তিতেই সামরিক বাহিনীর ইউনিট গঠিত হয়। সেক্ষেত্রে অফিসাররা নিযুক্ত হন যোগ্যতার ভিত্তিতে—দলীয় স্বার্থের খাতিরে নয়। বরকেন্যো বলেছেন: "In one word, the PSUC want an army at the order of the Government in which they participate (i e., the legal Government), whereas the anarchists want an army at their own orders" (Borkenau's—The Spanish Cockpit. Faber and Faber, P. 81)

কমিউনিস্টরা গৃহযুদ্ধ চলাকালে অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া উত্থাপন করেছিলেন,

কিন্তু অ্যানার্কিস্টরা প্রজাতন্ত্রের জন্য ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের কথা বলেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, দেশের জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে,—দেশের কাজের বিনিময়ে বিশেষ পুরস্কার দাবী করা যাবে না। অ্যানার্কিস্ট ও সিণ্ডিক্যালিস্টরা যেসব কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনা করতেন সেসব কারখানায় গৃহযুদ্ধের সময় শ্রমিকদের বেতন ও ভাতা বাড়াবার আন্দোলন হয়নি। বিপ্লবীরা বলেছিলেন, তাঁদের এলাকায় খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের কেনাবেচার অধিকার হরণ করা হয়েছে ও উৎপন্ন সমুদয় ফসল ট্রেড ইউনিয়নের কাছে বিক্রী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এ দাবী সত্য ছিল না। খাদ্য-ব্যবসায়ীরা আগের মতোই খাদ্য কেনা-বেচা করত।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে 'বিপ্লব' যে রূপ নিচ্ছিল সে সম্পর্কে মস্কো-অনুগত কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গী কী ছিল? নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বরকেন্তো বলেছেন যে, স্পেনে 'বিপ্লবী' কর্মসূচীর কথা নিয়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন যে, কমিউনিস্টরা এই সব বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর ওপর কোন গুরুত্বই দেননি। তাঁরা স্পেনের বিপ্লবকে 'বিপ্লব' বলে স্বীকারই করতে চাননি। বরকেন্তো জানতে চেয়েছিলেন কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের কাছে:

"What was revolution if it was not that? I was told that I was mistaken. All that had no political significance; these emergency measures were without political bearing I alluded to the attitude of Communist head-quarters at Madrid which described the present movement as a "bourgeois revolution"; an indication, after all, that it was a revolution. But my P S U C Communists did not hesitate to discuss their head quarters".

স্পেনের ভূম্যধিকারী, পুঁজিপতি, প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সমর্থিত ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোবাহিনীর বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে কমিউনিস্টরা বুর্জোয়া বিপ্লবের মর্যাদা দিতেও নারাজ! স্তালিনবাদী কমিউনিস্টদের এই মনোভাবে বিস্ময় প্রকাশ করে বরকেন্তো মন্তব্য করেছেন:

"I wonder how is that Communists who all over the world for fifteen years have discovered revolutionary situations where there were none, and done mischief by it, now do not

recognize revolution where, for the first time in Europe since the Russian revolution of 1917, it is really there" ( Franz Borkenau : The Spanish Cockpit, P. 110—11 ).

বরকেনৌ নিজেই মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে ছিলেন এবং অন্যান্য দেশের আদর্শবাদী ও উৎসাহী সমর্থকদের মতো নিজেই অনেকগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে অনেক কিছু দেখার ও গভীরভাবে জানার সুযোগ পেয়েছিলেন।

স্পেনের বিপ্লবে বিত্তবানদের, জমিদারদের ও গীর্জার সম্পত্তি বিপ্লবীরা কেড়ে নিয়েছিল। তারা নিজেদের প্রভাবাধীন বা দখলীকৃত এলাকায় বিরোধীপক্ষের লোকদের ফ্যাসিস্ট সমর্থক বলে ব্যাপকভাবে হত্যা করেছে। অপরপক্ষে ফ্যাসিস্ট শিবিরেও বিপক্ষগোষ্ঠীকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। বিপ্লবীরা ব্যাপকভাবে দেশের গীর্জাগুলিকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করেছে। তারা কারখানাগুলির ওপর দলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল, আমলা ও মালিকদের হাত থেকে পরিচালন ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। মার্কসীয় দৃষ্টিতে এইগুলিই তো বিপ্লবের লক্ষণ। তবু কেন কমিউনিস্টরা স্পেনের বিপ্লবে 'বিপ্লবের' চিহ্ন খুঁজে পাননি?

স্পেনের বিপ্লবী বামপন্থী শক্তিগুলি সে দেশের বিপ্লবকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফরাসী ও রুশ-বিপ্লবের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, প্রগতিশীল মডারেটদের হাত থেকে বিপ্লবের নেতৃত্ব অপেক্ষাকৃত উগ্র বিপ্লবী আদর্শ-বাদীদের হাতে গিয়ে পড়েছিল। এই দুই বিপ্লবের ক্ষেত্রেই এটা ছিল একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু স্পেনের বিপ্লবে বিপ্লব পরিচালনার দায়িত্ব যখন কট্টর বিপ্লববাদীদের—যথা, অ্যানার্কিস্ট, র‍্যাডিক্যাল বামপন্থী, সিণ্ডিক্যালিস্ট, ট্রট্স্কীপন্থী প্রভৃতির হাতে গিয়ে পড়ল, সাফল্যের সম্ভাবনা তখন ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। মার্কসীয় রাজনৈতিক তত্ত্ব এখানে প্রচণ্ড আঘাত খেল। এঁদের দলাদলির ফলে এঁরা লৌহ-কঠিন শৃঙ্খলা-ভিত্তিক ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি—যা ফরাসী-বিপ্লবের সময় জ্যাকোবিনরা বা রুশ-বিপ্লবের সময় বলশেভিকরা পেরেছিলেন। স্পেনের বিপ্লবীরা ইউরোপের কোন বিপ্লবকে মডেলরূপে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। প্রত্যেক বিপ্লবেই শুরুতে উদারতা, গণতান্ত্রিকতা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি দেখা যায়। কিন্তু বিপ্লব যখন সাফল্যের মুখে আসে তখন এইসব নীতি অবলুপ্ত হয়ে ক্ষমতার চরম কেন্দ্রীকরণ ঘটে। ব্রিটিশ, ফরাসী ও রুশ-বিপ্লবে তাই-ই ঘটেছিল। ইংলণ্ডে Long Parliament ও স্টুয়ার্ট রাজতন্ত্রের লড়াইয়ের মূলে ছিল

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও উদারনৈতিকতা। কিন্তু সে যুদ্ধের পর সে দেশে ক্রমওয়েলের সামরিক একনায়কত্ব স্থাপিত হয়েছিল। ফ্রান্সে জ্যাকোবিনদের তথা রবসপীয়ারের একনায়কত্ব স্থাপিত হয়েছিল। রাশিয়ায় সোভিয়েত বা পঞ্চায়েৎ প্রথার জায়গায় এসেছিল পার্টি ডিক্টেটরশিপ। স্পেনের বিপ্লবে বিপ্লবী শক্তিগুলি কোন ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসাও তারা করতে পারেনি, বিপ্লবী শক্তি তাই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কমিউনিস্টরা তো স্পেনের বিপ্লবকে আদৌ 'বিপ্লব' বলে মনেই করেনি। বরকেন্সো বলেছেন: "The Communist put an end to revolutionary social activity and enforced their view that this ought not to be a revolution but simply the defence of a legal Government." (The Spanish Cockpit, P. 289)

রাশিয়া যে 'বিপ্লবী' সরকারকে বিমান, অস্ত্র ও রসদ দিয়ে সাহায্য করছে সেটা এইজন্যে নয় যে, সেটা একটা বিপ্লবী সরকার; এ জন্যও নয় যে, ঐ সরকার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রজাতান্ত্রিক সামাজিক বিপ্লব প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে লিপ্ত।— সাহায্য এইজন্য করা হয়েছে যে, একটি আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত হবার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

রাশিয়া নিজের রাষ্ট্রীয় স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন ছিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী ঠিক ততটুকুই করেছে। রাশিয়া স্পেনের বিপ্লবের স্বার্থ বা স্পেনের জাতীয় স্বার্থ কোনটাই বিবেচনা করেনি।

রাশিয়ার কমিউনিস্টদের নির্দেশ ও পরামর্শ মত গৃহযুদ্ধে রত বিপ্লবীরা রুশ কেন্দ্রীকরণের নীতি ধাপে ধাপে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। নৈরাজ্যবাদী, সিণ্ডিক্যালিস্ট, ট্রট্স্কীপন্থী, বামপন্থী র‍্যাডিকালদের 'সমাজতন্ত্রের' শ্লোগান বন্ধ করার চাপ এল কমিউনিস্টদের কাছ থেকে সাহায্যের অন্যতম সর্ত হিসাবে। বরকেন্সো লিখেছেন:

"The Communist did not merely object to sweeping socialization; they objected to almost every form of socialization. They did not only object to collectivisation of peasants' plots; they successfully opposed any definite policy for the institution of large landed estates. They not only opposed, *rightly, the childish ideas of local abolition of money; they* opposed state control of markets, so easy to control as or

any market. They not only tried to organize a working police, but showed a definite preference for the police forces of the old regimes, so hated by the masses. They not only broke the power of the committees, they were distrustful of every sort of spontaneous, uncontrollable mass movement. They acted, in a word, not with the aim of transforming chaotic enthusiasm into disciplined enthusiasm, but with the aim of substituting disciplined military and administrative action for the action of the masses and getting rid of the latter entirely." ( The Spanish Cockpit, P. 291-92 )

বিপ্লব সুরু হবার সময় কমিউনিস্টরা বলতেন যে, এ বিপ্লব সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লব নয়, এটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। পরবর্তীকালে তাঁদের মত ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পাল্‌টে গিয়েছিল। তখন তাঁদের শ্লোগান হয়েছিল: "This is no revolution at all, it is simply a defence of the legal Government." অর্থাৎ স্পেনে যা চলছে সেটা কোন বিপ্লবই নয়, একটি আইন মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত সরকারকে রক্ষা করার লড়াই চলছে মাত্র। এইভাবে কমিউনিস্টরা স্পেনের বৈপ্লবিক শক্তিগুলির পিছন থেকে সমস্ত নৈতিক সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।

বিপ্লবের জন্য জনমনে যে প্রচণ্ড আবেগ ও আদর্শবাদ সঞ্চারিত হয়েছিল, কমিউনিস্টদের এই নীতির ফলে ধীরে ধীরে সেটা কর্পূরের মত উবে যেতে লাগল। ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনীর শাসনের বিরুদ্ধে জনমানসে জন্মেছিল ক্রোধ ও ঘৃণা। তারা কমিউনিস্টদের আচরণে হতাশ হল তাদের হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও উদ্দীপনা লোপ পেতে লাগল। চাষের জমির ব্যাপক রাষ্ট্রীয়করণ বন্ধ হল বটে, কিন্তু গরীব চাষীরা তো জমি পেল না? প্রজাতন্ত্রের পক্ষে লড়াইয়ের সময় চাষীর ঘরের স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকদের মনে সংশয় জেগেছিল বিপ্লবের একটা বড় প্রতিশ্রুতি তো লঙ্ঘিত হচ্ছে!

কলকারখানার সামাজিকীকরণ ( socialization ) কমিউনিস্টদের চাপে বন্ধ হল, অথচ তাদের মজুরী, বেতন তো বাড়ল না বরং বাড়ল দ্রব্যমূল্য। [ ভারতের মার্কসবাদীরা শ্রমিক আন্দোলনের ভিত্তিরূপে শ্রমিক-শ্রেণীর বেতন, মাগ্‌গী ভাতা, মজুরী বৃদ্ধির ওপরই শুধু জোর দিয়ে থাকেন। এই অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া-ভিত্তিক আন্দোলনই নাকি সমাজতন্ত্রের মূল কথা। স্পেনের বিপ্লবে

মস্কো-নিয়ন্ত্রিত কমিউনিস্টদের সেদেশে সেদিন মজুরী, বেতন বৃদ্ধির দাবীর বিরোধিতার কথা রাজনীতির ছাত্ররা তুলনামূলক ইতিহাস আলোচনার সময় মনে রাখতে পারেন। ]

অ্যানার্কিস্টদের কাল্পনিক ভাবধারা নিয়ে বিপ্লব পরিচালনার খেসারত শুধু তাদেরই দিতে হয়নি—এতে বিপ্লবী প্রজাতান্ত্রিক শিবিরও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। আর ট্রট্স্কীপন্থী? তাঁদের ভুল ছিল মারাত্মক—বিপ্লবের নামে তাঁরা মার্কসের শাস্ত্রীয় অনুশাসন পুঁথি দেখে অন্ধের মত প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। স্পেনের বিপ্লবে কোন স্পেনীয় জাতীয় আদর্শ বা প্রেরণাদায়ী আদর্শ চালক শক্তি-রূপে কাজ করেনি। বিপ্লবের নামে অ্যানার্কিস্ট ও ট্রট্স্কীপন্থীরা শিশু-সুলভ আচরণ করেছেন আগাগোড়া। এ ভুলের জন্য ইতিহাস তাদের মার্জনা করেনি। এই বিপ্লববাদীরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, শাস্ত্রীয় মতবাদের চাইতে দেশ অনেক বড়।

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে জর্জ অরওয়েল এসেছিলেন স্পেনে। তিনি ছিলেন সাংবাদিক। কিন্তু স্পেনে এসে তিনি প্রজাতন্ত্রের পক্ষ নিয়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলেন। গণবাহিনীর একজন সদস্য হয়ে যান তিনি।

ক্যাটালোনিয়া প্রদেশে অরওয়েল এসে দেখেছিলেন, শ্রমিক-শ্রেণীর কর্তৃত্ব সেখানে বহুদূর প্রসারিত; প্রতিটি বাড়িতেই উড়ছে লাল ঝাণ্ডা; প্রতিটি বাড়ি বিপ্লবীদের নিয়ন্ত্রণাধীন। ক্যাটালোনিয়ার নেতৃত্ব ছিল অ্যানার্কিস্টদের হাতে। প্রতিটি বাড়ির মাথায় লাল পতাকা, দেয়ালে দেয়ালে কাস্তে-হাতুড়ির ছবি; গরম শ্লোগান লেখা হচ্ছে, অবিরাম শোনা যাচ্ছে উগ্রপন্থী ধ্বনি। এই প্রদেশে প্রায় সব ক'টি গির্জাই ধ্বংস করা হয়েছিল। গির্জার দেবমূর্তিগুলি পোড়ানো হয়েছিল। শ্রমিকরা যেখানেই দেখতে পেত একটি গির্জা, সেখানেই তারা সেটিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিত। যে কোন দোকানে ঢুকলে দোকানের দেয়াল-লিপিগুলি দেখে মনে হত দোকানটি collectivized হয়ে গেছে। একটা সাম্যের পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। প্রত্যেকে প্রত্যেককে 'কমরেড' বলে পথে-ঘাটে সংবর্ধনা জানাত—Sir, Lord, Signor, Thou—এভাবে আর কেউ কাউকে সম্বোধন করত না সে-সময়। হোটেল-রেস্তরাঁয় টিপস্ বা বকশিস ছিল না। কারও কোন ব্যক্তিগত মোটরগাড়ি ছিল না। বিপ্লবী সরকার সব বাড়িই নিজের দখলে এনেছিল। সব ট্রাম ও ট্যাক্সিকে লাল ও কালো রঙে রঙ করা হয়েছিল। সর্বত্র দেখা যেত বিপ্লব বাণী-সম্বলিত পোস্টারের মেলা। পথে-ঘাটে-সমাবেশে লাউডস্পীকার থেকে অবিরাম ভেসে আসত বিপ্লবী-সঙ্গীত।

বাইরে থেকে এসব দেখে মনে হত যেন ধনিক-শ্রেণীর কোন অস্তিত্বই নেই। প্রকাশ্যে জাঁক-জমক-জৌলুস ও চোখ ধাঁধানো পোস্টারের কোন নিদর্শনই মিলত না। অরওয়েল লিখেছেন: "It was the aspect of the crowd that was the queerest thing of all." (George Orwell: Homage to Catalonia, P. 5)। দেখে মনে হত বুর্জোয়া-শ্রেণী হয় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, নতুবা তারা সর্বহারা-শ্রেণীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে। তারা যে গা-ঢাকা দিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় বসে ছিল, সেকথা বোঝার কোন উপায়ই ছিল না। মনে হত ক্যাটালোনিয়ায় শ্রমিকরাজ কায়েম হয়ে গিয়েছে।

এদিকে চলছিল যুদ্ধের পরিস্থিতি। দুধ ছিল দুষ্প্রাপ্য, মাংসের ছিল ঘাটতি। কয়লা, চিনি, পেট্রোল, রুটি পাওয়া যেত না। কিন্তু বেকার বেশি ছিল না। অন্যান্য জিনিসপত্রের দামও খুব বেশি ছিল না। অভাবগ্রস্ত দুঃস্থ মুখের মেলা বিশেষ ছিল না। পতিতাবৃত্তি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আবেদন-সম্বলিত পোস্টার দেখা যেত পথে-ঘাটে-ময়দানে। একটা আদর্শবাদের পরিবেশ ছিল নিঃসন্দেহে।

যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের নিয়ে গণফৌজ গঠন করেছিল। ট্রেনিং দেওয়া হত 'লেনিন ব্যারাকে'। গণফৌজভুক্ত শ্রমিকদের পরিবারের মহিলারা ও মুক্তিযোদ্ধ মহিলারা ব্যারাকে রান্নার কাজ সারতেন। গণফৌজে কিছু-সংখ্যক মহিলাও যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম দিকে পুরুষদের পাশে থেকেই তাঁরা লড়তেন।

শহরের চারদিকে ছিল অগোছাল নোংরা ভাব। বিপ্লবের এটা ছিল যেন একটা স্বাভাবিক পরিণাম। জর্জ অরওয়েল লিখেছেন:

"In every corner you come upon piles of smashed furniture, broken saddles, brass cavalry, helmets, empty sabre scabbards and decaying food. There was frightful wastage of bread. From my barrack room alone a basketful of bread was thrown away at every meal—a disgraceful thing when the civilian population was short of it." [Homage to Catalonia; By George Orwell: The Beacon Press—Boston.]

P O U M পরিচালিত গণফৌজের হাতে রাইফেলের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সারা লেনিন ব্যারাকে রক্ষীদের হাতে ছাড়া আর কারও কাছে কোন রাইফেলই ছিল না। তবু এরা যুক্তফ্রন্টের আদর্শের জন্য মরিয়া হয়ে লড়েছিল। সৈন্যদের মধ্যে ছিল একটা আন্তরিক বন্ধুত্ব, অরওয়েল লিখেছেন, অবিস্মরণীয়

সেই কমরেডশিপ। P O U M-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই অকৃত্রিম সখ্য ও বন্ধুত্বের মনোভাব সৃষ্টিতে। যুদ্ধ-পদ্ধতিতে অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, কিন্তু এই অনবদ্য বন্ধুত্বভাব স্পর্শ করেছিল অনেককে গভীরভাবে।

পনেরো বছরের কিশোররাও এসেছিল যোদ্ধার তালিকায় নাম লেখাতে। গণফৌজের সৈনিকদের বেতন ছিল দৈনিক ১০ পেসেতা, আর তারা রুটি খেত প্রচুর,—নিজেরা খেয়েও সেই রুটি তারা গোপনে বাড়ি পাঠিয়ে দিত। তাদের পরিবারের রুটির সমস্যা তাই ছিল না। যেসব বিদেশীরা এসেছিল মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে, তাদের কেউ বিদেশী বলে মনে করত না। ক্যাটালোনিয়ার স্পেনীয়রা বিদেশীদের আত্মীয় বলেই মনে করত।

অরওয়েল লিখেছেন : "As a militiaman one was a soldier against Franco, but was also a pawn in an enormous struggle that was being fought out between two political theories." ( Homge to Catalonia, P. 47 )। বাইরের যে ঐক্য, বন্ধুত্ব ও মধুর ভাব দৃশ্যমান ছিল তার ভিতরে ভিতরে চলছিল একটা অন্তঃসংঘাত। সে সংঘাত রাজনৈতিক। এমনকি সে সংঘাত এক রাজনৈতিক দল কর্তৃক আর এক রাজনৈতিক দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট। স্পেনের বিপ্লবের এটাই ছিল মহত্তম ট্রাজেডি; বিপ্লবীদের পরাজয়ের এটা অন্যতম কারণও বটে।

স্পেনের বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হোক—কোন দেশই হয়তো তা চায়নি। অরওয়েল লিখেছেন : "স্পেনে যা ঘটেছিল সেটা শুধু গৃহযুদ্ধ মাত্র নয়, সেটা বিপ্লবের সূচনা। বিদেশের সংবাদপত্রগুলি, যারা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ভূমিকা নিয়েছিল, তারাও এই সত্যটিকে সযত্নে গোপন করে গিয়েছে। প্রচার করা হয়েছে যে, স্পেনের লড়াই 'ফ্যাসিজম বনাম গণতন্ত্রের' লড়াই। এই সংগ্রামের বৈপ্লবিক দিকটি যথাসাধ্য গোপন করার চেষ্টা হয়েছে।" অর্থাৎ—"In England where the Press are more centralised and the public are more easily deceived than elsewhere, only two versions of the Spanish war have had any publicity to speak of : the Right-wing version of Christian parish versus Bolsheviks, dripping with blood and the Left-wing version of gentlemanly republicans quelling a military revolt. The central issue has been successfully covered up" ( পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫১ )

গোটা দুনিয়াই যেন স্পেনের এই বিপ্লবকে প্রতিহত করতে চেয়েছিল। বিশেষভাবে চেয়েছিল কমিউনিস্টরা। স্পেনের কমিউনিস্টরা চায়নি বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হোক, রাশিয়াও তা চায়নি। স্পেনের বিপ্লবে কমরেড স্তালিন যে শঠতা ও প্রবঞ্চনা করেছেন, রুশ-পররাষ্ট্রনীতির স্বার্থে অগ্নিদগ্ধ স্পেনকে নিয়ে যেভাবে তিনি খেলা করেছেন রাজনীতির ছাত্রদের সেকথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা দরকার। অরওয়েল লিখেছেন, সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সুর মিলিয়ে স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের পুরো শক্তি প্রয়োগ করেছিল 'বিপ্লবের' বিরুদ্ধে ('thrown its whole weight against the revolution')। কমিউনিস্ট তত্ত্বটা ছিল: সে-সময় বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং স্পেনে যা দরকার তা শ্রমিক-শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রের' প্রতিষ্ঠা। পুঁজিপতি-শ্রেণীও ঠিক ওই একই কথা বলত। স্পেনে বিপুল পরিমাণে বিদেশী পুঁজি লগ্নী করা হয়েছিল। এক বার্সিলোনা ট্রাক্টর্স কোম্পানীতেই ১ কোটি পাউণ্ড ব্রিটিশ পুঁজি লগ্নী করা ছিল। ক্যাটালোনিয়ায় ট্রেড ইউনিয়নগুলি সমস্ত যানবাহন দখল করে ফেলেছিল। বিপ্লবের আর অগ্রগতি হলে বিনা ক্ষতিপূরণে বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত। পুঁজিপতিরা বুঝেছিল, প্রজাতন্ত্র যতক্ষণ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক থাকবে ততক্ষণই পুঁজি নিরাপদ থাকবে। "And if revolution had got to be crushed, it greatly simplified things to pretend that no revolution had happened."

এই উদ্দেশ্য নিয়েই স্পেনের অগ্নিগর্ভ ঘটনাগুলির বৈপ্লবিক লক্ষণ ও তাৎপর্যকে চাপা দিয়ে আন্তর্জাতিক ও স্পেনীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থে একটা বিকৃত ও অর্ধসত্য আকারে স্পেনের ঘটনাবলীকে বিশ্বের কাছে উপস্থাপিত করা হচ্ছিল। এই দুষ্কর্মে কমিউনিস্টরাও লিপ্ত হয়েছিল। স্তালিন তখন ভাবছেন, ইউরোপের পুঁজিপতিকুলকে আশ্বস্ত করতে হবে, যেন তারা আর তাঁকে সন্দেহ ও শঙ্কার দৃষ্টিতে না দেখে। বিশ্ব-বিপ্লবী আখ্যায় ভূষিত হবার বদলে স্তালিন পুঁজিপতি বন্ধুরূপে পরিচিত হতে তখন আগ্রহী। বিশ্বের বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি ও কমিউনিস্টরা এমনভাবে স্পেনের ঘটনাবলীর বর্ণনা দিতেন, ব্যাখ্যা করতেন, যাতে বিশ্ববাসী বুঝতেই পারেনি যে, স্পেনে একটা বিপ্লব সুরু হয়ে গিয়েছে।

কমিউনিস্ট পত্রিকা ইংলণ্ডের Daily Worker (6th August, 1936) লিখেছিল: যারা বলছে স্পেনে সামাজিক বিপ্লবের লড়াই সুরু হয়ে গেছে তারা আপাদমস্তক মিথ্যাবাদী, ভণ্ড। ইংলণ্ডের পুঁজিপতিরা নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছিল এ অপব্যাখ্যা পড়ে।

স্পেন তখন একটা মোড়ের মাথায় এসে পড়েছে—হয় সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, নতুবা ফিরে যেতে হবে সাবেক পুঁজিবাদের কোলে। কৃষকরা জমি দখল করে নিয়েছে, সে দখল বজায় রাখতে তারা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত; বড় শিল্পগুলি সব রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে গিয়েছে। সেগুলি কি রাষ্ট্রায়ত্তই থাকবে, না পুঁজিপতিদের মালিকানায় ফিরে যাবে? সে প্রশ্নের উত্তর নিহিত ছিল বিপ্লবে কোন্ পক্ষ জয়ী হবে তার মধ্যে।

ক্যাবালারো যখন প্রধানমন্ত্রী তখন ক্যাটালোনিয়া শাসনের ভার পড়েছিল একটি ফ্যাসিস্ট-বিরোধী প্রতিরক্ষা কমিটির ওপর। ঐ কমিটিতে স্থান পেয়েছিল ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির ৯ জন প্রতিনিধি'। ক্যাটালোনিয়ার লিবারাল পার্টিগুলির প্রতিনিধি ছিলেন ৩ জন, আর বাকি তুজন ছিলেন বিভিন্ন মার্কসবাদী দলের প্রতিনিধি। এই তু'জনের মধ্যে একজন ছিলেন POUM-এর প্রতিনিধি। কোন্ ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার কতজন সদস্য তার ওপর ভিত্তি করেই তাঁরা প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন।

পরে এই প্রতিরক্ষা কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল—তার জায়গায় ফিরে এসেছিল Generalite। এই জেনারালাইট ছিল ক্যাটালোনিয়ার স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারী প্রাদেশিক সরকার।

পরবর্তীকালে সরকারের বামপন্থী চরিত্র পাল্টাতে স্বরু করেছিল। সরকার হয়ে উঠেছিল দক্ষিণমুখী। ক্যাবালারোকে সরিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেগ্রিন। তিনি ক্ষমতায় আসার পরই সরকার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল CNT-কে। তার আগেই বহিষ্কার করা হয়েছিল POUM-কে। সরকারে ছিল কেবল দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট ও উদারপন্থীরা।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাস থেকেই দক্ষিণমুখী প্রবণতা ফুটে উঠেছিল। তখনই রাশিয়া স্পেনকে অস্ত্র সাহায্য স্বরু করেছিল। রাশিয়া সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যানার্কিস্টদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যেতে লাগল কমিউনিস্টদের হাতে। রাশিয়া ও মেক্সিকো ছাড়া আর কোন দেশই সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। মেক্সিকোর ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই মস্কো তার খুশিমত সর্ত আরোপ করতে পারত সাহায্য দানের বিনিময়ে—আর তা-ই সে করেছিল। কাজও হত তাদের চাপ অনুযায়ীই। অরওয়েল লিখেছেন:

"There is very little doubt that these terms werein

-substance, 'prevent revolution or you get no weapons' and that the first move against the revolutionary elements, the expulsion of POUM from the Catalan Generalite was done under orders from the U.S.S.R." [ Homage to Catalonia. ] অর্থাৎ POUM-কে ক্যাটালোনিয়ার প্রাদেশিক সরকার জেনারালাইট থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল কমিউনিস্টদের নির্দেশে। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তাড়ানো হয়েছিল ক্যাবালারোর নেতৃত্বে পরিচালিত বামপন্থী সোশ্যালিস্টদের ও অ্যানার্কিস্টদের।

আগেই বলেছি স্পেনে কমিউনিস্টরা ছিল দুর্বল ও সংখ্যায় অল্প। কিন্তু রাশিয়া অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করার পর থেকে ও আন্তর্জাতিক ব্রিগেড স্পেনে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্পেনে কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়তে সুরু করেছিল। Aragon ফ্রণ্টে অ্যানার্কিস্টরা লড়েছিল। তাই Aragon ফ্রণ্টে রুশ অস্ত্র-সরবরাহ খুব কমই করা হয়েছে। অরওয়েল বলেছেন, ১৯৩৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত—

"The only Russian weapon I saw—with the exception of some aeroplanes which may or may not have been Russian – was a solitary sub-machine gun." (P. 54)

কমিউনিস্ট রাশিয়া থেকে আনীত অস্ত্র কেবল কমিউনিস্টদের বা তাদের অনুগতদের হাতে দেওয়া হচ্ছিল। POUM, অ্যানার্কিস্ট, বামপন্থী সোশ্যালিস্টদের দেওয়া হয়নি।

কমিউনিস্টরা বিপ্লব-বিরোধী নীতি গ্রহণ করার ফলে স্পেনের উগ্রপন্থী বিরোধী মানুষদের সমর্থন পেয়েছিল। উগ্রপন্থীদের মতবাদ তাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করেছিল। কমিউনিস্টরা সেই সুযোগ নিয়ে 'বিপ্লবের' বিরোধিতা করার নামে আদর্শবাদী উগ্রপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে পেরেছিল; আবার উদার-পন্থীদের সমর্থন আদায়ও করতে পেরেছিল। কমিউনিস্টরা তাদের নরম নীতির দরুন মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর সমর্থনও পেয়েছিল। দোকানদার, সম্পন্ন চাষী, সরকারী কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর অফিসাররা সাধারণতঃ নরম নীতির পক্ষপাতী হয়ে থাকে; স্পেনে কমিউনিস্টরা সেই কারণে কিছু পরিমাণে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল।

স্পেনের যুদ্ধটা দাঁড়াল ত্রিমুখী। একদিকে যুদ্ধ চলল ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে; অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়নের হাত থেকে যতটা সম্ভব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল,

যেন যুদ্ধটা শ্রমিকদেরও বিরুদ্ধে। শ্রমিকদের এই বলে হুমকী দেওয়া হত: 'তোমরা যদি কথা না শোন তাহলে যুদ্ধে আমরা হেরে যাব, রাশিয়া সাহায্য করবে না।' ফলে ১৯৩৬ সালেও শ্রমিকরা উদারপন্থী বুর্জোয়া সরকারের কাছ থেকে যেসব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার পেয়েছিল সেগুলিও খোয়াতে হল। কেউই যুদ্ধে হারতে চায়নি। তাই এই হুমকীর কাছে শ্রমিকরা স্বেচ্ছায় নতি স্বীকার করেছিল। যুদ্ধের এই দ্বিতীয় পক্ষের মধ্য ছিল অ্যানার্কিস্ট প্রভৃতি রাজনৈতিক দল। এই সব দল বুঝত যে, যুদ্ধে হারলে সোশ্যালিজম, গণতন্ত্র, নৈরাজ্যতন্ত্র, বিপ্লব সবই হবে অর্থহীন প্রলাপের নামান্তর। তাই তারা 'কালেক্টিভাইজেশনের' নীতি স্থগিত রাখতে রাজি হল, স্থানীয় 'গণকমিটির' ক্ষমতা কেড়ে নিতে দিল, Workers' Patrol বা শ্রমিক-শ্রেণী কর্তৃক নিযুক্ত প্রহরী ব্যবস্থা রদ করে পুলিশের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে দেওয়া হল। যেসব বড় বড় কলকারখানা শ্রমিক ইউনিয়নের দখলে এসেছিল সেগুলিকে সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হল—যেমন বার্সিলোনার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ শ্রমিকদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

ট্রেড ইউনিয়নগুলি দ্বারা গঠিত শ্রমিক-শ্রেণীর সামরিক বাহিনীগুলো ভেঙে দিয়ে আধা বুর্জোয়া অরাজনৈতিক পপুলার আর্মির হাতে ক্ষমতা দেওয়া হল। এই পপুলার আর্মিতে বিভিন্ন বেতনহার-সম্বলিত নানা শ্রেণীর অফিসার ও সৈনিক ছিল, যেটা ওয়ার্কার্স মিলিশিয়া বা শ্রমিক-শ্রেণীর বাহিনীতে আদৌ ছিল না। আবার অফিসার-শ্রেণীর প্রাধান্য ফিরে এল সৈন্যবাহিনীতে। এতে শ্রমিক-শ্রেণীর উপর প্রচণ্ড আঘাত এসেছিল। কেননা ওয়ার্কার্স মিলিশিয়া দিয়ে তারা তাদের অর্জিত অধিকার রক্ষা করতে পেরেছিল। কমিউনিস্টরা সেদিন এইভাবে একের পর এক শ্রমিক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছিল, ভেঙে দিয়েছিল তাদের মেরুদণ্ড, তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতার ভিত্তি। এটা সামরিক দক্ষতার নামেই করা হয়েছিল। [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিটলারও ক্ষমতায় এসে তাঁর ব্যক্তিগত বাহিনী (Private army)-কে ভেঙে দিয়েছিলেন।] তাছাড়া এই মিলিশিয়াগুলিতে বৈপ্লবিক ভাবধারা সহজে ছড়িয়ে পড়ত। জর্জ অরওয়েল লিখেছেন: "কমিউনিস্টরা সেকথা জানত এবং তাই তারা POUM ও অ্যানার্কিস্টদের সকলকে সমান বেতন দানের নীতির কঠোর সমালোচনা করত। আবার তারা বুর্জোয়া ভাবধারা ফিরিয়ে আনতে চাইছিল, বিপ্লবের প্রথম কয়েক মাসের সাম্যভাব ইচ্ছা করেই তারা দূর করে দিচ্ছিল। পরিবর্তনগুলি ঘটছিল এত দ্রুত যে, কয়েক সপ্তাহ

পর-পর কেউ যদি স্পেনে যেত তবে সে বুঝতেই পারত না যে, সে একই দেশ ভ্রমণ করতে এসেছে কিনা। অল্প কিছুদিনের জন্য যে দেশকে মনে হয়েছিল শ্রমিক-শ্রেণীর রাষ্ট্র বলে, চোখের সামনে সে দেশে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সাবেকী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র—যেখানে ধনী ও দরিদ্রের চিরপরিচিত পার্থক্য আছেই।" (Homage To Catalonia; P. 56.) যেসব ফ্যাসিস্ট সমর্থকরা ইতিপূর্বে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারা আবার ফিরে আসতে সুরু করল। স্পেনের যুদ্ধে প্রথম পক্ষ ফ্রাঙ্কো, দ্বিতীয় পক্ষ শ্রমিক-শ্রেণী ও বাম রাজনৈতিক দলগুলি ও তৃতীয় পক্ষ ছিল কমিউনিস্টরা। এই তৃতীয় পক্ষটির ছিল রাশিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা, রাশিয়ার স্বার্থ অনুযায়ী তারা পরিচালিত হত।

স্তালিনের পররাষ্ট্রনীতি তখন দ্বিমুখী, তিনি হিটলার ও মুসোলিনির ক্রোধভাজন হতে চান না, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের বন্ধুত্ব চান। হিটলার ও মুসোলিনিকে—পর্যাপ্তভাবে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করছিলেন, তাঁদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নামার ইচ্ছা স্তালিনের ছিল না। ওদিকে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড দুটি দেশই পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী। স্তালিন জানতেন যে, ফ্রান্সের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব যদি লাভজনক করতে হয় তবে ফ্রান্সকে দুর্বল করে দিলে চলবে না, ফ্রান্সকে শক্তিশালী করতে হবে, ইংলণ্ডকেও শক্তিমান রাখতে হবে। ইউরোপে জার্মান ও ইতালির প্রতিপক্ষরূপে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড দাঁড়াক এটা স্তালিন চেয়েছিলেন। তাই ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি দুটিকে স্তালিন বিপ্লব-বিরোধী ভূমিকা নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এমনকি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলিতে যাতে স্বাধীনতা-সংগ্রাম শক্তি সংগ্রহ না করতে পারে সেদিকেও তিনি নজর দিয়েছিলেন। স্পেনেও তিনি বিপ্লবীদের সমর্থন করেননি। বরং স্তালিনের নির্দেশে কমিউনিস্টরা স্পেনের বিপ্লবী শক্তিগুলির বিরোধিতাই করে এসেছে। স্পেনে কমিউনিস্টদের তৃতীয় পক্ষরূপে খাড়া করে দিয়ে বিপ্লবের সাফল্যের পথে একটি দুর্মোচনীয় কাঁটা বসিয়ে দিয়েছিলেন স্তালিন। অরওয়েল লিখেছেন:

"The thing for which Communists were working was not to postpone the Spanish Revolution till a more suitable time but to make sure it never happened." [Homage To Catalonia.]

প্রজাতান্ত্রিক সরকারের ৩।৪ জাহাজ বোঝাই তাল তাল সঞ্চিত সোনা রাশিয়ার ওডেসা বন্দরে ভিড়েছিল। রাত্রির অন্ধকারে জাহাজগুলো থেকে সোনা খালাস করা হত—যাতে কেউ দেখতে না পায়। জাহাজে কোন রুশ

পতাকাও ছিল না। স্তালিনের একান্ত বিশ্বস্ত গোয়েন্দা সচিব ক্রিভিট্স্কি বলেছিলেন :

"If all the boxes of gold that we piled up in Odessa were laid side by side in Red Sqaure they would cover it from end to end." [ Spanish Civil War, P. 418-19 ]

জাহাজগুলির সঙ্গে ৪ জন স্পেনীয় অফিসার এসেছিলেন। তাঁরা কিন্তু আর দেশে ফিরতে পারেননি, কেননা স্তালিন সে সুযোগ দেননি। এই ৪টি অফিসারের পরিবারেরা রুশ দেশে এসেছিলেন স্পেনে ফিরতে দেরী দেখে। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তাদের রাশিয়ার বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি। পরে একজনকে ওয়াশিংটনে, একজনকে স্টকহল্‌মে, একজনকে বুয়েন্‌স্‌আয়ার-এ এবং শেষোক্তকে মেক্সিকোতে পাঠান হয়। যে রুশ এই সমস্ত সোনা লেন-দেনের গোপন ব্যাপারটা জানতেন (তাঁর নাম Grink, অর্থ-সচিব—Commissar of Finance)। ১৯৩৮ সালের এক বিচারে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। স্তালিন এই বিপুল পরিমাণ সোনা রাশিয়ায় আনার পর আনন্দোৎসব করেছিলেন এবং ভোজের আয়োজন করেছিলেন। ভোজ-সভায় ঠাট্টা করে বলেছিলেন : "The Spaniards will never see their gold again as they do not see their own ears." [ Spanish Civil War : Hugh Thomas. P. 419 ]

'স্পেনীয়রা আর এই সোনার মুখ দেখবে না—নিজেদের কান থেকেও যেমন চোখে দেখা যায় না।' (এটি অবশ্য একটি রুশ প্রবাদ)

স্পেনের এই মজুত সোনার ব্যাপারটা গস্‌ ব্যাঙ্কের (Gos Bank) ডিরেক্টার মারকুইল্‌ৎস্‌ (Marquiltz) ও সাব-ডিরেক্টার কাগান (Cagan) জানতেন। স্তালিন তাঁদেরও সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করেন।

স্তালিনের আসল মতলব ও চরম সঙ্কীর্ণতাবাদী স্বার্থপর মনোভাব সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে Hugh Thomas তাঁর তথ্য-সমৃদ্ধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক পুস্তক The Spanish Civil War-এ লিখেছেন :

"Stalin···took no chance. Before Soviet weapons were actually used on Spanish soil, the entire remaining Spanish gold reserve had been despatched to Russia as security for payment. To the few Russian technicians and military experts whom he sent to Spain, Stalin gave the order 'stay

out of range of artillary fire.' This meant that they should neither be killed nor, more compromizing, captured." [ The Spanish Civil War : P. 380-81 : Pelican Book ]

স্তালিন কোনরকম ঝুঁকি নেননি। স্পেনের ভূখণ্ডে রুশ অস্ত্র-শস্ত্র প্রকৃতপক্ষে পাঠিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবার আগে স্পেনের প্রজাতন্ত্রী সরকারের খাজাঞ্চিখানায় যত মজুত সোনা ছিল সবটাই এই সব অস্ত্র-শস্ত্রের দাম বাবদ রাশিয়াতে আনিয়ে নিয়েছিলেন। কি স্তালিনবাদীদের আদর্শবাদিতা! বিপ্লবের জন্য অস্ত্র পাঠান হল; ভয়, পাছে স্পেনের মুক্তিযোদ্ধারা কড়ায়-গণ্ডায় তার দাম মিটিয়ে না দেয়! কোন ঝুঁকি নিতে তিনি রাজী নন। যখন স্পেনের মুক্তিযোদ্ধারা—তরুণ-তরুণীরা বুকের তপ্ত রক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে বিপ্লবী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ঢেলে দিচ্ছে তখন বিশ্ব-বিপ্লববাদী লেনিনবাদী স্তালিনের কি নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা! স্পেনে অল্প যে-ক'জন রুশ কারিগরি বিশেষজ্ঞ ও সামরিক বিশেষজ্ঞ স্তালিন পাঠিয়েছিলেন, তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল: কামানের গোলার পাল্লার দূরে থাকবে, যাতে প্রাণটা না যায়। গা বাঁচিয়ে চলবে, যাতে প্রতিপক্ষের হাতে ধরাও পড়তে না হয়।

আবার অস্ত্রপাতি যেন এ্যানার্কিস্ট ও সোস্যালিস্টদের হাতে না পড়ে। ইতালির কমিউনিস্ট নেতা টগ্‌লিয়াত্তি বলেছিলেন এক কমরেডকে:

"We will tell the Socialists and Anarchists that the arms are inadequate so that they will blame Blum and Non-Intervention Committee." [ The Spanish Civil War : P. 380 ]

অস্ত্র না পেয়ে সোস্যালিস্ট অ্যানার্কিস্টরা ফরাসী সোস্যালিস্ট নেতা লিঁও ব্লুমকে দোষী করবে, স্তালিনকে নয়। অথচ রাজধানী মাদ্রিদ থেকে রুশ-রাষ্ট্রদূত রোজেনবার্গ ( Rosenberg ) মস্কোতে জরুরী বার্তা পাঠিয়ে বললেন: রুশ অস্ত্র না পাঠালে প্রজাতন্ত্র যুদ্ধে দাঁড়াতেই পারবে না। "The Republic was lost unless Russian arms were sent soon." [ The Spanish Civil War : Hugh Thomas : P. 377 ]

স্পেনের বুকে এই ঐতিহাসিক আদর্শের লড়াইয়ে রাশিয়ার ভূমিকার পেছনে যে চিন্তা কাজ করেছিল সেটা এইরূপ: স্পেনের গৃহযুদ্ধে জাতীয়তাবাদী শক্তি জয়ী হলে ইউরোপে ফ্রান্স তিনদিক থেকে বৈরী ভাবাপন্ন রাষ্ট্রের দ্বারা পরিবৃত হবে। এই অবস্থায় জার্মানীর পক্ষে রাশিয়া আক্রমণের ঝুঁকি নেওয়া অনেক সহজ ব্যাপার হবে। পেছন থেকে ফরাসীদেশের পাল্টা-আক্রমণের

কোনই আশঙ্কা থাকবে না—ফরাসীদেশ নিজেই বিপন্ন থাকবে সব সময়। এই কারণে সোভিয়েট সরকার স্পেনে জাতীয়তাবাদী শক্তির বিজয় রুখতে চেয়েছিল। আবার সেদিন স্পেনে বিশ্বের দ্বিতীয় কমিউনিস্ট রাষ্ট্র স্থাপনের একটা বিরাট সুযোগ ছিল। কিন্তু স্পেনের গৃহযুদ্ধে সত্যি সত্যি যদি কমিউনিস্টরা বিজয়ী হয় এবং একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্স—এই দুই বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র আতঙ্কিত বোধ করবে—ঘরের কাছে প্রতিষ্ঠিত রুশ-সমর্থিত কমিউনিস্ট রাষ্ট্র স্পেন থাকায়। অথচ সে-সময় কমিউনিস্ট রাশিয়া কূটনৈতিক কারণে বিশেষ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স-এর বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হতে চেয়েছিল। কমিউনিস্ট পক্ষের চূড়ান্ত জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা রাশিয়া পূর্ণ করতে গেলে রাশিয়ার সঙ্গে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির বড় রকমের যুদ্ধ লেগে যাবার আশঙ্কা ছিল। তাই বিশ্ব-বিপ্লববাদী স্তালিন স্পেনের কমিউনিস্ট সাফল্যের জন্য নিজের দেশের রাষ্ট্রীয়-স্বার্থকে বিপন্ন করতে চাননি। তাই কমিউনিস্টরা স্পেনের 'বিপ্লবকে' পেছন থেকে ছুরি মেরে ষড়যন্ত্রের রাজনীতির পথ ধরে ফ্রাঙ্কোর বিজয় সুনিশ্চিত করেছিলেন। [ The Spanish Civil War : Hugh Thomas : P. 283-84. ]

[ ১৯৪১ সালের ২২শে জুন নাৎসী জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করার সাথে সাথে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ( অবিভক্ত ) সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করে রাতারাতি নূতন প্রচার-অভিযানে ও আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে ভারতের কমিনিউস্টরা হাত মিলিয়ে দেশের বৃহত্তম গণবিপ্লব 'আগস্ট বিপ্লব'-কে রুখবার চেষ্টা করেছে। মহাত্মা গান্ধী 'ইংরেজ, ভারত ছাড়' এই গণবিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। মুক্তিসংগ্রামী জাতীয় কংগ্রেসকে দুর্বল করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তৈরী সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলীম লীগ দলকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। রুশ-স্বার্থেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ( অবিভক্ত ) এই ঘৃণ্য নীতি নিয়েছিল। ] স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় কমিউনিস্টরা ( P.S.U.C. ) বলতেন :

এখন বিপ্লবের কথা নয়—যুদ্ধ সমানভাবে চালাতে হবে। কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়ে Collectivize করলে চাষীরা দূরে সরে যাবে। মধ্যবিত্ত-শ্রেণীকে বিপ্লবী কর্মসূচীর কথা বলে দূরে ঠেলে দিলে হবে না। স্থানীয় আঞ্চলিক কমিটির কাজ তাই শক্ত কেন্দ্রীয় সরকার ( ভারতের কমিউনিস্টদের মতলবটা লক্ষ্য করার )। কর্ম-নৈপুণ্যের জন্য ( efficiency ) আমাদের বিপ্লবী হিংসা

পরিত্যাগ করতেই হবে ( Revolutionary violence ); বিপ্লবী স্লোগান কপ্‌চানো এখন অর্থহীন পাগলামি। এখন আমরা বিপ্লবী সর্বহারার একনায়কত্ব কায়েম করতে চাইছি না, আমরা চাই 'পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র'। অরাজকতা বন্ধ করতে হবে—চাই শৃঙ্খলা। যারা গৃহযুদ্ধকে 'সামাজিক বিপ্লবে' রূপান্তরিত করতে চায় তারা ফ্যাসিস্ট শত্রুর হাতের ক্রীড়নক, দেশের শত্রু, বিশ্বাসঘাতক।

অতএব এই যুক্তিতে অ্যানার্কিস্টরা বা POUM-পন্থীরা ছিল বিশ্বাসঘাতক।

POUM-এর 'লাইন' ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। যুদ্ধে জয়লাভ বিষয়ে অবশ্য তারা একই মত পোষণ করত। POUM ছিল স্তালিনবাদ বিরোধী। কমিউনিস্ট দল থেকেই তাদের উৎপত্তি। ক্যাটালোনিয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল এর প্রভাব।

POUM-এর বক্তব্য ছিল :

বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাসির নামে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা নিছক ধাপ্পা। বুর্জোয়া গণতন্ত্র ক্যাপিটালিজম-এর আর এক নাম। ফ্যাসিবাদও তাই। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের হয়ে লড়াই করার অর্থ একপ্রকার পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে একপ্রকার পুঁজিবাদের হয়ে লড়াই করা। ফ্যাসিবাদের প্রকৃত বিকল্প শ্রমিকদের স্বায়ত্বশাসন ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। এই লক্ষ্য সামনে ঠিক ঠিক না তুলে ধরলে যুদ্ধে ফ্রাঙ্কোরই জয় হবে অথবা খিড়কির দরজা দিয়ে ফ্রাঙ্কো আসবেন। শ্রমিকরা ইত্যবসরে যেসব অধিকার অর্জন করেছে উদারপন্থী সরকারের আমলে—১৯৩৬ সালে ও তার আগে, ১৯৩১ সালে—সেগুলোকে রক্ষা করতেই হবে। [ ভারতবর্ষে অর্জিত অধিকার রক্ষার নকল লড়াই-এর ভান মার্কসবাদীরা ডান, বাম ও অন্যান্য শরিকরা করেছেন। কিন্তু স্পেনে মার্কসবাদী স্তালিন-বাদীরা POUM-এর এই অর্জিত অধিকার রক্ষার দাবীকে নস্যাৎ করেছিলেন। ] শ্রমিক-শ্রেণীকেই সেনাবহিনী নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তা না হলে সেনাবাহিনীই শ্রমিক-শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করবে। যুদ্ধ ও বিপ্লব অবিচ্ছেদ্য। অ্যানার্কিস্টদের সুস্পষ্ট কোন ভাবধারা ও কর্মসূচী পরিলক্ষিত হয়নি। তবে তারা POUM-এর মত Workers' control-তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল, পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে নয়। তাদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের মৌলিক মতভেদ ছিল। CNT-FAI : ( Anarchist ) এরা চেয়েছিল—(১). প্রতি শিল্পের পরিচালনায় শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ। (২) আঞ্চলিক কমিটিই সরকার পরিচালনা করবে ও (৩) চার্চ ও বুর্জোয়া-শ্রেণীর বিরুদ্ধে আপোষ সংগ্রাম। কমিউনিস্টদের কৌশল শেষ পর্যন্ত Anarchists POUM-কে একত্রে আসতে সুযোগ দিয়েছিল। যদিও দুটি শক্তি পরস্পরকে আদৌ পছন্দ করত না।

মাদ্রিদ শহরকে কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন সেনাবাহিনী আন্তর্জাতিক ব্রিগেড যেভাবে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করল তাতে কমিউনিস্টদের ইজ্জত বেড়ে গেল। তাঁরা দেশের নায়ক হয়ে গেল রাতারাতি। POUM-এর বিপ্লবী বিশুদ্ধতা 'Revolutionary purism' যেন ম্লান হয়ে গেল এর মুখে। এদিকে চলল বাম শক্তির মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব।

বিপ্লবী সরকার POUM-কে প্রচ্ছন্ন ফ্যাসিস্টবাহিনী বা 'পঞ্চমবাহিনী' বলে ঘোষণা করল। হিটলার-ফ্রাঙ্কোর অর্থে নাকি তাদের পোষা হয়েছিল। (যেমন, এদেশে সব কমিউনিস্ট-বিরোধীরাই CIA-র agent) 'Franco's fifth column—POUM'—এই কমিউনিস্ট প্রচারের অর্থ হল, যে সহস্র সহস্র মানুষ দারুণ শীতে অবর্ণনীয় কষ্টে পরিখায় মাসের পর মাস ধরে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে লড়েছিল তারা রাতারাতি ফ্রাঙ্কোর পোষা গুপ্তচর ও পঞ্চমবাহিনী হল! সারা স্পেনে কমিউনিস্টরা এই ঘৃণ্য প্রচার ছড়িয়ে দিল। সংগ্রামের মনোবলে ফাটল সুরু হল। সারা বিশ্বে এই অপপ্রচার ছড়ান হল। ফ্রাঙ্কোর দল এর সুযোগ নিল—সুযোগ নিল কায়েমী স্বার্থের তল্পিবাহকরা। এদের বলা হল Trotskyist traitors, spies, fascist-murderers, cowards ইত্যাদি। সাহিত্যিক অরওয়েল বলেছেন: যারা এই কুৎসিত ইস্তাহার-পুস্তিকা লিখেছিল তারা কেউই কোনদিন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে আসেনি। বাড়িতে নিরাপদে থেকে এই কাজ করে গেছে দিনের পর দিন। যুদ্ধক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের কমিউনিস্ট সভ্যরাও সেকথা বলত না।

পৃথিবীর ইতিহাসে গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লব অনেক ঘটেছে, কিন্তু মানব জাতির বিবেককে স্পেনের বিপ্লব যেভাবে আলোড়িত করেছিল তার তুলনা বিরল। বিশ্ববাসীর সমর্থন ছিল স্পেনের প্রজাতন্ত্রের প্রতি। ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কো ও স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রের মধ্যে লড়াইকে বিশ্বের সৎ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা, বিশেষত বুদ্ধিজীবীরা মানবাধিকার রক্ষার লড়াই বলে মনে করেছিল এবং এই লড়াইয়ে ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয় ও গণতান্ত্রিক শক্তির জয় যে-কোনো মূল্যেই আনতে হবে একথা তারা ভেবেছিল। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে তাই এই লড়াইয়ে অংশ নেবার উদ্দেশ্যে ছুটে এসেছিলেন সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক, কবি ও মনীষীরা। যুগোশ্লাভিয়া থেকে এসেছিলেন তরুণ মিলোভান জিলাস, তিনি তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকেও সঙ্গে এনেছিলেন।

আমেরিকা থেকে এসেছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে।

তিনি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। সিনক্লেয়ার লুইস ও ডব্লু. এইচ অডেন স্ট্রেচার বহন করার কাজ নিয়েছিলেন। এসেছিলেন আঁদ্রে মারলো। কবি স্পেন্ডার জর্জ অরওয়েলের কথা আগেই বলেছি। সাম্প্রতিক কালে স্পেনের চেয়েও বড় ও ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ এবং বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে—সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে—বাংলাদেশে। দুঃখের বিষয়, ঐ ঘটনা মানবজাতির বিবেককে তেমনভাবে আলোড়িত করেনি। আঁদ্রে মারলো বলেছিলেন, স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়ে যেমন হয়েছিল, বাংলাদেশের গৃহযুদ্ধের সময়ও তেমনটি হওয়া উচিত: বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের উচিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তথা গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করা। বিশ্বের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এ আবেদনে কর্ণপাত করেননি।

স্পেনের বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল স্পেনে তিনটি পক্ষ সৃষ্টি হয়ে যাবার ফলে। যদি ফ্রাঙ্কো ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে লড়াই সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে সে লড়াইয়ে প্রজাতন্ত্রের সমর্থকরা সম্ভবত জয়লাভ করত। কিন্তু কমিউনিস্টরা এসে আসর দখল করে প্রজাতন্ত্রের সমর্থকদের দুর্বল করে দিয়ে তাদের পরাজয়ের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিল। স্তালিন কোনমতেই চাননি যে, স্পেনের গৃহযুদ্ধ বিশ্ব-যুদ্ধকে ডেকে আনুক—তাই হিটলার-মুসোলিনি সর্বাঙ্গীণ সাহায্য দান করা সত্ত্বেও স্তালিন পাল্টা-সাহায্য পাঠাতে ইতস্ততঃ করেছেন। আবার যখন স্তালিন ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সঙ্গে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কোন সমঝোতায় আসতে পারলেন না তখন তিনি হিটলার ও মুসোলিনির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। সেজন্যও তিনি স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে বিশেষ কোন সাহায্য পাঠাতে রাজি হননি—কারণ ফ্রাঙ্কোকে হিটলার ও মুসোলিনি সর্বতোভাবে সমর্থন করতেন। অথচ স্পেনের গৃহযুদ্ধ তাড়াতাড়ি মিটে যাক বা কোন এক পক্ষ দ্রুত জয়লাভ করুক তাও চাননি স্তালিন। কারণ স্পেনের গৃহযুদ্ধ যতদিন চলবে ততদিন বিশ্ববাসীর দৃষ্টি স্পেনের প্রতিই নিবদ্ধ থাকবে—রাশিয়ায় স্তালিন যেসব নৃশংস কার্যকলাপ চালাচ্ছিলেন সেদিকে কেউ ভালো-ভাবে চেয়ে দেখবে না, একথা স্তালিন জানতেন। ১৯৩৭ সালের ব্যাপক নিধন অভিযানের সময় স্তালিন ৩৫,০০০ সামরিক অফিসারকে বরখাস্ত করেছিলেন। জাপানী গোয়েন্দা দপ্তরের সূত্রে জানা যায় যে, এর অর্ধেক-সংখ্যককে হত্যা করা হয়েছিল, আর বাকি অর্ধেকের মধ্য থেকে বহুজনকে পাঠানো হয়েছিল স্পেনে, যেখান থেকে স্তালিন আর তাঁদের দেশে ফিরতে দেননি। স্ট্যানলি পেইন লিখেছেন:

"The Soviet Union began to de-escalate in mid-1937, at the very time that the communists had achieved political and military hegemony in the Republican Zone. The decline in Russian military involvement,..... was not so much prompted by the situation in Spain itself as by the broader calculations of the Soviet Government. The outbreak of Japanese aggression in the Far-East posed a grave potential threat to Soviet security on the other side of the world. ..... A major effort to win a leftist triumph would be too expensive and run the risk of direct conflict with Germany, but continuation of the struggle at a lower rate of Soviet assistance would allow Stalin to retain his Spanish gambit at minimal risk." [ Stanley G. Payne : The Spanish Revolution, P. 273-74 ]

অর্থাৎ সাদা কথায়, স্পেনে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হোক স্তালিন তা চাননি, কিন্তু তিনি এটা চেয়েছেন যে, স্পেনে গৃহযুদ্ধের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকুক এবং অল্প খরচে স্পেনের ঘটনাকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে তিনি ব্যবহার করতে থাকুন। বিপ্লবের প্রতি চমৎকার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা!

স্তালিন যেটুকু সাহায্য পাঠিয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল স্পেনে কমিউনিস্টদের শক্তি বৃদ্ধি করা। অথচ তিনি চাননি যে, কমিউনিস্টরা স্পেনে ক্ষমতায় আসুক। পেইন লিখেছেন :

"The Comintern had no interest in a formal Communist take-over of the Republican Government. This would have further excited Western hostility." ( পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৯৯ )

স্তালিন তাঁর অনুগামীদেরও এইভাবে ডোবালেন। মনে-প্রাণে তিনি চাইছেন ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বন্ধুত্ব—পাছে তারা বিরক্ত ও রুষ্ট হয় তাই স্পেনের কমিউনিস্টদেরও তিনি ক্ষমতায় আসতে দিলেন না।

শেষে প্রশ্ন ওঠে, স্তালিন কি আদৌ স্পেনের বিপ্লবীদের কোন সাহায্য দিয়েছিলেন ? স্পেনের কমিউনিস্টরা দাবী করেছিল যে, যেহেতু প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রভাবাধীন এলাকায় প্রজাতান্ত্রিক সরকারের কোষাগার রাখা নিরাপদ নয়, কেননা সব ধনদৌলতই শত্রুপক্ষের দখলে যেতে পারে, অতএব

প্রজাতান্ত্রিক সরকারের কোষাগারে যত সোনা সঞ্চিত আছে এবং প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রভাবাধীন এলাকায় যত সোনা আছে তা নিরাপদে গচ্ছিত রাখার উদ্দেশ্যে রাশিয়ায় পাঠানো হোক। কমিউনিস্টদের চাপে প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্পেন থেকে কয়েকটি জাহাজ ভর্তি করে রাশিয়ায় সোনা পাঠিয়ে দিয়েছিল। সব সোনাই স্তালিনের কোষাগারে চিরতরে জমা পড়েছিল। রাশিয়া স্পেনকে যে সাহায্য পাঠিয়েছিল তার দাম রাশিয়ায় পাঠানো স্পেনের সোনার দামের তুলনায় অনেক কম। স্তালিন সাহায্য পাঠানোর নামে স্পেনে তাঁর অনুগত কমিউনিস্টদের সহায়তায় স্পেনের সম্পত্তি লুঠ করেছিলেন—এটাই প্রকৃত সত্য, রাশিয়ার তথাকথিত সাহায্যদানের এটাই অন্তরালের ইতিহাস।

স্পেনের বিপ্লব ব্যর্থ হবার জন্য মূলত দায়ী রাশিয়ার নীতি ও স্পেনের কমিউনিস্টদের ভূমিকা। আগেও একথা বলেছি। কিন্তু আর একদিক থেকেও একথা সত্য: স্পেনের জনসাধারণ বিপ্লব চেয়েছিল, গণতন্ত্র চেয়েছিল, কিন্তু কমিউনিস্টদের শাসন চায়নি। যেদিন তারা বুঝেছিল যে, প্রজাতান্ত্রিক সরকারের ওপর কমিউনিস্টদের প্রভাব ক্রমবর্ধমান এবং ঐ কমিউনিস্টরা বিদেশের অনুগত, এবং দেশ ও জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে তারা কাজ করছে, প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের বিরুদ্ধে কাজ করছে সেদিনই স্পেনের জনসাধারণ গভীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফ্রাঙ্কোর দিকে ঝুঁকতে সুরু করে। Joaquin Maurin লিখেছেন:

"From the moment in which the alternative was posed, beginning in June 1937, between the Communist Party, at the orders of Moscow or the opposing military regime, reactionary but Spanish conclusion of the Civil War was predetermined." [ Revolucion Contrarrevolucion en Espana, P. 289 ]

ফ্রাঙ্কো প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু জাতীয়তাবাদী; কমিউনিস্টরা প্রগতিশীলতার বড়াই যতই করুক, রাশিয়ার কাছে তাদের টিকি বাঁধা। প্রগতিশীলদের ভেকধারী পরদাসের চেয়ে, বামপন্থী দেশদ্রোহীর তুলনায় প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছিল দেশের সাধারণ মানুষের কাছে। প্রতিক্রিয়াশীল ফ্রাঙ্কো-পন্থীরা সেই মানসিকতার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে। স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লবকে কমিউনিস্টরা যখন এই রকম একটা বেছে নেবার মুহূর্তে এনে পৌঁছে দিল স্পেনের জনসাধারণ তখন ফ্রাঙ্কোকেই বেছে নিল, মস্কোর অনুগতদের প্রত্যাখ্যান করল। স্পেনের বিপ্লবে গণতান্ত্রিক শক্তির পরাজয়ের পথ এইভাবেই সুনিশ্চিত হয়েছিল।

১৩

## অস্ট্রিয়া পরিস্থিতি: বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লব

দানিয়ুব নদীর মধ্য-উপত্যকায় অবস্থিত অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রের আয়তন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক সঙ্কুচিত হয়ে গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ভেঙে চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোস্লোভিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। মধ্য-ইউরোপের মধ্যস্থলে অবস্থিত এই দেশটিকে কেন্দ্র করে ইউরোপে অনেক রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটে গেছে। অস্ট্রিয়ার ইতিহাস একটি জাতির ইতিহাস নয়—বরং একটি রাজবংশের—হ্যাপস্‌বুর্গ-বংশের ইতিহাস। এখানে একজাতি—একভাষা গড়ে ওঠেনি, একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত নিরপেক্ষ ক্ষুদ্র এই রাষ্ট্র ( Buffer State ) ইউরোপের রাজনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। দানিয়ুব নদী-উপত্যকার রাজনৈতিক ভারসাম্য নির্ভর করত অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ভারসাম্যের ওপর।

অস্ট্রিয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাজনীতিতে দুটি বিবদমান শক্তির দ্বন্দ্ব দেখা দিল। ভিয়েনা নগরীতে সমাজতন্ত্রীদের প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। মিউনিসিপ্যাল প্রশাসন ছিল সমাজতন্ত্রীদের হাতে। ইউরোপে সে-যুগে ভিয়েনার পৌর প্রশাসন সর্বশ্রেষ্ঠ ও জনকল্যাণকর প্রশাসন বলে খ্যাতিও অর্জন করেছিল। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ছিল পাদরী সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড প্রভাব। অস্ট্রিয়ার সোস্যালিস্টরা ইউরোপের সকল সমাজতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। ভিয়েনার উন্নত প্রশাসন, শহরবাসীর উন্নত জীবনের মান, বৈষয়িক উন্নতি গ্রামাঞ্চলের মানুষের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামাঞ্চলে গরীব কৃষক, পিছিয়ে-পড়া হতভাগ্য মানুষের দল পাদরী সম্প্রদায়ের পেছনে জোট বাঁধল—আর ভিয়েনার উন্নত স্বচ্ছন্দ ধনী মানুষরা সমাজতন্ত্রীদের পেছনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত দিন দিনই বাড়ছিল। সোস্যালিস্টরা নিজেদের ঘাঁটি রক্ষার জন্য দেশে শ্রমিক বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি বেসরকারী সেনাবাহিনী তৈরী করল। পাল্টা-ব্যবস্থা হিসাবে গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও অনগ্রসর মানুষরাও

তাদের প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তুলল। এদের সংঘর্ষই ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত হল।

অস্ট্রিয়াতে সোস্যালিস্টরাই সবচেয়ে সংগঠিত শক্তিশালী রাজনৈতিক দলরূপে পরিগণিত হলেও সেই দল গ্রামের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল। তাদের কাজ—আন্দোলন, প্রচার—শহরের মানুষের মধ্যেই সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ ছিল। সোস্যালিস্ট রাজনীতির পেছনে সেদিন অস্ট্রিয়ার না ছিল কোন আবেগ, না ছিল কোন উন্মাদনা। অস্ট্রিয়ান সরকার প্রস্তাবিত জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার শুল্ক-সম্বন্ধীয় ঐক্যের প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ ফরাসী-সরকার অস্ট্রিয়ায় অর্থসাহায্য বন্ধ করে দিল। ফলে দেশে দেখা দিল দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট।

১৯৩২ সালে অস্ট্রিয়ার রাজনীতিতে Dr. Engelbert Dolfuss নামে এক রক্ষণশীল রাজনীতিবিদের উদ্ভব হল। ইনি ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল (কনজারভেটিভ) পার্টির সদস্যরূপে অস্ট্রিয়ার পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন। ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল কনজারভেটিভ পার্টির মন্ত্রিসভায় ১৯৩১ সালে মন্ত্রী হন তিনি। ১৯৩২ সালে ২০শে মার্চ নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই দেশের প্রধানমন্ত্রী হন এবং ১৯৩৩ সালে দেশে পার্লামেণ্টারী শাসনপ্রথার অবসান ঘটার সাথে সাথেই ডলফাস্ একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করলেন ঐ বছরের ৭ই মার্চ। জার্মান চ্যান্সেলার হিটলার ডলফাসের এই প্রতিষ্ঠা ভাল চোখে দেখেননি। জার্মান ফুরার অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর Mein Kampf পুস্তকের সুরুতেই একথা লিখেছিলেন। তৃতীয় রাইখের সংলগ্ন অস্ট্রিয়ার ৬,৫০০,০০০ অস্ট্রিয়ান পৃথক জার্মান রাষ্ট্রীয় সত্তা নিয়ে মানচিত্রে অবস্থান করবে—এটা হিটলারের চিন্তায় ছিল অকল্পনীয়। তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অস্ট্রিয়ায় নাৎসীদের দিয়ে ভীতি প্রদর্শন, হিংসা ও গুপ্তহত্যার বিভীষিকার রাজনীতি সুরু করা হল। অস্ট্রিয়ার জনসাধারণের অধিকাংশই জার্মানীর সঙ্গে মিলিত হতে ইচ্ছুক ছিল (Pro-Anschuluss); কিন্তু নাৎসীদের হিংসা ও সন্ত্রাসের রাজনীতি তাদের ধীরে ধীরে জার্মানীর সঙ্গে অঙ্গীভূত হবার বিরোধী করে তুলেছিল। নাৎসীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ—বোমাবাজি—গুলিবর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠল। ডলফাস্ তাঁর দেশে নাৎসী দলকে নিষিদ্ধ করে এক ঘোষণা জারী করলেন। অস্ট্রিয়ার প্রতি জার্মানীর আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখে ডলফাস্ ইতালীর বন্ধুত্ব প্রার্থনা করলেন। মুসোলিনি সুযোগ ছাড়লেন না। তিনি চেয়েছিলেন—জার্মানী ও ইতালী এই দুই ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ট্রিয়া স্বাধীন নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে (Buffer State) টিকে

থাকুক। অস্ট্রিয়া জার্মানীর অঙ্গীভূত হয়ে গেলে ত্রিয়েস্তি ও লম্বার্ডির নিরাপত্তা বিঘ্নিত. হতে পারে এই আশঙ্কা তাঁর ছিল। মুসোলিনি তাই জাতীয় স্বার্থেই অস্ট্রিয়ার ডিক্টেটারকে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন।

যে দেশেই 'রাজনৈতিক বিপ্লব' সাধনের উদ্দেশ্যে কোন নেতা বা রাজনৈতিক দল সরকারী সেনা ও পুলিশবাহিনীর পাল্টা বেসরকারী সেনা বা ঠ্যাঙারে বাহিনী গঠন করে তাকে রাজনৈতিক হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেছেন বা করেছে সেখানে বিপ্লবের প্রাথমিক বা চূড়ান্ত পর্যায়ের পর সেই বেসরকারী সামরিক বা আধা সামরিক বাহিনী একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়াতে বা জার্মানীতে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অস্ট্রিয়াতেও ডলফাস্ যে বেসরকারী বাহিনীকে মদত জোগাচ্ছিলেন ( Heimwehr ) সেটা ছিল সম্পূর্ণ সমাজতন্ত্রী আদর্শ-বিরোধী। এই বাহিনীর পেছনে ছিলেন Rudiger Von Starhemberg এবং প্রাক্তন সেনাবাহিনীর একজন অফিসার Major Emil Fay। এঁরা পেছনে থেকে আরও ক্ষমতার জন্য চাপ দেওয়া স্থরু করেছিলেন। সমাজতন্ত্রীদেরও অনুরূপ বেসরকারী সেনাদল ছিল ( Schutzbund )। ডলফাস্ ক্রমেই এদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়লেন। তিনি তাদের প্ররোচনায় সোশ্যালিস্ট নিপীড়নের পথ ধরলেন। সোশ্যালিস্ট পত্র-পত্রিকা প্রকাশনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন, সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করলেন। ডলফাস্-এর এই ঠ্যাঙারে বাহিনীকে ইতালীয় সরকার অর্থ জোগাচ্ছিল। ডলফাস্ গণতান্ত্রিক সংবিধান রদ করে দেশের জন্য একটি কর্তৃত্ববাদী ( authoritarian ) ফ্যাসিস্ত মডেলের সংবিধান প্রবর্তনের অভিপ্রায় দেশবাসীকে জানালেন। সোশ্যালিস্টরা এর প্রচণ্ড বিরোধিতা স্থরু করলেন। ডলফাস্ তাঁর প্রস্তাবিত নয়া সংবিধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ হিসাবে দেশপ্রেমিকদের একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে সংহত করতে উদ্যত হলেন; আর এই প্ল্যাটফর্মের নাম দিলেন 'Fatherland Front'—দলের উর্ধ্বে হবে তার স্থান। পাদরী ও ফ্যাসিস্তদের প্ল্যাটফর্ম হয়ে দাঁড়াল এই নূতন ফ্রন্ট। ১৯৩৩ সালের পরের কয়েক বছরের অস্ট্রিয়ার রাজনীতির ইতিহাস তিনটি শক্তির সংঘাতের ইতিহাস—যথা, (ক) দক্ষিণপন্থী পাদরী ও ফ্যাসিস্টদের মিলিত মোর্চা, (খ) মার্কসবাদী ভাবাদর্শী শ্রেণী-সংগ্রামের আদর্শে বিশ্বাসী বামপন্থী শক্তি, (গ) নাৎসী দল—বা জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল ( National Socialist Paty ), তাদের শ্লোগান ছিল 'Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer.' এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক নেতা।

অস্ট্রিয়া ধীরে ধীরে গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছিল। ডলফাস্ কট্টর দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করলেন। মুসোলিনি তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন—সোস্যালিস্টদের শক্তি চূর্ণ করার জন্য। ডলফাস্ নাৎসীদের ক্রমবর্ধমান শক্তি লক্ষ্য করে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন, তবে অস্ট্রিয়ার স্বাধীন অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হবে এই ভিত্তিতেই অবশ্য। সোস্যালিস্ট ও কট্টর দক্ষিণপন্থী শক্তির সঙ্গে একাধারে লড়াই চালান ডলফাস্ সরকারের পথে সম্ভব ছিল না। মুসোলিনি তাঁকে পরামর্শ দিলেন সোস্যাল ডেমোক্রাটদের মেরুদণ্ড আগে চূর্ণ করে পরের পর্যায়ে দক্ষিণপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য। ডলফাস্-ও সেই পরামর্শ মত কাজ করতে উদ্যত হলেন।

সোস্যালিস্টরা বলশেভিক ধাঁচের বিপ্লবের প্রস্তুতি নিয়েছে এই প্রচারকে তিনি সোস্যালিস্টদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার অজুহাতরূপে গ্রহণ করলেন। আসলে কিন্তু অস্ট্রিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রাটরা বলশেভিক ধাঁচে বিপ্লবের পথে আদৌ পা বাড়ায়নি। দক্ষিণপন্থীরা সোস্যালিস্ট দলকে নিষিদ্ধ করে ভিয়েনার সোস্যালিস্ট ঘাঁটিগুলি জোরপূর্বক দখল করে নেওয়ার জন্য সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ বৃদ্ধি করতে লাগল। তাদের বেসরকারী-দলীয় সেনাবাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে কুচকাওয়াজের মাধ্যমে দেশের শান্ত রাজনৈতিক পরিবেশকে সুপরিকল্পিতভাবে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। তাদের স্লোগান ছিল: অস্ট্রিয়াকে সোস্যালিস্টমুক্ত করতে হবে। চ্যান্সেলার ডলফাস্ গোপনে এই শক্তিকে মদত জোগাচ্ছিলেন। সর্বোপরি মুসোলিনি তাঁর নূতন ত্রাতা ও পরামর্শদাতা। তিনি নিজেই সেই পরামর্শ দিয়েছেন।

১৯৩৪ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। ভিয়েনা নগরীতে প্রচণ্ড যুদ্ধ ৪ দিন ধরে চলেছিল—মফঃস্বল অঞ্চলে চলেছিল প্রায় এক সপ্তাহকাল। প্রায় এক হাজার নরনারী ও শিশু নিহত হয়েছিল—অনেক সোস্যালিস্ট নেতা গুরুতররূপে আহত হন। পরে তাদের ফাঁসিতে ঝোলান হয়। সোস্যালিস্ট পৌর সমাজতন্ত্রের অসামান্য কীর্তি রেখেছিলেন ভিয়েনা প্রশাসনে। সমগ্র মধ্য-ইউরোপের আর কোথাও এত উন্নত মানের পৌর প্রশাসন চালু ছিল না। সেসময় পৌর-প্রতিষ্ঠানের সেভিংস একাউণ্টে জমা ছিল ১৪,০০০,০০০ পাউণ্ড। সরকার সবটাই বাজেয়াপ্ত করল। পৌর-সংস্থার বার্ষিক আয় ছিল ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড। পৌর-প্রতিষ্ঠান শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের বাসস্থানের জন্য গৃহনির্মাণের ব্যাপক পরিকল্পনা সোস্যালিস্টরা নিয়েছিলেন এবং সেই বাবদ ২২,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ও করেছিলেন। সমগ্র

ভিয়েনার শতকরা ৩৫ ভাগ জমি ছিল মিউনিসিপ্যাল সম্পদ। সবই ডলফাস সরকার নিয়ে নিল। মিউনিসিপ্যালিটি প্রায় ৫৪,০০০ কর্মচারী-শ্রমিককে বিভিন্ন পৌরসংস্থা পরিচালিত উদ্যোগে কর্মসংস্থাপন করেছিল। মিউনিসিপ্যালিটিই শহরে গ্যাস, বিদ্যুৎ সরবরাহ করত, ট্রাম, যাত্রীবাহী যান, বাস, বড় বড় বিপণির পরিচালনা ও মালিকানা ছিল সোস্যালিস্ট-শাসিত এই পৌর-প্রতিষ্ঠানের। সমস্ত পৌর-সম্পদই সরকার নিয়ে নিল। হাজার হাজার কর্মচারী-শ্রমিক কর্মচ্যুত হল। সোস্যালিস্টদের প্রতিরোধ সফল হল না। সমস্ত সোস্যালিস্ট নেতাদেরই গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হল সরকার। তাদের প্রতিরোধ বাহিনীর ( Schutzbund ) অস্ত্রাগারগুলির গোপন খবরও কর্মী বা দ্বিতীয়, তৃতীয় সারির নেতাদের জানা ছিল না। যাদের ওপর প্রতিরোধের ভার ছিল তাঁদের সবাই গ্রেপ্তার হলেন। যে প্রতিরোধের চেষ্টা হল স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেটা চূর্ণ করতে সরকার পক্ষের কোনই অসুবিধা হয়নি।

সোস্যালিস্ট দলের নেতা অটো বয়ার ( Ȯtto Bauer ) ছিলেন একজন সংযত সংস্কৃতিবান উদারনৈতিক ব্যক্তি। তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তিনি ছিলেন সংগ্রাম ও সংঘর্ষ পরাঙ্মুখ। প্রতিপক্ষের নেতা ডলফাসের উপর তিনি ভরসা রাখতেন। তাই সঙ্কটের মুখে সমাজতন্ত্রীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ ও সাধারণ ধর্মঘটে আপত্তি জানালেন না। তিনি রক্তক্ষয় এড়াতে চেয়েছিলেন এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসায় তাঁর যথেষ্ট আস্থা ছিল। দেশের শ্রমিক-শ্রেণী প্রতি-বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু নেতারা সংগ্রামের আহ্বান না দিয়ে প্রায় দু' বছর ডলফাসের পার্লামেন্টে নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত দেশ-মানে না-আপনি-মোড়ল ডলফাসের একনায়কতন্ত্রকে মুখ বুজে সুবোধ বালকদের মত মেনে নিলেন। পরে Bauer স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁদের চরম ভুলের মাশুলই শেষে দিতে হল। হিংস্র প্রতি-বিপ্লবী প্রতিপক্ষের কাছে শান্তি-অহিংসা-ন্যায়পরায়ণতার বুলি আওড়াবার কোন অর্থ আছে? রক্তপাত-গৃহযুদ্ধ এড়াবার দায়িত্ব বা আগ্রহ কি শুধু গণতন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রীদেরই থাকবে? বিপক্ষ দলের থাকবে না? প্রতিপক্ষ ফ্যাসিস্ট ও আধা-ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলি যখন গোপনে ব্যাপক প্রস্তুতি চালাচ্ছিল সমাজতন্ত্রীদের ওপর সর্বাত্মক আক্রমণের জন্য, যখন তারা তাদের নিজস্ব বেসরকারী সেনাবাহিনীকে ( Heimwehr ) ডলফাসের ওপর চাপ দিয়ে আরও ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন ও আক্রমণাত্মক করে গড়ে তুলছিল, তখন সমাজতন্ত্রীরা গণতন্ত্র, অহিংসা ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের মালা জপছিলেন। তাঁরা তাদের নিজস্ব ফৌজ Schutzbund-

-কে আসন্ন সংঘর্ষের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতও করেননি। Bauer নিজেই স্বীকার করেছিলেন :

ভিয়েনা অভ্যুত্থান শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে নূতন প্রেরণা ও আদর্শবাদ সঞ্চার করেছিল। সোস্যালিস্টদের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ সংগ্রামকে চেকোশ্লোভাক কমিউনিস্ট নেতা ক্লিমেণ্ট গটওয়াল্ড ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন :

"The parties of the Second International try to make capital out of the blood of the Austrian proletariat, try to cover with its blood their interminable betrayals and crimes.……But the facts prove inconsistantably that the Austrian Socialist Party has brought the proletariat under the knife of Fascism" [ Randschan, Nov. 19, 1934 ]

সোস্যালিস্টদের তিনি "হায়েনা", "বিশ্বাসঘাতক" বলে চিত্রিত করলেন। ক্লিমেণ্ট গটওয়াল্ড ভুলে গেলেন যে, পূর্ব-ইউরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট যখন সে দেশে একটি প্রতিক্রিয়াশীল আধা-ফ্যাসিস্ট সামরিক জুনটা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে প্রতি-বিপ্লবের বিজয় নিশান উড়িয়েছিল তখন প্রতিরোধ-আন্দোলন না করে আত্মসমর্পণের পথ বেছে নিয়েছিল। ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ভিয়েনার সোস্যালিস্ট কর্মী ও শ্রমিকরা যুদ্ধ করল, অথচ গটওয়াল্ড তাদেরই দায়ী করলেন দেশকে ফ্যাসিবাদের উদ্যত ছুরিকার নীচে আনার জন্য। সত্যের এর চাইতে বড় কুৎসিত অপলাপ আর কি হতে পারে? সোস্যালিস্টদের ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনা করেছি। কিন্তু ফ্যাসিবাদের সঙ্গে ইউরোপের রাজনীতিতে সোস্যালিস্টদের করমর্দনের কোন প্রমাণ বা নজীর নেই। সোস্যালিস্ট-বিদ্বেষ ও বিরোধিতা একটা অন্ধ সংস্কারে পরিণত হয়েছিল—গটওয়াল্ডের উক্তি তারই একটা সাক্ষ্য বহন করছে মাত্র।

"We postponed the fight, because we wanted to spare the country the disaster of a bloody civil war. The civil war nevertheless broke-out eleven months later, but under conditions that were considerably less favourable to ourselves. It was a mistake, the most fatal of all our mistakes." ( Otto Bauer )

ফেব্রুয়ারী মাসের গৃহযুদ্ধের পরই ডলফাস্ দেশে প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের

জায়গায় একটি নূতন সংবিধান প্রণয়ন করলেন। কিন্তু ফেব্রুয়ারীর গৃহযুদ্ধে সোশ্যালিস্টদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে চ্যান্সেলার ডলফাস্ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা নাৎসীদেরই সুবিধা করে দিলেন। আর একথাটা বুঝতেও তাঁর বিলম্ব হয়নি। নাৎসীরা এর পর থেকে ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করতে লাগল। মুসোলিনি যে মতলব ডলফাসকে দিয়েছিলেন সেটা যে অস্ট্রিয়ার স্বার্থের সহায়ক হয়নি বোঝা গেল। ডলফাস্ নাৎসী দলের ও জার্মানীর শক্তি বৃদ্ধিতে ভয় পেয়েছিলেন। তাই তিনি আবার নাৎসীদের কিছুটা তোয়াজ করতে সুরু করলেন।

ফেব্রুয়ারীর গৃহযুদ্ধে সোশ্যালিস্ট দলের পাঁচ মাস পরে জার্মান সরকার পরিচালিত শতাধিক নাৎসী অস্ট্রিয়ায় ২৫শে জুলাই একটি প্রাসাদ চক্রান্ত দ্বারা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করল চ্যান্সেলার ডলফাসকে হত্যা করে। নাৎসী দলের খুন ও সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির পরিণতি—কর্মরত অবস্থায় ডলফাসের নৃশংস হত্যা বিশ্বস্ত রক্ষীবাহিনীর ছদ্মবেশে। কিন্তু এই নাৎসী বিদ্রোহের পেছনে কোনরকম জনসমর্থন ছিল না। ওপরতলার সামরিক অফিসারদেরও কোন সমর্থন ছিল না। প্রাসাদ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র অচিরেই ব্যর্থ হল। হিটলার তখন স্বদেশে মরণোন্মুখ প্রেসিডেন্ট ভন হিণ্ডেনবুর্গের কাছ থেকে ছলে-বলে পূর্ণ ক্ষমতা আদায় করার জন্য ব্যস্ত। তাই অস্ট্রিয়ায় তাঁর অনুচরদের সেই মুহূর্তে প্রত্যক্ষভাবে মদত দেবার আগ্রহ তাঁর ছিল না। ডলফাসের স্থলাভিষিক্ত হলেন ডঃ শুস্‌নিগ্। ষড়যন্ত্রকারীদের কয়েকজনকে সরকার ফাঁসিতে ঝোলালেন।

ডঃ শুস্‌নিগ্ চ্যান্সেলার হবার পর আধা-ফ্যাসিস্ট Heimwehr (বেসামরিক বাহিনী)-এর প্রধান স্টারেমবার্গ (Staremberg)-এর ক্ষমতা কেড়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। কোন ডিক্টেটারই একই প্রশাসনে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জরূপে অন্য কোন উঠতি প্রভাবশালী নেতা বা ব্যক্তিকে বরদাস্ত করতে পারেন না। সকল একনায়কতন্ত্র-শাসিত দেশে এই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ডঃ শুস্‌নিগ্ তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে এই Heimwehr-এর প্রতিনিধিদের ছেঁটে বাদ দিয়ে নিজের হাতে আরও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করলেন এবং প্রিন্স স্টারেমবার্গকে শেষ পর্যন্ত বরখাস্ত করলেন। শুস্‌নিগ্ ছিলেন জার্মান অনুরাগী আর স্টারেমবার্গ ছিলেন মুসোলিনির অনুরাগী। স্টারেমবার্গ ছিলেন তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

শুস্‌নিগ্ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন, কিন্তু মতবাদ বা কর্মসূচী-ভিত্তিক

কোন দল তিনি তৈরী করেননি। তিনি পুলিশের সাহায্যে শাসন চালাচ্ছিলেন। দেশের সোস্থালিস্ট ও কমিউনিস্টরা নতুন রণকৌশল গ্রহণ করলেন। দুই দলের যুক্তফ্রন্ট ( United Front ) রচিত হল। সোস্থালিস্ট পার্টির নতুন নামাকরণ হল "Revolutionary Socialists of Austria"। তারা নতুন ও ব্যাপক প্রচার-অভিযানে নামলেন। সরকারী নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই লাখ লাখ ইস্তাহার-পুস্তিকার মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের মতবাদ প্রচার স্বরু করলেন। দৈনিক সোস্থালিস্ট পত্রিকা Arbeiter Zeitung আবার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে আত্মপ্রকাশ করল।

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে জার্মানীর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। শুস্‌নিগ্‌ ও বিশেষ রাষ্ট্রদূত ভন্‌ প্যাপেনের উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তির দ্বারা দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ককে স্বাভাবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ করার চেষ্টা হল। জার্মানী অস্ট্রিয়ার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিল। এই চুক্তির অন্যতম সর্ত অনুযায়ী অস্ট্রিয়ার যেসব নাৎসীদের বৈরিতামূলক ও হিংসাত্মক কাজের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। শুধু তাই নয়, অস্ট্রিয়ার নাৎসীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব দেবার কথাও অস্ট্রিয়ার সরকার স্বীকার করেছিলেন ( Austro-German Agreement of July 11, 1936 )। এই চুক্তির বিপজ্জনক সর্তগুলি প্রকারান্তরে অস্ট্রিয়ার সার্বভৌমত্বের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল, হিটলারের পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণে সাহায্য করেছিল জাতির অলক্ষ্যে।

অস্ট্রিয়া যাতে ফ্যাসিস্ট ইতালীর খপ্পরে না পড়ে তার জন্য এই ধরনের চুক্তির আগ্রহ জার্মানী সেদিন দেখিয়েছিল। জার্মান কূটনীতি সফলও হয়েছিল পরিপূর্ণভাবে।

চুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে অস্ট্রিয়ার নাৎসী দল হিংসা ও সংগ্রামের রাজনীতি আরও জোরদার করল। জার্মান সরকার অর্থ দিয়ে তাদের সক্রিয় সাহায্য করতে লাগল। প্রায় প্রতিদিনই নাৎসীরা দেশের একটা না একটা অঞ্চলে সশস্ত্র বিক্ষোভ ও শোভাযাত্রা সংগঠিত করে জনজীবনকে ভীত ও ত্রস্ত করে তুলছিল। সরকারী পুলিশ নাৎসীদের গোপন ঘাঁটিতে হানা দিয়ে এমন সব দলিল কাগজপত্র উদ্ধার করল, যা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল তলে তলে জার্মানীর সহযোগিতায় নাৎসীরা অস্ট্রিয়ায় বিদ্রোহ করবে ১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি। চারিধারে তারই উদ্যোগ-আয়োজন চলছিল।

১৯৩৬ সালের অস্ট্রো-জার্মান চুক্তিতে হিটলারের আশা পূর্ণ হয়নি।

কেননা তিনি গোটা অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করতে চান। ভন্ প্যাপেনকে দিয়ে চ্যান্সেলার ডঃ শুস্‌নিগ্‌কে জানালেন যে, জার্মান চ্যান্সেলার অস্ট্রিয়ার আচরণে খুবই ক্ষুব্ধ এবং দুই চ্যান্সেলারের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি গড়ে উঠেছে সেটা দূর করার জন্য দু'জনের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়া দরকার। জার্মানীতে বারচেস্‌ট্ গ্যাডেন-এ ১২ই ফেব্রুয়ারী দু'জনের সাক্ষাৎ হবে স্থির হল। ডঃ শুস্‌নিগের কাছে হিটলার নানা কল্পিত অভিযোগ তুলে অস্ট্রিয়ার 'অপরাধ' প্রমাণ করতে চাইলেন। হিটলার কেবল হুমকীর পর হুমকী দিতে লাগলেন। সুস্পষ্ট ভাষায় জানালেন, তাঁর মতে সায় দিয়ে তাঁর দাবী পূরণ যে না করবে তাকেই তিনি ধ্বংস করবেন। "Who is not with me will be crushed......I have only to give an order and in one single night all your ridiculous defence mechanisms will be blown to bits"—আমি যদি নির্দেশ দিই তাহলে নিমেষের মধ্যে অস্ট্রিয়ার যাবতীয় প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

[ স্তালিন যুগোশ্লাভ-বিপ্লবের অন্যতম বর্ণাঢ্য নেতা মিলোভান জিলাসকে অনুরূপ দম্ভোক্তি করে বলেছিলেন : "I will shake my little finger and Tito will fall"—আমার সামান্য অঙ্গুলি হেলনেই টিটো ধরাশায়ী হবেন। টিটো যেন বুঝে-সুঝে চলেন। ( Conversations With Stalin By Milovan Djilas. ) ]

কিছুক্ষণ উত্তপ্ত পরিবেশে আলোচনার পরই এই চুক্তির খসড়া ডঃ শুস্‌নিগের কাছে স্বাক্ষর করার জন্য উপস্থিত করা হল। এই চুক্তিতে বলা হল অস্ট্রিয়ার নাৎসী দলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে, সকল নাৎসীদের কারামুক্তি দিতে হবে, যাদের আদালতে শাস্তি হয়েছে তাদের ক্ষমা করতে হবে। নাৎসী-পন্থী ভিয়েনার আইনজীবী Dr. Seyss Inquartকে অস্ট্রিয়ার পুলিশ বিভাগের মন্ত্রী নিয়োগ করতে হবে; আর একজন নাৎসী অনুরাগী Glaise Horstenauকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং Dr. Fischboeckকে অর্থমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করতে হবে। ইনিও ছিলেন নাৎসী-পন্থী। তাছাড়া অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর সেনাবাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। জার্মান সেনাবাহিনীর অফিসাররা অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হতে পারবেন পারস্পরিক ভিত্তিতে। এই জার্মান চরমপত্র মেনে নেবার অর্থই হল অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতার অপমৃত্যু। এই রকম অপমানজনক চুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভীতিপ্রদর্শন ও

যুদ্ধের হুমকীর কাছে নতি স্বীকার করতে হল। দুর্বলকেই ইতিহাসে যুগে যুগে এইভাবে প্রবলরা ভীতিপ্রদর্শন করে যুদ্ধের হুমকী দিয়ে পদানত করে এসেছে।

হিটলার তাঁকে মোট ৬ দিনের সময় দিয়েছিলেন—'হ্যাঁ' কি 'না' উত্তর জানাবার জন্য। হিটলার বলেছিলেন, এই প্রস্তাবে রাজী না হলে জার্মান সেনাবাহিনী অস্ট্রিয়া দখল করবেই। কেউ রুখতে সাহস পাবে না। ইংলণ্ড বা ফরাসী দেশ অস্ট্রিয়াকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসবে না। অস্ট্রিয়ার ভরসা মুসোলিনি—আর ভরসা ব্রিটিশ ও ফরাসী জাতির সমর্থন। ইংরাজ ও ফরাসীরা যদি অস্ট্রিয়ার পক্ষ না নেয় তাহলে কার ওপর নির্ভর করে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে সে লড়াই করবে?

যুদ্ধের হুমকীতে ডঃ শুস্‌নিগ্‌ ভীত হয়ে পড়লেন। স্বদেশে ফিরে এসে পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকলেন। পার্লামেণ্ট এই চুক্তি অনুমোদন করে আত্মহননের পথ বেছে নিল। এমনি করেই স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়ার বুকে রুশ দখলকার বাহিনীর বে-আইনী উপস্থিতিকে (১৯৬৮ আগস্ট) চেক্‌ পার্লামেণ্ট (কমিউনিস্ট সরকার) অনুমোদন করেছিল। অস্ট্রিয়ার পার্লামেণ্টে চ্যান্সেলার ঘোষণা করলেনঃ জার্মানী যেন আর কোন দাবী কখনও না করে—এই শেষ। এর বেশি কিছু দাবী করলে দেশবাসীর মৃতদেহের উপর দিয়ে গিয়ে তা পেতে হবে।

ডঃ শুস্‌নিগ্‌ স্থির করলেন, দেশে একটি গণভোটের ব্যবস্থা করে "স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্ট্রিয়ার" পক্ষে দেশবাসীর রায় নেওয়া হোক। তিনি যে সোস্যালিস্ট-দলের অগণিত নেতা ও কর্মীদের প্রাক্তন চ্যান্সেলার কারারুদ্ধ করেছিলেন তাদের সমর্থনের আশায় নাৎসীদের সঙ্গে তাদেরও কারামুক্তির নির্দেশ দিলেন। সোস্যালিস্টরা ডঃ শুস্‌নিগ্‌কে জানাবেন—নাৎসীদের আগ্রাসী রাজনীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু ১৯৩৬ সালের জুলাই-চুক্তি দ্বারা তিনিই সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করে রেখেছিলেন। গণভোটের প্রস্তাবের কথা শুনে হিটলার ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তিনি তাঁর বিশেষ দূতকে জানিয়ে দিলেন অবিলম্বে গণভোট যেন বন্ধ করা হয়। অন্যথায় জার্মান সেনাবাহিনী অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করবে। যুদ্ধ ও রক্তক্ষয় এড়াতে আগ্রহী ডঃ শুস্‌নিগ্‌ গণভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিলেন। হিটলারের বিশেষ দূত সে খবর জার্মান সরকারকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন। ডঃ শুস্‌নিগ্‌ ভাবলেন বোধ হয় এ যাত্রায় রেহাই পাওয়া গেল। কিন্তু অস্ট্রিয়ার নাৎসীরা প্রকাশ্যেই অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী তো হিটলারের নিজের অনুগত ব্যক্তি। তাছাড়া

অর্থমন্ত্রীও নাৎসী সমর্থক এবং হিটলার মনোনীত ব্যক্তি। ডঃ শুস্‌নিগের এই নতি স্বীকারে ব্ল্যাক্‌মেল-এর রাজনীতিতে সিদ্ধহস্ত হিটলার সাথে সাথে দাবী করলেন চ্যান্সেলার শুস্‌নিগ্‌কে এখনি পদত্যাগ করতে হবে এবং তাঁর জায়গায় Dr. Seyss Inquartকে (নাৎসীপন্থী পুলিশমন্ত্রী) নিয়োগ করতে হবে। টেলিফোনে এই দাবীর কথা জানান হল—আর দু'ঘণ্টার মধ্যে এই দাবী কার্যকরী করা চাই। হিটলারের আরও নির্দেশ, সীস্‌ ইনকোয়ার্ট (Seyss Inquart) বার্লিনে জরুরী টেলিগ্রাম যেন পাঠান অস্ট্রিয়ায় দারুণ অরাজকতা দেখা দিয়েছে জানিয়ে এবং জার্মান সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে। সেই দিনই হিটলারের বিশেষ দূত উইলহেলম্‌ কেপলার (Wilhelm Keppler) বার্লিন থেকে ভিয়েনায় এসে পৌছান। অস্ট্রিয়ার অবস্থা সম্পূর্ণ শান্ত। মিথ্যা কাল্পনিক অরাজকতার কাহিনী আবিষ্কার করে টেলিগ্রাম যথারীতি পাঠান হল জার্মান সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে। ডঃ শুস্‌নিগ্‌ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট Miklas তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন বটে, তবে তিনি Seyss Inquartকে দেশের চ্যান্সেলাররূপে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। চাপের কাছে কিছুতেই তিনি নতি স্বীকার করবেন না। তাঁর এই মনোভাবের কথা Seyss Inquart ফিল্ড-মর্শাল গোয়েরিংকে জানিয়ে দিলেন সেইদিনই। গোয়েরিং অনেক হুমকী ও ভয় দেখালেন। ফোনে বলা হল "Austria will cease to exist"। কিন্তু প্রেসিডেন্ট Miklas তাঁর সিদ্ধান্তে অটল।

এর পরই দ্বিতীয় চরমপত্র পাঠান হল প্রেসিডেন্টের কাছে জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে। এবার দাবী কার্যকর করার সময়-সীমা একঘণ্টা। এদিকে অস্ট্রিয়ার নাৎসী দল তাদের সমর্থকদের দিয়ে রাস্তা-ঘাটে অবরোধ রচনা সুরু করে দিয়েছিল। শোভাযাত্রা করে নাৎসীরা দাবী করছিল 'শুস্‌নিগের ফাঁসি চাই'। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই উচ্ছৃঙ্খলতা, নাৎসীদের উন্মত্ত তাণ্ডব দেখছিল। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর প্রচণ্ডতম আঘাত আসছে দেখেও দেশে কমিউনিস্ট বা সমাজতন্ত্রী অথবা উদারপন্থী গণতন্ত্রীদের কোন বিদ্রোহের লক্ষণমাত্র পরিদৃষ্ট হয়নি। পুলিশ প্রশাসনও দেশের স্বাধীনতার গঙ্গাযাত্রার নীরব দর্শক হয়ে রইল। ইতিহাসে বিনাযুদ্ধে এক ইঞ্চি দেশের মাটিও ছেড়ে দেয়নি শক্তিশালী রাষ্ট্রের কাছে এমন দৃষ্টান্ত যেমন আছে—তেমনি আবার গৃহযুদ্ধ-রক্তপাতের ভয়ে গোটাদেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার দৃষ্টান্তও রয়েছে।

গোয়েরিং নির্দেশ দিলেন একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হোক Dr. Syess

Inquart-এর নেতৃত্বে, আর সেই অস্থায়ী সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জার্মান সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ দাবী করুক। টেলিগ্রাম অর্ডার মাফিক পাঠান হল :

**The Provisional Austrian Government·· considers it its task to establish peace and order in Austria, sends to the German Government the urgent request to support it in the task and to help it to prevent bloodshed. For this purpose it asks the German Government to send German troops as soon as possible.**

একটি স্বাধীনদেশের আভ্যন্তরীণ কাল্পনিক বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য আর একটি বিদেশী রাষ্ট্র তার সেনাবাহিনী পাঠাবে কোন আন্তর্জাতিক রীতি বা আইনের ভিত্তিতে? হিটলার তো জার্মান পার্লামেণ্টে সুস্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, জার্মানীর ভৌগোলিক সীমানার বাইরে চেকোশ্লোভাকিয়া ও অস্ট্রিয়ায় যে এক কোটী জার্মান বাস করছে তাদের 'মাতৃভূমির' সঙ্গে অঙ্গীভূত হবার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। ঈশ্বর তাঁকে সেই মহান 'মিশন' পূর্ণ করার জন্যই জার্মান জাতির নায়ক করে পাঠিয়েছেন। গ্রেট ব্রিটেন, ফরাসীদেশের ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ ও ইউরোপের বামপন্থীরা কেন আসন্ন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে এলেন না? চেকোশ্লোভাকিয়াই বা কেন নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল সেদিন? চেক-রাষ্ট্রনেতাদের ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির বোঝা উচিত ছিল যে, অস্ট্রিয়া জার্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলে চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্তের তিনদিক জার্মানী কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকবে চিরতরে এবং সে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব একদিন বিপন্ন হবে, যদি অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। বামপন্থীদের বিশ্ব-বিপ্লব-বাদীদের বিপ্লবীদর্শন কেন তাদের সংগ্রামের সঙ্কল্পে সঙ্ঘবদ্ধ করল না? কেনই বা রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও জার্মানীকে বাধা দিল না? ১৯৩৬ সালের জুলাই-চুক্তি ও ১৯৩৮ সালের বারচেট্‌স্‌-গ্যাডেন চরমপত্র থেকে কি ইউরোপের রাজনীতিবিদরা বোঝেননি অস্ট্রিয়ার আয়ু ফুরিয়ে আসছে?

চেম্বারলেন ফ্যাসিস্ট তোষণনীতি ছাড়বেন না। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব এণ্টনী ইডেন এই নীতির প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে দ্বিধা করলেন না। শেষ মুহূর্তে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার ফাঁকা প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হলেন। অস্ট্রিয়ার শেষ ভরসা মুসোলিনি। তিনিও সাফ জানিয়ে দিলেন

অস্ট্রিয়ার ব্যাপারে তাঁর কিছুই করার নেই। হিটলার মুসোলিনিকে কিছু লুটের বখরা দেবেন স্থির করেই রেখেছিলেন। চতুর মুসোলিনি সেটা বুঝেই আর গণ্ডগোলের মধ্যে নিজের দেশকে জড়াতে চাননি। মুসোলিনিকে হিটলার জানিয়েছিলেন 'ব্রেনার পাশ'ই হচ্ছে ইতালী ও জার্মানীর সীমানা। অবস্থা বুঝে অস্ট্রিয়ার শক্ত জেদী প্রেসিডেণ্টও নতি স্বীকার করলেন—Dr. Seyss-Inquartকেই চ্যান্সেলার করতে রাজী হলেন।

অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেণ্ট ও চ্যান্সেলার জার্মান আচরণের আনুপূর্বিক বিবরণ ব্রিটিশ সরকারকে অবহিত করেও কোন সহযোগিতার সাড়া পাননি। ইতিহাসে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের এই আচরণ চরম ও নির্মম বিশ্বাস-ঘাতকতারূপেই ধিক্কৃত হবে। প্রেসিডেণ্ট মিকলাস যখন বুঝলেন 'গণতান্ত্রিক শিবির' থেকে কোনরকম সক্রিয় সাহায্যই তিনি বা তাঁর সরকার পাবেন না, তখনই তিনি আত্মসমর্পণের পথ বেছে নিলেন। Dr. Inquart তাঁর মন্ত্রিসভা মনোমত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠন করলেন। এর পর অস্ট্রিয়া ও জার্মানীতে দুই দেশের পূর্ণ মিলনের প্রস্তাবের উপর—'আন্‌সলুশ্‌' ( Anschluss ) 'গণ ভোটের' ( Plebisite ) প্রস্তাব করলেন ডঃ গেবলস। রক্তপাতের ভয়ে বিনাযুদ্ধে অস্ট্রিয়া তার স্বাধীনতা বিকিয়ে দিল—আবার বিনা যুদ্ধে টেলিফোনের হুমকী, যুদ্ধের ভয়াল বিভীষিকার হুমকী দিয়ে জার্মানী অস্ট্রিয়াকে গ্রাস করল। হিটলার অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেণ্ট হলেন। এর পর এক নূতন সংবিধান রচনা করে অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর একটি 'প্রদেশ'রূপে ঘোষণা করা হল। [ স্বাধীন তিব্বতকে চীনদেশ গ্রাস করে সেই বিশাল দেশকে কমিউনিস্ট চীনের ভূখণ্ড ( Region of China ) বলে ঘোষণা করেছিল। ] ১০ই এপ্রিলের গণভোটে হিটলারের অভিলাষই পূর্ণ হল। ডঃ শুস্‌নিগ্‌কে গ্রেপ্তার করা হল এবং মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে তাঁকে হিটলারের বন্দীশিবির থেকে মুক্ত করেন। অস্ট্রিয়া ধর্ষণের সময় ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাশিয়ার মনোভাব থেকে বিশেষ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মনোভাব থেকে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের প্রেরণা সঞ্চয় করেছিলেন। ব্রিটিশ, ফরাসী ও রুশ সরকারের এই তোষণনীতি ইউরোপে এক ভয়াবহ শোণিতস্রাবী পরিস্থিতিরই সূচনা করল।

রাজনীতির ছাত্রদের কাছে একটা কথা বার বার এসে বাজবে : সচেতন উন্নত জীবনের মানসম্পন্ন শ্রমিক-কর্মচারী-বুদ্ধিজীবীরা জাতির সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কেন লড়াই-এর পথে নেমে এলেন না? তাহলে

কি উন্নত জীবনের মান, উন্নত শিক্ষা, দেশের বৈষয়িক উন্নতি-স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে স্বাধীনতা ও জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধগুলির প্রতি শ্রদ্ধা বা আকর্ষণের কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই? যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে—যারা দুঃসহ দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে উন্নতির সোপান বেয়ে ওপরে উঠে যায়, দেশের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার এগুলির প্রতি কি তাদের আকর্ষণ কমে যায়? বৈষয়িক স্বার্থপরতা মহৎ জলন্ত আদর্শবাদের অভাব কি—যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তেমনি জাতির ক্ষেত্রেও—জাতির আত্মহত্যার পথ রচনা করে না? রুটি-মাখনের দৃষ্টিকোণসর্বস্ব জীবনদর্শন কি কোন জাতিকে স্বাধীনতা গণতন্ত্র সৌভ্রাতৃত্ব সাম্য জাতিসত্তার অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পারে? স্বাধীনতা সাম্য সৌভ্রাতৃত্ব গণতন্ত্র ন্যায়বিচারের বিমূর্ত বস্তু-নিরপেক্ষ শাশ্বত গুণাবলীর প্রতি প্রগাঢ় আবেগই যুগে যুগে ব্যক্তি ও জাতিকে সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আঁধারের বুকে ঝাঁপ দিতে প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। ভিয়েনা নগরীর শ্রমিক-শ্রেণীর জন্য সোস্যালিস্টরা অনেক কিছু করেছিলেন। আগেই বলেছি সে-যুগে ভিয়েনার পৌর শাসন পৌর সমাজতন্ত্রের মডেল বলে পরিগণিত হয়েছিল। শুধু যে তাদের জীবন ধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ব্যবস্থাই সোস্যালিস্টরা করেছিলেন তাই নয়—তাদের আরাম, বিলাস ও প্রভূত স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও করেছিলেন। তবে কেন এই শ্রমিক-শ্রেণী জাতির এই অবমাননার বিরুদ্ধে সর্বস্বপণ করে রুখে দাঁড়াল না? 'ফেব্রুয়ারীর গৃহযুদ্ধের' সময় যে-শ্রমিকশ্রেণী Heimwehr-এর বিরুদ্ধে অমিত বিক্রমে সংগ্রাম করতে এগিয়ে এসেছিল, তারা জাতির এই চরম সঙ্কটের মুহূর্তে কেনই বা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্র ধারণ করল না? প্রলিটেরিয়েট-শ্রেণীর এই আচরণ ও ভূমিকা কি মার্কসীয় রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ? ভাববাদী আদর্শের মদিরা পানে পাগল স্বার্থত্যাগী মানুষই পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিরুপদ্রব নিরাপদ জীবনের মোহজাল ছিন্ন করে 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে আঁধারের বুকে ঝাঁপ দিতে পারে। মাগগী ভাতা, বর্ধিত বোনাস, কাজে ফাঁকি, কম উৎপাদন দিয়ে পুরো বেতন আদায়ের 'বিপ্লবী-চেতনা' দিয়ে পাইয়ে দেবার রাজনীতিতে বিশ্বাসী ও প্রলুব্ধ মানুষ কখনই সে লড়াইয়ের সামিল হতে পারে না। রাজনৈতিক দল ও নেতার কাজ হবে সেই ভাববাদী প্রেরণাদায়ী আদর্শের জন্য জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধের অনুসরণ ও সংরক্ষণের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ ও সহজাত আবেগ সঞ্চারণে সাহায্য করা।

যে-জাতি স্বাধীনতা গণতন্ত্র সামাজিক ন্যায় বিচার—সাম্য রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে তার জীবনদর্শনের অঙ্গীভূত করে তারই সচেতন নিরলস অনুসরণ ও সংরক্ষণকে দৃঢ় অঙ্গীকাররূপে গ্রহণ করতে না শেখে সে-জাতি প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না।

আগেই বলেছি অস্ট্রিয়ার রাজনীতি তিনটি বিভিন্ন শক্তির সংঘাতে বিধ্বস্ত ছিল। আধা-ফ্যাসিস্ট ও কমিউনিস্ট সোস্যালিস্টদের গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়েছিল নাৎসী দল। যদি 'ব্ল্যাক' ও 'রেড' সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারত তাহলে নাৎসীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতো। ডঃ ডলফাস্ ও ডঃ শুস্নিগ্ দু'জনেই সোস্যালিস্টদের 'বড় শত্রু' বলে মনে করেছিলেন এবং মুসোলিনির কু-মতলবের ফাঁদে পা দিয়ে সমাজতন্ত্রীদের পর্যুদস্ত করে হিটলারের অভিলাষ পূরণে সাহায্য করেছিলেন। ডঃ শুস্নিগ্ একথা পরে বুঝেছিলেন এবং তাঁর নীতি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তাও স্বীকার করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে দক্ষিণপন্থী Heimwehr ও বামপন্থী Schutzbund সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারত। [The Brutal Takeover—By Kurt Von Schuschnigg: Translated by Richard Barry Weidenfeld and Nicolson.]

Anschluss-এর স্বপক্ষে সোস্যালিস্টরা এক সময় উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিলেন। অস্ট্রিয়া জার্মানীর অঙ্গীভূত হলে জার্মান-বিপ্লবের (German Workers' Revolution) অংশীদার হতে পারবে—অস্ট্রিয়ার সোস্যালিস্টদের এই আশা ছিল। অবশ্য দক্ষিণপন্থীরা (Heimwehr) এই Anschluss-এর পক্ষে বড় একটা ছিল না। ১৯১৮ সালে অস্থায়ী জাতীয় পরিষদে (Provisional National Assembly) সোস্যাল ডেমোক্রাটদের নেতা ডঃ কার্ল রেনার (Dr. Karl Renner) ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন:

"The German-Austrian Republic is an integral part of the German Republic; this is essential because of the race to which we belong……we are a single race a community in face of destiny"

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে শুধুমাত্র নাৎসীরাই এই অস্ট্রিয়া-জার্মানীর একীকরণের পক্ষেই ছিলেন না, জনগণের একটি অংশ ও এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। হিটলার তার পুরো সুযোগ নিয়েছিলেন। সোস্যালিস্টরা যখন দেখলেন জার্মানীতে 'সর্বহারার শ্রেণী-বিপ্লব' সফল হল না এবং সে জায়গায় হিটলার ও তাঁর দল ক্ষমতাসীন হলেন তখনই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা সুরু করে দেন।

১৪

## চেকোশ্লোভাকিয়ার ধর্ষণ

অস্ট্রিয়ার পর এবার এল চেকোশ্লোভাকিয়ার পালা।

১৯৩৭ সালের ২৪শে জুন হিটলার ফিল্ড-মার্শাল ভন্ ব্লমবুর্গ রচিত পরিকল্পনা অনুযায়ী চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করে গ্রাস করার গোপন সিদ্ধান্ত নেন। খুব ক্ষিপ্রগতিতে এই আক্রমণের কাজ শেষ করার মতলব আঁটলেন। তবে হিটলার কোন অজুহাত না দেখিয়ে আক্রমণ করে একটি রাজ্য দখল করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ব্লমবুর্গের সঙ্গে তাঁর এ ব্যাপারে মত পার্থক্য ঘটেছিল। তিনি জনমতকে সরাসরি বিক্ষুব্ধ করার পক্ষে ছিলেন না। আক্রমণের আগে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে যাতে সেই সৃষ্ট কৃত্রিম পরিস্থিতিকে অজুহাতরূপে ব্যবহার করে আক্রমণ চালান যায়। সেটাই ছিল তাঁর অন্যতম কৌশল। এতে বিশ্ব-জনমতকে বিভ্রান্ত করার সুযোগও থাকত। তাঁর অপর একটি কৌশল এই ছিল যে, আক্রমণের প্রথম অবস্থাতেই আক্রান্ত রাজ্যকে ধরাশায়ী করতে হবে। সংঘর্ষ দীর্ঘমেয়াদী হলেই ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, রাশিয়া—বিভিন্ন রাষ্ট্র মধ্যস্থতা করতে আসার সুযোগ পাবে অথবা যুদ্ধে আক্রান্তের পক্ষ নিয়ে নিতে পারে। এই পাল্টা-আক্রমণের ভয় হিটলারের বরাবরই ছিল। আক্রমণকে কেন্দ্র করে কোন আন্তর্জাতিক সঙ্কট সৃষ্টি হোক এটা হিটলার কখনই চাইতেন না।

চেকোশ্লোভাক প্রজাতন্ত্রকে নাৎসী নেতা ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। তাঁর আরও আক্রোশের কারণ চেকোশ্লোভাক রাষ্ট্র কুখ্যাত ভার্সাই চুক্তির ফলশ্রুতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯১৮ সালে এই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এই নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে দু'জন প্রখ্যাত চেক বুদ্ধিজীবীর অবদান অনস্বীকার্য। একজন হলেন গ্যারীগ্ মাস্যারিক ( Garrigue Masaryk ), অপরজন ডঃ এডুয়ার্ড বেনেস ( Eduard Benes )। মাস্যারিকের পিতা ছিলেন একজন ঘোড়ার গাড়ির চালক আর বেনেসের পিতা ছিলেন একজন কৃষক। চেকোশ্লোভাক রাষ্ট্র ছিল মধ্য-ইউরোপের অন্যতম প্রগতিশীল উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

হাপ্‌স্‌বুর্গ সাম্রাজ্যের কিছু অংশ দিয়ে এই নূতন রাষ্ট্র তৈরী হল। এই নূতন রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির মানুষ ছিল। যেমন, হাঙ্গেরীয়, সুদেতেন জার্মান, শ্লোভাক। প্রায় দশ লক্ষ হাঙ্গেরীয় ছিলেন, পাঁচ লক্ষ রুমেনিয়া জাতিভুক্ত ইত্যাদি। যদিও নতুন রাষ্ট্রে প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ কৃষ্টি শিক্ষাপদ্ধতি ভাষা বাঁচিয়ে রাখায় নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তবুও এইসব জাতি তাদের মাতৃভূমিরূপে চেকোশ্লোভাকিয়াকেই মনে করত না। জাতির ইতিহাসে এটা ছিল একটা বড় ট্র্যাজেডি। ফলে এই দেশের নানা আভ্যন্তরীণ সমস্যা রয়েই গেল। তারা আবার স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্বশাসন দাবী করতেও দ্বিধা করেনি। হিটলার এই সুযোগে সুদেতেন জার্মানদের জন্য ইস্তাহার বিলির ব্যবস্থা যেমন করলেন, সেই সঙ্গে চেক-সরকারকে হুমকী দেওয়াও সুরু করলেন। শ্লোভাক জাতি ছিল মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। তারাও স্বায়ত্বশাসন দাবী করছিল। যদিও ভাষা ও রক্তের দিক থেকে তারা চেক-জাতিরই বেশী কাছাকাছি ছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ায় তাই সংখ্যালঘু সমস্যাটি খুব জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। মন্ত্রিসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল, তবু তারা সন্তুষ্ট ছিল না। আরও অধিকার চাইছিল। তাদের পূর্ণ ভোটাধিকারও ছিল।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় সুদেতেনে জার্মানরা নাৎসী দলের প্রেরণায় সংগঠিত হয় Sudetan German Party (SDP) কন্‌র্যাড হেনলীনের (Konrad Henlein) নেতৃত্বে। জার্মান সরকার থেকে গোপনপথে মাসোহারার টাকা তারা নিয়মিত পাচ্ছিল। সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা এই পার্টির আওতার বাইরে ছিলেন। হেনলীন বার্লিনে এসে হিটলার, রিবেনট্রপ ও হেস-এর সঙ্গে ২৮শে মার্চ (১৯৩৮) দেখা করে জেনে নিলেন সুদেতেনে জার্মান পার্টি কিভাবে এগুবে। বলা হল, এই দল এমন সব দাবী চেক-সরকারের কাছে উত্থাপন করবে যা সেই সরকার মেনে নিতে পারেন না। তখন জার্মান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চরম দুর্গতি। এই সমস্যার আশু সমাধানের প্রশ্নটিকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে। হিটলার তাঁর ফরমুলা মাফিক ধাপে ধাপে এগুচ্ছিলেন। এদিকে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার নীরব দর্শক রইলেন। চেম্বারলেন ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়্যের ধরে নিলেন হিটলার সত্যি-সত্যি জার্মান সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা করতে চাইছেন এবং তাঁর কোন অসৎ উদ্দেশ্য নেই। শুধু তাই নয়, এই দুই সরকার চেক-সরকারের ওপর চাপ দিতে লাগলেন সুদেতেনে জার্মানদের জন্য সুযোগ-সুবিধা ও দাবী আদায়ের ব্যাপারে।

ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের এই ঘৃণ্য আচরণে হিটলার খুব খুশি হলেন না। তাঁর সাম্রাজ্যলিপ্সা বরং আরও বৃদ্ধি পেল।

সুদেতেন সঙ্কটকে কেন্দ্র করে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। হিটলার এইটাই চাইছিলেন ধাপে ধাপে এগুবার কৌশল হিসাবে। ১৯৩৮ সালের মে মাসে একদিকে এই জোর কূটনৈতিক তর্ক-বিতর্ক চলছিল যখন, তখন জার্মানী তলে তলে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের তোড়জোড় চালাচ্ছিল। অস্ট্রিয়া গ্রাসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সব কূটনৈতিক তৎপরতা ব্রিটিশ, ফরাসী ও রুশ সরকারকে আশ্বস্ত করতে পারেনি জার্মানীর মতলব সম্বন্ধে। জেনারেল কাইটেল হিটলারকে পরামর্শ দিলেন এমন একটি গুরুতর ঘটনা ঘটার সুযোগ দিতে হবে, যে ঘটনা স্বভাবতই জার্মান জাতির এবং বিশ্ববাসীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের কাছে অত্যন্ত প্ররোচনামূলক বলে প্রতীয়মান হবে। মনে হবে এইরূপ প্ররোচনার মুখে কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতির পক্ষে মুখ বুজে চুপ করে থাকা সম্ভবই নয় আর এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশকে চতুরভাবে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎবেগে আক্রমণ করে ৪ দিনের মধ্যে যুদ্ধপর্ব সমাধা করতে হবে। কাইটেল-এর এই প্রস্তাবটি রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হিটলারের কাছে। হিটলার ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী যাতে কোনমতে জার্মানীর বিরুদ্ধে চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষ নিতে না পারে সে বিষয় বিশেষ সজাগ রইলেন।

হিটলারের উদ্দেশ্য গোপন রইল না। অভিযোগ উঠল জার্মানী চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের আয়োজন করছে। জার্মানীকে সতর্ক করে দেওয়া হল যে, এই ধরনের কোন আক্রমণ হলে চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমানার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে না, গোটা ইউরোপে সেই যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়বে। ক্রুদ্ধ হিটলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে দেখে ঘোষণা করলেন যে, চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের কোন অভিপ্রায়ই তাঁর নেই এবং চেক-সীমান্তে জার্মান সৈন্য সমাবেশের অভিযোগটি সম্পূর্ণ অসত্য। এদিকে চেকোশ্লোভাক সরকারও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সীমান্ত বরাবর সামরিক তৎপরতা সুরু করলেন। অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি হিটলারের আশ্বাসবাণীকে আপাতমূল্যে গ্রহণ করে চুপ করে রইল। হিটলার রিবেনট্রপ, কাইটেল, গোয়েরিংকে জানিয়ে দিলেন তাঁর অপরিবর্তনীয় সঙ্কল্প: সামরিক শক্তির ঘায়ে চেকোশ্লোভাকিয়াকে তিনি নিশ্চিহ্ন করবেন। ("It is my unalterable decision to smash Czecho-Slovakia by military

action in the near future."—Hitler )। ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও দ্বিধাগ্রস্থতার ওপর হিটলার অনেকটা নির্ভর করেই একটার পর একটা পরিকল্পনা ভাঁজছিলেন। ব্রিটিশ সরকার কখনই চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে আসবে না। ফ্রান্স এবং রাশিয়া হয়ত আংশিকভাবে আসতে পারে, এই ছিল হিটলারের অনুমান।

চেকোশ্লোভাকিয়াকে কেন্দ্র করে এবং তার বুকের ওপরই দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের প্রথম মহড়া হবে এটা ইউরোপের অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই ইউরোপীয় শক্তিগুলি নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক অনাক্রমণের চুক্তি সম্পাদন করে জোট বাঁধছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে ফ্যাসিবিরোধী রাষ্ট্রগুলি জোট বেঁধেছিল। চেকোশ্লোভাক নেতা এডুয়ার্ড বেনেস মস্কো ছুটলেন রুশ-চেক পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তির জন্য। এই চুক্তি শুধুমাত্র নেতিবাচক অনাক্রমণ চুক্তি নয়, পারস্পরিক রক্ষা ও সহযোগিতার মৈত্রীচুক্তি ( mutual assistance treaty )। চুক্তিবদ্ধ যে কোন একটি রাষ্ট্র আক্রান্ত হলে অপর রাষ্ট্র সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। আবার রাশিয়ার সঙ্গে ফরাসী দেশের মধ্যেও অনুরূপ সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদিত হল। দুটি ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তির লক্ষ্য সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করা। সম্ভাব্য যুদ্ধে রাশিয়া ও ফরাসী দেশের মধ্যবর্তী স্থান চেকোশ্লোভাকিয়ায় অবস্থিত চেক বিমানঘাঁটিগুলির উপযোগিতা মস্কো ও প্যারিসের মার্কসবাদী ও বুর্জোয়া এবং সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি ও কূটনীতিবিদরা বুঝেছিলেন। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির উল্লেখ করছি এটা দেখাবার জন্য যে, আর কিছুর জন্য না হোক চুক্তির গাম্ভীর্য ও যথার্থতার তথ্য বিবেচনা করে যে পরিমাণ আন্তরিকতা ও গভীর আগ্রহ গাম্ভীর্য ও সামরিক কূটনৈতিক তৎপরতা মস্কো ও প্যারিসের দেখানো উচিত ছিল, তা আদৌ হয়নি। চুক্তি চুক্তিই রয়ে গেল। কাজে এলো না বিপদের মুহূর্তে। চুক্তির মর্যাদা রক্ষার আগ্রহ ও আন্তরিকতা থাকলে চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর নাৎসী আক্রমণ সম্ভবই হত না। কেননা হিটলারের সেনাপতিরা এরূপ আক্রমণের ঝুঁকি নিতে চাইছিলেন না। কেননা রুশ, ফরাসী ও ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে প্রত্যাক্রমণের ভয় খুবই ছিল। দুই ফ্রণ্টে লড়বার মত প্রয়োজনীয় শক্তি ও প্রস্তুতি জার্মানীর সেদিন ছিল না নিঃসন্দেহে। তাছাড়া জার্মানীর অভ্যন্তরে একশ্রেণীর পদস্থ সামরিক অফিসার, সিভিলিয়ান এই ধরনের হঠকারিতার বিরুদ্ধে ছিলেন।

সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল লুডউইগ্ বেক্ ( General Ludwig Beck ) এই আক্রমণের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিমতই শুধু ব্যক্ত করেননি, অন্যান্য সামরিক অফিসারদেরও সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন তাঁর অভিমতের স্বপক্ষে। অবশ্য হিটলার এই গোপন বিরোধিতাকে দানা বাঁধার বেশি অবকাশ দেননি। তিনি তাঁকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় জেনারেল হ্যালডারকে নিযুক্ত করলেন। হ্যালডার ছিলেন ব্যাভেরিয়ার একজন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিবের মুখ্য উপদেষ্টা স্যার রবার্ট ভ্যান্‌সিটার্ট ব্রিটিশ সরকারের হিটলার তোষণ-নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি জার্মানীর রাজধানী থেকে ফিরে এসে তাঁর সরকারকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের দিন-ক্ষণ স্থির করে ফেলেছেন, তাঁর সেনাপতি ও সমর বিশেষজ্ঞদের মতের বিরুদ্ধেই। যদি ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার প্রকাশ্যে ঘোষণা করে জানিয়ে দেন আক্রমণ হলেই এই দুই দেশ চেকোশ্লোভাকিয়ার সমর্থনে জার্মানীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাহলে হিটলারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। কেননা জার্মানীর সেনাবাহিনীর বড় বড় অফিসাররা হিটলারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন। ভ্যান্‌সিটার্ট উইনস্টন চার্চিলকেও এটা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং হিটলার তোষণ বন্ধ করার জন্য বিশেষ চাপ দিয়েছিলেন। সঙ্কট যখন ঘনীভূত হচ্ছিল, চেকোশ্লোভাকিয়ার দিকে যুদ্ধ যতই এগিয়ে আসছিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দ্বিধাগ্রস্ততা ততই বাড়ছিল। তিনি ১৯৩৮ সালের ৩রা আগস্ট লর্ড রুন্সিম্যানকে তাঁর বিশেষ দূত হিসাবে প্রাগে পাঠালেন চেক-সরকার ও সুদেতেন জার্মানীর মধ্যস্থতা করার জন্য।

সুদেতেন নেতা হেনলীন হিটলারের এজেন্ট ছিলেন। হিটলারের নির্দেশ মত তিনি কাজ করছিলেন। তাই হেনলীনের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারটা নিতান্তই হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ করতে কোনমতেই রাজী নয়, এটাই হিটলারের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। হিটলার আরও বুঝলেন জেনারেল বেক্ ও অন্যান্য সেনাপতিদের ব্রিটেন ও ফরাসী দেশের যুদ্ধ সম্পর্কে মনোভাবের মূল্যায়ন যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও কাল্পনিক। ইংরাজ জাতি চিরদিন পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার কৌশল প্রয়োগতত্ত্বে বিশেষ পটু। চেম্বারলেন অসত্য-ভাষণের আশ্রয় নিলেন। তিনি পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন চেক-সরকারের অনুরোধেই তিনি লর্ড রুন্সিম্যানকে পাঠিয়েছেন। চেকোশ্লোভাকিয়াও বুঝে নিল রুন্সিম্যান-দৌত্যের উদ্দেশ্যই হল

. বিনা রক্তপাতে সুদেতেন অঞ্চলকে জার্মানীর কাছে উপঢৌকনের পথ প্রশস্ত করা। রুন্সিম্যানের উপস্থিতিতে হেনলীন উৎসাহিত হলেন। তাঁর দাবী বেড়েই চলছিল। এদিকে কূটনৈতিক তৎপরতার আড়ালে আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করছিলেন জার্মান সরকার। হিটলারের বিরুদ্ধে যাঁরা বিদ্রোহের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের পায়ের তলার জমি সরে যেতে লাগল। শক্তের ভক্ত নরমের যম—সকল সম্প্রসারণবাদী সরকারের মতন ব্রিটিশ তোষণ-নীতি এইখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। চেম্বারলেন বার্লিনস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হেণ্ডারসনকে লণ্ডনে বিশেষ আলোচনার জন্য ডেকে পাঠালেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হেণ্ডারসনকে বোঝালেন যে, হিটলারকে মোলায়েম ভাষায় একটি বিনম্র হুঁশিয়ারী যেমন শোনাতে ছাড়বেন না, তেমনি তিনি অতি অবশ্যই হিটলারের সঙ্গে 'ব্যক্তিগত যোগাযোগ' স্থাপন করতেও যেন চেষ্টা করেন। হেণ্ডারসন হুমকী দেবার পথ পরিহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়ে বলেন। 'সোনায় সোহাগা'! হেণ্ডারসন ১৪ই জুলাই (১৯৩৮) লর্ড হ্যালিফ্যাকস্‌কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন:

"...If Benes can not satisfy Henlein, he can satisfy no Sudeten leader...we have got to be disagreeable to the Czecks." অর্থাৎ চেক-প্রেসিডেণ্ট এডুয়ার্ড বেনেস যদি হেনলীনের মত নেতাকেও সন্তুষ্ট করতে পারেন—তিনি কোন সুদেতেন জার্মানকেই সুখী করতে পারবেন না।...সেক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে চেকদের পথ নেওয়া সম্ভব হবে না। স্যার নেভিল হেণ্ডারসন বিশ্বাসই করেননি যে, হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া অভিযানে আদৌ নামতে পারেন। চেম্বারলেন যেভাবেই হোক শেষ পর্যন্ত জানতে পেরেছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রান্ত হতে চলেছে—দিন স্থির: ১লা অক্টোবর।

ইংলণ্ডের রক্ষণশীল জনমত কোন্ খাতে বইছিল সেটা বুঝতে হলে এই সময়ের 'দি টাইম্‌স্' পত্রিকার একটি বিশেষ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মন্তব্য থেকে তা বোঝা যাবে (The Times, 7th Sept. 1938)। এই প্রবন্ধে সরাসরি বলা হল চেকোশ্লোভাকিয়া সরকারের ভেবে দেখা দরকার ভিন্ন জাতি-অধ্যুষিত অপর দেশ-সংলগ্ন ছোট্ট একটি অঞ্চলকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে নিজের দেশকে একজাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার প্রস্তাবটা বাস্তববাদী ও গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ সুদেতেন অঞ্চলটিকে, যা জার্মান জাতি-অধ্যুষিত—জার্মানীকে দিয়ে দেওয়া

ভাল। এতে অনেক ঝামেলার অবসান হবে। বহু-জাতি-ভিত্তিক চেক রাষ্ট্রের অসুবিধা অনেক। তার জায়গায় যদি একজাতি-সংস্কৃতি-ভিত্তিক চেক রাষ্ট্র হয় তাতে সুবিধা অনেক বেশি। এইভাবে প্রকাশ্যে হিটলারের সাম্রাজ্যলিপ্সাকে উৎসাহ জোগান হল।

"It might be worthwhile for the Czechoslovak Government to consider whether they should exclude altogether the project which has found favour in some quarters, of making Czechoslovakia a more homogeneous State by the secession of that fringe of alien populations who are contiguous to the nation with which they are united by race···the advantages to Czechoslovakia of becoming a homogeneous State might conceivably outweigh the obvious disadvantages of losing the Sudeten-German district of the border land." [ The Times, 7th Sept. 1938 ]

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে আসছে দেখে এডুয়ার্ড বেনেস সুদেতেন-জার্মান দলের দুই প্রতিনিধিকে আলোচনার জন্য আহ্বান করলেন। তিনি স্থির করলেন তাঁদের দাবী তিনি মেনে নেবেন। প্রকৃতপক্ষে আলোচনার শেষে তাঁদের দাবীর সবটাই তিনি মেনে নিলেন। সুদেতেন-জার্মান দলের নাৎসী-পন্থী নেতা হেনলীন ধরেই নিয়েছিলেন তাঁর দাবী পুরোটা কখনই চেক সরকার মেনে নেবেন না। আর তখন তাঁর দল এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে জার্মানীকে আক্রমণের ইন্ধন জোগাবে।

এদিকে চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হিটলার ১২ই সেপ্টেম্বর নুরেমবুর্গে তাঁর পার্টির এক বিরাট জমায়েতের নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে চেকোশ্লোভাকিয়া সম্বন্ধে তিনি তাঁর চূড়ান্ত মতামত ব্যক্ত করবেন। সমগ্র ইউরোপের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল এই জনসমাবেশে হিটলারের ভাষণের ওপর। হিটলার তাঁর বক্তৃতায় সরাসরি যুদ্ধের কথাই বললেন না, সুদেতেন-জার্মানদের প্রতি সুবিচার দাবী করলেন এবং সুবিচার না পেলে যে-কোন পরিস্থিতির জন্য যেন চেকোশ্লোভাকিয়া প্রস্তুত থাকে এই হুমকীও দিয়ে রাখলেন। অপরপক্ষে প্রেসিডেন্ট বেনেসও শান্তি সংযমের ও পারস্পরিক সহযোগিতায় আবেদন জানালেন তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ বেতার-ভাষণে। সুদেতেন-জার্মানরা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। ১২ই সেপ্টেম্বরের সমাবেশে হিটলারের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী

ভাষণের ওপর সুদেতেন অঞ্চলে বিদ্রোহ সুরু হল। চেক-সরকার সেনাবাহিনী পাঠিয়ে বিদ্রোহ দমন করলেন। সমগ্র অঞ্চলে সামরিক আইন জারী হল। হেনলীন জার্মানীতে পালিয়ে এলেন এবং সুদেতেন অঞ্চলকে চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে মূল জার্মান ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী তুললেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রশ্নে ফরাসী সরকার ব্রিটিশ সরকারের মতই নিষ্ক্রিয়তা ও দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয় দিচ্ছিলেন। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের নাৎসী ডিক্টেটারের সঙ্গে একটা শান্তিপূর্ণ রফায় আসার জন্য অনুরোধ জানালেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিটলারের কাছে এক জরুরী টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বললেন যে, তিনি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আলাপ-আলোচনা করতে চান—কবে এবং কোথায় এই আলোচনা হতে পারে তা জানালেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রওনা হয়ে যাবেন। চেম্বারলেনের এই টেলিগ্রাম পড়ে তিনি আরও সুনিশ্চিত হলেন যে, চেকোশ্লোভাকিয়াকেও আক্রমণ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাঁর কথা নিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না। আগেই বলেছি, এই প্রশ্ন নিয়ে হিটলার ও তাঁর প্রথম সারির সেনাপতিদের মধ্যে দারুণ মতভেদ ছিল।

জার্মানীর একপ্রান্তে অবস্থিত বারচেট্‌স্‌গ্যাডেন-এ হিটলার-চেম্বারলেন বৈঠক বসেছিল ১৫ই সেপ্টেম্বর। জার্মান সেনার বাসভবনেই আলোচনার ব্যবস্থা হল,—যে ঘরে বৈঠক বসেছিল ৭ মাস আগে, ঠিক সেই একই কক্ষে—হিটলার অস্ট্রিয়ার নেতা ডঃ শুস্‌নিগের ( Schuschnigg ) সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে শেষে অস্ট্রিয়া গ্রাস করে নেন। আলোচনায় হিটলার পরিষ্কারভাবে জানালেন, চেকোশ্লোভাকিয়ার ৩০ লক্ষ জার্মান অধিবাসীর তাদের মাতৃভূমির সঙ্গে মিলিত হবার পক্ষে কোন বাধাই তিনি মানবেন না। হিটলার খোলাখুলিই জানতে চান চেম্বারলেনের কাছ থেকে—সুদেতেন ভূখণ্ডের জার্মানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে ( Right of self-determination ) চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত হবার দাবী তিনি সমর্থন করবেন কি? স্বভাবতই হিটলার গণভোট চাইছিলেন। চেম্বার-লেনের পক্ষে এই প্রশ্নের জবাবে নেতিবাচক কোন উত্তর দেওয়ার কথা নয়। কেননা রুন্সিম্যানের দৌত্য, রুন্সিম্যান ও সুদেতেন-জার্মান প্রতিনিধিদের দফায় দফায় বৈঠকে হেণ্ডারসনের মনোভাব থেকে বোঝাই গিয়েছিল এই প্রস্তাবে ইংলণ্ডের আপত্তি নেই। চেম্বারলেন স্বদেশে ফিরে মন্ত্রীমণ্ডলী ও পার্লামেন্টের মতামত নিয়ে চূড়ান্ত মতামত জানালেন তাঁর সরকারের।

প্রকৃতপক্ষে ধাপে ধাপে আত্মসমর্পণের পথই প্রশস্ত হচ্ছিল। চেম্বারলেন-হিটলার বৈঠকের জার্মান ভাষ্য হল এই যে, চেম্বারলেন এই জার্মান প্রস্তাবের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত সম্মতি আছে সেটা জানালেন—তবে সরকারের মতটা পরামর্শ করেই সঠিক জানাতে পারবেন।

হিটলারের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন, আলোচনার পথ বন্ধ করে জার্মানী কোন সামরিক অভিযানের পথে পা বাড়াবে না। চেম্বারলেন হিটলারের এই প্রতিশ্রুতিবাক্যে আস্থাবান ছিলেন। এদিকে জার্মানী যুদ্ধ-প্রস্তুতি পুরোদমে চালাতে লাগল। ৩৬ ডিভিসন সৈন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ফুয়েরার নির্দেশে। কোন্ কোন্ অফিসার যুদ্ধ-পরিচালনা করবেন তাও তিনি স্থির করে দিলেন।

চেম্বারলেন বারচেটেস্‌গ্যাতেন-এর বৈঠক শেষ করে ১৬ই সেপ্টেম্বর স্বদেশে ফিরে মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠক ডাকলেন। প্রাগ-এ প্রেরিত তাঁর বিশেষ দূত লর্ড রুন্সিম্যানকে ডেকে পাঠানো হল। রুন্সিম্যান তাঁর রিপোর্ট মন্ত্রিসভার কাছে পেশ করলেন। সুদেতেন অঞ্চল পাবার পথ হিসাবে হিটলারও যা বলেননি তিনি সেই প্রস্তাব করলেন: সরাসরি এই অঞ্চলটিকে জার্মানীকে দিয়ে দিতে বলা হোক। তার জন্য কোন গণভোটের দরকার নেই। চেকো-শ্লোভাকিয়ায় সে সময় জার্মানীর সমালোচনা করে যেসব মতামত বিভিন্ন ব্যক্তি ও দল ব্যক্ত করছিলেন—সেগুলি আইনের মাধ্যমে বন্ধ করতে হবে (স্বভাবতই জার্মানীকে খুশি করার জন্য)। শুধু তাই নয়, ছোট্ট দেশ চেকোশ্লোভাকিয়াকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, সে তার প্রতিবেশী কোন রাজ্য (স্বভাবতই জার্মানীর ন্যায় শক্তিশালী প্রতিবেশী) আক্রমণ করবে না। জার্মানী কর্তৃক আসন্ন চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের কথা চাপা থাকল—উল্টে চেকোশ্লোভাকিয়াকে চাপ দিতে হবে সে তার প্রতিবেশী রাজ্য—জার্মানী সমেত—আক্রমণ করবে না, তাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। ব্রিটিশ শঠতা ও appeasement কতদূর যেতে পারে এ তারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

হিটলারও চুপ করে ছিলেন না। নানা ফন্দি-ফিকির আবিষ্কারে ব্যস্ত। পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর সরকারকে প্রলুব্ধ করছিলেন তিনি যাতে চেকোশ্লোভাকিয়ার লুটেরও কিছু ভাগ পেতে পারে। যে যেটুকু পারে চেকোশ্লোভাকিয়ার অংশ খাবলিয়ে কেড়ে নিতে উদ্যত—আর হিটলার যখন স্পষ্টভাষায় জানিয়েই দিয়েছেন চেকোশ্লোভাকিয়াকে মানচিত্রের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন, সুযোগ বুঝে হাঙ্গেরী সরকার ও পোল সরকার ২২শে সেপ্টেম্বর গণভোট দাবী

করে বসল পোল ও হাঙ্গেরী জাতি-অধ্যুষিত এলাকাগুলির জন্য। পোল্যাণ্ড টেস্‌চেন জেলায় ( Teschen district ) সংখ্যালঘু পোলদের স্বায়ত্বশাসন দাবী করে বসল। ঐ একই দিনে সুদেতেন ফ্রী-কোর-বাহিনী এবং ঝটিকা-বাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্তবর্তী দুটি ছোট শহর Asch ও Eger দখল করে নিল বলপূর্বক।

যুদ্ধ কি করে এড়ানো যায় এই ভাবনা ভেবে ভেবে কাহিল হয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়্যের লণ্ডনে আলোচনায় বসলেন। অথচ যে চেক জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা সেই চেক জাতির বা সরকারের কোন প্রতিনিধিই উপস্থিত ছিলেন না। তাঁদের আমন্ত্রণও জানানো হল না। এই যৌথ আলোচনায় স্থির হল চেকোশ্লোভাকিয়ার যে অঞ্চলে সুদেতেন-জার্মানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি, সেইসব অঞ্চলগুলি জার্মানীকে দিয়ে দিতে হবে। এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার পর চেকো-শ্লোভাকিয়ার যে ভৌগোলিক সীমানা দাঁড়াবে ইংরেজ ও ফরাসী সরকার তা রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক গ্যারাণ্টি দেবে। যখন এই যৌথ প্রস্তাব রচিত হয় তখনও কিন্তু ফরাসী দেশ ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ( Mutual assistance ) চুক্তি বহাল ছিল। এক রাজ্য আক্রান্ত হলে অপর দেশের সরকার তাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসবেই। ফরাসী সরকার বুঝিয়ে দিলেন অতীতের সেই চুক্তির কোনই মূল্য নেই। সুতরাং নূতন গ্যারাণ্টির কি দাম সেটা বুঝতে চেক-সরকারের কোন অসুবিধা হয়নি। প্রস্তাবে বলা হল, এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তবে শান্তির জন্য সকলের স্বার্থেই সেটা করা দরকার। চেক-সরকার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তবে ১৯২৫ সালের চেক-জার্মান চুক্তির অন্যতম সর্ত অনুযায়ী সমগ্র সুদেতেন প্রশ্নটি Arbitration-এ পাঠাতে রাজী ছিলেন। ইংরেজ ও ফরাসী সরকার চেক-সরকারের মনোভাব সমর্থন করল না। পরিষ্কার ভাষায় জানান হলো, যৌথ ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাব মেনে না নিলে এই দুই সরকার চেকোশ্লোভাকিয়ার পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে না। 'গণতন্ত্রের পূজারী' দুই দেশের সরকার চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রকে নাৎসী আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার কোনই চেষ্টা করল না। রাশিয়াও তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব বিস্মৃত হল। ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার অবিরাম চাপ দিতে থাকল চেক-সরকারের ওপর হিটলারের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করার জন্য। ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাসই বটে।

মীমাংসার জন্য চেম্বারলেন আবার ২২শে সেপ্টেম্বর হিটলারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য জার্মানী যাবেন স্থির হল। এবার আলোচনার স্থান রাইন নদীর তীরবর্তী গোডেস্‌বার্গ নগর। ফরাসী সরকারের মনোভাবে নিরাশ হতোত্তম ফরাসী রাষ্ট্রনায়করা স্বভাবতই ভাবছিলেন রাশিয়াও কি এইভাবে চরম বিপদের মুখে সরে দাঁড়াবে? রাশিয়ার সঙ্গে তো পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি বহাল আছে? কিন্তু ঐ চুক্তির মধ্যে একটি সর্ত ছিল, চেকোশ্লোভাকিয়া যদি কোন রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং ফরাসী সরকার চেক-সরকারের পেছনে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে তবেই রাশিয়া সাহায্যের জন্য আসবে। কিন্তু যেহেতু ফরাসী সরকার বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা নিল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, সেইহেতু রুশ-সরকার তার সেনাবাহিনী নিয়ে সাহায্যের জন্য আসবে না। রাজনীতির ছাত্ররা বামন ও দৈত্যের, টিকটিকি ও কুমীরের, বলবান ও দুর্বলের মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তির মূল্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কতটুকু এই ঘটনাগুলি থেকেও বুঝতে পারবেন। অবশ্য আদর্শবাদী সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী লিটভিনভ জেনেভাতে বক্তৃতায় বললেন, তাঁর দেশ ও সরকার চেক জাতির পেছনে থাকবে। কিন্তু সেও হল নিছক স্তোকবাক্য।

চেক-প্রেসিডেণ্ট ডঃ বেনেস বুঝলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হতে চলেছে। পশ্চিমের আকাশ যুদ্ধের কামানের গোলা, ফ্লেম থ্রোয়ার, বোমা বিস্ফোরণের আগুনে রক্ত-রাঙা হয়ে উঠছিল।

বেনেস ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যে কড়া চিঠি দিয়েছিলেন সেটা যাতে ফিরিয়ে নেন তার জন্য ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার আবার চাপ দিতে সুরু করলেন। তিনি জানতে চাইলেন জার্মানী আক্রমণ করলে ফরাসী সরকার চেকোশ্লোভাকিয়ার পাশে এসে দাঁড়াবে কিনা চুক্তির প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী? চেকোশ্লোভাকিয়ার পাশে কি কোন বন্ধু রাষ্ট্রই এসে দাঁড়াবে না? প্রেসিডেণ্ট বেনেস ফরাসী মন্ত্রী ল্যাক্রোইক্সের (Lacroix) কাছে এই প্রশ্নের লিখিত উত্তর চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের মনোভাবে চেক-নেতারা ভেঙে পড়লেন। বুঝলেন নাৎসী আক্রমণের মুখে তারা নির্বান্ধব—সম্পূর্ণ একা। বেনেস ও তাঁর সরকার পদত্যাগ করলেন ২১শে সেপ্টেম্বর। সামরিক বাহিনী দেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করল। সরকারী ঘোষণায় বলা হল, "We had no other choice because we were left alone." 'এ ছাড়া আমাদের আর কোন পথ ছিল না,

কেননা কেউই আমাদের পাশে দাঁড়াল না।' এডুয়ার্ড বেনেস নাকি দুঃখ করে বলেছিলেন, "We have been basely betrayed". 'আমাদের জাতি কুৎসিত কৃতঘ্নতার বলি হল।'

'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না'—এই দম্ভোক্তি ব্রিটিশ-শাসিত উপনিবেশগুলির মানুষকে শোনান হয়েছে। সেই সাম্রাজ্যের পরিচালকমণ্ডলীর প্রধান চেম্বারলেন সাহেব আত্মসম্মান খুইয়ে যেচে নিজে থেকে ৮ দিনের মধ্যে দু'বার ছুটে এলেন জার্মানীতে হিটলারকে তোয়াজ করার জন্য। হিটলার আমন্ত্রণও করেননি, দেখা করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেননি। বারচেট্‌স্ গ্যাডেন-এ আত্মসমর্পণের প্রস্তুতির যে ভিত রচনা করা হয়েছিল গোডেসবুর্গ-এ সেই আত্মসমর্পণ চূড়ান্ত রূপ নিল। লর্ড রুন্সিম্যানের পরামর্শ অনুযায়ী চেম্বারলেন কোনরকম গণভোট না নিয়েই সুদেতেন অঞ্চলকে সরাসরি জার্মানীকে দিয়ে দিতে প্রস্তুত। আর মিশ্র এলাকাগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে একটি ৩ জন সদস্য-বিশিষ্ট কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে। এই কমিশনে একজন জার্মান, একজন চেক এবং তৃতীয় একজন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সদস্য থাকবেন। হিটলার চেম্বারলেনকে বললেন—গত কয়েক দিনের সুদেতেন অঞ্চল ও সীমান্তের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকারের এই প্রস্তাব আর গ্রহণযোগ্য নয়। ( "I am terribly sorry, but after the events of the last few days this plan is no longer of any use." —Hitler )

রাশিয়ার সঙ্গে চেকোস্লোভাকিয়ার যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালে, সেটা ফুয়ারের আদৌ মনঃপূত ছিল না। চেম্বারলেন হিটলারের বলশেভিক বিদ্বেষবোধে সুড়সুড়িও দিয়েছিলেন। সেই প্রস্তাব বাতিল করে তার জায়গায় আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি দ্বারা চেক-সীমান্ত রক্ষার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন—তিনি আরও প্রস্তাব করেছিলেন চেকোস্লোভাকিয়া 'নিরপেক্ষ' থাকবে এই ঘোষণাও চেকোস্লোভাকিয়াকে দিতে হবে। এইসব প্রস্তাব হচ্ছে, অথচ প্রেসিডেন্ট বেনেস কিছুই জানলেন না। চেক-মন্ত্রিসভার ও সমগ্র জাতির পশ্চাতে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে জুয়া খেলছিলেন সেদিন চেম্বারলেন, ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়েরে-এর সম্মতি নিয়ে।

হিটলার সুদেতেন অঞ্চল দখল করবেনই। চেম্বারলেন-দৌত্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। সেই রাত্রেই তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনা করে অবশেষে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে চেক-সরকারকে

জানানো হল পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেই পরামর্শও অনেক ঘুরিয়ে দেওয়া হল। চেক-সরকার সীমান্তে সমাবেশ সুরু করলেন ২৩শে সেপ্টেম্বর বেলা ১০-৩০মিঃ-এ। চেক-সরকার গত্যন্তর না দেখে ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাবে রাজীও হয়েছিলেন। হিটলার তবু কেন এই প্রস্তাব মেনে নিলেন না? হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়াকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। পশ্চিমের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সরকারগুলি যে মেরুদণ্ডহীন—কাপুরুষ, সেটা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। সেটা প্রমাণ করে ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তারের স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। সর্বোপরি ভার্সাই চুক্তির অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছিলেন। কত রক্ত কত অশ্রু কত জীবনের বিনিময়ে সেই প্রাগৈতিহাসিক আদিম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হবে তা ভাবার দরকার নেই। কার্থেজকে ধ্বংস করতেই হবে—এই যুক্তি। জার্মানী ছেড়ে চলে আসার আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আবার হিটলারের সঙ্গে গোডেসবুর্গ-এর হোটেলে অতৃপ্ত নাৎসী ডিক্টেটারের মন ভেজাতে এলেন। তিনি এমন প্রস্তাবও পর্যন্ত করলেন যে, সুদেতেন অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যেন চেক-সরকার সুদেতেন জার্মানদের ওপরই ছেড়ে দেন। চেক-সরকারকে সেই মর্মে তিনি চিঠিও দিলেন। হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার আর কোন্ কোন্ অঞ্চল পেতে চান তাও লিখিতভাবে জানাবার জন্য অনুরোধ করলেন। চেম্বারলেনের প্রস্তাব অনুযায়ী সুদেতেন অঞ্চল থেকে চেক-সরকারকে তাদের লোকজন সরিয়ে নেবার কথা ২৮শে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই। হিটলার ১লা অক্টোবরের মধ্যে ইভাকুয়েশনের কাজ সম্পূর্ণ করার দাবী জানালেন।

চেম্বারলেন দেশে ফিরে এলেন—হৃদ্যতা ও সৌজন্য বিনিময়ান্তে। গোডেসবুর্গ-এর জার্মান প্রস্তাব বা স্মারকলিপি চেক-সরকার অগ্রাহ্য করলেন। দালাদিয়েরে লণ্ডনে ছুটে এলেন আলোচনার জন্য। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট হিটলারের দাবী মেনে নিতে রাজী হলেন না। ফরাসী সরকার জানালেন চুক্তির দায়-দায়িত্ব অনুযায়ী চেকোশ্লোভাকিয়ার পাশে দাঁড়াতেই হবে। তবে ব্রিটিশ সরকার কি করবেন সেটা জানা দরকার। ব্রিটিশ সরকারও জানালেন যে, ফরাসী সরকার যুদ্ধে গেলে ব্রিটেনও তার পাশে পাশে থাকবে। চেম্বারলেন আবার ২৬শে তারিখে বিশেষ দূত স্যার হোরেস উইলসনকে হিটলারের কাছে একটা অনুরোধ সম্বলিত চিঠি পৌছে দেবার জন্য পাঠালেন। এই চিঠিতে বলা হল জার্মান ও চেক-প্রতিনিধিরা একত্রে

বসে কিভাবে সুদেতেন অঞ্চল জার্মানীকে দিয়ে দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করা হবে—বিশেষ করে যখন চেক-সরকারের আপত্তি নেই। হিটলার ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোষণা করলেন গোডেসবুর্গ প্রস্তাব মেনে নিতেই হবে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে চেক-সরকারকে ঐ অঞ্চল থেকে লোকজন সরিয়ে নিতেই হবে। এ নিয়ে আর আলোচনা তিনি করবেন না।

হোরেস উইলসন হিটলারের ক্রুদ্ধ অনমনীয় মনোভাব বুঝে তাঁর প্রধান-মন্ত্রীকে সব জানালেন। এদিকে ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে যুদ্ধের সাজ-সাজ রব। বিপুল ফরাসী বাহিনী নিম্ন আলসাস ও লোরেন অঞ্চল থেকে আঘাত হানতে পারে জার্মানীর ওপর। হিটলার ভাল করেই জানতেন ফরাসীবাহিনীকে অনেকটা আটকিয়ে রাখতে পারে ইতালীর সীমান্তে অবস্থিত সেনাবাহিনী। কেননা সেনাবাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হলে বা যুদ্ধের হুমকী দিলে বিপুল ফরাসীবাহিনীকে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে অথবা প্রতিরোধ কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। ফলে জার্মানীর ওপর পুরো শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হবে না। ইতালী যদিও সেদিন জার্মানীর পরম মিত্র—তবু এমন কোন সামরিক তৎপরতা ফরাসী-ইতালী সীমান্তে দেখায়নি যাতে ফরাসী সরকার উদ্বিগ্ন বা বিব্রত বোধ করতে পারে। চেম্বারলেনের এই সব ঘটনাই জানার কথা। কিন্তু তবু তিনি হোরেস উইলসনের কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে এক চিঠি পাঠালেন ২৭শে সেপ্টেম্বর এডুয়ার্ড বেনেসের কাছে। এই চিঠিতে জার্মান-আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন। সেই সঙ্গে একথাও জানালেন, জার্মানীর দাবী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মেনে না নিলে কোন শক্তি একক বা যৌথভাবে চেকো-শ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করতে পারবে না। এই চিঠিতে প্রকারান্তরে আসন্ন যুদ্ধের জন্য তিনি বেনেসকেই যেন দায়ী করলেন। এর অব্যবহিত পরেই ২৮শে সেপ্টেম্বর দ্বিতীয়বার এক জরুরী চিঠি পাঠিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডুয়ার্ড বেনেসকে অনুরোধ করলেন ১লা অক্টোবর আংশিকভাবে জার্মান সেনাবাহিনীকে যেন অন্তত Egerland ও Asch এই দুটি অঞ্চল দখল করতে দেওয়া হয় শান্তিপূর্ণভাবে। এর পরই জার্মান-চেক-ব্রিটিশ সীমান্ত কমিশন বসিয়ে বাকী কোন্ কোন্ অঞ্চল জার্মানীকে দেওয়া হবে সেটা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হবে। এই প্রস্তাব না মানলে বলপ্রয়োগ দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়াকে ধ্বংস ও খণ্ডিত করতে উদ্যত হবে। যুদ্ধ হলে অপরিসীম লোকক্ষয় ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি হবে।
[ See Wheeler-Bennett—Munich ; P. 151, 152, 153 ]

"The only alternative to this plan would be an invasion and a dismemberment of the country by force……" চেম্বারলেন।

এই হল বন্ধুরাষ্ট্রের বন্ধুত্বের নমুনা! যুদ্ধের ভয়াল পরিণতির ভয় দেখিয়ে বলবান রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রকে যুগে যুগে পদানত করে এসেছে। হিটলার, স্তালিন, নিকসন, জনসন, মাও-সে-তুঙ, চার্চিল, ফ্রাঙ্কো, ইয়াহিয়া খাঁ একই কৌশল নিয়ে এসেছেন। হিটলার অত্যাধুনিক ভয়াল মারণাস্ত্র গোলাবারুদ তৈরীর ঢালাও আয়োজন করবেন—সেনাবাহিনীর শক্তি বাড়াবেন, আবার 'শান্তির' কথাও বলবেন। যুদ্ধ বাধলে ভয়াবহ পরিণতির বিভীষিকার ছবি তুলে ধরবেন দুর্বল রাষ্ট্রের জনগণের সামনে তাদের মনোবল ও প্রতিরোধস্পৃহা ভেঙে দেবার জন্য। আর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের একদল 'গণতন্ত্রী' শান্তির দূত— 'যুদ্ধ কখনই নয়'—'যে কোন মূল্যে শান্তি চাই' এই সব কথা দিয়ে দেশবাসীকে তথা বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করবেন। স্তালিনও তাই করেছিলেন নিপুণভাবে। নিজের দেশে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তৈরী করলেন। মেগাটন বোমা ফাটালেন, আণবিক বোমার বিপুল অস্ত্রাগার গড়ে তুললেন, কিন্তু বিশ্বশান্তির জন্য প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অকমিউনিস্ট দেশে 'শান্তি আন্দোলন' জোরদারও করলেন। এটা করলেন তাঁর দলের ও সরকারের ভাতাপুষ্ট বুদ্ধিজীবী ও মগজধোলাই-করা জঙ্গী কর্মীদের দিয়ে। মার্কসবাদীরাও 'শান্তি আন্দোলনের' পক্ষে যুদ্ধের বিভীষিকার চিত্রটিই তুলে ধরে এসেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 'শান্তি আন্দোলনে' সাধারণ দেশবাসী বিভ্রান্ত হয়ে অকমিউনিস্ট দেশগুলির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে রেখে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কোন-না-কোন এক শক্তিশালী দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উদ্দেশ্য ও রাজনীতি-নির্ভর করে তুলতে সাহায্য করেন। আমেরিকা ও তার উপর নির্ভরশীল প্রতিটি দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তার নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল করে রাখবে সেইসব অনুগত দেশগুলিকে দুর্বল করে রেখে।

যুদ্ধের ভয়াল পরিণতির কথায় শুধু চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণই ভীত হবে কেন? হিটলার ও তাঁর দেশের জনগণেরই বা ভয় পাবার কারণ থাকবে না কেন? যে দেশের ওপরই নিক্ষেপ করা যাক—একই শক্তি-সম্পন্ন গোলা-বোমার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সমানই। পশ্চিম-পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খাঁর সামরিক জুন্টা নির্বিচারে পূর্ব-বাংলায় মুক্তিকামী নরনারী-শিশু বেপরোয়া-ভাবে হত্যা করবে তার বিপুল সেনাবাহিনী দিয়ে, গ্রাম-শহর জ্বালিয়ে দেবে,

লক্ষ লক্ষ নরনারীকে নিরস্ত্র করে ভিটেছাড়া করে ভারতের অর্থনীতি বিপর্যস্ত করার জন্য ভারতের বুকে ঠেলে দেবে—সবই নীরবে সহ্য করতে হবে? ভারত যদি নিজের জাতীয় স্বার্থ, সীমানার অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়, পূর্ব-বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কথা বলে, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের জীবন রক্ষার জন্য মত ব্যক্ত করে তাহলেই শক্তিশালী চীন পশ্চিম-পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, যুদ্ধের হুমকী দেবে! আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্লজ্জভাবে পশ্চিম-পাকিস্তানকে অঢেল অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবেন দুর্বল নিরস্ত্র মুক্তিকামী 'বাংলাদেশের' মানুষকে চিরপদানত রাখতে!

সেই একই কৌশল: যুদ্ধের ভয়াল বিভীষিকার কথা তুলে প্রতিপক্ষকে নতশির হতে বাধ্য করা। যুদ্ধের ভয়াল ভ্রুকুটি কেন বাংলাদেশের মুক্তিফৌজকে অথবা আত্মরক্ষাবাদী ভারতকে ভীত-চঞ্চল করবে? যারা জেনে-শুনে ক্ষমতামত্ত হয়ে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালাচ্ছে 'বাংলাদেশে'—সেই পশ্চিম-পাকিস্তানের দাম্ভিক সামরিক জুণ্টার পেছনে যারা উস্‌কানি দিয়ে চলেছে তাদের বুঝি ভয় পাবার কোন কারণ নেই? চেকোশ্লোভাকিয়ার ক্ষেত্রেও এই সনাতনী কৌশল প্রযুক্ত হয়েছিল। ১৯৬৮ সালের ২০শে আগস্ট ৬ লক্ষ সৈন্য নিয়ে 'বন্ধু' ও 'রক্ষক-রাষ্ট্র' সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ছোট্ট সমাজতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়াকে 'শান্তিপূর্ণ'ভাবে আক্রমণ করে সমাজতন্ত্রী নেতা ডুবচেক্-কে বলপূর্বক ক্ষমতাচ্যুত করল এবং স্বদেশে এক তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত করল। তখন শক্তিমানের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে ধ্বংসের বিভীষিকাকে আমন্ত্রণ না জানাবার তত্ত্বই জনপ্রিয় ঐতিহাসিক কমিউনিস্ট নেতা ডুবচেকের অনুগামীদের সোভিয়েট ও ওয়ারশ জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত দখলদার ফৌজ কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের ঘটনাটিকে ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ নিষ্পন্ন কাজ (fait accompli) হিসাবে মেনে নেবার মানসিকতা সৃষ্টি করেছিল। রুশ-লালফৌজের সাঁজোয়া গাড়ির সামনে 'শ্রেণী সচেতন' সহস্র সহস্র শ্রমিক, 'পেশাদারী বিপ্লবী', নির্ভীক ছাত্র-যুবকের দল বুক পেতে দিয়ে জীবনের 'অপচয়' ঘটাননি। মাত্র কিছুকাল অসহযোগিতা, নীরব অহিংস আন্দোলন করেছিলেন। কালের স্রোতে বয়ে আনা পলিমাটিতে অপমানে হতমানে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল গোটা দেশ। এক নিষ্ঠুর স্মৃতির ক্ষতের চর-ঢাকা পড়ে গেল। মহাকাল এসে চেকো-শ্লোভাকিয়ার বুকে যে আঘাত করে গেল সেই মহাকালই একদিন সেই জাতিকে তার আঘাতের কথা ভুলিয়ে দিয়ে গেল।

কিন্তু সত্যি সত্যিই কি ভোলা যায়? ইতিহাসে কতবার এমনটি ঘটেছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শে বিশ্বাসী যে সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবী তাঁদেরই নিজহাতে 'আদর্শের' যে আরাধ্য প্রতিমা তৈরী করেছিলেন, তাকে রক্ষার জন্য রক্ত ঢালতে সাহস পাননি যে-কারণে, সেই শাশ্বত কারণে কিন্তু পূর্ব-বাংলার লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র সহায়সম্বলহীন মানুষ সকল ভয় উপেক্ষা করে এক-নদী রক্ত ঢেলে দিল। পূর্ব-বাংলার নামগোত্রহীন অসংখ্য শহীদের দল মার্কস-লেনিন-মাও-সে-তুঙ-চে-গুয়েভারা-ফিডেল ক্যাস্ট্রোর রচনা পড়ে প্রেরণা নেননি, নেননি মেরুদণ্ডহীন তথাকথিত 'শান্তিবাদী' নির্বীর্য গণতন্ত্রীদের কাছ থেকে। তাঁরা আমেরিকার শাসকগোষ্ঠীর বা কমিউনিস্ট চীনের হুমকীতে ভয় পাননি। তাঁরা জেনেছিলেন জীবন দিয়ে মহাজীবন পেতে হয়। অল্পমূল্যে অনায়াসে যা পাওয়া যায় তা রাখা যায় না। টম্ পেইনের স্মরণীয় কথাগুলি পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে:

"What we obtain too cheap, we esteem too lightly; 'tis dearness only that gives everything its value. Heaven knows how to put a price upon its goods; and it would be strange indeed if so celestial an article as FREEDOM should not be highly rated." [ Tom Paine : Crisis Papers; from The Selected Works of Tom Paine ]

[ ভারতের স্বাধীনতার কেন এই হাল হল? কেন এই পুঁজিবাদী শোষণ দুর্নীতি অনাচার অবিচার, খাদ্যে ওষুধে ভেজাল, বামপন্থী তক্‌মাধারী স্বার্থপর নেতাদের অমার্জনীয় ভণ্ডামী, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নামে গরীব শ্রমিক শোষণ, দেশের অর্থনীতি ও প্রশাসনকে ফোঁপড়া করে দিয়ে নূতন পরাধীনতার শৃঙ্খল জাতির হাতে-পায়ে পরাবার ঘৃণ্য চক্রান্ত? কেন বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের নামে সর্বস্তরে উচ্ছৃঙ্খলতা ও হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি? সমাজতন্ত্রের নামে দারিদ্র্য দূরীকরণের মহৎ লক্ষ্য রূপায়ণের পথে না এগিয়ে প্রকারান্তরে এক বিশাল সর্বব্যাপী কর্তৃত্ববাদী হৃদয়হীন দায়িত্বহীন আমলাশাহী সৃষ্টির পথ উন্মোচন করা? কেন এই দারিদ্র্য ও বেকারীর দুঃসহ জ্বালায় জ্বলে-জ্বলে ক্ষয়প্রাপ্ত গোটা ভারতের কর্মক্ষম মানুষের মনুষ্যত্বের এই অবক্ষয়? কেন দেশের নেতারা বুঝবেন না দেশপ্রেম-বর্জিত সোস্যালিজম বা কমিউনিজম কখনই মুক্তির দিশারী হতে

পারে না? উত্তর চান? উত্তর: দেশের স্বাধীনতা মিলেছে সহজে, অনায়াসে।]

যেকথা বলছিলাম। স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়া ১৯৬৮ সালে আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু গ্রামে-গাঁথা কৃষিপ্রধান অনগ্রসর পূর্ব-বাংলার শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত নিরক্ষর মানুষেরা লাখে লাখে জীবন দিল, তবু স্বাধীনতার সঙ্কল্প ত্যাগ করেনি। নাগিনীরা যেখানে উদ্যত ফণা বিস্তার করে বিষাক্ত নিশ্বাস ছড়াচ্ছে সেখানে শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসের মতই শোনায়। ক্ষমতামত্ত দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য যারা ঘরে ঘরে ক্ষেতে-খামারে কলে-কারখানায় প্রস্তুত তাদের অবিভাজ্য মৈত্রী-শৃঙ্খলা অপরাজেয় সঙ্কল্পকে প্রজ্বলিত রাখাই মানবতার ধর্ম, পৌরুষের গর্ব, বন্ধুরাষ্ট্রের মহান কর্তব্য। 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে'। ১৯৩৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য ফরাসী, ব্রিটিশ ও রুশ-সরকারের পাশে এসে দাঁড়ানো নৈতিক কর্তব্য ছিল। এক ক্ষমাহীন অপরাধ তাদেরই চোখের সামনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। হিটলারের রাজ্যলিপ্সার হাড়িকাঠে চেকোশ্লোভাকিয়াকে বলি দেওয়া হল। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে সেদিন।

'যুদ্ধ' কখনও কোন দেশে আচমকা এসে পড়ে না। বহু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই যুদ্ধ জন্ম নিয়ে থাকে। যুদ্ধ যখন এসে পড়ে তখন প্রত্যেক নাগরিককেই ভাবতে হবে: কি তার কর্তব্য—দেশের প্রতি, জাতির প্রতি। বিচার করতে হবে ভবিষ্যতের কথা—নিজের সযত্নে লালিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের অস্তিত্বের যৌক্তিকতার নিরিখে। নৈতিক প্রশ্ন নিয়ে তাকে যেমন ভাবতে হবে, তেমনি ভাবতে হবে পার্থিব পরিবেশের কথা। শত্রুরাষ্ট্রের আক্রমণ প্রতিহত না করারই বা কি ফল হতে পারে, আর প্রতিহত করতে যাবারই বা কি পরিণাম হতে পারে? শান্তি বিঘ্নিত যখন তখনই বিপন্ন দেশের নাগরিক কি বিচার করে দেখবেন না কে বা কোন্ রাষ্ট্র তার জন্য দায়ী? কোন্ 'রাজনীতির' অপরিহার্য পরিণতি এই প্রত্যাসন্ন 'আক্রমণ' বা 'যুদ্ধ'? অস্ত্রধারণ করে আক্রমণের মোকাবিলা না করে জীবনের 'অপচয়' না ঘটিয়ে আত্মসমর্পণ করলেই কি 'শান্তি' প্রতিষ্ঠিত হয়? বিশ্বাস, মূল্যবোধ—এর কি কোন দামই থাকবে না? স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মূল্য দিতে গিয়ে প্রাণ দেওয়া ও আক্রমণকারী দস্যুর সৃষ্ট ধ্বংস তাণ্ডবের চাইতে কি ক্রীতদাসের শান্তিপ্রিয় জীবন বরণ বেশি শ্রেয়?

চেকোশ্লোভাক রাষ্ট্রের অন্যতম স্রষ্টা গ্যারিগ ম্যাসারিক তাঁর The Making of a State গ্রন্থে হিংসা-অহিংসার তর্ক সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে দার্শনিক ও অমর বিশ্বসাহিত্যিক টলস্টয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারকে উপলক্ষ করে যে মন্তব্য করেছিলেন সেটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

"Neither morally nor I think psychologically did Tolstoy recognise the distinction between aggressive violence and self-defence. Here he was wrong; for the motives are different in two cases and it is the motive which is ethically decisive. Two men may shoot, but it makes a difference whether they shoot in attack or defence. The mechanical acts are identical but the two acts are dissimilar in its intention, in object, in morality. Tolstoy once argued arithmatically that fewer people would be killed if attack were not resisted; that in fighting both sides get wilder and more are killed. Whereas if the aggressor meets with no opposition he ceases to slay. But the practical standpoint is that, if any body is to be killed let it be the aggressor. Why should peace-loving man, void of evil intent, be slain and not the man of evil purpose who kills?......I knew, too, that it is hard sometimes to say precisely who the aggressor is, but it is not impossible. Thoughtful men of honest mind can distinguish impartially the quarter whence attack proceeds." [The Making of a State]

আক্রমণ কোন্ পক্ষ থেকে আসছে সেটা সময় সময় সঠিক নির্ণয় করা শক্ত, কিন্তু সেটা আদৌ অসম্ভব নয়। চিন্তাশীল সৎ মানুষ মাত্রেই নিরপেক্ষভাবে বিচারে বসলে বুঝতে পারেন কে বা কারা আক্রমণকারী? যারা নিজের দেশকে রক্ষা করবে—যাদের মনে অসৎ কোন মতলব নেই, দুরভিসন্ধি নেই, যারা শান্তিপ্রিয় তারা কেন নীরবে আক্রমণ মেনে নেবে? টলস্টয় তর্ক উঠিয়েছিলেন—আক্রমণকারীকে বাধা না দিলে বিনা রক্তপাতে রাজ্য জয় হবে—কোন ক্ষয়ক্ষতি, জীবনহানি হবে না। ম্যাসারিক এই

যুক্তিতে সায় দেননি। ম্যাসারিকের এই যুক্তি ও বক্তব্য প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশেই ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যতদিন মানুষ পৃথিবীতে থাকবে যতদিন হিংসা-হানাহানি-লোভ-সম্প্রসারণবাদ বেঁচে থাকবে, ততদিন এই তর্ক বেঁচে থাকবে।

চেক-জাতির নেতা বেনেস ম্যাসারিকের এই যুক্তির সঙ্গে খুবই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সে বিশ্বাস—যা প্রজাতন্ত্রের প্রাণ—তা জাগাতে পারেননি জনমানসে। চেক-সৈন্যবাহিনীতে সে সময়ে ৮ লক্ষ সৈনিক ছিল। একটি ছোট দেশের জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধের জন্য এ সংখ্যা কম নয়। গণতন্ত্রের পূজারী বলে পরিচিত ফরাসী দেশের সরকারের আচরণ বিশ্বাসঘাতকতা বলেই ইতিহাসে ধিক্কার কুড়াবে। ফরাসী দেশের হাতে সেদিন ছিল জার্মানবাহিনীর চেয়েও শক্তিশালী, কমপক্ষে একশ' ডিভিশনের সেনাবাহিনী। ইঙ্গ-ফরাসী চেক-রুশ প্রতিরোধের সামনে জার্মান-বাহিনী দাঁড়াতে পারত না। তাছাড়া ব্যাভেরিয়ার পার্বত্য অঞ্চল চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্তকে স্বাভাবিকভাবে সুরক্ষিত রেখেছিল। তার ওপর এই সমস্ত ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে চেক-সরকার শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আগে থেকেই গড়ে তুলেছিল। যুদ্ধ করে এই স্বাভাবিক ও গড়ে-তোলা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে চেক ভূখণ্ড দখল করা সেদিন জার্মান-বাহিনীর পক্ষে অসম্ভবই ছিল। চেম্বারলেন হিটলারের কাছে ব্রিটিশ-জার্মান-ফরাসী-ইতালী এই চতুঃশক্তির যুক্ত বৈঠকে সুদেতেন সঙ্কট সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতেই পারছিলেন না কেন হিটলার যুদ্ধ করতে চাইছেন, যখন বিনা যুদ্ধেই তিনি যা চাইছেন তাই তাঁকে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে? চেম্বারলেন এই সম্মেলনে চেকো-শ্লোভাকিয়ার একজন প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকারও প্রস্তাব করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত হিটলার সম্মত হলেন চেম্বারলেনের প্রস্তাবে। হিটলার মিউনিক শহরে ২৯শে সেপ্টেম্বর মিলিত হবার জন্য চেম্বারলেনকে আমন্ত্রণ জানালেন।

এদিকে ফরাসী দেশে জার্মান রাষ্ট্রদূত তাঁর সরকারের একটি প্রস্তাব নিয়ে হিটলারের সঙ্গে দেখা করলেন। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল সুদেতেন জার্মানীর তিনটি বৃহৎ অঞ্চল ১লা অক্টোবরের মধ্যে জার্মানীকে দিয়ে দেওয়া হোক। কে কত বেশি তোয়াজ করতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলছিল।

মিউনিক-বৈঠকে মুসোলিনি ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাবটি এবং হিটলারের গোডেসবুর্গ প্রস্তাব এক করে একটি তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তিনি ১০ই অক্টোবরের মধ্যে স্থদেতেন অঞ্চল থেকে চেক নাগরিকদের চলে যাবার প্রস্তাব করেন (১লা অক্টোবরের পরিবর্তে)। ফরাসী সরকারের প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়েরে চেক-সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেন এই বলে যে, কোন রকম দীর্ঘসূত্রতা এ ব্যাপারে বরদাস্ত করা হবে না। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে চেকদের স্থদেতেন অঞ্চল পরিত্যাগ করে চলে যেতেই হবে। আলোচনা কক্ষে কোন চেক প্রতিনিধি থাকলেন না। হিটলার তো এডুয়ার্ড বেনেসের উপস্থিতি সহ্যই করবেন না। শেষে চেম্বারলেনের পীড়াপীড়িতে একজন চেক প্রতিনিধিকে বৈঠকের সময় পার্শ্ববর্তী ঘরে বসবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আলোচনার ফলশ্রুতি কুখ্যাত ও কুৎসিত মিউনিক চুক্তির কথা ( Four Power Munich Agreement ) চেক প্রতিনিধিকে শোনান হয়েছিল। এই অবিচারের কোন তুলনা মিলবে না ইতিহাসে। চেক প্রতিনিধি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতেই ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি তাঁকে শুনিয়ে দিলেন যে, এ প্রস্তাব মেনে না নিলে কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসী সরকারের কিছুই করার থাকবে না। চেকোশ্লোভাক সরকারকেই হিটলারের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে হবে। [ See Rise And Fall of Third Reich ; and The Origins of the Second World War By A. J. P. Taylor ]

৩০শে সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে হিটলার, মুসোলিনি, দালাদিয়েরে ও চেম্বারলেন মিউনিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। ১লা অক্টোবর জার্মান সেনাবাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়া স্থদেতেন অঞ্চলে প্রবেশ করবে এই হল চুক্তির মূল কথা।

চেম্বারলেন মিউনিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে চেকোশ্লোভাকিয়ার সর্বনাশ সাধন করে দেশে যখন ফিরলেন তাঁকে তখন বিজয়ীর সম্মান দেওয়া হল। তিনি যুদ্ধ এড়িয়ে ইউরোপকে রক্তস্নানের হাত থেকে রক্ষা করেছেন! ব্রিটিশ জনতার বিপুল অভিনন্দন তিনি পেলেন। উইনস্টন চার্চিল এই ঘৃণ্য চুক্তিকে চরম সার্বিক পরাজয় বলে ধিক্কার জানিয়েছিলেন পার্লামেণ্টে। চার্চিলের এই উক্তিতে পার্লামেণ্টে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড়ও উঠেছিল সেদিন।

চেকোশ্লোভাকিয়া আত্মসমর্পণ করল শেষ পর্যন্ত। নতুন প্রধানমন্ত্রী সিরোভী ঘোষণা করলেন আমাদের সবাই পরিত্যাগ করেছে, আমরা আজ এই সঙ্কট মুহূর্তে সম্পূর্ণ একা। বেনেস প্রেসিডেণ্টের পদ ত্যাগ

করলেন ৫ই অক্টোবর—তাও বার্লিনের চাপে। তাঁর নিজের জীবনও বিপন্ন তখন। তিনি ইংলণ্ডে পালিয়ে এলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার যে সব অঞ্চল নিয়ে বিতর্ক চলছিল—সেই সব স্থানে গণভোট হবার কথা মিউনিক চুক্তিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ১৩ই অক্টোবর সেটাও এই চতুঃশক্তি বাতিল করলেন। এর পরই পোল্যাণ্ড চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছ থেকে ৬৫০ বর্গমাইল জমি ছিনিয়ে নিল। এই অঞ্চলের জন-বসতির সংখ্যা ছিল ২,২৮,০০০—তার মধ্যে ১৩,৩০০ ছিল চেক অধিবাসী। হাঙ্গেরীও সুযোগ বুঝে ৭,৫০০ বর্গমাইল ভূখণ্ড খাবলিয়ে কেড়ে নিল। উসকানি দিলেন রিবেনট্রপ। চেকোশ্লোভাকিয়াকে শেষ পর্যন্ত জার্মানীকে সর্ব মোট ১১,০০০ বর্গমাইল ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে হল। এই অঞ্চলে প্রায় ২৮ লক্ষ সুদেতেন জার্মান বাস করতেন। এই চুক্তির ফলে চেকোশ্লোভাকিয়া শতকরা ৬৬ ভাগ কয়লা খনি, ৭০ ভাগ লৌহ ও ইস্পাত, ৭০ ভাগ বিদ্যুৎ শক্তি, ৮০ ভাগ সিমেণ্ট শিল্প, ৮০ ভাগ বয়ন শিল্প ও ৮৬ ভাগ রাসায়নিক শিল্প খোয়াল জার্মানীর কাছে। জাতি হিসাবে এত উন্নত শিল্পপ্রধান দেশটির অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙে গেল। একটি রাইফেলের বুলেট খরচা না করে এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড হিটলার পেয়ে গেলেন। ইতিহাসে এরও কোন নজির মিলবে না।

মিউনিক চুক্তির কালি শুকোতে না শুকোতেই হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার অবশিষ্ট অংশটিও গ্রাস করতে উদ্যত হলেন। অথচ মিউনিক-এ চতুঃশক্তি বৈঠকে হিটলার সঙ্কুচিত কাট-ছাঁট চেকোশ্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশকে যে কোন সামরিক আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করার গ্যারাণ্টি দিয়েছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে শ্লোভাক অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে চেকোশ্লোভাকিয়াকে আরও অসহায় করে জার্মানীর অনুকম্পা-নির্ভর করার চক্রান্ত সুরু হল। আর জার্মানীর পূর্বাঞ্চলের দিকে অভিযানে এইরূপ তাঁবেদার শ্লোভাক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব খুবই সহায়ক হবে। সুরু হল সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি। চেকোশ্লোভাকিয়াতে একটি জার্মান অনুগত সরকারও স্থাপন করা হল। চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ভেঙে দিলেন এই সরকার। এতে হিটলার যথেষ্ট খুশিও হলেন। গ্রেট ব্রিটেন চেয়েছিল নতুন খণ্ডিত চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমানা রক্ষার গ্যারাণ্টি যৌথভাবে ব্রিটেন, ফরাসী ও জার্মানী দিক। হিটলার আদৌ তাতে রাজী নন। এর পর সদ্যসৃষ্ট স্বায়ত্বশাসিত শ্লোভাক অঞ্চলকে "পূর্ণ স্বাধীনতা" দেবার

প্রস্তাব করলেন স্লোভাক প্রদেশের তাঁবেদার সরকারের নেতারা। তাঁরা জার্মানীর সঙ্গে সর্বপ্রকার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। এদিকে চেকোশ্লোভাক সরকার বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলিকে এক করার উদ্দেশ্যে হিটলারের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন যে, নতুন সরকার সর্বতোভাবে জার্মানীর অভিলাষ পূর্ণ করবে। হিটলার সঙ্গে সঙ্গে চাপ দিলেন বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘ থেকে চেকোশ্লোভাকিয়াকে বার হয়ে আসার জন্য। আরও বলা হল নতুন সরকারকে কমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে,—দেশের সেনাবাহিনী আরও ছেঁটে ফেলতে হবে—ইত্যাদি। আরও অবিশ্বাস্য আবদার একের পর এক উত্থাপন করা হচ্ছিল। যেমন—চেকোশ্লোভাকিয়ায় কোন নূতন শিল্প স্থাপন করতে হলে আগে জার্মান সরকারের অনুমতি নিতে হবে। ইহুদীদের ওপর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে—ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জার্মানীকে বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। জার্মানীর কোন রকম সমালোচনা করা চলবে না। এককথায় চেকোশ্লোভাকিয়া হবে জার্মানীর উপনিবেশ, চেক নাগরিকরা হবে জার্মানীর নয়া গোলাম। ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের গণতন্ত্রীরা, বামপন্থী বিপ্লবীরা, মার্কসবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। রেস্টুরেন্ট, কফি হাউসে চা-কফির কাপে বিপ্লবের তুফান ছুটেছে।

স্লোভাকিয়া ও রুমেনিয়ায় যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন জোরদার হচ্ছিল সেটা এভাবে চলতে থাকলে চেকোশ্লোভাক রাষ্ট্রের অস্তিত্বই লুপ্ত হবে—একথা সেদিনের চেক সরকার বুঝেছিলেন। তাই আর বিলম্ব না করে এই স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলের সরকারকে বরখাস্ত করলেন চেক-প্রেসিডেণ্ট ডঃ হাচা—১৯৩৯ সালের ৬ই মার্চ। এর পরই স্লোভাক-এর প্রধানমন্ত্রী টিসোকে (Tiso) গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিলেন—সমগ্র প্রদেশে সামরিক আইন জারী করতেও দ্বিধাবোধ করলেন না। হিটলারও বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া দখলের জন্য আয়োজন করতে লাগলেন এবং এক চরমপত্রও দিলেন। এদিকে ১৪ই মার্চ (১৯৩৯) নতুন স্বাধীন স্লোভাক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হল। চেক-প্রেসিডেণ্ট ডঃ হাচা হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হল। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার বিশেষ ব্যবস্থাও হল। ডঃ হাচা হিটলার সকাশে পৌঁছবার আগেই জার্মান সেনাবাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-নগরী (**Moravska-Ostrava**) দখল করে নিল। ডঃ হাচা চেক রাষ্ট্রের বাকী

অংশটুকুকে রক্ষা করার জন্যই ছুটে এসেছিলেন হিটলারের কাছে। তাঁর মন পাবার জন্য মাস্তারিক-বেনেসের কঠোর নিন্দা করলেন। তাঁদের চিন্তাধারা ও রাজনীতি যে না-পছন্দ তাও জানালেন। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। হিটলার প্রত্যুত্তরে চেকরা কবে কিভাবে জার্মানীর প্রতি খারাপ আচরণ করেছে সেইসব নানান মন-গড়া সাজান-অভিযোগ একটার পর একটা উত্থাপন করতে লাগলেন। এডুয়ার্ড বেনেসের চিন্তাধারা ও মানসিকতা যেহেতু চেক রাজনীতিবিদ ও শাসকশ্রেণীর মনকে এখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেইহেতু চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। [ See Rise And Fall Of The Third Reich.—Shirer ]

হিটলার ডঃ হাচাকে জানিয়ে দিলেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জার্মান সেনাবাহিনীকে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে যদি চেক-প্রেসিডেণ্ট ধ্বংস এড়াতে চান তাহলে তিনি যেন একটি চুক্তিতে এখনই স্বাক্ষর করেন। চুক্তির খসড়া তৈরী করাই ছিল। হয় জার্মান সেনাবাহিনীর প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে; সেক্ষেত্রে সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই প্রতিরোধ চূর্ণ করা হবে। এতে রক্তপাত ও ধ্বংস অনিবার্য। দ্বিতীয় বিকল্প, শান্তিপূর্ণভাবে বিনা বাধায় জার্মানবাহিনীকে গোটা দেশ দখল করতে দিতে হবে। সেই দ্বিতীয় বিকল্পকে রূপ দেবার জন্যই এই নূতন চুক্তি। প্রেসিডেণ্ট ডঃ হাচা ও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী Chval Kovsky হিটলারের চক্রান্ত বুঝতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। স্পষ্টই বুঝলেন বাঁচার আর কোনই পথ নেই। তিনি সময় চাইলেন দেশে গিয়ে পরামর্শের জন্য। তাঁকে প্রত্যুত্তরে বলা হল তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে ফোনে আলাপ করতে পারেন—পাশেই তো টেলিফোন রয়েছে। ডঃ হাচা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। হিটলারের ভয় হল যদি প্রেসিডেণ্টের এভাবে মৃত্যু হয় তাহলে বিশ্ববাসী মনে করবে তাঁকে জার্মানীতে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করে এনে হত্যা করা হয়েছে। গোয়েরিং ডাক্তার ডেকে পাঠালেন। ইন্‌জেকশন দিয়ে তাঁকে আবার চাঙ্গা করে তোলা হল। তারপরই চুক্তিপত্রটি হাতে গুঁজে দেওয়া হল সই করার জন্য। প্রেসিডেণ্ট ও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হলেন। ১৫ই মার্চ সকালে জার্মান সেনাবাহিনী বিনা বাধায় মোরাভিয়া বোহেমিয়ায় প্রবেশ করল। এইভাবে চেকোশ্লোভাকিয়াকে ধ্বংস করলেন প্রতিহিংসাপরায়ণ হিটলার। সেদিনের মধ্য-ইউরোপে একটিমাত্র রাষ্ট্রে ম্যাসারিক-বেনেসের হাতে-জ্বালা গণতন্ত্রের দীপশিখাটি নিভে

গেল। তৃতীয় রাইখের চ্যান্সেলার হিটলার প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন চেক-প্রেসিডেন্ট ও রাষ্ট্রমন্ত্রীর মত নিয়েই চেকোশ্লোভাকিয়াকে গ্রাস করা হল তাদেরই স্বার্থে শান্তি নিরাপত্তা শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য। বার্লিন থেকে প্রচারিত সন্ধ-স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্রটিতে বলা হল :

"The conviction was unanimously expressed on both sides that the aim of all efforts must be the safeguarding of calm order and peace in this part of Central Europe. The Czechoslovak President declared that in order to save this object and to achieve ultimate pacification, he confidently placed fate of the Czech people and the country in the hands of the Fuehrer of the German Reich. The Fuehrer accepted this declaration and expressed his intention of taking the Czech people under the protections of the German Reich and of safeguarding them an autonomous development of their ethnic life as suited to their character."

মোদ্দা কথা দু' পক্ষ সম্পূর্ণ একমত হয়েই মধ্য-ইউরোপে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্মান রাইখের অন্তর্ভুক্ত করা হল। তবে চেক জাতি স্বায়ত্বশাসনের অধিকারের মাধ্যমে নিজেদের জীবনধারা পদ্ধতির ক্রমবিকাশের ও উন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না অবশ্য। চেক রাষ্ট্রপ্রধানের দৃঢ় বিশ্বাস এই সঙ্কটে সমগ্র চেক জাতি ও রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব ভবিষ্যৎ জার্মান ফুরারের হাতেই সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া কর্তব্য।

এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরের দিনই বোহেমিয়া মোরাভিয়াকে স্বায়ত্বশাসনের যে গ্যারান্টি দেওয়া হল তা কেড়ে নেওয়া হল। এর পরের ধাপে হিটলার শ্লোভাকিয়া অঞ্চলকেও জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। রুদেনিয়া রিবেনট্রপের পরামর্শমতই হাঙ্গেরীয় সেনাবাহিনী ১৫ই মার্চ দখল করল। ২৩শে মার্চ বার্লিনে শ্লোভাকিয়া ও জার্মানীর মধ্যে "Treaty of Protection" স্বাক্ষরিত হল। শ্লোভাকিয়ায় ২৪ ঘণ্টার যে স্বাধীনতা ষড়যন্ত্রের সুড়ঙ্গপথে চুপিসাড়ে এসেছিল সেই ষড়যন্ত্রের সুড়ঙ্গপথেই তা হরণ করা হল। মহানাটকের চরিত্রগুলি হিটলার আগে থেকে সাজিয়ে রেখেছিলেন মাত্র। তাদের স্ব-স্ব ভূমিকার অভিনয় যেমন শেষ হল মহানাটকের যবনিকা তখনই পাত হল। স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়া বিলুপ্ত হল। মিউনিক চুক্তির আগে

হিটলার জানিয়েছিলেন পররাজ্য গ্রাসে তাঁর আর কোন রুচি নেই। তবে স্থদেতেন অঞ্চল জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। চেম্বারলেন, রুন্সিম্যান, হেণ্ডারসন, দালাদিয়ের হিটলারকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছিলেন। মিউনিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে চেম্বারলেন যখন নিজের দেশে ফিরে এলেন তখন বিজয়ীর সম্বর্ধনা পেলেন। তিনি নাকি যুদ্ধ এড়িয়েছেন, শান্তি রক্ষা করতে পেরেছেন শেষ পর্যন্ত, স্থদেতেন অঞ্চলকে উপঢৌকন দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়াকে বাঁচিয়েছেন! বিনা যুদ্ধে শুধু প্রতারণা, চক্রান্ত, যুদ্ধের ভয়াল পরিণতির হুমকীর কথা বার বার দুর্বল প্রতিপক্ষকে শুনিয়ে প্রতিরোধ-স্পৃহা ও স্বাধীন জাতির দুর্জয় সঙ্কল্পকে চূর্ণ করে দিয়ে এক বছরের মধ্যে অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করে নিল জার্মানী। তোষণনীতি ও শান্তির নামে নাটুকেপনার পরিণতি কি হতে পারে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ বুঝে নিলেন। পারস্পরিক সহযোগিতার গ্যারাণ্টি থাকা সত্বেও ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এগিয়ে আসেনি দুর্বলকে প্রবলের লৌহহস্তের বজ্রমুষ্টির নিষ্পেষণ থেকে রক্ষা করার জন্য। অনাক্রমণ-চুক্তি, মৈত্রী-চুক্তি পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি অনেক সময় একটি শক্তিশালী শিল্পোন্নত আধুনিক রাষ্ট্রের জনগণ ও শাসকশ্রেণীর মনে আত্মসন্তুষ্টি ও আত্মপ্রবঞ্চনার কোলে নিশ্চিন্তে মাথা গুঁজে থাকার মানসিকতা সঞ্চারিত করে থাকে। আমরা তো একা নই আমাদের পেছনে "বড় দাদা" ( Big brother ) আছে, এই ভাব পেয়ে বসে। "সহযোগিতার চুক্তিতে" ( Mutual Assistance Treaty ) যে যে রাষ্ট্র আবদ্ধ হল তাদের শাসকশ্রেণীর মধ্যে আদর্শ বা আইডিয়ার বন্ধন সব সময় থাকে? ১৯০৮ সালে যে ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণী গর্ব করে বলে বেড়াতেন "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য অস্ত যায় না"—যে শাসকশ্রেণী নির্মম ঔপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছিল সেই শাসক-শ্রেণীর সঙ্গে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী এডুয়ার্ড বেনেস ও তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে চুক্তির ভিত্তি কি? নিছক কূটনীতি? না, একটি মহৎ জীবনদর্শনের। রাজনৈতিক মূল্যবোধের উপলব্ধি উদ্ভূত অবিভাজ্য সৌভ্রাতৃত্বের স্বতঃপ্রবৃত্ত চুম্বকের আকর্ষণ। ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পরিচালকমণ্ডলী কোন্ নৈতিক শক্তির ভিত্তিতে হিটলারের পররাজ্যলিপ্সা প্রতিহত করবে? পেরেছিল তারা মুসোলিনির আবিসিনিয়া ধর্ষণ প্রতিহত করতে? উপনিবেশগুলির লুঠ-করা-ধনে নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছিল ইংরেজ জাতি। সে জাতির প্রধানমন্ত্রী কোন্ মুখে মুসোলিনির আবিসিনিয়ায়

অনুষ্ঠিত নরমেধযজ্ঞ প্রতিহত করবে? ১৮৭০ সাল থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে ব্রিটেন কতগুলি স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা লুণ্ঠন করে নিজ অন্তর্ভুক্ত করেছে! বালুচিস্তান, বর্মা, সাইপ্রাস, Wei-hai-wei, হংকং, কুয়াইত, উত্তর গিনি, পূর্ব গিনি, দক্ষিণ গিনি, রোডেসিয়া, নাইজিরিয়া, ব্রিটিশ মধ্য-আফ্রিকা, ট্রান্স্‌ভ্যাল, অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট, ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড, সুদান, উগাণ্ডা, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জ, জাঞ্জিবার ইত্যাদি। মোট বিশ্বের ⅕ অংশ তার দখলে গিয়েছিল। ১৭৮৮ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ভারতে বাণিজ্য-লুণ্ঠনের পথ বাধামুক্ত রাখার জন্যে গ্রেট ব্রিটেন কমপক্ষে ২০ বার যুদ্ধ বা সামরিক অভিযান চালিয়ে এসেছে। আমেরিকা পানামা খাল, ফিলিপাইন টেক্সাস দখল করেছিল। ব্রিটিশ সরকার কি মিশরে ষড়যন্ত্রের জাল বোনেনি, এডেন গ্রাস করেনি? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অব্যাহত রাখেনি?

কূটনীতি দিয়ে সাময়িক দুর্যোগকে এড়ান যেতে পারে, তার প্রয়োজনও আছে। আবার জীবনযুদ্ধের মহাসাগরে কূটনীতির অদৃশ্য টরপেডো বড় বড় রাষ্ট্রীয় অর্ণবকে ডুবিয়ে দিয়েছে। কূটনৈতিক সখ্যতা আর আদর্শগত মৌলিক বোঝাপড়া এক জিনিস নয়। স্বাক্ষরপ্রদানকারী দুই "বন্ধু-রাষ্ট্রের" লক্ষ্য ও আদর্শ কি একই ধরনের (Fundamental State interest)? কূটনৈতিক সহযোগিতা ও মৈত্রীচুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে দুটি 'জাতি' কিছু পথ অতিক্রম করতে পারে, কিন্তু সবটা নয়। কূটনীতিতে তার প্রয়োজনও আছে। কিন্তু তা নিয়ে মাতামাতি করা বা তার ওপর নির্ভর করে আত্মসন্তুষ্ট হয়ে থাকা মারাত্মক ভুল। মৌল স্বার্থের ও ভাবধারার বোঝাপড়া না থাকলে কিছুদিন পরেই কোন না কোন সঙ্কটের মুখে স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে হতচকিতের ভান করলে ইতিহাস ক্ষমা করে না। ইতিহাসে এমনটি বার বারই হয়েছে। ইংরেজ, ফরাসী ও রুশ জাতি মৈত্রী ও বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতার চুক্তি সত্ত্বেও চেক জাতিকে বাঁচাবার জন্য অস্ত্রধারণ করেনি একই কারণে। যেখানে এই সৌভ্রাতৃত্ব ও 'আইডিয়ার' অচ্ছেদ্য বন্ধন থাকে না সেখানে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরপ্রদানকারী দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অনিবার্যভাবেই এই চিন্তা জন্ম নেয়: কে ভরসার 'দাতা', আর কে এই ভরসার 'গ্রহীতা'? এই ধরনের চুক্তি নিঃসন্দেহে ভরসা জাগায়—সম্ভাব্য আক্রমণকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার করে একটা নূতন শক্তির ভারসাম্যও সৃষ্টি করে। এই দাতা-গ্রহীতা মনস্তত্ত্বের চোরাবালির ওপর প্রতিষ্ঠিত বহু মিত্রতার মঞ্জিল অচিরেই

ধ্বসে গেছে। যেখানে আদর্শের মৌলিক মিল আছে—সেই আদর্শের পেছনে সেখানে চুক্তিতে আবদ্ধ দুই দেশের জনগণের মনে সেই আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, জ্বলন্ত বিশ্বাস ও আবেগ সৃষ্টি করতে হয় শান্তি ও সমৃদ্ধির গ্যারান্টিরূপে।

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বন্ধুত্ব, জাতিতে জাতিতে মৈত্রীও ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের মত প্রতিনিয়ত ঝালাই করা যাচাই করার প্রয়োজন সাপেক্ষ। বন্ধুত্ব-চুক্তি হল বলেই আত্ম-সন্তুষ্ট বা নিশ্চেষ্ট হলে চলে না। নিজের শক্তির ওপর নিজেকে দাঁড়াতেই হবে। তত্ত্বের চাইতে জীবন বড়। জীবনের প্রয়োজনেই তত্ত্ব। জীবনের তাগিদ এই শিক্ষা দেয়—শুধু আইডিয়ার জোরেই জাতি বাঁচে না। 'আইডিয়াকে' বাঁচাবার জন্য চাই শক্তির আরাধনা। বাহুবলে বলীয়ান মত্ত মাতালের মাতলামি শুধু 'আইডিয়ার' মাহাত্ম্য কীর্তন করে, নিজের উদারতা অহিংসা নির্দোষিতার প্রমাণ দিয়ে দুনিয়ার কাছে জাহির করে কেউ কোনদিন রুখতে পারেনি—রোখা যায় না। নেকড়ের কাছে মেষশাবকের ভূমিকা নেবার অর্থ নেকড়েকে তার স্বভাবসুলভ আচরণে প্রলুব্ধ করা।

বন্ধুত্ব-চুক্তি (Pact of Co-operation) মানে সমালোচনার মুখ বন্ধ করা নয়। বন্ধুরই ধর্ম ও কর্তব্য বন্ধুর ভুল-ত্রুটি বিচ্যুতি ধরিয়ে দিয়ে তা সংশোধন করা। নতুবা "আমাদের বন্ধু, তা সে ভুলই করুক আর ঠিকই করুক"—'Our friend right or wrong'—এই অযৌক্তিক মনোভাব গড়ে ওঠে। অন্যায় দেখেও চোখ বুজে থাকা কখনই সমর্থনযোগ্য আচরণ হতে পারে না। দেশের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যেও জাতির চরিত্র-পৌরুষ, তার আদর্শবাদিতা (Idealism) ফুটে ওঠা চাই। নতুবা সাময়িক স্বার্থ-নির্ভর এবং পরিবর্তনশীল কোন নীতি বা কর্মসূচীর উপযোগিতা, সাময়িক বাঞ্ছনীয়তা একটি জাতির "আদর্শ" হয়ে দাঁড়ায়। এই 'এক্স্‌পিডিয়েন্সী'কে একটি জাতি যখন 'প্রিন্‌সিপল্‌' বা নীতির ঊর্ধ্বে স্থান দেয় তখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বহু অনাচারের পথও তৈরী হতে থাকে। পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই জাতির সুন্দর কল্পনা, আদর্শ-পরায়ণতা প্রতিফলিত না হয় তাহলে বন্ধুত্ব চুক্তির বা প্রচ্ছন্ন সামরিক চুক্তির আড়ালে দুই রাষ্ট্রই বা চুক্তিতে স্বাক্ষরপ্রদানকারী যে-কোন একটি রাষ্ট্র অপর বন্ধু-রাষ্ট্রের 'স্বার্থকে' বাঁচিয়ে নিজের সম্প্রসারণশীল জঙ্গী উগ্র জাতি-রাষ্ট্র-স্বার্থকে চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হতে পারে। এ জিনিস রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির আড়ালে সংঘটিত হয়েছিল।

ইতিহাসের বিস্ময়কর পুনরাবৃত্তি ঘটল এই স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়ার মাটিতেই—১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে। ১৯৩৯ সালে জার্মান সেনাবাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়া বিনা বাধায় বিনা প্রতিরোধে গ্রাস করেছিল নাৎসী সরকারের নির্দেশে। ১৯৬৮ সালের ২০শে আগস্ট ওয়ারশ' জোটভুক্ত দেশগুলির ৬ লক্ষ সৈন্য নিয়ে রুশ লাল ফৌজ ও তার বিপুল সাঁজোয়া বাহিনী চেক ভূখণ্ডে প্রবেশ করে সে দেশের সার্বভৌমত্ব লুণ্ঠন করল, 'মানবতাবাদী' কমিউনিস্ট নেতা ডুবচেক ও তাঁর দলের নির্দেশিত পথে গণতন্ত্রের ও মানবতাবাদের সোপান বেয়ে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছবার সাধনার অধিকার রুশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা কেড়ে নিলেন। ১৯৩৯ সালে সুদেতেন জার্মান অঞ্চলটি জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করার পর প্রেসিডেণ্ট এডুয়ার্ড বেনেস দেশ ছেড়ে পালাবার পর ডঃ এমিল হাচা চেক রাষ্ট্র-প্রধান হলেন। কি কুৎসিত চক্রান্ত করে হিটলার ডঃ হাচা ও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলপূর্বক বার্লিন শহরে আনিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার আত্মহননের প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়াকে গ্রাস করেছিলেন সে বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতাকামী সমাজতান্ত্রিক নেতা ডুবচেকের অবস্থাও প্রকারান্তরে তাই হয়েছিল। দেশের সর্বজনমান্য এই নেতা ও দেশভক্ত তাঁর ও মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা হল রুশ সরকারের নির্দেশে। তার জায়গায় এক রুশ অনুগত তাঁবেদার কাঠপুতুলি সরকার স্থাপিত হল। ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে 'দ্বিতীয় মিউনিক চুক্তি' স্বাক্ষরিত হল। ১৯৩৯ সালে স্বাধীনতাকামী চেক জাতি জার্মানদের যে চোখে দেখত, ১৯৬৮ সালের আগস্টের পর রুশদেরও সেই চোখে দেখলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

১৯৩৯ সালে নাৎসীবাদী জার্মানরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় বলপূর্বক প্রবেশ করেছিল 'শান্তি-শৃঙ্খলা' রক্ষার নামে—'রক্ষকের' ভূমিকায়, ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে রুশ সেনাবাহিনী প্রাগ-নগরীতে প্রবেশ করল সমাজতন্ত্রের 'বিচ্যুতি'র হাত থেকে 'খাঁটি সমাজতন্ত্র'কে রক্ষা করার জন্যে! হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়া ধর্ষণের সমর্থনে ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ সুদেতেন জার্মান। চেকো-শ্লোভাকিয়ার রুশ অভিযানের সমর্থনে ছিল ডুবচেক-বিরোধী স্তালিনবাদী রুশ অনুগামী চেক কমিউনিস্ট ও তাদের সমর্থকরা। হিটলার, রিবেনট্রপের সঙ্গে ডঃ হাচা ও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর যে প্রতারণামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে

অজুহাত হিসাবে বলা হয়েছিল আইন-শৃঙ্খলার দারুণ অবনতি, শান্তি-নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা। "Fuehrer expressed his intention of taking the Czech people under the protection of German Reich and for guaranteeing them an autonomous development of their ethnic life as suited to their character."

এডুয়ার্ড বেনেসের স্থলাভিষিক্ত প্রেসিডেন্ট ডঃ এমিল হাচা চেক জাতির নিরাপত্তা শান্তি স্বাধীনতা শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব জার্মান ফুরারের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। ১৯৬৮ সালে রাশিয়া 'সীমিত সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের' ভিত্তিতে (Doctrine of limited sovereignty) সে দেশে লাল ফৌজ পাঠিয়েছিল। এই তত্ত্বের মূল কথা :

"...When external and internal forces hostile to socialism try to turn the development of a given socialist country in the direction of a restoration of the capitalist system, when a threat arises to the cause of socialism in that country—a threat to the security of the socialist Commonwealth as a whole—this is not merely a problem of that country's people, but a common problem—the concern of all socialist countries." ( Pravda, Nov. 13, 1968 )

চেকোশ্লোভাকিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী ও অধিকার এই সোস্যালিস্ট কমনওয়েলথ-এর মৌল স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করাতে সোভিয়েট রাশিয়া ও অন্যান্য সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালনের তাগিদে—চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণকে রক্ষার জন্য এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য এইভাবে রুশ লাল ফৌজ পাঠাতে হয়েছে! [ Pravda, Sept. 26, 1968 ] হিটলার ও রুশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের আচরণের মধ্যে কোন নীতিগত মৌল পার্থক্য কি আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে?

Czechoslovak "Self-determination" had infringed, "vital interest" of the Commonwealth and required the Soviet Union and the socialist states in fulfilment of their international duty to the fraternal peoples of Czechoslovakia and in defence of their own socialist gains ...to act. শুধু কথার মার-প্যাঁচ। আক্রমণকারীর কি কখনও ছলের অভাব হয়? সোস্যালিস্ট

কমনওয়েলথ-এর "মৌল স্বার্থের" মূল্যায়নের শেষ ও চূড়ান্ত ভার কার বা কোন্ রাষ্ট্রের? সেই তথাকথিত "মৌল স্বার্থ" লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা সেটাই বা বিচারের দায়িত্বভার কার? ১৯৩৯ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বার্থ, তার ভাল মন্দ বিচারের দায়িত্ব ইতিহাস-বিধাতা হিটলার তথা নাৎসী জার্মানীর ওপর অর্পণ করেছিলেন। ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে সেই বিধাতা সেই দায়িত্বই চাপিয়ে দিলেন রুশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের ওপর!

## ১৫

### (ক) হিটলার-স্তালিন মৈত্রী চুক্তি

এবার রুশ-জার্মান মৈত্রী চুক্তি কিভাবে ও কি পরিস্থিতিতে সম্পাদিত হয়েছিল সেটা দেখা যাক। ১৯৩৯ সালের ১৫ই আগস্ট রাত আটটার সময় জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের কাছ থেকে একটি অতি গোপন জরুরী টেলিগ্রাম নিয়ে মস্কোস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূত ভন ডার শূলেনবুর্গ ( Von der Schulenburg ) সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ সকাশে হাজির হলেন রুশ-জার্মান সম্পর্কের উন্নতি সাধনের প্রস্তাব নিয়ে। জার্মান সরকারের মৈত্রী স্থাপনের আগ্রহকে রুশ সরকার "গভীরতম আগ্রহের সঙ্গে" ( "with the greatest interest" ) গ্রহণ করলেন। রুশ সরকারের সঙ্গে জার্মান সরকারের মৈত্রী স্থাপনের এই আকাঙ্ক্ষাকে রুশ সরকার অভিনন্দিতও করলেন ( "Warmly welcomed German intention of improving relations with Soviet Union" )। কিন্তু চতুর কূটনীতিবিদ জার্মান সরকারের আগ্রহকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে চাইলেন। ভন্ রিবেনট্রপ রাশিয়ায় পায়ের ধুলো দেবেন এ তো উত্তম কথা! কিন্তু মলোটভ প্রস্তাব করলেন ভন শূলেনবুর্গের কাছে এই বলে যে: উভয় পক্ষ থেকেই যথোচিত প্রস্তুতি প্রয়োজন যাতে মৈত্রী আলোচনা সত্যি সত্যি ফলপ্রসূ ও কায়েমী হয় ( "required adequate preparations in order that the exchange of opinions might lead to results." )।

একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—সমাজতন্ত্রের মৌল আদর্শ পরিপন্থী অপর একটি সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের কাছ থেকে মৈত্রী আলোচনার অলিখিত অনুচ্চারিত শর্ত হিসাবে কী ফলের প্রত্যাশা করছিলেন?

এ সম্পর্কে এক প্রখ্যাত গ্রন্থকারের মন্তব্য উল্লেখ্য:

"What results? The wity Russian dropped some hints. Would the German Government, he asked (meaning Molotov), be interested in a non-aggression pact between the two·

countries? Would it be prepared to use its influence with Japan to improve Soviet-Japanese relations and "eliminate border conflicts"?—A reference to an undeclared war which had raged all summer on the Manchurian-Mongolian frontier. Finally, Molotov asked how did Germany feel about a joint guarantee of the Baltic States?

All such matters he concluded, must be discussed in concrete terms so that, should the German foreign minister come here, it will not be a matter of an exchange of opinions but of making concrete decision. And he stressed again that adequate preparations of the problems is indispensable." [Rise And Fall Of The Third Reich—By William L. Shirer, Pp. 631-32]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় মলোটভ এক দূরপাল্লার প্যাটোয়ারী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দর কষতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনিই প্রকারান্তরে রুশ-জার্মান মৈত্রী চুক্তির প্রস্তাবক। বিস্তৃত ফলদায়ী চুক্তির দিকেই রুশ সরকারের আসল লক্ষ্যটা ছিল। তিনি জানতে চেয়েছিলেন জার্মানী কি এই ধরনের মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হতে রাজী? দূর-প্রাচ্যে রাশিয়া ও জার্মানীর সম্ভাব্য সকল সীমান্ত সংঘর্ষকে দূরীভূত করতে খুবই আগ্রহী ছিলেন রুশ সরকার। হিটলার-স্তালিন দোস্তির সুযোগে সেই গ্যারান্টি আদায় করা যায় কি করে সেটা ভাবছিলেন এই চতুর কূটনীতিবিশারদ। লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া এইসব বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধে যৌথ গ্যারান্টির কথাও তিনি পাড়তে ছাড়েননি। এই ধরনের মৈত্রী চুক্তির প্রস্তাব এলো শেষ পর্যন্ত রুশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে, যখন কিনা রাশিয়া জার্মান সম্প্রসারণ-বাদকে প্রতিহত করার জন্য ইংলণ্ড ও ফরাসী রাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন। রাজনীতির ছাত্রদের কাছে এটা খুবই অদ্ভুত বলে হয়ত মনে হবে। মলোটভের প্রস্তাব তো সম্প্রসারণবাদী হিটলারের কাছে নিশ্চয়ই লুফে নেবার মত। আর শেষ পর্যন্ত হলও তাই। মলোটভ সময় নিচ্ছিলেন, কিন্তু হিটলার ক্ষিপ্র-গতিতে কাজ সারতে চাইছিলেন। আলোচনার সারমর্ম শুনেই রিবেনট্রপ ফুয়ারের সঙ্গে দেখা করলেন তাঁর নির্দেশের জন্য—গ্রীষ্মকালীন কার্যালয়—ওবারসাল্‌জবার্গ-এ (Obersalzberg)।

শুলেনবুর্গকে পরের দিনই নির্দেশ দেওয়া হল মলোটভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জার্মান সরকারের বক্তব্য জানাবার জন্য: "...that Germany is prepared to conclude a non-aggression pact with the Soviet Union and if the Soviet Government so desire, one which would be undenounceable for a term of twenty-five years. Further, Germany is ready to guarantee the Baltic States jointly with the Soviet Union. Finally, Germany is prepared to exercise influence for an improvement and consolidation of Russo-Japanese relations." [ Rise And Fall Of The Third Reich. ]

রুশ সরকার আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুতির অজুহাতে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের সঙ্গে গোপনে আলোচনাও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) ব্রিটিশ ও ফরাসী সামরিক মিশন (Anglo-French Military Mission) আলোচনার জন্য মস্কোতে হাজির। হিটলার অনাক্রমণ চুক্তি করে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন পোল্যাণ্ড আক্রমণের পূর্বাহ্ণে যাতে রাশিয়া তার বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে পেছন থেকে এই আক্রমণের মুখে জার্মানীর ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়ে। হিটলার ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ স্বরু করবেন। তাই তার আগে যেভাবে হোক এই মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হওয়া একান্ত দরকার। মলোটভ শুলেনবুর্গকে জানালেন:

প্রথম ধাপে: বাণিজ্য ও অর্থ সাহায্য চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। দ্বিতীয় ধাপে: অনাক্রমণের চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। জার্মান সরকার তড়িঘড়ি করে ১৮ই আগস্ট বার্লিন শহরে বাণিজ্য চুক্তিতে সামিল হলেন। স্থতরাং দ্বিতীয় ধাপের পথ প্রশস্ত হল এবার। ধৈর্যহারা রিবেনট্রপ মলোটভের অবগতির জন্য এক জরুরী বার্তায় জানালেন:

"Please emphasize that German foreign policy has to-day reached a historic turning point......please press for a rapid realization of my journey and oppose appropriately any fresh Russian objections. In this connection must keep in mind the decisive fact that an early outbreak of open German-Polish conflict is possible and that we, therefore, have the greatest interest in having my visit to Moscow take place immediately."

রিবেনট্রপ কেন এত তাড়াতাড়ি মস্কোতে গিয়ে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করতে চান তার স্পষ্ট ইংগিত এই বার্তাতেই ছিল। নাৎসী জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণের ক্ষেত্র ও নানান অজুহাত তৈরী করছিল। জার্মান-পোল সংঘর্ষ প্রত্যাসন্ন; অতএব আর দেরী নয়। ১৯শে আগস্ট "খুব গোপন ও জরুরী" টেলিগ্রাম মস্কো থেকে এলো। শুলেনবুর্গ জানালেন যে, রাশিয়া জার্মান প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে এবং মলোটভ-প্রস্তাবিত "অনাক্রমণ" চুক্তির একটি অগ্রিম খসড়াও পাঠিয়ে দিলেন। ১৯৩৯ সালের ২০শে আগস্ট হিটলার স্তালিনকে লিখিত এক পত্রে জানালেন:

"I sincerely welcome the signing of the new German-Soviet commercial agreement as the first step in the reshaping of German-Soviet relations.…I accept the draft of the non-aggression pact that your Foreign Minister M. Molotov handed over but consider it urgently necessary to clarify the questions connected with it as soon as possible. The substance of the supplementry protocol desired by the Soviet Union can, I am convinced, he clarified in the shortest possible time if a responsible German statesman can come to Moscow himself to negotiate.……

The tension between Germany and Poland has become intolerable……A crisis may arise any day……

In my opinion, it is desirable in view of the intentions of the two States to enter into a new relationship to each other, not to lose any time. I, therefore, again propose that you receive my Foreign Minister on Tuesday, August 22, but at the latest on August 23. The Reich Foreign Minister has the fullest powers to draw up and sign the non-aggression pact as well as the protocol. A longer stay by the Foreign Minister in Moscow than one or two days atmost is impossible in view of the international situation .."
( Adolf Hitler ).

আমি রুশ-জার্মান বাণিজ্য চুক্তিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, আর এই চুক্তি

রুশ-জার্মান সম্পর্ককে নূতন রূপ দান করার পক্ষে একটি পদক্ষেপ।...মলোটভ যে অনাক্রমণ চুক্তির খসড়াটি পাঠিয়েছেন তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বিষয় নিয়ে বোঝাপড়ার প্রয়োজন আছে। আর সেটা খুব তাড়াতাড়ি করাও দরকার। একজন শীর্ষস্থানীয় জার্মান রাজনীতিবিশারদের মস্কোতে গিয়ে আলোচনা করা দরকার প্রশ্নগুলি নিয়ে। খুব দ্রুত না করতে পারলে মীমাংসা সম্ভব হবে না।...জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। জার্মানী বেশিদিন আর সহ্য করবে না। যে কোন মুহূর্তে সঙ্কটের সূচনা হতে পারে জানবেন। এই পরিস্থিতিতে—যেহেতু দুই রাষ্ট্রই আগ্রহী—নূতন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে, আমি মনে করি, আর কালহরণ করা চলে না। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভন রিবেনট্রপের সঙ্গে আপনার সরকার ২২শে না হলে ২৩শে আগস্ট আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিক এই প্রস্তাব আবার করছি। রিবেনট্রপকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েই পাঠান হবে চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য। দু' একদিনের বেশি রিবেনট্রপ মস্কোতে থাকতেও পারবেন না জানবেন—কেননা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমশই জটিলতর হয়ে উঠছে।” (এ্যাডলফ্ হিটলার)

পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে নাৎসী জার্মানীর চ্যান্সেলার কয়েকদিনের মধ্যে কি করতে চলেছেন সেটা বুঝতে অন্তত ঝুনো রাজনীতিবিশারদ স্তালিন বা মলোটভের কোনই অসুবিধা হয়নি। এত তড়িঘড়ি করে এ ধরনের একটা “ঐতিহাসিক” চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে সেদিনের সেই জটিল বিশ্ব-পরিস্থিতিতে ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

২১শে আগস্ট স্তালিনের জবাব এসে গেল। তিনিও এ্যাডলফ্ হিটলারকে ধন্যবাদ জানালেন তাঁর জরুরীবার্তার জন্য। তিনি লিখলেন:

...“I hope that the German-Soviet non-aggression pact will bring about a decided turn for the better in the political relations between the two countries. The peoples of our countries need peaceful relations with each other. The assent of the German Government to the conclusion of a non-aggression pact provides the foundation for eliminating the political tensions and for the establishment of peace and collaboration between our countries.

"The Soviet Government have instructed me to inform you that they agree to Herr Von Ribentrop's arriving in Moscow on August 23." ( J. Stalin. )

স্তালিনের আশা এই অনাক্রমণ চুক্তি সুনিশ্চিতভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সন্তোষজনক ও কল্যাণকর পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। এই চুক্তি, স্তালিনের বিশ্বাস, উত্তেজনা দূরীকরণে এবং শান্তি ও মৈত্রীর ভিত্তি সুদৃঢ় করতে সাহায্য করবে। তাই স্তালিন হিটলারের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে জানিয়ে দিলেন ২৩শে আগস্ট (১৯৩৯) রিবেনট্রপ যেন মস্কো পদার্পণ করেন চুক্তি সম্পাদনের জন্য। হিটলার-রিবেনট্রপের চাপের কাছে স্তালিন-মলোটভ নতি স্বীকার করলেন। এই চুক্তি সম্পাদিত না হলে ইউরোপের ইতিহাসের মোড় ঘুরে যেতো সেদিন একথা মনে করার যথেষ্ট জোরাল কারণ আছে। রতনে রতন চিনেছিল। উইলিয়াম শিরার ( William L. Shirer ) মন্তব্য করেছেন :

"For sheer cynicism the Nazi dictator had met his match in the Soviet despot. The way was now open to them to get together to dot the i's and cross the t's on one of the crudest deals of this shabby epoch." [ Rise And Fall Of The Third Reich ; P. 640 ]

হিটলার যুদ্ধের এতবড় ঝুঁকি নিলেন কেন, যখন তিনি নিজেই জানতেন এই যুদ্ধকে বেশিদিন টেনে নিয়ে যাবার মত অবস্থা জার্মানীর ছিল না? ইউরোপীয় রাজনীতি পর্যালোচনা করে তিনি বুঝেছিলেন তৎকালীন অবস্থাটা সবদিক দিয়ে জার্মানীর অনুকূলে। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ইতালী, ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে ঈর্ষা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ফরাসীদেশ কিছু করে উঠতে সাহস পাবে না। ইংলণ্ড তো একেই সঙ্কটের মুখোমুখি। ফরাসী দেশের অবস্থাও শোচনীয়। যুগোশ্লাভিয়া তো পতনোন্মুখ, ধুঁকছে। রুমানিয়াও যথেষ্ট দুর্বল। তুরস্কের কামাল পাশার মৃত্যুর পর তুরস্ক খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল; তার উপর ছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই অবস্থার সুযোগ নিতে হবে। তার ওপর ছিল হিটলারের নিজস্ব প্রভাব ও ক্ষমতা। অতীতে কোন জার্মান রাষ্ট্র-নেতার হাতে এই অপরিসীম রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়নি। ক্ষিপ্রগতিতে ঝটিকা আক্রমণের দ্বারা গোটা ইউরোপকে পদানত করার নেশা তাঁকে পাগল করে তুলল। ইংলণ্ড ও

ফরাসী দেশ কি প্রতিরোধ করতে পারবে? হিটলারের চিন্তায় দু'টি বিকল্প পথ উন্মুক্ত ছিল সেদিন এই দুই রাষ্ট্রের সামনে: (১) অবরোধ (blockade)। কিন্তু যেহেতু জার্মানী আপাতত সব দিক দিয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ (self-sufficient) সেই হেতু অবরোধের কর্মসূচী নিয়ে জার্মানীকে বেকায়দায় ফেলা যাবে না। (২) পশ্চিম ইউরোপের ম্যাজিনো লাইন (Maginot Line) থেকে প্রত্যাক্রমণ। কিন্তু হিটলার সুনিশ্চিত ছিলেন এটা কখনই সম্ভব হবে না। অপর আর একটি সম্ভাবনার কথাও হিটলারের মনে উঁকি দিয়েছিল। সেটি হল—ডাচ, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন। হিটলার বুঝেছিলেন ইংলণ্ড বা ফরাসীদেশ এই সব দেশের নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন করতে সাহসী হবে না, এবং জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে ইংলণ্ড বা ফরাসী সরকার পোল্যাণ্ডের সাহায্যে সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসবে না।

আর রাশিয়া? রাশিয়া সম্বন্ধেও তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন যে, সে দেশ গ্রেট-ব্রিটেন ও ফরাসী দেশের রাষ্ট্র-নায়কদের কথায় বিশ্বাস করে জার্মানীর বিরুদ্ধে যাবে না। পোল্যাণ্ডের অখণ্ডতা রক্ষার ব্যাপারে রাশিয়ার বিন্দুমাত্র কোন উৎসাহ ছিল না। পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদ থেকে লিটভিনভের অপসারণ হিটলারের কাছে বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল। হিটলার বলেছিলেন:

"Destruction of Poland has priority···Even if war breaks out in the West, the destruction of Poland remains the primary objective.······In starting and waging a war it is not right that matters but victory."

পোল্যাণ্ডকে ধ্বংস করাই প্রধান কাজ—সে দেশকে ধ্বংস করতেই হবে। যুদ্ধে ন্যায় আদর্শ নীতির কথা তোলা বাতুলতামাত্র। যুদ্ধজয়ের সাফল্য দিয়েই সব কিছু যাচাই হয়ে থাকে। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও অনিবার্য সংঘর্ষ তত্ত্ব বুঝতে হলে ইতিহাসের পাতাগুলো উল্টান দরকার। মস্কোর তত্ত্বকথা ও আচরণের গরমিল বুঝতে হলে রুশ-জার্মান চুক্তির আরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

১৯৩৯ সালের ২৩শে আগস্ট রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সাধিত হল, সেই দলিলে সই করলেন স্বয়ং স্তালিন এবং জার্মান প্রতিনিধি ভন রিবেনট্রপ। সেই সঙ্গে গভীর গোপনীয়তা রক্ষা করে স্বাক্ষরিত হল আর একটি মারাত্মক গোপন চুক্তি (Secret Additional Protocol)। তাতেও সই করলেন এই দুই রাষ্ট্র-নেতা। এই গোপন দলিলের পরিচয় পাওয়া গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

সমাপ্তির পর। এই চুক্তির মুখবন্ধের পরই সংযোজিত হল চারটি সিদ্ধান্ত ( conclusion )। সেগুলি নিয়ে উদ্ধৃত করা হল :

1. In the event of a territorial political rearrangement in the areas belonging to the Baltic States ( Finland, Estonia, Latvia, Lithuania ) the northern boundary of Lithuania shall represent the boundary of the spheres of influence of Germany and the U. S. S. R. In this connection the interest of Lithuania in the Vilna area is recognised by each party.

2. In the event of a political and territorial rearrangement of the area belonging to the Polish State the spheres of interest of Germany and the U. S. S. R shall be bounded approximately by the line of the rivers Narew, Vistula and San.

The question of whether interest of both parties make desirable the maintenance of an independent Polish state and how such a state should be bounded can only be definitely determined in the course of further political developments.

In every event both Governments will resolve the question by means of a friendly agreement.

3. With regard to Southern Eastern Europe attention is called by the Soviet side to its interests in Bessarabia. German side declares its complete political disinterestedness in these areas.

4. This Protocol shall be treated by both parties as strictly secret.

For the German Government Von Ribentrop. ( Rise And Fall Of Stalin : P. 559 )

[ MOSCOW ; August 23, 1939 Plenipotentiary of the U. S. S. R., V. Molotov. ]

চমৎকার ব্যাপার ! পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া —কোন দেশই কিছু জানতে পারল না। মস্কোতে বসে দুই জঙ্গী রাষ্ট্রের

কর্ণধাররা ২৪শে আগস্ট তাঁদের ভাগ্যাকাশের উদীয়মান প্রভাত-সূর্যকে যখন অভিনন্দন জানাচ্ছেন তখন চুক্তিতে উল্লিখিত অপর রাষ্ট্রগুলির ভাগ্যসূর্য রক্তলাল পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল!

পোল্যাণ্ড ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি—কোন্‌টা নাৎসী-জার্মানীর ভাগে পড়বে আর কোন্‌টা কমিউনিস্ট রুশের ভাগে পড়বে—তারই পাকাপাকি বন্দোবস্ত এই সর্বনাশা গোপন চুক্তিতে করা হল। এরপর স্তালিন-মলোটভ হিটলারের স্বাস্থ্য কামনা করে রুশ মৃতসঞ্জীবনী সুধা পান করলেন—আর বললেন, "আমি জানি জার্মানীর জনগণ কত গভীরভাবে ভালবাসেন তাঁদের প্রিয় ফুয়েরার—নেতা হিটলারকে।" হিটলারও স্তালিনের প্রশংসায় ফেটে পড়ে বলেছিলেন:

"Stalin…a tremendous personality, an ascetic who has taken the whole of that gigantic country firmly in his iron grasp."

"একজন অসামান্য ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ, নিস্পৃহ যোগীপুরুষ যিনি বিশাল দেশকে তাঁর লৌহমুষ্টির মধ্যে এনে ফেলেছেন।" সত্যিকারের প-পি-চু-স! (পরস্পর পিঠ চুলকানো সমিতি) সাবাস! সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ—বিশ্ববিপ্লবের মহান সঙ্কল্প ও আদর্শ! নিরপরাধ পোল্যাণ্ডের বুকে ঘাতকের ছুরি বসাবার কি ঘৃণ্য চক্রান্ত!

এর পরই ১লা সেপ্টেম্বরের ভোরে নাৎসী সেনাবাহিনী পোল্যাণ্ডের সীমানা লঙ্ঘন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই দেশের ওপর সাম্রাজ্যবাদী জিঘাংসা নিয়ে। স্তালিন ভাবতেও পারেননি হিটলার-রিবেনট্রপ এত বৈপ্লবিক দ্রুততার সঙ্গে ২৩শে আগস্টের গোপন চুক্তি কার্যকরী করতে ঝুঁকি নেবেন। তিনি মলোটভকে দিয়ে সেই সময় জার্মানীতে অবস্থিত রুশ রাষ্ট্রদূত মারফৎ জানতে চাইলেন পোল্যাণ্ডের রাজধানীর উপকণ্ঠে কি নাগাদ জার্মান সেনাবাহিনী গিয়ে উপস্থিত হবে যাতে করে তিনিও রুশ লাল ফৌজকে পোল্যাণ্ডের বাকী অংশটুকু দখল নেবার জন্য পাঠাতে পারেন—রুশ স্বার্থ রক্ষার জন্য। ১০ই সেপ্টেম্বর জার্মানবাহিনী ওয়ারশ' প্রান্তে পৌছল আর ১৭ই সেপ্টেম্বর রুশ লাল ফৌজ পোল্যাণ্ডের সীমানা লঙ্ঘন করে ঢুকে পড়ল এবং এই দুই রাষ্ট্রের আক্রমণকারী সেনাবাহিনী ব্রেস্ট্‌-লিটভস্কে মিলিত হল।

গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এরপরই যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে স্তালিন লিথুয়ানিয়া নিলেন—রুশ প্রভাবাধীন পোল্যাণ্ডের বাকী

অংশটুকু জার্মান প্রভাবাধীন এলাকারূপে মেনে নেবার বিনিময়ে। হিটলার রিবেনট্রপকে আবার মস্কো পাঠালেন। স্বাক্ষরিত হল আর একটা গোপন চুক্তি—জার্মান-রুশ সীমান্ত ও মৈত্রী চুক্তি—দুই দেশের মধ্যে ( German-Soviet Boundary and Friendship Treaty )। এই গোপন চুক্তির সর্ত ছিল :

"The territory of the Lithuanian State falls to the sphere of influence of USSR while the province of Lublin and parts of the province of Warsaw falls in the sphere of influence of Germany." অর্থাৎ লিথুয়ানিয়ার ভৌগোলিক এলাকা সোভিয়েট রুশ প্রভাবাধীন অঞ্চল বলে গণ্য হবে, আর পোল্যাণ্ডের লুবলিন ও ওয়ারশ' প্রদেশ জার্মানীর প্রভাবাধীন এলাকা বলে স্বীকৃত হবে। পোল্যাণ্ড রক্তের সাগরে নিমজ্জিত হল। শুধু তাই নয়। এই দুই দেশের মধ্যে স্থির হল নাৎসীদলের সভ্যরা ও কমিউনিস্টরা উভয় অঞ্চলেই দেশপ্রেমিক পোলদের সর্বপ্রকার বিরোধিতা স্তব্ধ করবে এবং এই দুই দলই জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতাকামী পোলদের নিশ্চিহ্ন করার কাজে 'বৈপ্লবিক' বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হল। হিটলার-স্তালিনের মধ্যে, জার্মানী ও রুশ দেশের মধ্যে খুব মিলমিশ ও বন্ধুত্ব হল—শেষ হল স্বাধীনতাকামীরা—পোল্যাণ্ডের মুক্তি ফৌজরা! নিরীহ স্বাধীনতাকামী পোলদের তপ্ত রক্তেই দুই আপাত-বিরোধী রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব দানা বাঁধল। সাবাস মার্কসবাদ-লেনিনবাদ! ধন্য পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজবাদী রাষ্ট্রের অনিবার্য মার্কসবাদী সংঘর্ষ তত্ত্ব! মার্কসবাদ-লেনিনবাদ লাল সেলাম! এরপর থেকে রুশঘাঁটি দিয়ে জার্মানীতে যুদ্ধের সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। রুশিয়ার পেট্রোল জার্মানীতে আসছিল, এমন কি লেনিনগ্রাড বন্দরে জার্মান নৌবাহিনীর যুদ্ধ-জাহাজ নির্মাণের কথাও সর্বজনবিদিত। সনাতনী সাম্রাজ্যবাদ ও বৈপ্লবিক "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ" হাত-ধরাধরি করে চলেছিল সেদিন।

ঐ বছরই 'মহান্' স্তালিনের ষষ্ঠতিতম জন্মদিবসে হিটলার তাঁকে রুশ-জনগণের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও উন্নতি কামনা করে শুভেচ্ছাবাণী পাঠালেন : "Best wishes for your personal well-being as well for the prosperous future of the peoples of the friendly Soviet Union." স্তালিনও রুশ জনগণের প্রতি কল্যাণ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেও মাত্র ৬ মাস পরে সেই পরম

মিত্র দেশ ও তার জনগণের ওপর জার্মান সৈন্য ও বিমানবহর নিয়ে আচমকা বর্বরোচিত আক্রমণ করতে হিটলারের বাধেনি। কোথায় রইল অনাক্রমণ চুক্তি ও অতি গোপনে পরদেশ গ্রাস করে ভাগ-বাঁটোয়ারার পবিত্র দলিল!

যে কথা হচ্ছিল সেখানে ফিরে আসা যাক। হিটলার তাঁর নতুন দোস্তকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছাবাণী পাঠালেন। স্তালিনও প্রত্যুত্তরে জানালেন : "Friendship of the peoples of Germany and the Soviet Union cemented by blood has every reason to be lasting and firm."

"দুই দেশের জনগণের বন্ধুত্ব—রক্তের মধ্য দিয়েই ঘনিষ্ঠ হয়েছে এবং এই মৈত্রী স্থায়ী ও সুদৃঢ় হবে আশা করার কারণও আছে।"

প্রশ্ন : এর মধ্যে কোন আন্তরিকতা ছিল কি? না এটা কূটনৈতিক ভব্যতার মোড়কে ঢাকা নির্ভেজাল শঠতা ও প্রবঞ্চনা? কেননা হিটলার বা স্তালিন কেউই কাউকে কোনদিন বিশ্বাস করেননি। কাদের রক্তের বিনিময়ে এই মিথ্যা, ডাকাতি লুণ্ঠনের সহঅবস্থান চুক্তি-নির্ভর মৈত্রীর ভিত্তি দীর্ঘস্থায়ী করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হল? স্বাধীনতাকামী নিরপরাধ পোল্যাণ্ড-এর নিষ্পাপ জনগণের রক্তের বিনিময়ে, বাল্টিক দেশগুলির স্বতন্ত্র স্বাধীনতা লুণ্ঠন করে?

১৯৩৯ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর মস্কোস্থিত পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূতকে এক সোভিয়েট ঘোষণায় জানিয়ে দেওয়া হল : "The Polish State and its government have in fact ceased to exist"—অর্থাৎ পোল-রাষ্ট্র ও পোলিশ সরকার পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমন কি পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ' জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ করার আগেই সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ মস্কোস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূতকে বার্তা পাঠালেন : 'I have received your communication regarding the entry of German troops into Warsaw. Please convey my congratulations and the greetings to the German Reich government." মার্কসবাদী বিশ্বভ্রাতৃত্ববাদী সর্বহারাদের সাথী—মলোটভ রুশ দেশের সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষ থেকে আক্রমণকারী জার্মান সরকারকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছার বাণী পাঠালেন পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করে নিয়ে সেই দেশের সর্বহারাশ্রেণী ও দেশের আপামর জনসাধারণকে নাৎসী দাসত্বের

শৃঙ্খলের নিগড়ে পিষে মারার জন্য—নিষ্পাপ শান্তিপ্রিয় পোল জাতির ওপর এই পাশবিক বলাৎকারে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া খুশি হয়েই বৈপ্লবিক শুভেচ্ছা ও অভিবাদন পাঠালেন। শুধু কি তাই? ৩১শে অক্টোবর (১৯৩৯) রাশিয়ায় সুপ্রীম সোভিয়েটের বিশেষ জরুরী পঞ্চম অধিবেশনে মলোটভ ঘোষণা করলেন: "The ruling circles of Poland used to boast quite a lot about the 'stability' of their state and the 'might' of their army. However, it needed only one swift blow to Poland, first by the Germans and then by the Red Army, and nothing was left of this ugly offspring of the Versailles Treaty"......দুটি উপর্যুপরি আঘাতে—প্রথম জার্মান বাহিনীর, দ্বিতীয় সোভিয়েট লাল ফৌজের—ভার্সাই চুক্তির কুৎসিত ফলশ্রুতি পোল রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটল স্বাধীন দেশ হিসাবে—মানচিত্রের পৃষ্ঠা থেকে। আনন্দ করে সদম্ভে ঘোষণা করার মতই ঘটনা এটা যেন! ইতিহাসের কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

হিটলার-স্তালিন মৈত্রী চুক্তি নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে এবং হবেও। নাৎসী জার্মানী যখন চুক্তি লঙ্ঘন করে রাশিয়া আক্রমণ করে বসল তখনও স্তালিন তাঁর কৃতকর্মের সাফাই গেয়ে দম্ভোক্তি করে বলেছিলেন: "We secured peace for the country for one and half years." অর্থাৎ চুক্তি দ্বারা আমরা অন্তত দেড় বছর দেশকে যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করেছিলাম। লেনিন ব্রেস্টলিটভস্ক চুক্তি করেছিলেন জার্মান সরকারের সঙ্গে ১৯১৮ সালে। তখনও এই ধরনের উক্তি করা হয়েছিল সেই অপমানজনক চুক্তির সমর্থনে। রাশিয়া এই চুক্তি করে ১৯১৭ সালে দম নেবার সময় পেয়েছিল। ১৮০৭ সালে জার আলেকজান্দার (প্রথম) (Czar Alexander I) নেপোলিয়ানের কাছ থেকে টিল্‌সিট-এর (Tilsit) চুক্তির বলে অনুরূপ দম নিয়ে নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে লড়াই করার অবকাশ পেয়েছিলেন। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং চার্চিলও হিটলার-স্তালিন চুক্তির সম্বন্ধে বলেছিলেন: এই চুক্তি ছিল রাশিয়ার দিক থেকে খুবই বাস্তববাদী......"at the moment realistic in a high degree" [The Gathering Storm: Churchill: P. 394]

এই চুক্তির একটা ব্যাখ্যা এই যে, স্তালিন ও হিটলারের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, গ্রেট ব্রিটেন ও ফরাসী দেশ রাশিয়ার সঙ্গে কোন স্থায়ী চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের হিটলার তোষণনীতি

কমিউনিস্ট ডিক্টেটারকে এই পথে ঠেলে দেবার মনস্তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিল। হিটলারও ইঙ্গ-ফরাসী রাষ্ট্র নেতাদের দ্বিধাগ্রস্ততা ও দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিতে ছাড়েননি। হিটলার এই দুই রাষ্ট্রকে বার বার উপেক্ষা করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি রাইনল্যাণ্ড দখল করলেন, ১৯৩৮ সালে দখল করলেন অস্ট্রিয়া, সুদেতেন এবং ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করলেন। ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশ নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল। এই দুই মতলববাজী—'বুর্জোয়া' রাষ্ট্রের সেদিনের ঘৃণ্য কূটনীতি ধুরন্ধর স্তালিনকেও উৎসাহ জুগিয়েছিল নিঃসন্দেহে।

কিন্তু একথা জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে যে, এই ডাকাতে-চুক্তি স্বাক্ষরিত না হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হতে পারত না। এই চুক্তির সঙ্গে যে গোপন চুক্তিটি সংযোজিত হয়েছিল সেই Secret Protocol সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিজ্ঞরা জানতে পেরেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর। জার্মান সরকারের মহাফেজখানা থেকে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী এইসব নথিপত্র হস্তগত করে। এই গোপন চুক্তিতে পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বেসারাবিয়া, এই বল্‌কান রাজ্যগুলির ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে যে রফা হয়েছিল এই দুই স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে—সেটা সেদিন ইউরোপের অন্য রাষ্ট্রপ্রধানরা জানতে পারলে ইতিহাসের মোড় ঘুরে যেত।

যেমন, একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড আক্রমণের ঠিক আগেই ইংলণ্ড ও পোল সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদিত হয় (Anglo-Polish Treaty) লণ্ডন শহরে। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ২৬শে আগস্টের (পূর্ব-পরিকল্পিত পোল্যাণ্ড অভিযানের দিন) পূর্বেই। এই চুক্তি দ্বারা পারস্পরিক প্রতিরক্ষা ও সহযোগিতা প্রতিশ্রুত হল দুই স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের মধ্যে। এর আগে পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেন এক-তরফা পোল্যাণ্ডকে সীমান্ত ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার গ্যারান্টি দিয়েছিল। এই যে ইঙ্গ-পোলিশ চুক্তি সম্পাদিত হল এরও সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি সংযোজিত হয়েছিল—Secret Protocol। তার ১নং অনুচ্ছেদে (Article I) "ইউরোপীয় শক্তি"র ("European Power") যে শক্তির উল্লেখ ছিল—সেই শক্তি বলতে জার্মানীকে বোঝান হয়েছিল। এই Secret Protocol-এ বলা হয়েছিল যদি কোন "ইউরোপীয় শক্তি" (European Power) দুই দেশের কোন দেশকে আক্রমণ করে তাহলে দুই রাষ্ট্রই যৌথভাবে পরস্পরকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে।

ফলে জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণের ঘটনায় গ্রেট ব্রিটেনকে এই চুক্তির সর্ত অনুযায়ী এগিয়ে আসতে হল অনিবার্যভাবেই। এখন "ইউরোপীয় শক্তি" বলতে জার্মানীকে যদি বোঝান না হত পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা তাহলে ইংলণ্ডকে একই সঙ্গে রাশিয়ার বিরুদ্ধেও অনিবার্যভাবেই যুদ্ধ ঘোষণা করতে হত। নাৎসী জার্মানী ও কমিউনিস্ট রাশিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির সিক্রেট প্রোটোকল-এ পোল্যাণ্ড ভাগ-বাঁটোয়ারায় কি ক্রূরতম ও কুৎসিত রফা দুই ডিক্টেটারের মধ্যে হয়েছিল সেটা জানাজানি হলে এই ইঙ্গ-পোলিশ চুক্তির সিক্রেট প্রোটোকলের আওতা থেকে ( Article I ) রাশিয়াকে বাদ দেবার কোন প্রশ্নই আসত না। এতে ইংলণ্ড ও রাশিয়া—দুই দেশেরই চরম বিপর্যয় ডেকে আনত নিঃসন্দেহে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ড ও রাশিয়া মিত্রপক্ষ বলেই পরিচিত হয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। পনের দিনের মধ্যে পোল্যাণ্ড দখল সম্পূর্ণ কখনই হত না, যদি রাশিয়া এই গোপন আঁতাতের ভিত্তিতে পোল্যাণ্ডের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত না করত। হিটলার যদি বুঝতেন যে, তাঁকে একাধারে পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে, ব্রিটেন ও ফরাসী দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে—তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া আদৌ তাঁর পক্ষে সম্ভবই হত না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নরমেধ যজ্ঞের হাত থেকে দুনিয়া বেঁচে যেত। একই সঙ্গে রাশিযা ও ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিজোটের বিরুদ্ধে লড়াই করে যুদ্ধ করাটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। এটা জার্মান যুদ্ধবিশারদরাও ভাল রকম জানতেন।

বার্লিনে অবস্থিত তৎকালীন ফরাসী রাষ্ট্রদূত কুলঁদ্রে ( M. Coulondre ) তৎকালীন ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন: "Hitler will risk war if he does not have to fight Russia. On the other hand, if he knows he has to fight her too he will draw back rather than expose his country, his party and himself to ruin." অর্থাৎ রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই করতে না হলে হিটলার বিশ্বযুদ্ধের পথে পা বাড়াবেনই। কিন্তু যদি তিনি বোঝেন যে, বিশ্বযুদ্ধে জড়ালে জার্মানীকে রাশিয়ার সঙ্গেও লড়াই করতে হবে তাহলে তিনি যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে নিজের দেশ, দল ও নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করবেন না। ফরাসী রাষ্ট্রদূত তাই তাড়াহুড়া করে রাশিয়ার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন।

নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে এই ধরনের চুক্তির কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে স্তালিন ১৯৪২ সালে, যখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, তখন তাঁকে জানান:

"We formed the impression that the British and French Governments were not resolved to go to war if Poland were attacked, but that they hoped the diplomatic line up of Britain, France and Russia would deter Hitler. We were sure it would not, 'How many divisions' Stalin had asked, 'will France send against Germany on mobilisation?' The answer was: 'about a hundred.' He then asked: 'How many will England send?' The answer was: 'Two and two, more later.' 'Ah, two and two more later.' Stalin had repeated, 'do you know,' he asked, 'how many divisions we shall have to put on the Russian front if we go to war with German?' There was a pause: More than three hundred" [ The Gathering Storm: Churchill: P. 391 ]

রুশবাসীদের ধারণা জন্মেছিল যে, পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হলে ব্রিটেন ও ফরাসী দেশ আক্রান্ত পোল্যাণ্ডের পক্ষ নিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার শুধুমাত্র কূটনৈতিক জোট বাঁধার দ্বারা হিটলারকে প্রতিহত করা সম্ভব হত না। যদি যুদ্ধে নামলে সেই সময় ফরাসী দেশ ও ব্রিটেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞই থাকত তাহলে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে—ফরাসী দেশ রণাঙ্গনে মোট কত ডিভিসন সৈন্য পাঠাত? স্তালিন চার্চিলকে প্রশ্ন করেছিলেন। স্তালিন নিজেই উত্তর দিয়ে বলেছিলেন: ১০০ ডিভিসন। ইংলণ্ড কত ডিভিসন সৈন্য পাঠাত? স্তালিনের উত্তর: প্রথমে দুই ডিভিসন এবং পরে আরও দুই ডিভিসন। মোটে দুই ডিভিসন—আগে—দুই ডিভিসন পরে! "আর জানেন", স্তালিন স্বগতোক্তি করে বললেন: "রাশিয়াকে এই পরিস্থিতিতে কত ডিভিসন সৈন্য পাঠাতে হত?"—"৩০০ ডিভিসন সৈন্য।"

ধুরন্ধর চার্চিল জবরদস্ত ঝুনো কূটনীতিবিদ স্তালিনকে চিনতে পেরেছিলেন —ব্রিটেনের কলিজার পরিচয় ও রণহুঙ্কারের আসল সারমর্ম সঠিকভাবে ধরে ফেলার জন্য। তাই বোধ করি তিনিও এই ডাকাতে-চুক্তিকে খুব 'বাস্তববাদী' বলে মেনে নিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে অবশ্য চেম্বারলেনের হিটলার তোষণের ন্যায় চার্চিল-রুজভেল্টের স্তালিন তোষণের মর্মান্তিক পরিণতি কি হতে চলেছে সেটা এই দুই রাষ্ট্রপ্রধান বুঝতে পেরেছিলেন।

হিটলার-স্তালিন গোপন চুক্তি বিশ্বযুদ্ধের পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে গেল। প্রাক্তন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিট্‌ভিনভ্‌ যে হিংসা ও চিরকালের মত যুদ্ধ পরিহারের তত্ত্ব বিশ্ববাসীকে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে শুনিয়েছিলেন সবই ফাঁকা বুলিতে পরিণত হল। বিশ্বশান্তির অগ্রদূত তথা নিপীড়িত স্বাধীনতাকামী জাতিগুলির হয়ে কথা বলার যে নৈতিক অধিকার ও মর্যাদা সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া অর্জন করেছিল সেটা নিঃসন্দেহে সে হারাল। W. L. Shirer লিখেছেন :

"Since joining the League of Nations the Soviet Union had built up a certain moral force as the champion of peace and the leading opponent of Fascist aggression. Now that moral capital had been utterly dissipated." [ P. 659 : Rise And Fall Of The Third Reich. ]

জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্ররূপে অন্তর্ভুক্তির পর থেকে সোভিয়েট রাশিয়া ফ্যাসি-বাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বে স্বাধীনতাকামী নিপীড়িত জাতিসমূহের নির্ভীক চ্যাম্পিয়ানরূপে গণ্য হয়ে এক নৈতিক মর্যাদা ও খ্যাতি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অর্জন করেছিল। সেই বৈপ্লবিক আদর্শবাদ ও নৈতিক পুঁজির সুনিশ্চিতরূপেই চরম অবক্ষয় ঘটল এই আচরণের মধ্য দিয়ে।

## (খ) হিটলার-স্তালিন চুক্তি :
## ইউরোপে কমিউনিজম-এর নয়া রূপ

হিটলার-স্তালিন চুক্তিকে একটি সম্পূর্ণ আকস্মিক কূটনৈতিক রাজনীতির বহিঃপ্রকাশরূপে দেখা ঠিক হবে না। রুশ রাজনীতি বিপ্লবোত্তর যুগে ধাপে ধাপে যেদিকে গড়িয়ে চলছিল তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি ছিল এই আপাত অত্যাশ্চর্য চুক্তিটির। কমিউনিস্টরা ইউরোপে রুশ-বিপ্লবের পর প্রথমে বামপন্থী সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তালমিল করে গা ঘেঁষে চলতে চলতে বামপন্থী সমাজ-তন্ত্রীদের ছেড়ে দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলা সুরু করেন। তার পরের পর্যায়ে বুর্জোয়া উদারপন্থীদের সঙ্গে, রক্ষণশীলদের সঙ্গে পরের ধাপে, তারপর রক্ষণশীল পুঁজিপতিশ্রেণীর সঙ্গে এবং সর্বশেষ নাৎসীদের সঙ্গে। এইভাবে ধাপে ধাপে কমিণ্টার্ণের সঙ্গে সংযুক্ত ইউরোপের কমিউনিস্টদের চরিত্র ও আচরণের ক্রমবিবর্তন ঘটেছিল। কমিউনিস্ট তত্ত্বের সঙ্গে এই অদ্ভুত আচরণের কোন মিল কেউই কোনদিন খুঁজে পাবেন না, কিন্তু রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ পরিপূরণের হাতিয়ার হয়ে পড়ায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের চেহারাটা এইভাবেই বদলাচ্ছিল সেদিন। [ See : European Communism, P. 233 ; By Franz Borkenau. ] রুশ নির্দেশেই রাশিয়ার স্বার্থ এবং বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, দু'টোই যে সমার্থ-বোধক, সেই কথাটা পৃথিবীর সকল দেশের কমিউনিস্টদের বোঝান ও শেখান হয়েছিল।

কিন্তু ১৯২৪ সালে স্তালিনের "একটি দেশে সমাজতন্ত্রের সম্ভাব্যতা-তত্ত্ব" ('Socialism in one country') গৃহীত হবার পর কিন্তু এই কমিউনিস্টদের বোঝান হয়েছিল যে, রাশিয়ার স্বার্থ ও প্রয়োজন আর বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থ একই বস্তুর দু'টো পিঠ বলে দেখা ঠিক নয়। এই নীতি চালু হবার সাথে সাথে বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থের সঙ্গে রুশ-স্বার্থের অবিচ্ছেদ্যতা-তত্ত্ব প্রচণ্ড ঘা খেল।

রুশ-বিপ্লবের অব্যবহিত পরে গোটা দুনিয়ার রাজনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্নতা (Isolation) থেকে রাশিয়াকে রক্ষা করার জন্য একরকম পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের প্রয়োজন হয়ে

পড়ে। তখন কমিণ্টার্ণ একটা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। পৃথিবীর, বিশেষ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট তথা বিপ্লবীদের মধ্যে নূতন প্রেরণা ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছিল। রুশ পররাষ্ট্রনীতিতে একটা বিপ্লবী ও জঙ্গী ব্যঞ্জনা সংযোজিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধের ঘটনা-পরম্পরা থেকে পরিষ্কার দেখা গেল রাশিয়ার নিজ স্বার্থেই এই পররাষ্ট্রনীতির বৈপ্লবিক সংগ্রামী ঐতিহ্য খসিয়ে ফেলার নূতন রাজনীতি স্থরু হয়। বার্লিন ও লণ্ডনের সঙ্গে একই সাথে রুশ সমঝোতার প্রয়োজনীয়তার তত্ত্বকথাটা চালু হয়েছিল।

এই রাজনীতির বলি কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিই হয়েছিল। নিজ নিজ দেশে এইসব দলগুলির মর্যাদা ও কার্যকারিতা হ্রাসও পেয়েছিল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে স্তালিন ও স্পেনের কমিউনিস্টদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা আগেই করেছি। রুশ-স্বার্থেই স্পেনের বিপ্লবের স্বার্থকে ও বৈপ্লবিক প্রজাতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও ভাবাদর্শকে বলি দেওয়া হয়েছিল। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিও রুশ পার্টির অঙ্গুলি হেলনে সব সময় চলেছে। ফলে দলের ভাগ্যবিপর্যয় অনেকবার ঘটেছে।

হিটলার-স্তালিন চুক্তির বিষয়টি এমন কি কমিণ্টার্ণও জানতে পারেনি। এই চুক্তির সাথে সাথেই "তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের" রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণটাই ( General line ) পালটিয়ে গেল। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি চরম ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাদেরই আবার রাশিয়ার প্রয়োজন ও স্বার্থে সেই নীতি বর্জন করতে হল। এ কাজ করতে গিয়ে অবশ্য ব্রিটিশ, ফরাসী ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট দলগুলির মধ্যে ভাঙনের পালাও স্থরু হয়।

ব্রিটিশ ও ফরাসী কমিউনিস্টদের আচরণ সম্বন্ধে কিছু বলে নেব। কেননা এই দু'টি দেশের কমিউনিস্ট দলের মর্যাদা ছিল সবচেয়ে বেশি। কি রাশিয়া, কি অন্যান্য দেশে—যে সকল কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী রাশিয়ার এই নীতি-পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারছিলেন না তাঁদের হয় খতম ( পার্জ ) করা হয়েছে, যেমন রাশিয়ায়,—আর না-হয় তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে অথবা তাঁরা নিজেরাই দল থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। বরকেনো এই 'amazing transition' সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন: "Given the choice between their humanist professions of youth and their real allegience

to Moscow, almost the whole of the leadership and a large majority of the membership chose the latter." [ European Communism : By F. Borkenau : Faber & Faber Limited London—P. 235 ]

মানবতাবাদী আদর্শ যা কমিউনিস্টরা নিজেদের আদর্শ বলে প্রচার করে থাকেন এবং রাশিয়ার প্রতি আনুগত্য—এই দু'য়ের মধ্যে যখন পক্ষ নেবার লগ্ন উপস্থিত হল তখন প্রায় সমগ্র কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ও অধিকাংশ কমিউনিস্টই কমিউনিস্ট আদর্শকে পরিত্যাগ করে রাশিয়ার প্রতি আনুগত্যকে আঁকড়িয়ে ধরেছিলেন।

পোল্যাণ্ড সম্পর্কিত প্রশ্নে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি এমন একটা নীতি নিয়েছিলেন যেটা পোল্যাণ্ডের স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিল। তাছাড়া যেমন রক্ষণশীল দল পরিচালিত সেদিনের ব্রিটিশ সরকার পূর্ব-ইউরোপের রাজনীতি নিয়ে জড়িয়ে পড়তে চায়নি—তেমনি মনোভাব বামপন্থী ব্রিটিশ কমিউনিস্টদের ছিল মোটামুটিভাবে। এই হিটলার-স্তালিন চুক্তিকে স্বাগত জানাল ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি। দলের পক্ষ থেকে বলা হল এই চুক্তি চেম্বারলেনের ওপর স্তালিনের কূটনৈতিক বিজয়। কেননা ইঙ্গ-ফরাসী সরকার জার্মানীকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। স্তালিন সুকৌশলে সেটা ব্যর্থ করে দিলেন। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে এক প্রবন্ধে বলা হল :

"It is time to dry lot of the crocodile tears that are flowing in the Fleet Street, Transport House, and Downing Street over what might happen to Poland. If Poland and border states want peace of mutual assistance, let them open negotiations with the Soviet Government at once." [ World News and Views : 26th August, 1939 ]

অর্থাৎ "পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে ডাউনিং স্ট্রীট এবং ফ্লীট্ স্ট্রীটের সরকারী মহলে প্রচুর কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করা হচ্ছে। যথেষ্ট হয়েছে। চোখের জল শুকোবার সময় এসেছে এখন।...যদি পোল্যাণ্ড ও তার সীমান্ত রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করতে চায় তাহলে তারা এখনি রাশিয়ার সঙ্গে সেই ধরনের চুক্তি করে ফেলতে পারে।"

পোল্যাণ্ডের সীমান্তবর্তী রাজ্য বলতে কাকে বা কাদের বোঝান হচ্ছে সেটা কি বুঝতে অসুবিধা হয়? ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি এই সময় ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি

( Anglo-Soviet Pact ) সম্পাদনের জন্য দাবী জানাল। . ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) কমিণ্টার্ণ থেকে এক ঘোষণায় বলা হল নির্লজ্জভাবে: "After the signing of the Soviet-German Pact the fascist bloc disintegrates and peace is more secure." অর্থাৎ, এই চুক্তির ফলে ইউরোপে ফ্যাসিস্ট ব্লক বা গোষ্ঠী নির্মূল হবার পথে এবং সেই সঙ্গে শান্তির সুদৃঢ় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি এই সন্ধির প্রাক্কালে স্বদেশকে জার্মান আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য জাতীয় ঐক্য স্থাপন ও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতির উল্লেখও করেনি।

পরে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ সম্পর্কিত নীতি নিয়ে দলের মধ্যে হ্যারি পলিট ও সি. এ. ক্যাম্বেলের মতপার্থক্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব দেখান পামি দত্ত ও এমিল বার্নস। শেষোক্ত দুই নেতা স্বার্থের দিকেই ঝুঁকে পড়েছিলেন। এই গোষ্ঠীর "revolutionary-sounding phrases"-এর বিরুদ্ধে পামি দত্ত হুঁশিয়ার করে দেন।

Harry Pollitt একটি পুস্তিকায় লিখলেন:

"The Communist party supports the war, believing it to be a just war...To stand aside from this conflict, to contribute only revolutionary-sounding phrases while the fascist beast rides roughshod over Europe would be a betrayal of everything our forebears have fought to achieve in the cause of long years of struggle against capitalism. The Polish people have had no choice. War has been thrust upon them. If Hitler is allowed to impose his domination in Poland people will be forced to accept condition infinitely worse than anything they have yet suffered...... whatever the present motive of the present rulers of Britain and France, the action taken by them—under considerable pressure from their own people is not helping the Polish peoples' fight, but actually, for the first time challenging the Nazi aggression which has brought Europe into crisis after crisis for the last three years". [ Quoted from: The Betrayal Of The Left: London, 1941; P. 1 ]

কিন্তু হ্যারী পলিট জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করলেন বটে কিন্তু পোল্যাণ্ডের পূর্বাঞ্চলে রুশ লাল ফৌজ আক্রমণের সাথে সাথে এঁদের স্বরও বদলিয়ে গেল। স্তালিনের নির্দেশ অনুযায়ী ইউরোপের সব কমিউনিস্ট দলগুলিই রাশিয়ার এই সম্প্রসারণবাদী আক্রমণাত্মক আচরণকেও সমর্থন করতে নেমে গেল। যখন নিরপরাধ স্বাধীনতাকামী পোল্যাণ্ডের পশ্চাদ্দেশে জার্মানীর সঙ্গে যোগসাজসে ছুরিকাঘাত করল তখন ব্রিটিশ ও ফরাসী কমিউনিস্টরা "real democratic peace", "put an end to the imperialist war" এইসব বিভ্রান্তকারী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শ্লোগান ওঠালেন নিজেদের বিবেকহীন ঘৃণ্য আচরণকে ঢাকবার জন্য। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দু'দিক থেকে আক্রমণ করে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করল—তার বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনিত হল না, হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য আহ্বান জানালেন না সাচ্চা বিপ্লবীরা, পোল্যাণ্ডের জন্য সমবেদনাও জানান হল না। তখন শ্লোগান দেওয়া হল: সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটান হোক। কি অদ্ভুত আচরণ! কি অদ্ভুত রাজনীতি! শুধু তাই নয়, ইংলণ্ডের জনমানসে ভয় ও আতঙ্কের আবহাওয়া সৃষ্টিরও চেষ্টা করা হল দলের প্রচার দিয়ে। ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধের বিরোধিতা করে একটি বিশেষ ঘোষণা করল। যুদ্ধের দায়িত্ব চাপান হল শুধু নাৎসী জার্মানীর উপর নয়, গ্রেট বিটেন, ফরাসীদেশ ও পোল্যাণ্ডের ওপর। বলা হল ব্রিটেন ও ফরাসী দেশ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষ হয়ে লড়ছে বলা সম্পূর্ণ ভুল। এই দুই দেশই তাদের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য সামনে রেখেই লড়ছে। লেনিনের "Revolutionary defeatism"-থিওরীকে অবলম্বন করে কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করল:

"The present war is not a just defensive war but an unjust and imperialist war in which Britain and Germany are fighting for imperialist aims, for colonies and for world domination." অর্থাৎ এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য ন্যায়ধর্মী যুদ্ধ আদৌ নয়। উপনিবেশ গড়ার ও বিশ্বপ্রভুত্ব স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ-জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণিত যুদ্ধ। (অক্টোবর ১৯৩৯, World News and Views—Oct. '14) এই রাজনীতি ক্রমেই নাৎসীদের সহায়ক হয়ে উঠছিল। নভেম্বর মাসের ঐ পত্রিকায় বলা হল:

"...It is the British and French imperialists who now come

forward as the most zealous supporters of the continuation and further incitement of war." (Nov. 11; 1939—World News & Views) যুদ্ধের জন্য এবং যুদ্ধকে জিইয়ে রাখার জন্য ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রদ্বয়কেই দায়ী করা হল। যুদ্ধের বিভীষিকার কথা ব্রিটিশ জনমানসে তুলে ধরা হচ্ছিল—জার্মানীর ভয়ে ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত করার জন্য। নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ প্রতিরোধ আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়েও ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি সংশয় প্রকাশ করে জাতির মনোবলকে ভাঙার চেষ্টারও ত্রুটি করেনি। এই সময় দেশে ধর্মঘট আহ্বানও করা হয়েছে—অবশ্য তা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিও (CPGB) হিটলার-স্তালিন চুক্তির পর ক্রেমলিন-এর ক্রীড়নকে পরিণত হল। হ্যারী পলিট ও ক্যাম্পবেলের পার্টির অভ্যন্তরে বিরোধিতার ভূমিকা—নেহাতই লোক দেখান ব্যাপার। কেননা পোল্যাণ্ড আক্রমণের পর মস্কোর আচরণকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন না করার অর্থ শৃঙ্খলাভঙ্গ। আর এই অভিযোগই দল থেকে বহিষ্কারের পক্ষে যথেষ্ট। কমিউনিস্ট পার্টির (CPGB) এই 'anti-war', 'anti-allies', 'Pro-Nazi'—নীতির জন্য কিছু কিছু ওপরতলার এবং নীচেরতলার কর্মী দলত্যাগ করেন। বিশেষ করে জন স্ট্র্যাচীর (John Strachey) নাম উল্লেখযোগ্য। বরকেনো বলেছেন: "Yet this impartial condemnation of Britain and Germany was merely for show...The clumsy aping of internationalist slogans of 1914 in a totally different situation was only a transitional stage on the way to a policy becoming more and more openly anti-Western and directly pro-Nazi"...(P. 244)

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে 'কমিণ্টার্ণ' সুইডেনের ও জার্মানীর কমিউনিস্টদের সহযোগিতায় স্টকহল্‌ম থেকে Dei Welt এই নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিল। এই পত্রিকাতে ধাপে ধাপে নাৎসীদের অনুকূলে প্রচার চালান হচ্ছিল। সেই সঙ্গে সোস্যালিস্টদের বিরুদ্ধেও চলেছিল প্রচার-অভিযান। তখন কমিণ্টার্ণ ও কমিণ্টার্ণ-পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মূল দুশমন শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, নাৎসী সাম্রাজ্যবাদ বা ফ্যাসিবাদও নয়। শুধু তাই নয় নাৎসীদের সঙ্গে কমিউনিস্টরা যুক্তফ্রন্ট গঠনের কৌশলের প্রস্তাবও রেখেছিলেন। কমিউনিস্ট নেতা উলব্রীখ্‌টের (Ulbricht) একটি প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রবন্ধটি Dei Welt পত্রিকার ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল :

"When the bourgeois ( British ) papers declare in one article that England is fighting for freedom and report in another article in the same issue the arrest of fighters for freedom, the muzzling of the workers' press, the establishment of concentration camps, and special laws against the workers (in Britain) then the German workers have proof before their eyes that the ruling class in England is carrying on the war against the working class, and that, if Germans were conquered the German working class would be treated in the same way. The German workers know the big businessmen of England at the two hundred families of France, and are aware what an English victory would mean for them. The revolutionary workers and the progressive forces in Germany who, at the cost of great sacrifices are fighting against the terror and against reaction do not wish to exchange the present regime of national and social oppression by British imperialism and German big capitalist who are subservient to Britain but are fighting against all enslavement of the working people, for a Germany in which the working people really rule...not only the Communists but also many social democratic and national socialist workers regard it is their task not in any circumstances to permit a breach of the (Hitler-Stalin) pact. Those who intrigue against the friendship of the German and Soviet people are enemies of the German people and are wanted as accomplies of British imperialism. Among the German working class greater and greater efforts are being made to expose the followers of the Thyssen clique who are the enemies of the Soviet-German pact. There have been many demands that these

enemies shall be removed from their army and government positions and that their property shall he confiscated...."

অর্থাৎ বুর্জোয়া সংবাদপত্রে ( ব্রিটিশ ) লেখা হচ্ছে, ইংলণ্ড নাকি গণতন্ত্রের জন্যই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ সেইসব পত্রিকাতেই স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য যারা লড়ছে—তাদেরই দেশে গ্রেপ্তারের কথাও স্বীকার করা হচ্ছে। বন্দী শিবির রচনা, শ্রমিকদের অধিকার খর্ব, তাদের পত্র-পত্রিকার কণ্ঠরোধের কথাও বলা হচ্ছে। তাহলে কি বোঝাচ্ছে? এই কথাটাই প্রমাণিত হচ্ছে জার্মানীর শ্রমিক-শ্রেণীর কাছে যে, ইংলণ্ড বিশ্বের শ্রমিক-শ্রেণীর বিরুদ্ধেই এই লড়াই আসলে লড়ছে। আর এই যুদ্ধে যদি কোনক্রমে জার্মানী ইংলণ্ডের কাছে পরাজিত হয় তাহলে পদানত জার্মানীর শ্রমিক-শ্রেণীরও সেদিন এই শোচনীয় হাল হবে দাসত্বের বেড়ি পরে। জার্মানীর শ্রমিকসমাজ ইংলণ্ডের বড় বড় শেঠদের চরিত্র ভালভাবেই জানে, আর জানে যে, ফরাসী দেশের দুইশ' ধনী পরিবার ফরাসী দেশকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। তাই যুদ্ধে ইংলণ্ডের জয়লাভের কি পরিণতি হবে তা জার্মানী ভালভাবেই উপলব্ধি করে। জার্মানীর যে-বিপ্লবী শ্রমিক-সমাজ ও প্রগতিশীলরা ( নাৎসী তাণ্ডবের বিরুদ্ধে এই বিপ্লবীরা, প্রগতিবাদীরা নীরবতা ও চরম নিষ্ক্রিয়তার ষড়যন্ত্র বরাবরই পালন করে এসেছিলেন ) অনেক ত্যাগ স্বীকার করে প্রতিক্রিয়া ও ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছেন, তাঁরা আর যা-ই হোক বর্তমান শাসনের ( অর্থাৎ হিটলার-তন্ত্রের ) অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় ব্রিটিশ শোষণকে ডেকে আনবেন না, জার্মানীর বড় বড় পুঁজিপতি যারা—ব্রিটেনের দোসর—তাদের দ্বারা দেশকে পদানত হতে দেবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার সাকরেদ এই জার্মান পুঁজিপতিরা জার্মানীর সর্বনাশ ডেকে আনতে বদ্ধপরিকর—বর্তমান জার্মানী যেখানে জনগণের রাজ কায়েম হয়েছে—তাকে পদানত করে। থাইজেন নেতৃত্বাধীন জার্মান পুঁজিপতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জার্মান জনগণ আজ সোচ্চার ;—তাদের মুখোস খুলে দেবার দাবী উঠছে দিকে দিকে, কেননা এই ধনিক-বণিকগোষ্ঠী জার্মান-সোভিয়েট চুক্তির দুশমন। এই গোষ্ঠীর সমর্থকদের সব জায়গা থেকে উৎখাত করতে হবে। তাদের সরকারী সংস্থা, সামরিক সংস্থা থেকে হটাতে হবে, তাদের বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। [ভিনভেস্ট পত্রিকা-কমিউনিস্টদের]

তাহলে জার্মান কমিউনিস্টদের মতে হিটলার-রাজ বা ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র জনগণের রাষ্ট্র—গণশাসনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রবন্ধে যে 'Anti-Thyssen clique' বা পুঁজিপতি থাইজেন-বিরোধী চক্রান্তের কথা বলা হয়েছে সেটা আসলে

জার্মানীর অভ্যন্তরে নাৎসী-বিরোধী গোষ্ঠীর বিরোধিতার রাজনীতি। জার্মান কমিউনিস্টরা এই নাৎসী-বিরোধীদের শ্রমিক-শ্রেণীর তথা দেশের চরম শত্রু বলে প্রচারে নেমে গেলেন। অথচ কমিউনিস্টরাই একদিন বলেছিলেন শিল্পপতি থাইজেন হিটলারের অভ্যুত্থানে মদত দিয়েছিলেন। সমাজতন্ত্রীরা এই থাইজেন-গোষ্ঠীর পোষা চর বলে নিন্দিত হলেন। রাজনীতির অদ্ভুত পট-পরিবর্তন। কমিউনিস্টরাই একদিন পপুলার ফ্রন্ট, যুক্তফ্রন্টের আহ্বান দিয়েছিলেন, বাম-সংহতির ডাক দিয়েছিলেন বড় বড় পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে। আর এই হিটলার-স্টালিন চুক্তির মেয়াদকালে নাৎসীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর আহ্বান জানান হল।

অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াতেও কমিউনিস্ট ডিগবাজি বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করেছিল। অস্ট্রিয়াতে কমিউনিস্টরা শেষ পর্যন্ত সোশ্যালিস্টদের বিরুদ্ধে চলে গেলেন এবং হিটলারের আগ্রাসন নীতির বিরোধিতা পরিত্যাগ করলেন। যে-প্রতিরোধ আন্দোলনে তারা একদিন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন সেই আন্দোলন থেকে তাঁরা সরে দাঁড়ালেন। চেকোশ্লোভাকিয়াতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। যুদ্ধের পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত কমিউনিস্টরা সেদেশের সর্বজনমান্য নেতা ডঃ বেনেস-এর সঙ্গে সহযোগিতা করে আসছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই বেনেসকে 'ইংলণ্ডের চর' বলে তাঁরা ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেননি। চেক জনগণ কখনই বেনেসকে সমর্থন করবে না বলা হল। বেনেস-এর অপরাধ, তিনি হিটলারের কাছে নিজের দেশকে বিকিয়ে দিতে চাননি—স্বাধীনতার জন্য শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করেছিলেন।

[ ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে রুশ লালফৌজের ৬ লক্ষ সৈন্য যখন সোশ্যালিস্ট চেকোশ্লোভাকিয়ায় বলপূর্বক অনুপ্রবেশ করল তখন কমিউনিস্ট নেতা ডুবচেককেও রুশ কমিউনিস্টরা ও তাদের আশ্রিত কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদের চর, দেশের শত্রু বলতে দ্বিধা করেনি। ডুবচেকের অপরাধ ছিল দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি লড়াই করতে চেয়েছিলেন ! ]

"The British ruling class called up its last reserves ; the labour leaders have been given the responsibility of leading the workers to the slaughter and crushing the opposition against rapid deterioration of living standards which is now inevitable……" [ World News and Views : 18th May 1940 ]……চার্চিল সরকারের সমালোচনা করে বলা হল : "This is

the worst government that has ruled Britain." [ Same Issue : World News and Views ] চারিদিকে আতঙ্ক, পরাজয় ও আত্ম-সমর্পণের মনোভাব ছড়ান হতে লাগল। যখন দেশের ওপর টন-টন বোমা নাৎসী পুষ্পকরথ বর্ষণ করে চলেছে তখন কমিউনিস্টরা নাগরিকদের জীবিকার মান নিম্নমুখী হচ্ছে অভিযোগ তুলে জাতির মন যুদ্ধ-বিরোধী করার চেষ্টা চালালেন। লণ্ডনের ওপর বোমা বর্ষণ পর্ব সুরু হবার আগে পর্যন্ত ব্রিটেনের কমিউনিস্টরা 'জনগণের সরকার' 'Peoples' Government', এবং নানাবিধ অর্থনৈতিক-সামাজিক দাবী-দাওয়া তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অবিরাম চেষ্টা করলেন। রাশিয়াও সন্দিহান হয়ে পড়েছিল, সত্যি সত্যি কি জার্মানী ইংলণ্ড অভিযান করবে? কিন্তু লণ্ডন শহরের ওপর ব্যাপক বোমা বর্ষণ শুরু হবার সাথে সাথে কমিউনিস্টদের প্রচারের তারতম্য পরিলক্ষিত হল। আবার পরাজয়সুলভ মনোভাব ও আতঙ্ক বিস্তারের প্রয়াস করা হল। যুদ্ধে জার্মানীর চেয়ে ব্রিটেনের ক্ষয়-ক্ষতি ধ্বংস অনেক বেশি হচ্ছে সেটা ফলাও করে প্রচার সুরু হল: The Germans are hardly guilty of random bombing." [ World News and Views : September, 7. ]

"পোল্যাণ্ডের জন্য ব্রিটেনের যুদ্ধে নামার যৌক্তিকতা হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে —যদি এইভাবে আমাদের ক্ষয়-ক্ষতি চলতে থাকে"। ভবিষ্যদ্বাণী করা হল যে, অচিরেই দেশে 'a sharp revolution of feeling' দেখা দেবে। এসব কথা বলার অর্থই হল—হিটলার-বিরোধিতা করার কি দরকার বাপু! মিটিয়ে নাও—যে কোন মূল্যে। বলা হল: "All the propaganda about being a 'Peoples' war' cannot create the courage and willingness to bear sacrifice that existed in Spain." [ World News & Views : Sept. 21. ]

অর্থাৎ ইংলণ্ডের পক্ষে এই মরণ-বাঁচন সংগ্রামকে 'জন-যুদ্ধ' বলে প্রচার করার চেষ্টাকে হেয় করার চেষ্টা হল। 'জন-যুদ্ধ' বললেই দেশের মানুষের মনে প্রতিরোধের সঙ্কল্প ও সার্থকতা আসবে না। কেনই বা লোকে এই দুঃখ-কষ্ট বরণ করবে? এ যুদ্ধ তো স্পেনের গৃহযুদ্ধের মত নীতি-ভিত্তিক যুদ্ধ নয় যে, জনগণ এই ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী হবে? বোমা-বর্ষণে মস্কো তো খুশি। কেন না তখন স্তালিন-মলোটভ ভাবছেন ইংলণ্ডের পতন আসন্ন। দেশের জনগণের মন অন্তর্মুখী করার চেষ্টায় ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি অদ্ভুত অদ্ভুত কর্মসূচী ও শ্লোগান দেশের কাছে রেখেছিল। তারা

দাবী করল: Peoples' Convention—জনগণের সম্মেলন আহ্বান করা হোক; জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হোক; 'জনগণের শান্তি' চাই (Peoples' peace)। এই People's peace-এর স্বরূপটি কি হবে? তা কিন্তু বলা হল না। বোমায় বিধ্বস্ত নাগরিকদের সামনেও কোন দেশপ্রেমিক আবেদন জানান হল না,—মৃত্যুপণ করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার কথা ঘোষণা করা হল না। বলা হল: বর্ধিত বেতন ও সুযোগ-সুবিধার কথা; ভাল বিমান-আক্রমণ-প্রতিষেধক ("Better air-raid shelter")।

[ভারতবর্ষে বাংলার দুর্ভিক্ষের (১৯৪৩) সময় ৫০ লক্ষ মানুষ যখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল তখন বাংলার কমিউনিস্টরা লাইন দিয়ে মানুষকে খিচুড়ি পরিবেশনের জন্য বেশি সংখ্যায় লঙ্গরখানা খোলার দাবী জানিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের কাছে।] ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি আরও দাবী করলেন শিল্পের ব্যাপক জাতীয়করণের। অবশ্য এইসব দাবীর ফাঁকে ইঙ্গ-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তির দাবীও করা হয়েছিল। দলের এই অদ্ভুত অবিশ্বাস্য আচরণ জন-মন থেকে দলকে প্রায় মুছেই দিয়েছিল। নির্বাচনের ফলগুলিই তার প্রমাণ। ২১শে জানুয়ারি (১৯৪১) দলের পত্রিকা Daily Worker-এর প্রকাশ বন্ধ করে দিল তৎকালীন সরকার।

যুদ্ধের সময় দেশের স্বাধীনতা যখন বিপন্ন তখন এইসব সামাজিক রূপান্তরের (Social changes) নূতন সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী রূপায়ণের অবকাশ থাকে না। ইতিহাসই তার সাক্ষী। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ট্রট্স্কীপন্থী, সিণ্ডিক্যালিস্ট ও প্রজাতন্ত্রীরা এই Social changes-এর দাবী করেছিলেন, তার ভিত্তিতে বিপ্লবী সংগ্রামে জীবনপণ করেছিলেন। তখন এদের বিরোধিতা করে এই কমিউনিস্টরাই বলেছিলেন: এখন যুদ্ধ, ওসব দাবী এখন উঠতে পারে না এবং উঠতে দেওয়া উচিত হবে না, যুদ্ধে জয়লাভের প্রয়োজনীয়তার স্বার্থে।

রাশিয়া হিটলারকে খুশি করার জন্য আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিকে চাপ দিয়েছিল যাতে মার্কিন সরকার যুদ্ধে ব্রিটেনকে কোন সাহায্য না পাঠায়।

"During that whole period Moscow attempted to hold out a bait to Berlin by letting the American Communists systematically oppose all help for Britain and in particular lend-lease." (P. 262)। কিন্তু আমেরিকায় কমিউনিস্টদের এমন কোনই প্রভাব ছিল না যে, তারা এই চাপকে কার্যকরী করে সে দেশের সরকারের নীতির কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারত।

কিন্তু ২২শে জুন ( ১৯৪২ ) রাশিয়া যে-মুহূর্তে আক্রান্ত হল—সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধ ও দেশ-সংক্রান্ত নীতিরও রূপান্তর ঘটল। কমরেড পামি দত্ত তাঁর মত বদলালেন। তাঁর আচরণের এই দ্রুত আকস্মিক পরিবর্তন দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারেনি। হ্যারি পলিট আবার কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির পুরোভাগে চলে এলেন। যে চার্চিল-সরকার সম্বন্ধে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি 'ইংলণ্ডের ইতিহাসের ঘৃণ্যতম সরকার' বলে মন্তব্য করেছিলেন পামি দত্তের নেতৃত্বে—আজ সেই পামি দত্ত ঘোষণা করলেন :

"The broadest National Front round the Churchill Government." চার্চিলকে কেন্দ্র করে বৃহত্তম ও সবচেয়ে উদারভিত্তিক জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করার দাবী উঠল। যে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সমালোচনায় ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি মুখর ছিল—যারা কথায় কথায় 'enemy is within' 'আসল শত্রু জাতির অভ্যন্তরে রয়েছে—পুঁজিপতি পরিবাররা'—বলে জনগণের দৃষ্টি ও মন অন্যদিকে ফেরাতে চেষ্টা করছিলেন, যুদ্ধ-প্রয়াসে বাধা সৃষ্টি করছিলেন, ধর্মঘটের ডাক দিচ্ছিলেন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের আশু প্রয়োজনীয়তার দাবী তুলছিলেন—তাঁরাই রাতারাতি যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সর্বাত্মক সহযোগিতার শ্লোগান তুললেন। মুখে আর মজুরী-বৃদ্ধির দাবী শোনা গেল না—এখন দাবী করা হল 'ensure maximum production'—'যেভাবে পার উৎপাদন বৃদ্ধি কর কল-কারখানায়।'

মস্কোর বিশেষ অনুরাগী ও অনুগৃহীত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা এমিল বার্ণ একটি প্রবন্ধে লিখে ফেললেন :

"We can only play our part fully if we really understand the *changed character of the war*. What is at issue is now *no longer which of the two imperialist groups is to dominate the world*."

অর্থাৎ 'ব্রিটিশ জনসাধারণ যুদ্ধে তাদের ভূমিকা সার্থকভাবে পালন করতে পারবেন যখন তাঁরা যুদ্ধের প্রকৃতিগত চরিত্রের রূপান্তরটি বুঝতে পারবেন। আজ আর আমাদের কাছে এ প্রশ্ন নয়—দুই বিবদমান সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে পরিশেষে কোন্ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্বে প্রভুত্ব করবে।'

এ এক অতি অদ্ভুত তত্ত্বকথা। প্রথমত, রাশিয়া আক্রান্ত হবার সাথে সাথেই যুদ্ধের চেহারাটাই পাল্‌টিয়ে গেল। 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' 'জন-যুদ্ধে' রূপান্তরিত হল। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের পরিণতি-স্বরূপ যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্বে প্রভুত্ব

স্থাপন করতে সক্ষম হয় তাহলে ভবিষ্যতের সেই সম্ভাবনা নিয়ে ভাববার সময় এটা নয়। আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কমিউনিস্টদের সমস্যার বিশ্লেষণ বা কর্তব্য-নির্ণয় করা ঠিক হবে না।—সত্যিই, তা তো নয়ই। কেননা যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জিতলে উপনিবেশগুলি থেকে লুঠের বখরা অঢেল আসবে দেশে। ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের উপনিবেশগুলির শোষিত বঞ্চিত কৃষ্ণাঙ্গদের স্বার্থের বিনিময়ে—রুটির দু'পিঠে মাখন জেলি জুটবে—মজুরী বেতন সুযোগ-সুবিধা সবই বাড়বে যে!

বলা হল: "With this aim it is necessary to support all measures taken by the Government for the continuation of the war on British part and at the same time to fight vigorously against those sections of the ruling class who oppose or try to sabotage the fullest possible help, military or economic to the Soviet struggle." ( Emile Burns )

## ১৬

### (ক) পোল্যাণ্ড : নাৎসী ও রুশ-আক্রমণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে বিভিন্ন শক্তিবর্গের মধ্যে চুক্তির ফলে পোল্যাণ্ড স্বাধীন হয়। পুরাতন পোলীশ রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পোল্যাণ্ড মধ্য-ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া ও রাশিয়ার শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয় এই রাষ্ট্রকে। তিন-তিনবার এই দেশ বিভক্ত হয়ে ( পার্টিশান ) শেষে ১৭৯১ সালে এই দেশ তার স্বাধীনতা হারাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মান,—অস্ট্রিয় ও রুশ সাম্রাজ্যের পতনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন পোল্যাণ্ডের নবজন্ম লাভ ঘটল। ইউরোপের সমতল ভূমির মধ্যে অবস্থিত পোল্যাণ্ডের কোন সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা ছিল না—দক্ষিণাঞ্চল ছাড়া। সেখানে কার্পেথীয় পর্বতমালা স্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে স্বাভাবিক সীমানা রচনা করেছিল। জার্মানীর সঙ্গে পশ্চিম ও উত্তর সীমান্ত ভার্সাই চুক্তির সর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট হয়েছিল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা রয়েই গেল। এ ছাড়া পোল্যাণ্ডে জার্মান, অস্ট্রিয়ান ও রাশিয়ান পোলরা মিলিতভাবেই বাস করত। এখানেই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বীজ রয়ে গিয়েছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে প্রাক্-অস্ট্রিয়ার সাইলেশিয়া—সাইলেশিয়াকে কেন্দ্র করে পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। সাইলেশিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কয়লা খনি অধ্যুষিত অঞ্চল; এখানে পোল ও চেক দুই জাতির লোকেরই বাস ছিল। ১৯১৯ সালের প্রথমদিকে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষের উপক্রম হয়েছিল। সেইসময় ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের মধ্যস্থতায় স্থির হয় গণভোটের ( Plebiscite ) মাধ্যমে এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা হবে। কিন্তু গণভোটের দিন যতই এগিয়ে আসছিল, ততই দুই জাতির বাসিন্দাদের মধ্যে উত্তেজনা এত উগ্র হয়ে উঠল যে, শেষ পর্যন্ত গণভোটের প্রস্তাব বাতিল করে একটা আপোষ মীমাংসা হল। এই

আপোষ রফায় চেকোশ্লোভাকিয়া কয়লাখনি অঞ্চলগুলি ভাগে পেল—আর পোল্যাণ্ডের ভাগে পড়ল প্রধান সহর Teschen। এতে অবশ্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। আবার পোল্যাণ্ডের পূর্ব-গ্যালিসিয়া ( East Galicia ) প্রদেশ নিয়ে সংঘাত চলছিল। সেখানকার কৃষকরা ছিল পোল-বিদ্বেষী। জমির বড় বড় মালিক ছিল পোলরা। মিত্রপক্ষ ( Allies ) পূর্ব-গ্যালিসিয়ার ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রসংঘ ( League of Nations ) কর্তৃক নির্ণীত করার প্রস্তাব দেয়। সেটা অবশ্য পোলীশ সরকার নাকচ করে দেয়। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, পোল্যাণ্ডের অধীনে এই প্রদেশ ২৫ বছর থাকার পর তার স্বতন্ত্র ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ কর্তৃক। পরিশেষে ১৯২৩ সালে এই প্রদেশের ওপর পোল্যাণ্ডের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল মিত্রপক্ষ। পূর্ব-গ্যালিসিয়াকে পোল্যাণ্ড পরে স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেনি। পূর্ব-গ্যালিসিয়া প্রদেশ ছিল তৈলখনি অধ্যুষিত অঞ্চল। পোল্যাণ্ডের পূর্ব সীমান্ত ছিল আরও জটিলতাপূর্ণ। লিথুয়ানিয়া, হোয়াইট রাশিয়া ও কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ইউক্রেন অঞ্চল থেকে ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের সময় পোলীশ জমিদাররা পালিয়ে পোল্যাণ্ডে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা পোল সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল ফেলে-আসা অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য। এর জন্য দরকার ঐসব অঞ্চলগুলি দখল করা। বাল্টিক সাগর থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে পুরাতন পোলীশ সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নে তারা বিভোর ছিল।

নূতন পোল্যাণ্ড সৃষ্টির মূলে দুটি শক্তি কাজ করেছে: জাতীয়তাবাদী ভাবধারা এবং বিপ্লবী জোসেফ পিলসুড্‌স্কির বিরাট ব্যক্তিত্ব। ১৯১৪ সালে তিনি অস্ট্রিয়ার অনুমতি নিয়ে তিনশ' সৈন্যসহ বিরাট রুশ দেশ আক্রমণ করে বসেন—পরে এই থেকে তিনটি ব্রিগেড গড়ে ওঠে। পোল্যাণ্ড ইতিহাসে অতীতে প্রুশিয়া, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় ৪ বার বিভক্ত ( পার্টিশান ) হয়েছে। পোল্যাণ্ডকে আক্রমণকারীদের হাত থেকে মুক্ত করার মানসে এই সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়েছিল। ১৯১৬ সালে জার্মানরা ওয়ারশ নগরী দখল করে নিল। জার্মান দখলদারবাহিনী রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোলীশ সেনাদলকে জার্মানীর তাঁবেদার বাহিনীরূপে কাজ করার অনুমতি দিলে পিলসুড্‌স্কি তা অস্বীকার করেন। তিনি গ্রেপ্তার হন। কেননা তিনি তাঁর দেশের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেছিলেন। ১৯১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর পিলসুড্‌স্কি স্বাধীন

পোল্যাণ্ডের নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। পোল্যাণ্ড প্রকৃতপক্ষে তাঁরই সৃষ্টি। তাঁকে বাদ দিয়ে স্বাধীন পোল্যাণ্ডের কথা কল্পনাই করা যায় না। ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা কি বিরাট হতে পারে তা পোল্যাণ্ডের এই নেতার অবদান থেকে বোঝা যায়।

১৯২০ সাল পিল্‌সুড্‌স্কি ইউক্রেন দখলের অভিযানে বার হলেন। গৃহযুদ্ধে বিচ্ছিন্ন দুর্বল রুশ সেনাবাহিনী আক্রমণের মুখে দাঁড়াতেই পারল না। পোলীশ সেনাবাহিনী কিয়েভ ( Kiev ) পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সেই বছরের জুন মাসে রুশ সেনাবাহিনী পাণ্টা আক্রমণ করে পোলীশ সেনাবাহিনীকে তাড়া করে একেবারে রাজধানী ওয়ারশ নগরীর উপকণ্ঠে এনে হাজির করল। কিন্তু যুদ্ধে এবার রুশ লালফৌজের বিপর্যয় দেখা দিল। রুশ সেনাবাহিনী পিছু হটতে আরম্ভ করল। এবার পোলীশ বাহিনী ইউরোপের মধ্য দিয়ে হোয়াইট রাশিয়ায় প্রবেশ করল। সেখানে সন্ধি স্থাপিত হল। দুই দেশের মধ্যে স্থায়ী সীমানা 'কার্জন লাইনে'র পূর্ব দিয়ে স্থিরীকৃত হল। ১৯২১ সালে Treaty of Riga-দ্বারা সেই সীমানাই পাকাপাকি করা হল। পোল্যাণ্ড ইউক্রেনের দাবী পরিত্যাগ করল এবং তার বদলে হোয়াইট রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পেল রাশিয়ার কাছ থেকে।

পোল্যাণ্ড লিথুয়ানিয়ার ভিলনা-অঞ্চলও দাবী করে বসে। ১৯১৮ সালে স্বাধীন লিথুয়ানিয়া স্বীকৃতি লাভ করল এবং ভিলনা নগরীকে তার রাজধানী বলে ঘোষণা করল। ১৯২০ সালে রুশ-সেনাবাহিনী যখন পাণ্টা আক্রমণ করে ওয়ারশ অভিমুখে রওনা হল তখন রাশিয়া ও লিথুয়ানিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি সাধিত হয়। তাতে প্রসঙ্গত রাশিয়া ভিলনাকে লিথুয়ানিয়ার রাজধানী-রূপে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু যখন রুশ-সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পিছু হটে আসছিল তখন পোলরা রাশিয়ার কাছে লিথুয়ানিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তারপরই পোলদের সঙ্গে লিথুয়ানিয়াবাসীদের যুদ্ধ সুরু হয়। অক্টোবর মাসে ( ১৯২০ ) সন্ধি হয় দুই দেশের মধ্যে। কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গ করে পোলরা ভিলনা দখল করে নেয়। লিথুয়ানিয়ার সৈন্যরা পাণ্টা-ব্যবস্থা হিসাবে মেমেল দখল করে নিল মিত্রপক্ষীয় কর্তৃত্ব অমান্য করেই। এর পর অবশ্য মিত্রপক্ষ ( Allies ) ভিলনাকে পোল্যাণ্ডের অংশ বলে মেনে নিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে পোল্যাণ্ডের জনসংখ্যা প্রায় তিন কোটী দাঁড়ায়। ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ শক্তিরূপেই পোল্যাণ্ড গণ্য হত। তার জনসংখ্যা ছিল মিশ্র : ইহুদীরাই সংখ্যায় $\frac{1}{3}$ অংশ ছিল মোট জনসংখ্যার। এই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল

প্রচুর—যথা, খনিজ তৈল, লৌহ, বনসম্পদ, কয়লা ইত্যাদি। পূর্ব-ইউরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল এই পোল্যাণ্ড।

প্রতিবেশী প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের সঙ্গেই পোল্যাণ্ডের সীমান্ত নিয়ে সংঘাত ও তিক্ততা দেখা দিয়েছিল। পোল্যাণ্ডের সুসংগঠিত জার্মান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি পোল-সরকারের আচরণ এবং ডানজিগ-এর সমস্যা নিয়ে জার্মানীর সঙ্গেও তার বিবাদ চলছিল। আবার ফরাসী দেশের সঙ্গে জার্মানীর স্বার্থ-সংঘাত ছিল। জার্মানীর শক্তি বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত ফরাসী সরকার পোল্যাণ্ডের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ( Franco-Polish Treaty of 1921 )। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সহযোগিতার ভিত্তি রচিত হল। এই সঙ্গে একটি গোপন চুক্তিও সম্পাদিত হল। তার ফলে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ফরাসী দেশ থেকে পোল্যাণ্ডে আমদানী হচ্ছিল। গোপনেই অবশ্য। উদ্দেশ্য, পোলিশ সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা।

জার্মানীর সঙ্গে বেশি করে ঝগড়া সুরু হল পোলীশ করিডর নিয়ে। ভার্সাই সন্ধির আগে এই জায়গাটা জার্মানীরই ছিল। এখানকার লোকেরাও প্রায় সবাই জার্মান। চারিদিকে পররাষ্ট্রীয় ভূ-ভাগবেষ্টিত পোল্যাণ্ডকে বাল্‌টিক সমুদ্রে যাবার সুযোগ দেবার জন্য ভার্সাই সন্ধিতে এটা পোল্যাণ্ডকে দেওয়া হয়েছিল। হিটলার দাবী করলেন পোলীশ করিডর (পোলদের রাস্তা) তাঁর দেশকে ফিরিয়ে দিতে হবে। পোল্যাণ্ড এতে রাজী হল না। ডানজিগের পার্শ্ববর্তী পোজেন প্রদেশ চিরদিনই জার্মান ভাষাভাষী লোকের বাসভূমি। এই পোলীশ করিডরের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল জার্মান। জার্মানীর পুনরুজ্জীবনে তারা কম উল্লসিত হয়নি। নাৎসী সেনাবাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন করিডরে প্রবেশ করল সেখানকার জার্মানরা তাদের অভ্যর্থনা জানাল।

হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলার হবার প্রায় এক বছর পর ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জার্মানীর এক মৈত্রী চুক্তি হয় ( German-Polish Pact )। এই চুক্তির ফলে গত ১৫ বছর ধরে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে দুই দেশের সংবাদপত্রে যে তিক্ত তীব্র আক্রমণাত্মক পরস্পর-বিরোধী প্রচার-অভিযান চলছিল তা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দুই রাষ্ট্রই দিল এবং বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘের ( League of Nations ) আলোচনার তালিকা থেকে পোল্যাণ্ডের জার্মান সংখ্যালঘুদের পোলীশ সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও ডানজিগ-সম্পর্কিত বিতর্কিত বিষয়টিও উঠিয়ে নেওয়া হল।

এই ধরনের জার্মান-পোলীশ মৈত্রী-চুক্তির প্রয়োজনীয়তা দু'পক্ষ থেকেই পারস্পরিক স্বার্থে অনুভূত হয়েছিল। জার্মানীতে হিটলার চ্যান্সেলার হবার পর থেকে কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট নিপীড়ন সুরু হয়। সুতরাং র‍্যাপালো চুক্তির সুড়সুড়ি দিয়ে রাশিয়াকে কাছে টানার পক্ষে রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাধা রচিত হয়েছিল। র‍্যাপালো চুক্তিকে পশ্চিম দুনিয়া সন্দেহের চোখে দেখেছিল। হিটলারের আভ্যন্তরীণ কমিউনিস্ট-সম্পর্কিত নীতির ফলে হিটলার অনুভব করেছিলেন জার্মানী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে ( fear of isolation )। পোল্যাণ্ডকে আশ্বস্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আবার পোল্যাণ্ড প্রতিবেশী সকল রাষ্ট্রের চোখেই ঝগড়াটে দেশ বলে পরিচিত হয়ে পড়েছিল। তার একমাত্র ইউরোপের সেদিনের বড় দোস্ত ফরাসী দেশ। কিন্তু ভৌগোলিক দিক থেকে ফরাসী দেশের অবস্থিতি খুব বড় একটা ভরসা জাগাতে পারেনি। তাছাড়া লোকার্নো চুক্তি ( Locarno Treaty ) একদিকে র‍্যাপালো চুক্তির ( Rapallo Treaty ) পাল্টা দাওয়াই বলে মনে করার কারণ ছিল। ফরাসী দেশ লোকার্নো চুক্তিতে সামিল হয়ে প্রমাণ করল যে, ফরাসী জাতি ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তাজনিত প্রশ্ন অগ্রাধিকার পাবেই পোলীশ স্বার্থের ওপর। জার্মানী যেভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল তাতে জার্মানীর কাছ থেকে যদি কোনদিন কোন বিপদ আসে তাহলে দূর থেকে ফরাসী দেশের সরকার পোল্যাণ্ডের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে আদৌ পড়বে কিনা সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ পোলীশ নেতাদের ছিল। [ International Relations Between Two World Wars 1919—1939 By C H. Carr. ]

পোল্যাণ্ডের সঙ্গে দশবছরের অনাক্রমণ চুক্তি হিটলারের একটি অতি চতুর পদক্ষেপ। এতদিন পোল্যাণ্ড রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর অবধি পোল্যাণ্ডের বড় ভরসাদাতা—রক্ষক ছিল ফরাসী দেশ। এই অনাক্রমণ চুক্তির ফলে পোল্যাণ্ড নাৎসী জার্মানীর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। পোল্যাণ্ডের নেতারা উপলব্ধি করতেই পারেননি এই কাছাকাছি হবার মধ্যে বিপদ আছে। একথা মনে করলে ভুল হবে যে, পোল্যাণ্ডের ডানজিগ ও পোলীশ করিডর সম্বন্ধে একমাত্র হিটলারই বুঝি কড়া মনোভাব পোষণ করতেন। প্রজাতন্ত্রের যুগে জেনারেল ভন সীক্‌ট ( General Von Seekct ), চ্যান্সেলার স্ট্রেসম্যান্—এঁরাও মনে করতেন জার্মানীর কাছ থেকে পোলীশ করিডর দ্বারা পূর্ব প্রুশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার মত অন্যায়কে কখনই মেনে নেওয়া চলে না। ডানজিগ নগরীকে 'লীগ অব নেশনসের' অধীনে একটি 'স্বাধীন নগরী' (Free City of Danzig)

রূপে শাসিত হতে দেখতে প্রজাতন্ত্রের আমলের নেতারাও প্রস্তুত ছিলেন না। জেনারেল ভন সীক্‌ট তো বলেই ছিলেন:

"Poland's existence is intolerable and incompatible with essential conditions of Germany's life. Poland must go and will go as a result of her own internal weaknesses and of action by Russia with our aid···The obliteration of Poland must be one of the fundamental drives of German policy···and is attainable by means of and with help of Russia. [Quoted in 'Sword and Swastika'—By Telford Taylor at P. 41, See also Rise And Fall Of Third Reich: By Shirer at P. 558]

অর্থাৎ জার্মানীর পাশে পোল্যাণ্ডের সহঅবস্থান অকল্পনীয় ও অসহনীয়। পোল্যাণ্ড নিজের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, সংঘাত এবং জার্মান সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার আঘাতেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হবে নিঃসন্দেহে। পোল্যাণ্ডকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেওয়াই হবে জার্মান রাষ্ট্রনীতির অন্যতম মৌল উদ্দেশ্য। আর এটা করা সম্ভব এবং তা করতেও হবে রাশিয়ার সহযোগিতায়। ভন সীক্‌টের এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিল। সেটা পরবর্তী অধ্যায়েই আমরা দেখব।

১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে জার্মান-পোলীশ অনাক্রমণ চুক্তিতে বলা হল সর্বপ্রকার সংঘর্ষ এড়িয়ে প্রত্যক্ষ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সমস্ত বিতর্কিত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বার করতে হবে। এটা ছিল জার্মান সরকারের নিছক ধাপ্পা এবং ফাঁদ। একটি জঙ্গী সম্প্রসারণবাদী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনীতি-বিদদের প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস-বাণীকে মৌখিক মূল্যে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে পররাষ্ট্রনীতি রচনা করা যে কি মারাত্মক তা পোল্যাণ্ডের নেতারা, বিশেষ করে তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্নেল বেক ( Colonel Beck ) বুঝতেই পারেননি। [ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র দপ্তরের নীতি নির্ধারণ যাঁরা করেন তাঁরা চীনের আক্রমণাত্মক ও মাতব্বরিসুলভ মনোভাব সত্ত্বেও পিংপং খেলার নেমন্তন্ন পেয়েই আনন্দে আহ্লাদে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। অতীতের অপমান, তিক্ত গ্লানিকর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও শিক্ষা হয়নি। আমলারাই নিয়ন্ত্রণ করছে দেশের ভাগ্য,—দেশপ্রেমিক বিশেষজ্ঞ, ভারতীয়-সচেতন রাষ্ট্রনীতিবিশারদ সমরশাস্ত্র প্রতিরক্ষা বিশারদ, রণপণ্ডিতরা নন। যে দেশই এই মারাত্মক নীতি অনুসরণ

করবে—তাকেই তার পুরো মাশুল দিতে হবে একদিন। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। ]

পোল্যাণ্ডের এমন শক্তি ছিল না যে, রাশিয়া ও জার্মানী এই দুই শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে নিজের পায়ের ওপর সেদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারত। রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ১৯২০ সাল থেকেই খুবই তিক্ত ছিল। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার তিক্ত সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে জার্মানী এই অনাক্রমণ চুক্তির ফাঁদ পেতেছিল এবং প্রত্যক্ষ আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব রেখেছিল। জার্মানীর কমিউনিস্ট বিদ্বেষ পোল্যাণ্ডকে হয়ত আশ্বস্ত করে থাকতে পারে।

হিটলারের আমলে জার্মানীর রাইনল্যাণ্ড অভিযান, বিনা রক্তপাতে অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা হরণ ইউরোপে সেদিন জার্মানীকে যে প্রচণ্ড সামরিক মর্যাদা দিয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে হিটলার পোলীশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী কর্নেল বেকের সঙ্গে বারচেট্‌স্ গ্যাডেন-এ ডানজিগ ও পোলীশ করিডর নিয়ে আলোচনার আমন্ত্রণ জানালেন।

এর আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ইংলণ্ড, ফরাসীদেশ, রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড—এই চারটে রাষ্ট্রের মধ্যে এক চুক্তি স্থাপনের প্রস্তাব করলেন। এই জোটের লক্ষ্য হবে: ইউরোপে অন্য আর যে কোন রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ প্রতিহত করা। পোল্যাণ্ড এই প্রস্তাবে রাজী হল না। রাশিয়াকে সে বিশ্বাস করতে পারেনি। হিটলার পোলীশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে জানালেন: "Danzig is German, will always remain German and will sooner or later become part of Germany." (জানুয়ারি ৫, ১৯৩৯)।

ভন রিবেনট্রপও বার্লিনস্থিত পোলীশ রাষ্ট্রদূত লিপসিকে (Lipsi) জানিয়ে দিলেন ১৯৩৯ সালের ২১ মার্চের এক বৈঠকে যে, ডানজিগ পোল্যাণ্ডেরই অংশ। পোল্যাণ্ড হিটলার ও রিবেনট্রপের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজী হল না। হিটলার জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বলপ্রয়োগ করে ডানজিগ দখল করতে চান না অথবা ডানজিগ দখলের পরিস্থিতিও সৃষ্টি করতে চান না—তথাপি তলে তলে বলপূর্বক দখলের পরিকল্পনা রচনার নির্দেশ দিলেন। সেইসঙ্গে পোল্যাণ্ড আক্রমণের ব্লু-প্রিণ্টও তৈরী হল। ['Case White': Top secret.]

## ( খ )

জার্মানবাহিনী হিটলারের এই গোপন পরিকল্পনা অনুযায়ী (Case White : Top secret ) ২৬শে আগস্ট পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবে তাই স্থির হয়েছিল। হিটলার তাই ২৩শে আগস্টের মধ্যে ভন রিবেনট্রপকে মস্কো পাঠিয়ে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের কাজ সম্পূর্ণ করতে খুব ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। রুশ ডিক্টেটার স্তালিনের চুক্তি সম্পর্কিত সম্মতিজ্ঞাপক শর্ত পাবার সাথে সাথেই বিশ্ববাসীকে জার্মান সরকার এই মৈত্রীচুক্তির কথা জানিয়ে দিলেন। ঠিক এই সময় রাশিয়ায় ফরাসী ও ব্রিটিশ সামরিক প্রতিনিধিদল রুশ-সরকারের সঙ্গে জার্মান সম্প্রসারণবাদকে প্রতিহত করার মানসে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন। এদিকে ইংলণ্ডে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ২১শে আগস্ট সিদ্ধান্ত নিলেন যে, রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ব্রিটিশ সরকারের পোল্যাণ্ডের প্রতি প্রতিশ্রুতি পালনের পথে কোন বাধাই সৃষ্টি করতে পারবে না। ইংলণ্ড পোল্যাণ্ডকে আক্রমণ থেকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি পালন করবেই। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন হিটলারকে এক চিঠিতে জানালেন :

"Apparently the announcement of a German-Soviet Agreement is taken in some quarters in Berlin to indicate that intervention by Great Britain on behalf of Poland is no longer a contingency that need be reckoned with. Whatever may prove to be the nature of the German-Soviet Agreement, it can not alter Great Britain's obligations to Poland."

এই চিঠি ২৩শে আগস্ট নাৎসী চ্যান্সেলারের হস্তগত হল।

জার্মান সরকারকে সুস্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিতেও ছাড়েননি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যে, ব্যাপক যুদ্ধের যে কোন পরিণতির জন্য ব্রিটিশ সরকার প্রস্তুত। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি ব্রিটিশ সরকার মনের কথা বলছিলেন, না অভিনয় করছিলেন? কেননা এই ধরনের হুঙ্কার দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চেম্বারলেন হিটলারের কাছে শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য হাত বাড়াবার আবেদন জানালেন।

এ ব্যাপারে হিটলারের মনোভাব ছিল আপোষহীন। পোল্যাণ্ড ধ্বংস করতে তিনি বদ্ধপরিকর। একটার পর একটা অজুহাত আবিষ্কার করছিলেন

মাত্র আক্রমণের সমর্থনে। হিটলার চেম্বারলেনের চিঠি পেয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হেণ্ডারসনকে জানিয়ে দিলেন যে, যুদ্ধ বাধলে কি হতে পারে তা তিনি একজন প্রথম সারির সৈনিক হিসেবে ভালভাবেই জানেন । কিন্তু হিটলার বেশ কিছুটা বিচলিতও হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর চিঠিতে ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ জানালেন যে, জার্মানী পোল্যাণ্ডের ডানজিগ ও করিডর মাত্র চেয়েছে। জার্মান সরকারের এই প্রস্তাব 'অতুলনীয় উদারতার' ভিত্তিতে রচিত, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের পোল্যাণ্ডকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার গ্যারাণ্টী পোলদের আরও দুর্বিনীত ও উদ্ধত করে তুলতে সাহায্য করছে। তারা পোল্যাণ্ডের জার্মান-বাহিনীর ওপর নাকি অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। জার্মানী সেটা আর বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয়।

হিটলার বুঝলেন জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে গ্রেটব্রিটেন পোল্যাণ্ডের পক্ষেও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। ২৫শে রিবেনট্রপ মস্কোতে চুক্তি সম্পাদন করে বিজয়ীর গর্ব নিয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন। এদিকে ২৬শে পোল্যাণ্ড আক্রমণের দিন স্থির হয়ে আছে। কিন্তু সেইদিনই তাঁর পরম বন্ধু মুসোলিনির কাছ থেকে প্রাপ্ত এক জরুরী চিঠি পেয়ে প্রমাদ গনলেন। মুসোলিনির আক্ষেপ—কেন ফুরার তাঁর ইউরোপের নিকটতম পার্টনার মুসোলিনিকে এই যুদ্ধ-পরিকল্পনার কথা কিছুই জানাননি? হিটলার ধরে নিয়েছিলেন তিনি যা করবেন মুসোলিনি তাতেই সায় দিয়ে যাবেন। হিটলারের সেই ধারণা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল এখন।

হিটলার পোল্যাণ্ড অভিযানে ইতালীর সাহায্য চাননি। অথচ জার্মান-ইতালী চুক্তিতে (Italo-German alliance) এই ধরনের সহযোগিতা এড়িয়ে যাবার কোনই উপায় ছিল না। হিটলার মুসোলিনিকে তোয়াজে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে চেয়েছিলেন পোল্যাণ্ড আক্রমণের সময় ব্রিটেন ও ফরাসী দেশ যাতে পেছন থেকে আক্রমণ করে না বসে। ইতালী যদি তার সেনাবাহিনী নিয়ে ফরাসী-ইতালী সীমান্তে যুদ্ধ-প্রস্তুতির ভান করে অপেক্ষা করে থাকে, তাহলে কি ব্রিটেন, কি ফরাসী দেশ যুদ্ধের কোন ঝুঁকি নেবে না। তাতে অনায়াসে জার্মান সেনাবাহিনী পোল্যাণ্ডকে ধ্বংস করে ফেলতে পারবে। আবার মুসোলিনিও কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। যদি হিটলারকে সমর্থনই করতে হয় তাহলে তার জন্য পাওনা পুরো মাত্রায় জার্মান সরকারের কাছ থেকে বুঝে নিতে হবে। মুসোলিনি ভেবেছিলেন—জার্মানী অভিযান সুরু করলে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান-বিরোধী মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধের

চাপ সম্পূর্ণভাবে ইতালীর উপর এসে পড়বে। ভূমধ্য সাগরে শক্তিশালী ব্রিটিশ নৌবহরের মোকাবিলা করা ইতালীর নৌ-সেনার পক্ষে অসম্ভব। ফরাসী পদাতিক বাহিনীর প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে পাল্লা কষার ক্ষমতাও ইতালীয় বাহিনীর সে সময় ছিল না। মুসোলিনি বুঝেছিলেন যুদ্ধ সুরু হলে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানীর সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার ভূমিকা হবে মূলত আত্মরক্ষাত্মক। আবার মুসোলিনি হিটলারের বিরাগভাজন হতেও চাননি। হিটলার-স্তালিন দোস্তির ফলে শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন ও ফরাসী দেশ আদৌ যুদ্ধে নামবে কিনা পোল্যাণ্ডের পক্ষ নিয়ে, এবিষয়েও তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তিনি ভাবছিলেন যদি হিটলারের পোল্যাণ্ড অভিযান সফল হয় তাহলে লুঠের বখরাই বা তিনি কেন ছাড়বেন? তাই হিটলারের দিকে পিঠ ফেরাতে মন তাঁর চাইছিল না। তাঁর দ্বিধা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে ইতালীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী মুসোলিনির জামাতা কাউণ্ট সিয়ানো তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ( Ciano Diaries : P. 120—29) সিয়ানো নিজেও চাননি—মুসোলিনি হিটলারের এই অভিযানকে কোনরকম মদত দেন। জার্মানী ইতালীর প্রতি বেইমানী করেছে এই ছিল কাউণ্ট সিয়ানোর অভিমত। কিন্তু মুসোলিনিকে শেষ পর্যন্ত তাঁর মতের অনুকূলে আনতে পারলেন না। সিয়ানো ২১শে আগস্ট মুসোলিনিকে নাকি বার বার নিষেধ করেছিলেন : জার্মানীর সঙ্গে আর যাবেন না।

"...You, Duce, cannot and must not do it...the Germans, not ourselves, have betrayed the alliance....Tear up the pact. Throw it in Hitler's face"... "জার্মানরাই আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আপনি এই চুক্তি ছিঁড়ে ফেলে হিটলারের মুখের উপর ছুঁড়ে দিন।"

মুসোলিনি স্থির করে ফেললেন—হিটলারের সঙ্গে তিনি থাকবেন। তবে চাপ দিয়ে কিছু আদায় করার ফন্দী আঁটলেন। তিনি হিটলারকে লিখিতভাবে জানালেন : যদি পোল্যাণ্ড আক্রমণের বদলা হিসেবে ব্রিটেন ও ফরাসীদেশ পাল্টা আক্রমণ করে তাহলে কিন্তু—"I inform you in advance that it will be opportune for me not to take the initiative in military operations in view of the present state of Italian war preparations.

Our intervention can, nevertheless, take place at once if Germany delivers to us immediately the military supplies

and raw materials to resist the attack which the French and English would predominantly direct against us"...(Mussolini)

ইতালী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতই ছিল না। তবে জার্মান পক্ষে আসার মূল্য-স্বরূপ দাবী করে বসল ৭০ লক্ষ টন পেট্রোলিয়াম, ৬০ লক্ষ টন কয়লা, ২০ লক্ষ টন স্টীল, দশ লক্ষ টন কাস্ট, আরও কত কি সব। বার্লিনস্থিত ইতালীয় রাষ্ট্রদূত এট্টলিকো (Attolico) মারফত এই প্রস্তাব পাঠান হল। অবশ্য পরে এর জন্য মুসোলিনি রোমের জার্মান রাষ্ট্রদূতের কাছে লজ্জা প্রকাশ করেন।

যুদ্ধ সুরু হওয়ার আগেই এই সব সরবরাহ যেন ইতালীতে পৌছায় এই ছিল প্রস্তাব। মুসোলিনি দেশের সামরিক প্রস্তুতির দিক বিবেচনা করে শেষবারের মত পোল্যাণ্ডের ব্যাপার নিয়ে মীমাংসার প্রস্তাব পাঠালেন। তাই হিটলারের সামনে দু'টি চাপ এল দু'দিক থেকে: (১) ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে: জার্মান আক্রমণের জবাব ব্রিটিশ সরকার জানাবে জার্মানীর ওপর পাল্টা-আক্রমণ করে; (২) ইতালীর মীমাংসা প্রস্তাব। গত্যন্তর না দেখে হিটলার ২৬শে আগস্ট অভিযানের তারিখ বদল করলেন। অনেকে মনে করলেন, যাক, বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে বিশ্ববাসী বাঁচলেন।

চতুর হিটলার ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে বুঝতে দিলেন সমগ্র পোলীশ প্রশ্নটি তাঁর বিবেচনাধীন। তিনিও গ্রেট ব্রিটেনের কাছে জানালেন যে, তিনি গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তিতে আসতে রাজী আছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার গ্যারান্টি তিনি দিতে প্রস্তুত।

"The Fuehrer is ready to conclude agreements with England which would not only guarantee the existence of the British empire in all circumstances so far as Germany is concerned, but would also if necessary assure the British empire of German assistance regardless of where such assistance would be necessary"

হিটলার ৬ দফা দাবী-সম্বলিত আর একটি প্রস্তাব পাঠালেন:

(১) জার্মানী ইংলণ্ডের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে চায়,

(২) ব্রিটেনের জার্মানীকে সাহায্য করতে হবে ডান্‌জিগ ও করিডর পোল্যাণ্ডের কাছ থেকে ফিরে পেতে,

(৩) জার্মানী পোল্যাণ্ডের নতুন সীমানা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেবে,

(৪) জার্মানীকে তার উপনিবেশগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে,

(৫) পোল্যাণ্ডকে পোল্যাণ্ডে বসবাসকারী জার্মান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষার গ্যারান্টি দিতে হবে, এবং

(৬) জার্মানী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব বিবেচনার নামে তলে তলে হিটলার আক্রমণের প্রস্তুতি চালালেন। দিন স্থির হল ১লা সেপ্টেম্বর ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটে। প্রায় ১৫ লক্ষ জার্মান সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করে পোল্যাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে লাগল।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জানতেন পোলবাসীরা করিডর কখনই পরিত্যাগ করতে পারে না। তার চাইতে দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব-পণ করে সংগ্রাম করা শ্রেয়। পোল্যাণ্ড হিটলারের আবদার মেনে নিচ্ছে না এই অজুহাতে হিটলার আক্রমণাত্মক যুদ্ধে নিজের দেশকে নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত। হিটলার যে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিটলার-স্তালিন চুক্তির সঙ্গে সংযোজিত গোপন চুক্তিটি (Secret Protocol)। একদিকে হিটলার-স্তালিনের চরম শঠতা—আর একদিকে ব্রিটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রনায়কদের কূটনীতির মারপ্যাচ—মাঝ থেকে বলি হল স্বাধীন পোল্যাণ্ড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল।

ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়্যের (Daladier) তাঁর সরকারের মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠক ডাকলেন কর্তব্য নির্ধারণের জন্য। পোল্যাণ্ডকে যখন এভাবে মানচিত্র থেকে মুছে দেবার ষড়যন্ত্র চলছে তখন ফরাসী দেশ কি চুপ করে বসে থাকবে—এই প্রশ্ন ফরাসী কূটনৈতিকদের মনে জেগেছিল। পোল্যাণ্ডের পাশে দাঁড়াবার অতীত প্রতিশ্রুতিতে অবিচল থাকার কথাই তিনি ঘোষণা করলেন। ফরাসী সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত হতে বলা হল।

২রা সেপ্টেম্বর জার্মানীকে ইংলণ্ড চরমপত্র দেবে স্থির হল—ফরাসী দেশকে তাতে যুক্ত করার চেষ্টা হল। কিন্তু ফরাসী সেনাপতি গ্যামেলিন (General Gamelin) এবং ফরাসী সমরনায়করা ইতস্তত: ভাব দেখালেন। কেননা তাঁরা ভাবলেন যদি জার্মানী পশ্চিমে আক্রমণাত্মক অভিযান চালায় তাহলে তার কোপ পড়বে প্রধানত ফরাসী দেশের ওপর। আর লড়াইটাও হবে ফরাসী সেনাবাহিনীর সঙ্গে, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে নয়। একটি ব্রিটিশ সৈন্যও রণক্ষেত্রে রক্ত দিতে আসবে না। ধুরন্ধর ইংরেজ শুধু বক্তৃতা আর পরের ওপর দিয়ে কাজে হাসিল করে এসেছে চিরকাল! ফরাসী সমরপ্রধানরা

৪৮ ঘণ্টার সময় চাইলেন। তার মধ্যে প্রস্তুতি সেরে ফেলতে হবে। প্যারিসে অবস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার এরিক ফিপ্‌স ( Sir Eric Phipps ) বলেছেন : ৪৮ ঘণ্টা অপেক্ষা করে থাকা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। এদিকে ইংলণ্ডের জনসাধারণ, সকল দলের নেতা ও কর্মীরা চেম্বারলেনের নিন্দায় মুখর। কারণ—পোল্যাণ্ডের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ব্রিটিশ সরকার এত দেরী করছে কেন? কেন এই তোষণ-নীতি? এদিকে জার্মানবাহিনী ক্ষিপ্রগতিতে পোল্যাণ্ডের ভিতরে অনুপ্রবেশ করে এগিয়ে চলেছে। ব্রিটিশ সরকার ৩রা সেপ্টেম্বর চরমপত্র পাঠালেন। জার্মান সরকার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন সেই চরমপত্র। এরপর এল ফরাসী সরকারের চরমপত্র।

হিটলার কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন ও ফরাসী দেশকে যুদ্ধের আওতার বাইরে রাখতে পারলেন না। তাঁর কূটনীতি ব্যর্থ হল। তিনি গোটা দেশকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করলেন। ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করলেন শেষ পর্যন্ত। কমিউনিস্ট রাশিয়া কিন্তু জার্মানীর সঙ্গে চুক্তির সর্ত অনুযায়ীই কাজ করে যাচ্ছিল।

পোল্যাণ্ড অভিযানে জার্মানবাহিনী যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিল রুশ-সরকারের কাছ থেকে। জার্মান বিমানগুলির পোল্যাণ্ডের বিভিন্ন ঘাঁটির উপর বোমা-বর্ষণের সময় রুশ রেডিও স্টেশন মিন্‌কস্‌ ( Minks ) যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। Shirer লিখেছেন :

"Already on the first day of German attack on Poland the Soviet Govt., as the secret Nazi papers would later reveal, had rendered the German Luftweffe a signal service. Very early on that morning the Chief of the General Staff of Air Force, General Hans Jeschonnek, had rung up the German Embassy in Moscow to say that in order to give his pilots nevigational aid in the bombing of Poland—'Urgent navigation test' he called it—he would appreciate if the Russian Radio Station at Minks would continually identify itself. By afternoon Ambassador Von Schulenburg was able to inform Berlin that the Soviet Govt. was prepared to meet your wishes. The Russians agreed to introduce a station identification as often as possible in the programmes over their

transmitter and to extend the broadcasting time of the Minks Station by two hours so as to aid the German flyers late at night." [ Rise & Fall Of The Third Reich : P. 749 ]

জার্মানীই খুব গোপনীয়তার সঙ্গে রুশ-সরকারকে আমন্ত্রণ জানাল পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার জন্য।

প্রচণ্ড ষাঁড়াশী অভিযানের মুখে পোলীশ বাহিনী বিপর্যস্ত ও নিশ্চিহ্ন হল। যুদ্ধের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তার বিমানবাহিনী ধ্বংস হল, ৭ দিনের মধ্যে পোলীশ সেনাবাহিনী পরাস্ত হল, ৩৫ ডিভিসন জার্মান সৈন্যের ব্লিৎস্‌ক্রীগের মুখে একেবারে ভেঙে পড়ল। নীচে সাঁজোয়া গাড়ি ও কামানের অবিশ্রান্ত গর্জন—তার প্রাগৈতিহাসিক বিষ উদ্গিরণ। উপরে বিমানবহরের অবিরাম জলন্ত অঙ্গার ও বোমাবর্ষণ। তবু পোলরা বীরের মতো বিনা অস্ত্রে বিনা সাহায্যে লড়েছিল। ঘোড়সওয়ার সৈন্য সাঁজোয়া গাড়ির মোকাবিলা করতে পারে কখনও? বল্লম নিয়ে কামানের সঙ্গে লড়াই করা যায়? তাই হয়েছিল। তার উপর রাশিয়ার পশ্চাৎদেশ থেকে ছুরিকাঘাত। কি মিত্রপক্ষ, কি রাশিয়া জার্মানীর এই সাফল্যে হত-বিহ্বল হয়ে পড়ল।

যুদ্ধজয়ের এই প্রাথমিক সাফল্যের মুখে জার্মানী রুশ-কর্তৃপক্ষকে খুব গোপনীয়তা রক্ষা করে এক টেলিগ্রাম মাধ্যমে জানাল যে: আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পোলীশ বাহিনী চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত হবে। জার্মানীর প্রভাবাধীন অঞ্চল ('spheres of interest') বলে গোপন চুক্তিতে (secret pact) (হিটলার-স্টালিন চুক্তি) যে অঞ্চল চিহ্নিত হয়েছিল মস্কো বৈঠকে সেই অঞ্চলগুলি জার্মানবাহিনীর অধীনে রাখা হবে। আর রুশ-প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলিতে যেখানে পোলীশ বাহিনী বাধা দেবে সেইসব অঞ্চলগুলি বাধা-মুক্ত করে রুশ-বাহিনীর দখলের অপেক্ষায় জার্মানবাহিনী দখলদাররূপে আপাতত থেকে যাবে। মস্কোস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূতকে রুশ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাওয়া হল রুশ-প্রভাবাধীন বলে চিহ্নিত পোলীশ ভূখণ্ড দখল করার জন্য রুশ সেনাবাহিনী সময়মত সংঘর্ষের জন্য পোল্যাণ্ডের অভিমুখে রওনা হবে কিনা। 'আমাদের অর্থাৎ জার্মান সরকারের বিবেচনায় এটা করলে আমাদের ওপর চাপ শুধু লাঘবই হবে না—এটা হবে মস্কো চুক্তি-মাফিক কাজ এবং রুশ স্বার্থের পরিপূরক।'

"Please discuss this at once with Molotov and see if the Soviet Union does not consider it desirable for Russian

forces to remove at the proper time against police force in the Russian sphere of interest and for their part to occupy this territory. In our estimation this would not only be *relief* for us, but also be in the sense of Moscow agreements and in the Soviet interest as well." [ German Foreign Office Papers : P. 540—541. ]

হিটলার-রিবেনট্রপ চেয়েছিলেন পোল্যাণ্ড আক্রমণের সমস্ত নিন্দা ধিক্কারের বোঝা জার্মানীই একা বহন করবে কেন ? সমাজতান্ত্রিক সর্বহারা শ্রেণীর পরিত্রাতা মার্কসবাদী রাশিয়াও এই পাপকাজের ভাগীদার হোক। আর ভাগ-বাঁটোয়ারা ও লুঠের বখরা সম্বন্ধে যে গোপন চুক্তি মস্কোতে হয়েছিল তা নিয়ে দুই ডিক্টেটারের মধ্যে যাতে কোন ভুল-বোঝাবুঝি না হয় সেটার দিকেও খেয়াল ছিল। সর্বোপরি সোভিয়েট নেতাদের সন্তুষ্ট করা একান্ত দরকার ছিল সেই সময়। কেননা ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সঙ্গে বোঝাপড়া যখন ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনে করতে হবে, তখন রাশিয়া যেন জার্মানীকে পেছন থেকে ছুরি না মারে। তাই রিবেনট্রপ চাইছিলেন না যে, জার্মানবাহিনী রুশ ভাগের লুঠের মালের 'রিসিভার' হয়ে বেশিদিন থাকুক। তিনি কিছুটা 'রিলিফ' চাইছিলেন সমাজতান্ত্রিক দেশের কাছ থেকে। আর আক্রমণের মধ্য দিয়ে ব্যাপক পরিকল্পিত নরহত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীনদেশের স্বাধীনতা হরণের মধ্য দিয়ে এই 'রিলিফ' যেন নাৎসী জার্মানীকে দেওয়া হয়। জার্মান রাষ্ট্রদূত শূলেনবুর্গ 'অতি গোপন' বার্তা পাঠালেন বার্লিন শহরে—কি-ভাবে রাশিয়ার আক্রমণের অজুহাত সৃষ্টি করা হবে তারই পরামর্শ দিয়ে। তিনি বলে পাঠালেন পোল্যাণ্ডের পরাজয় সুনিশ্চিত। এখন ইউক্রেনবাসী ও হোয়াইট রাশিয়ানদের জার্মানীর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার পোল্যাণ্ডে ঢুকে পড়া একান্ত দরকার। মলোটভ এই দুষ্টবুদ্ধি দিলেন শূলেনবুর্গকে। এই অজুহাতে আক্রমণ করলে স্বদেশবাসীদের ( রুশ ) বোঝান যাবে এবং বিশ্ববাসীও বুঝবে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া নিছক আক্রমণকারী রাষ্ট্র নয় ( জার্মানীর মত )। অবশ্য হিটলারও পোল্যাণ্ডে বসবাসকারী জার্মানদের রক্ষার অজুহাতকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেছিলেন।

"...It was necessary for the Soviet Union in consequence, to come to the aid of the Ukranians and White Russians 'threatened' by German. This argument [ said Molotov ]

was necessary to make the intervention of Soviet Union plausible to the masses and at the same time avoid giving the Soviet Union the appearance of an aggressor." [ Rise & Fall Of The Third Reich : P. 754. ]

১৪ই সেপ্টেম্বর মলোটভ শূলেনবুর্গকে ডেকে পাঠান এবং জানতে চান সোভিয়েট আক্রমণের কারণে যদি অজুহাতস্বরূপ জার্মানীকে দায়ী করা যায় তাহলে সে ব্যাপারে কি জার্মান সরকার আপত্তি করবেন? রিবেনট্রপ জানালেন সোভিয়েট আক্রমণকে জার্মান সরকার অভিনন্দন জানাবে। আর 'জার্মান সরকারকে দায়ী করার' কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি তার উত্তরে জানালেন ১৫ই সেপ্টেম্বর : As to Russian excuse blaming Germany for it, this was 'out of the question…contrary to the true German intentions…would be in contradiction to the arrangement made in Moscow and finally…would make the two states appear as enimes before the whole World.'

"এটা হবে মস্কো চুক্তি-বিরোধী, জার্মান অভিপ্রায় পরিপন্থী; এটা করলে বিশ্বের কাছে জার্মানী ও রাশিয়া পরস্পর পরস্পরের শত্রু বলে পরিগণিত হবে। তাহলে এত ঘটা করে মস্কো-মৈত্রী চুক্তির অর্থ কি ছিল?" রিবেনট্রপ মলোটভকে আক্রমণের দিন-ক্ষণ স্থির করে জার্মান সরকার জানাতে অনুরোধ করলেন।

যুদ্ধশেষে হস্তগত জার্মান দলিলপত্র থেকে এখন জানা গেছে সমস্ত তথ্য। শূলেনবুর্গ ১৬ই সেপ্টেম্বর এক টেলিগ্রামে জানালেন তাঁর সরকারকে :

"আমি বিকাল ৬টায় মলোটভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। মলোটভ জানালেন দু'-একদিনের মধ্যে রাশিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবে। আলোচনার সময় স্তালিন উপস্থিত ছিলেন।"

কি পরিস্থিতিতে এবং কি পদ্ধতিতে আক্রমণ করা হবে সে সম্বন্ধেও মলোটভ জানালেন। মলোটভ আরও জানালেন, পোলীশ রাষ্ট্র এখন বিলুপ্ত। তার কোন ভৌগোলিক অস্তিত্বই যখন রইল না তখন সেই বিলুপ্ত পোলীশ রাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার এতদিন যে-সব চুক্তি ( অনাক্রমণ চুক্তি ) ছিল সেই সব চুক্তিই বাতিল হয়ে গেল। পোল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করে যে অরাজকতা ও জটিলতার সৃষ্টি হবে তার সুযোগ নেবে 'তৃতীয় পক্ষ' ( Third Powers )। সোভিয়েট রাশিয়া ইউক্রেনবাসী ও হোয়াইট রাশিয়ানদের রক্ষার কর্তব্য থেকে কখনই বিচ্যুত হতে পারে না—এই অঞ্চলে 'শান্তিরক্ষা' করতেই হবে রুশ সরকারকে।

"Molotov added that…the Soviet Government intended to justify its procedure as follows : The Polish state had disintegrated and no longer existed, therefore all agreements concluded with Poland were void : *Third Powers* might try to profit by the chaos which had arisen ; Soviet Government considered itself obligated to intervene to protect its Ukranian and White Russian brothers and make it possible for these unfortunate people to work in peace."
[ Schulenburg Despatch ]

অদ্ভুত যুক্তি ! না, অমার্জনীয় শঠতা। জার্মানী স্বাধীন সার্বভৌম পোল্যাণ্ড আক্রমণ করল আনুষ্ঠানিকভাবে কোনরকম যুদ্ধ ঘোষণা না করে। ক্ষমতামত্ত নাৎসী যুদ্ধদানবদের সামনে পোলীশ সেনাবাহিনী দাঁড়াতে পারছিল না। অতএব পোল্যাণ্ড নামে পৃথিবীর মানচিত্রে কোন দেশ নেই বলে ধরে নিতে হবে। ফরাসীদেশ নাৎসী আক্রমণের মুখে তার স্বাধীনতা হারাল। ফরাসীদেশ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে অবলুপ্ত হবে বলে মেনে নিতে হবে ? রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করছিল, তাই বলে ফিনল্যাণ্ড বলে কোন দেশ মানচিত্রে আর নেই একথা তো রাশিয়াও সেদিন বলেনি ! বাল্‌টিক রাজ্যগুলির স্বাধীনতা রাশিয়া হরণ করেছিল। কিন্তু তাই বলে সেইসব রাষ্ট্র 'ceased to exist' বলে কি রাশিয়া ঘোষণা করেছিল কোনদিন ? স্বাধীন পোল্যাণ্ডকে ধ্বংস করবার ঘৃণ্য চক্রান্ত চূড়ান্ত করেন খোদ রিবেনট্রপ-মলোটভ মস্কোতে ১৯৩৯ সালের ২৩শে আগস্ট। সাম্রাজ্যবাদী হিটলারও এই ধরনের অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করেননি। সবচেয়ে আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে, একটি 'সমাজতান্ত্রিক' 'বিশ্ব-বিপ্লববাদী' সরকার নির্লজ্জ পররাজ্য গ্রাসকে এইভাবে সমর্থন করার চেষ্টা করেছে। উপরোক্ত নোটে এই যে 'তৃতীয় শক্তিগুলির' কথা বলা হয়েছিল তা নিয়ে শূলেনবুর্গ মলোটভের কাছে আপত্তি জানান। মলোটভ স্বীকার করেন যে, এই শব্দ ব্যবহার করায় জার্মানী স্বভাবতই বিব্রত বোধ করতে পারে। তবু তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, জার্মান সরকার এই ব্যাপারটাকে যেন বেশি গুরুত্ব না দেন। পরে অবশ্য জানা যায় স্তালিন শূলেনবুর্গের আপত্তি মেনে নিয়ে তাঁর সরকারের নোটটির সংশোধন করে নেন। রাশিয়া স্তালিনের নির্দেশে ১৭ই সেপ্টেম্বর ভোরে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করল। হিটলারের বাহিনীও ভোররাত্রে আক্রমণ শুরু করেছিল। ১৭ই তারিখের

নির্মল প্রভাতে নিরীহ পোলবাসীদের ওপর বিজয়ীরা উন্মত্ত প্রলয়নাচনে মেতে উঠল। 'শ্রেণী-সচেতন' রুশ লালফৌজও! রাত্রির তপস্যা কি এই ধরনের প্রভাতের সূচনা করে? রুশ-অভিযানের আগের মুহূর্তেও মস্কোস্থিত পোলীশ রাষ্ট্রদূতকে স্তালিন জানালেন: 'জার্মান-পোলীশ যুদ্ধে রাশিয়া পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকবে।' অথচ পরের দিন ১৮ই সেপ্টেম্বর রুশ লালফৌজ ব্রেস্ট্-লিট্‌ভস্ক-এ জার্মান সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হল। অদ্ভুত নিরপেক্ষতাই বটে! স্বাধীন পোলীশ রাষ্ট্র পৃথিবীর মানচিত্র থেকে অবলুপ্ত হল।

স্তালিনের মনে সন্দেহ ছিল হিটলার শেষ পর্যন্ত মৈত্রীচুক্তির সর্তগুলি ঠিক ঠিক মেনে চলবেন কিনা! রিবেনট্রপ তাঁকে জানান—"Tell Stalin that the agreements which I made at Moscow will, of course, be kept and that they are regarded by us as the foundation-stone of the new friendly relations between Germany and the Soviet Union." এই চুক্তি আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলব প্রতি পদক্ষেপে, কেননা এই চুক্তি দুই রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মূল ভিত্তি বলে জার্মান সরকার মনে করেন। স্তালিন আশ্বস্ত হলেন। তিনি পোল্যাণ্ডকে দু'ভাগ করার প্রস্তাব দিলেন। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বিলোপ ও পোল্যাণ্ডের দ্বিধাবিভক্তিকরণের প্রস্তাবটা এসেছিল সাচ্চা লেনিনবাদী স্তালিনের কাছ থেকে! রাশিয়া প্রস্তাব করল ৪টি নদী বরাবর ( Pissa—Narew—Vistula—San Line ) পোল্যাণ্ডকে দু' টুকরো করার। জার্মানী সেই রুশ-প্রস্তাব মেনে নিল ২৩শে সেপ্টেম্বর। এর পর থেকে স্বয়ং স্তালিন নিজেই আলোচনায় অংশ নিচ্ছিলেন। শুলেনবুর্গ লিপিবদ্ধ করে গেছেন:

"Stalin stated he considered it wrong to leave an *independent residual* Poland. He proposed that from the territory to the east of demarcation line all the province of Warsaw which extends to Bug should be added to our share. In return we should waive our claim to Lithuania.

Stalin added...that if we consented the Soviet Union would immediately take up the solution of the problem of the Baltic Countries in accordance with the secret Protocol of August 23 and expected in this matter the unstinting support of the German Government. Stalin expressly

indicated Estonia, Latvia and Lithuania but did not mention Finland."

দুই রাষ্ট্রের মধ্যে নূতন চুক্তি হল "German-Soviet Boundary and Friendship Treaty." এই চুক্তিদ্বারা দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ভিত্তিতে সীমানা রচিত হল। রাশিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণে বেশি লাভবান হল জার্মানীর চাইতে। রাশিয়ার আক্রমণের কোন প্রতিরোধই হয়নি—কোন ক্ষতিই হয়নি। অথচ এই যুদ্ধে জার্মানীর ১০,৫৭২ জন সৈন্য নিহত, ৩০,৩২২ আহত এবং ৩,৪০০ নিখোঁজ হয়। স্বাধীন পোল্যাণ্ড বলে আর কিছু রইল না। পোল্যাণ্ডের অর্ধেক পেল রাশিয়া। সমস্ত বাল্টিক রাজ্যগুলি তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হল। স্তালিন চেয়েছিলেন পোল্যাণ্ডের জনসংখ্যার বেশির ভাগটা জার্মানীর ভাগে পড়ুক। কেননা পোলবাসীদের স্বাধীনতার দাবীকে শেষপর্যন্ত স্তব্ধ করে রাখা যাবে না। তাদের নিয়ে হিটলারকে সমস্যায় পড়তেই হবে একদিন না একদিন। গম উৎপাদনকারী ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল এল রাশিয়ার ভাগে। রুমানিয়ার খনিজ তৈল-সম্পদ রাশিয়ার ভাগে পড়ল। ইউরোপীয় যুদ্ধে ইউক্রেনের গম ও রুমানিয়ার তৈল একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল জার্মানীর কাছে। দু'টোই তার হাতের বাইরে চলে গেল। এ ছাড়া পোল্যাণ্ডের তৈলখনি অঞ্চল Borislor—Drogobycz হিটলার চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু পেলেন না বখরায়। ওটাও স্তালিনের ভাগে পড়ল। তবে বদান্য স্তালিন এই তেলের সমপরিমাণ অংশ প্রতি বছর জার্মানীকে দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নিপীড়িত জাতির পরিত্রাতা—মুক্তিযুদ্ধের চ্যাম্পিয়ান সোভিয়েট রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে পোল্যাণ্ডের ধ্বংস সাধন করল। এই নিয়ে ৪ বার পোল্যাণ্ডের পার্টিশান হল। ২৮শে সেপ্টেম্বরের সিক্রেট প্রোটোকল-এর ভিত্তিতে দুই অতিকায় দানব-শক্তি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা, সন্ত্রাস ও বিভীষিকার রাজত্বের সূচনা করল।

যখন পৃথিবীর ইতিহাসের এক ঘৃণিত চুক্তি দুই পরস্পর-বিরোধী সামাজিক অর্থনৈতিক চিন্তাভিত্তিক রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় এবং সেই চুক্তির সর্তানুসারে স্বাধীন পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লুণ্ঠনের কাজ সমাধা হয় তখনও লেনিন-সৃষ্ট বিশ্ব-বিপ্লবের হাতিয়ার "তৃতীয় আন্তর্জাতিক" (কমিণ্টার্ণ) পূর্ণ মর্যাদা নিয়েই বেঁচে ছিল। স্তালিন ও ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বিশ্ব-বিপ্লবের সমস্ত আদর্শ—মস্কোর স্বার্থেই বিস্মৃত হয়ে বোবার ভূমিকায় অভিনয় করতে কোন দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয় দেননি। কমিণ্টার্ণের ও ইউরোপের

বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির এই আচরণের কৈফিয়ৎ কি আছে? স্তালিন তাঁর "Problems Of Leninism" গ্রন্থে বলেছিলেন: "The victory of socialism in one country is not a self-sufficient task. The revolution which has been victorious in one country must regard itself not as a self-sufficient entity but as an aid, *a means of hastening the victory of the proletariat in all the countries* · ···."

একটি দেশে (অর্থাৎ রাশিয়ায়) সমাজতন্ত্রের বিজয় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাজ নয়। যে দেশে বিপ্লব সফল হয়েছে সেই দেশের কাজ সেখানেই শেষ হয় না। সেই দেশকে কাজ করতে হবে অন্যান্য দেশের বিপ্লবে সহায়করূপে —সেই সব দেশে সর্বহারার বিপ্লব ত্বরান্বিত করতে। তাই রাশিয়ার কাজ অন্যান্য সকল দেশে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে শ্রেণী-সচেতন সর্বহারারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে।

হিটলার-স্তালিন দোস্তি ও পোল্যাণ্ড এবং বাল্‌টিক রাজ্যগুলি সম্পর্কিত গোপন চুক্তিতে কি এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব প্রতিফলিত হয়েছে?

স্তালিন আরও বলেছেন:

"This (assistance) should be expressed first in the victorious country achieving the utmost possible in one country to the development, support and awakening of the revolution in all countries. Secondly it should be expressed in that the victorious proletariat of one country having expropriated the capitalist and organised its own socialist production, would confront the rest of the capitalist world, attract to itself the oppressed classes of other countries, raise revoult among them against the capitalists and in the event of necessity, come out even with armed force against the exploiting classes and theirs states [ Stalin : 'Problems Of Leninism'; Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1941 : P. 113 ]

অর্থাৎ যে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হয়েছে সেই দেশের শক্তি-সমৃদ্ধির লক্ষ্যই হবে অন্যান্য দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য

করা। এটা হবে বিশ্ব-বিপ্লব ত্বরান্বিত করার পথে একটা ধাপ। সমাজতান্ত্রিক দেশকে (এক্ষেত্রে রাশিয়া) বিশ্বের সকল শোষিত শ্রেণীর মানুষকে তার দিকে আকৃষ্ট করার যা কিছু করণীয় তা করা এবং তাদের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করা ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে রণং দেহি মনোভাব নিয়ে চ্যালেঞ্জের জন্য অবতীর্ণ হওয়া। আর তৃতীয়ত প্রয়োজন দেখা দিলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে (রাশিয়া) তার সেনাবাহিনী নিয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষের জন্য পুঁজিবাদী দেশের শোষক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। বিশ্ব-বিপ্লববাদী লেনিনবাদী স্তালিনের কথা এসব।

কিন্তু পোল্যাণ্ড আক্রমণের সময় তিনি তাঁর দল ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক (কমিণ্টার্ণ) এই বিশ্ব-বিপ্লবের আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলি দিলেন। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতারক্ষাকারী মুক্তিপিপাসু জনগণকে বা সে দেশের শ্রমিক-শ্রেণীকে নাৎসী আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিশ্ব-বিপ্লবের পীঠস্থান সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি কোন সাহায্য কি পাঠিয়েছিলেন? স্তালিন তাঁর পুস্তকে (Problem Of Leninism) সাহায্য প্রদানের যে কয়েকটি ধাপের কথা বলেছিলেন—সেগুলি পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিস্মিত হওয়ারই বা কারণ কি ছিল? নাৎসী জার্মানী কি পোলবাসীদের 'পুঁজির শোষণের' হাত থেকে 'মুক্ত' করার জন্য সে দেশ আক্রমণ করেছিল? পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকামী জনগণকে বা সে দেশের সর্বহারা শ্রেণীকে নাৎসী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য 'সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদে' বিশ্বাসী রাশিয়ার কি কোন ভূমিকাই ছিল না? যদিও স্তালিন ঘোষণা করলেন যে, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি কর্মসূচীরূপে কখনই মনে করা উচিত নয়। কেননা এই একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের বিচার হবে অন্যান্য দেশের নিপীড়িত মানুষ শোষিত শ্রেণীর সমাজতন্ত্রে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সাহায্য করা ও সফল করার চেষ্টার ওপর, কিন্তু আসলে তিনি ও তাঁর দল তাঁদের একটানা আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, রাশিয়ার 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ সত্তা "Self-sufficient duty" এবং রুশ স্বার্থের বেদীমূলে অন্যান্য যে কোন দেশের মুক্তিকামী প্রগতিশীল সংগ্রামী নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের স্বপ্ন ও স্বার্থ বলি দেওয়া যেতে পারে। রাশিয়াকে সবদিক দিয়ে রক্ষা করতে হবে সর্বাগ্রে। কেননা রাশিয়া বাঁচলে তবে অন্য দেশের বিপ্লবের কথা ভাবা যাবে।

আগের আলোচনা থেকে দেখা গেছে কি অছিলায় রাশিয়া তার শক্তিশালী লালফৌজ নিয়ে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করল। সর্বহারাদের শ্রেণীবিপ্লব ত্বরান্বিত

করার জন্য নয়, পুঁজির শোষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করার জন্য নয়, নাৎসী জার্মানীর হত্যা-ধ্বংস-লুণ্ঠনের হাত থেকে শান্তিকামী পোলবাসীদের রক্ষা করার জন্য নয়—পোল্যাণ্ডস্থিত ইউক্রেনবাসী ও হোয়াইট রাশিয়ানদের (শ্বেত রুশদের) রক্ষা করার তাগিদেই এই শান্তিপূর্ণ রুশ-আক্রমণ (Peaceful aggression)! রাশিয়ার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও গোপনচুক্তি স্বাক্ষরিত হলে, ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের হিটলার-তোষণনীতি অনুসরণ না করে চললে পোল্যাণ্ডের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হত না। রুশ-সীমান্তে অবস্থিত রুশ রেডিও স্টেশন মিনক্স্ (Minks) থেকে জার্মান বিমানবন্দরকে সারাক্ষণ একটানা সঙ্কেত ও নিশানার ইঙ্গিত দিয়ে পোল্যাণ্ডের শহর জনপদ শিল্পাঞ্চল বেপরোয়াভাবে ধ্বংস করে শান্তিপ্রিয় জনগণের শ্রমিক কৃষক-বুদ্ধিজীবী মেহনতী শ্রেণীর রক্ত-স্রোত বইয়ে দিতে সাহায্য করে কি বৈপ্লবিক সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ (Revolutionary Proletarian Internationalism) প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়েছিল?

নাৎসী ও কমিউনিস্টবাহিনীর সাঁড়াশী আক্রমণের মুখে স্বাধীন পোল্যাণ্ড বিলুপ্ত হবার সাথে সাথেই হিটলার বিশ্ববাসীকে তথা পশ্চিম দুনিয়ার পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রপ্রধানদের ও সেইসব দেশের জনগণকে শান্তির প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করতে সুরু করেছিলেন। পোল্যাণ্ড গ্রাস করা সম্পূর্ণ হয়েছে তার, তবে আর কেন ইংলণ্ড বা ফরাসী দেশ জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে? তাতে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবে। ঠিক একই সুরে স্তালিনও পোল্যাণ্ডের অর্ধেকটা গ্রাস করার পর শান্তির কথা সুরু করলেন। ১৯৩৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর মলোটভ ও রিবেনট্রপ এক যৌথ ইস্তাহারে ঘোষণা করলেন :

"After the Government of the German Reich and the Government of the U.S.S.R. have by means of the treaty signed today definitely settled the problems arising from the collapse of the Polish state and have thereby caused a sure foundation for a lasting peace in Eastern Europe, they mutually express their conviction that it would serve the true interest of all peoples to put an end to the state of war existing at present between Germany on the one side and England and France on the other .....

Should, however, the efforts of the two Governments

remain fruitless, this would demonstrate the fact that England and France are responsible for the continuation of the war whereupon, in case of the contimation of the war, the Governments of Germany and the U S.S.R shall engage in mutual consultation with refund to necessary measures."

এর ভাবার্থ এই:

দুই রাষ্ট্র নতুন চুক্তির দ্বারা পোলীশ রাষ্ট্রের অবলুপ্তির পর তা থেকে উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছে। পূর্ব ইউরোপে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ী শান্তির ভিত্তি সুনিশ্চিতভাবে স্থাপিত হয়েছে। জার্মান ও রুশ সরকার বিশ্বাস করে যে, যেভাবে পোল্যাণ্ড রাষ্ট্র-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করা হল সেটা সকল জাতির স্বার্থ সহায়কই হবে। পশ্চিম ইউরোপে জার্মানী এবং ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির মধ্যে যে যুদ্ধাবস্থা রয়েছে তারও অবসান ঘটা দরকার। যদি এই দুই সরকারের ( জার্মান ও রুশ ) এই শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ না হয়—তাহলে এটাই প্রমাণিত হবে, গ্রেট ব্রিটেন ও ফরাসী দেশই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, আর সেই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য রুশ ও জার্মান সরকার পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

দু'টি আক্রমণকারী রাষ্ট্র সুপরিকল্পিতভাবে যৌথ আক্রমণ চালিয়ে একটি স্বাধীন দেশকে মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েই শান্তির ললিত বাণী ইউরোপবাসীদের শোনাতে আরম্ভ করল। আর সেই শান্তির প্রস্তাব না মানলেই নতুন হুমকী। এই সময়কার সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার মনোভাব ৯ই অক্টোবর ( ১৯৩৯ ) রুশ পত্রিকা ইজভেস্তিয়া ( Izvestia ) প্রবন্ধ থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

"...A termination of hostilities would be in the interest of the people of all nations. In the speech which Hitler... delivered in the Reichstag on 6th October he put forward the German proposals intended to regulate the question of Poland and to end the war.

Hitler's proposal can be accepted, rejected or subjected to certain ammendments, but it next be admitted that they can in any case serve as a genuine and practical basis

for negotiations directed towards a speedy conclusion of peace.

In view of this it might be supposed that the Government of Britain and France, who in their declarations show their desire for peace, would bring a serious and businesslike attitude to bear on their chance of ending the war quickly."

এই একই দিনের সংখ্যায় এই পত্রিকায় (Izvestia, 9th October, 1939) বলা হল :

"War or peace—that is the question. The supporters of the slogan 'War to its victorious conclusion' stand for the further prosecution of the war, stand for war against peace."

পোল্যাণ্ড গ্রাস করে নেবার পর হিটলার যে শান্তি প্রস্তাব ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের কাছে দিলেন সেই শান্তি প্রস্তাবের পক্ষে ওকালতি করলেন সমাজতান্ত্রিক রুশ সরকার। পোল্যাণ্ড যখন মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্নই হল তখন আর শুধু শুধু যুদ্ধ চালিয়ে ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকার কাদের স্বার্থ রক্ষা করবে? "সফল না হওয়া পর্যন্ত শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে"—এই শ্লোগান প্রকারান্তরে যুদ্ধকে দীর্ঘমেয়াদী করারই নামান্তর। এই মনোভাব নাকি বিশ্ব-শান্তির পরিপন্থী। রুশ সরকারের সরকারী মুখপাত্র 'বলশেভিক' পত্রিকার ঊনবিংশতিতম সংখ্যায় লেখা হল :

"The British Government makes full use of its emergency power and smothers free—thought and every protest against the unjust Imperialist war……( i.e. the dicision, to fight on after the fall of Poland until Hitler was defeated.

Alarmed and bewildered working classes in Britain and France ask "What next ? In whose interest must we go to the trenches' ?" ( Bolsheviki Issue 19. )

'বলশেভিক' পত্রিকায় উষ্মা প্রকাশ করা হল এই বলে যে, ব্রিটিশ সরকার 'অন্যায়' 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের' বিরুদ্ধে সকল প্রকার প্রতিবাদ ও বিরোধিতা স্তব্ধ করতে বদ্ধপরিকর জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে ও আপৎকালীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে। ( হিটলারের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ড পতনের পরও শেষ পর্যন্ত লড়াই

চালিয়ে যাবার ব্রিটিশ সিদ্ধান্ত 'অন্যায়' ('unjust') এবং তা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের নামান্তর।) ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের ত্রস্ত বিহ্বল শ্রমিক-শ্রেণীর মুখে মুখে এই মূল প্রশ্ন উচ্চারিত হচ্ছে—"এর পর কি? কার স্বার্থে আমরা রণক্ষেত্রে আমাদের তপ্ত রক্ত ঢালতে যাব?"

স্তালিন ৩০শে নভেম্বরের প্রাভদা পত্রিকায় প্রচারিত এক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করলেন: (১) জার্মানী ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশ আক্রমণ করেনি। বরং ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশই জার্মানীর ওপর আক্রমণ চালিয়েছে, (২) যুদ্ধ সুরু হবার পর জার্মানী শান্তির প্রস্তাব দেয় ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের কাছে। রুশ সরকার এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিল। কিন্তু পরিতাপের কথা—(৩) ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার এই যৌথ শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। [ Pravda, November. 30, 1939. ]

[ "(i) It is not Germany who attacked England and France but British and French Government have attacked Germany.

(ii) After the opening of military operations, Germany made overturns to the British and French Governments proposing to them to make peace. The U.S.S.R. supported this peace offer.

(iii) The British and French Government rudely rejected these German offers and the efforts of the U. S S. R. ( Pravda, Nov., 30, 1939. ) ]

এর পরই ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কমিউনিস্টরা তোতাপাখীর মত শান্তির জয়গান সুরু করেছিল। সুরু হল শান্তি-আন্দোলন পর্ব। বিলাতে কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা ডেইলি ওয়ার্কারে ('Daily Worker') ১লা ফেব্রুয়ারি (১৯৪০) তারিখের 'হিটলার বলছেন' এই শিরোনামায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হল:

"Hitler repeated once again his claim that the war was thrust upon him by Britain. Against this historical fact there is no reply. Britain declared war, not Germany. Attempts were made to end the war, but the Soviet-German peace overtures were rejected by Britain"

স্তালিনের শেখান-পড়ান বুলির প্রতিধ্বনি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকার

সম্পাদকীয়তেও। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিও বলেছে: ইংলণ্ড আক্রমণকারী—জার্মানী নয়। জার্মানীর 'শান্তির প্রস্তাব' ইংলণ্ড প্রত্যাখ্যান করেছে। নিজের দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি বানচাল করার জন্য ধর্মঘট, ধীরে চল (গো স্লো) প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করে শ্রমিকদের উত্তেজিত করার কাজ সুরু হল। বিমান-আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ( air raid measures ) যে সরকারী ব্যবস্থাদি গৃহীত হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে গোপন আন্দোলন সুরু করার নীতি গৃহীত হল। সেনা-বাহিনীর মধ্যে বিভেদ ও বিক্ষোভ ছড়াবার চেষ্টা হল। সব দিক দিয়ে জনগণের মনে জার্মান সম্প্রসারণবাদ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের সঙ্কল্প ও স্পৃহাকে নষ্ট করার কুৎসিত চক্রান্ত চালু হল। স্লোগান উঠল 'যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই।' জার্মানী ও রাশিয়া দুই রাষ্ট্রই চাইছিল পোল্যাণ্ড গ্রাস করার পর শান্তিতে বিনা উপদ্রবে লুঠের বখরা গুছিয়ে নিয়ে নিজেদের স্ব-স্ব শক্তি শান্তির অছিলায় বহু গুণ বাড়িয়ে নিতে। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে রাশিয়ার স্বার্থেই 'শান্তির আন্দোলনে' নামতে হল—নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করতে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪০ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শান্তি-আন্দোলন অব্যাহত রইল। ডানকার্ক-এর বিপর্যয়—ফরাসী দেশের পতন যখন সম্পূর্ণ হয়েছে তখনও কমিউনিস্টরা হিটলার-স্তালিন দোস্তিকে জোরদার করার জন্য এই দেশাত্মঘাতী রাজনীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন।

রাজনীতির ছাত্রদের বুঝে নিতে হবে কেন আক্রমণকারী রাষ্ট্র এই ধরনের শান্তির আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়। সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে অন্যান্য স্বাধীন দেশগুলিকে সামরিক প্রস্তুতি ও প্রতিরক্ষার দিক থেকে দুর্বল করে রাখতে হবে, আক্রমণের বিরুদ্ধে জীবন-পণ করে লড়াই করার সঙ্কল্প ও স্পৃহাকে ভেঙে দিতে হবে, শান্তির ঘুম পাড়ানি গান গাইয়ে সেইসব দেশগুলিকে নির্বীর্য করে রাখতে হবে। আর এই শান্তির আন্দোলন যখন চলবে সেইসব মোহগ্রস্ত দেশ-গুলিতে, তখন আক্রমণকারী দেশগুলিতে গোপনে সামরিক প্রস্তুতি চলবে সমাজে অপ্রতিহত গতিতে—প্রতিরক্ষা-খাতে ব্যয় অবিশ্বাস্য হারে বাড়বে, নিত্য-নূতন মারণাস্ত্র তৈরী হবে শান্তির আফিমের বড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে-পড়া দেশগুলির মনুষ্যরূপী গিনিপিগ্‌দের ওপর এক অশুভ ভয়ঙ্কর মুহূর্তে পরীক্ষিত হবার জন্য। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-ফ্যাসিবাদীরা ও গণতন্ত্রের ভেকধারী সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের এই উদ্দেশ্য সফলের জন্য যেমন এই ধরনের শান্তির বিভ্রান্তকারী মতলব অথচ মোহবিস্তারকারী স্লোগানের শরণ নেন তাদের ভাতা-পুষ্ট ব্যক্তি,

গোষ্ঠীদের ও বুদ্ধিজীবিদের সহযোগিতায়, তেমনি গণতান্ত্রিক দেশের 'শান্তিবাদী' ( Pacifists ) তথাকথিত অহিংসপন্থী সঞ্চারিণী-পল্লবিনী-লতেব দলের ভণ্ডামীর আশ্রয়ও নিয়ে থাকে।

## ( গ )

ইউরোপের ইতিহাসে দু'টি স্বাধীনতাকামী দেশের ওপর একাধিকবার সীমাহীন অবিচারের অন্যায় নেমে এসেছে : পোল্যাণ্ড আর চেকোশ্লোভাকিয়া। ইতিহাসের সঙ্কটমুহূর্তে দেখা গেছে বিশ্বাসঘাতকের শাণিত ছুরির আক্রমণ থেকে এরা রেহাই পায়নি। সে-বিশ্বাসঘাতকতা কখনও প্রত্যক্ষ আক্রমণে কখনও বা তথাকথিত বন্ধুর নীরবতার ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে পরিলক্ষিত হয়েছে। অবশ্য অতীতে পোল্যাণ্ডের সুবিধাবাদী আদর্শহীন আচরণের উল্লেখও আগে করেছি।

পোল্যাণ্ড বরাবরই ইউরোপীয় রাজনীতিতে যেন একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল—আর ইউরোপীয় উদ্ধত রাষ্ট্রশক্তিগুলি সেই তথাকথিত 'সমস্যার' 'সমাধান' করার চেষ্টা করেছে তার স্বাধীনতা লুণ্ঠন করে, রাষ্ট্রীয়-ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে খর্ব করে। ১৯৩৯ সালে জার্মান আক্রমণের পরই রুশ লালফৌজ পূর্ব-পোল্যাণ্ড অতর্কিতে আক্রমণ করে বসল। যদিও রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, তারা পোল্যাণ্ডের পূর্বাঞ্চল দখল করেছে কেবলমাত্র রাশিয়ার সীমানাকে বিপন্মুক্ত রাখার জন্য। আসলে গোটা দেশকে খণ্ডিত করে পূর্বাঞ্চলকে রুশ অন্তর্ভুক্ত করার যাবতীয় কাজই করা হয়েছিল। এই সময় রুশ-সম্প্রসারণবাদী মতলবকে রুখবার জন্য পূর্বাঞ্চলের পোলবাসীদের মধ্যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠছিল। সেই প্রতিরোধ-প্রচেষ্টাকে চূর্ণ করার জন্য রাশিয়া তার কুখ্যাত আভ্যন্তরীণ গোপন পুলিশবাহিনীর ( NKVD—Soviet Secret Police ) অধীনে পোল্যাণ্ডের দখলীকৃত অঞ্চলের আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে নির্মম অত্যাচার চালায়। বিভিন্ন শহরগুলিকে কতকগুলি পৃথক পৃথক জেলায় বিভক্ত করে সেইসব প্রশাসনিক অঞ্চলগুলিকে NKVD অফিসারদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সমগ্র প্রশাসন-ব্যবস্থাকেই গোপন পুলিশী তত্ত্বাবধানে আনার কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। কর্তৃপক্ষ যাদের 'বুর্জোয়া-শ্রেণী'ভুক্ত অথবা 'বুদ্ধিজীবী' মনে করত তাদের নির্মূল করে রুশ-আধিপত্য নিষ্কণ্টক করে ফেলে। দেশের অর্থনীতিতে দারুণ সঙ্কট দেখা দিল। দারুণ খাদ্য-সঙ্কট, ব্যাপক চোরাবাজার, মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছিল। জার্মানী ও রাশিয়া এই দুই

'ভাগীদারে'র ( স্তালিনের ভাষায় 'পার্টনার' ) মধ্যে পোল্যাণ্ড ভাগাভাগির ফলে ১ কোটি ২০ লক্ষ পোলবাসী ও ৭৬,৫০০ বর্গমাইল পোল্যাণ্ডের জমি রাশিয়ার ভাগে পড়ল—পিসা, ন্যারিউ, বাগ, সান ( Pisa, Narew, Bag, San ) নদী বরাবর চূড়ান্ত সীমানা টানা হল দুই ভাগীদার 'বন্ধুর' পরস্পরের অংশের বাঁটোয়ারায়। সোভিয়েট রাশিয়ার দখলের ২০ মাসের মধ্যে পোলীশ সেনাবাহিনীর ২,২০,০০০ অফিসার ও সৈন্যকে সোভিয়েট রাশিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয় ( deportation )। রুশ-অধিকৃত অঞ্চলের পোলবাসীদের সোভিয়েট নাগরিকত্বও ( Soviet citizenship ) দেওয়া হয়েছিল—সোভিয়েট নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করার পরিণতি সে সময় কি হতে পারত তা সহজেই অনুমেয়। পোলীশ সেনাবাহিনীর যে-সব অফিসার ও সৈনিকদের গ্রেপ্তার করে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল রুশ-আক্রমণের পর—তাদের মধ্যে ১৪,০০০ স্থায়ী ও রিজার্ভ অফিসারকে তিনটি শিবিরে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। যথা: (১) Kozielsk, (২) Ostashkow এবং (৩) Starobiebsk। এদের আর হদিস পাওয়া যায়নি। লণ্ডনে অবস্থিত যুদ্ধকালীন 'স্বাধীন' পলাতক পোলীশ সরকারের পক্ষ থেকে এদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর দাবী করে আন্দোলন হয় যথেষ্ট। প্রথমে আশঙ্কা করা হয়েছিল রুশ-সরকার এই বিপুলসংখ্যক অফিসারকে ( Regular and Reserve officers ) পাইকারী হারে হত্যা করেছে। ইতিহাসে এটাই কুখ্যাত 'Katyn massacre' বলে পরিচিত।

১৯৪৩ সালে জার্মানী রাশিয়ার কবল থেকে পোল্যাণ্ডের অধিকৃত অঞ্চল মুক্ত করে নিজের দখলে আনার পর ক্যাটীন বনাঞ্চলে ( Katyn Forest ) বিস্তীর্ণ সমাধিক্ষেত্র ( mass graves ) আবিষ্কার করে। নাৎসী জার্মান সরকার আন্তর্জাতিক রেডক্রস সংস্থা দিয়ে সমগ্র বিষয়টির তদন্ত দাবী করেছিল। জার্মানী অভিযোগ এনেছিল রুশ-সরকার যে-সব পোলীশ সামরিক অফিসারদের গ্রেপ্তার করেছিল—তাদের হত্যা করে বিস্তীর্ণ পরিখা খনন করে তাদের মৃতদেহ নিক্ষেপ করে উক্ত Katyn Forest অঞ্চলে। লণ্ডনে অবস্থিত পোলীশ সরকার জার্মান সরকারের দাবীর প্রতি সমর্থন জানায়। এতে স্তালিন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন লণ্ডনের পলাতক পোলীশ সরকারের প্রতি। স্তালিন বা রুশ-সরকার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। Katyn অঞ্চলে তদন্ত ও সমীক্ষা করে সমগ্র বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশ আন্তর্জাতিক কমিশন প্রেরণের যে-প্রস্তাব করেছিল রাশিয়া বরাবরই তা অগ্রাহ্য করে এসেছে।

৪২৫৩টি মৃতদেহ সেইসব কবর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং তিনটি

শিবিরের মধ্যে একটি মাত্র শিবিরের যুদ্ধবন্দী পোলীশ অফিসারের হিসাব পাওয়া যায়—বাকী হু'টি শিবিরের যুদ্ধবন্দী অফিসারদের কোন হদিশ আজও মেলেনি। এ এক অমানুষিক নিষ্ঠুরতা - কেননা, যুদ্ধবন্দীদের এভাবে হত্যা করা নীতি বিগর্হিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'The Committee of the U.S. House of Representatives' সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে তথ্যানুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সোভিয়েট গুপ্ত পুলিশ ( NKVD ) এইসব বন্দী অফিসারদের পাইকারী হারে হত্যার জন্য দায়ী। (Interim Reports, 1952, July 2.) কমিটির সামনে একজন মার্কিন পদাতিক অফিসার—Van Vliet—বিস্তৃতভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণ রেখেছিলেন। Van Vliet জার্মানীর হাতে যুদ্ধবন্দী হয়েছিলেন এবং ১৯৪৩ সালে জার্মান সরকার যখন এই Katyn mass graves নিয়ে তদন্ত করেন তখন এই অফিসারকে সেখানে উপস্থিত করা হয়েছিল।

'Katyn massacre'কে কেন্দ্র করে পোলীশ জনসাধারণ ও রুশ-সরকারের মধ্যে দারুণ তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। ক্যাটীন-হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে লণ্ডনে অবস্থিত নির্বাসিত পোলীশ সরকারের সঙ্গে স্তালিনের সম্পর্ক খুবই তিক্ত হয়ে পড়ল। তখন থেকেই তিনি যুদ্ধ-শেষে স্বাধীন পোল্যাণ্ডে তাঁর অনুরাগী তাঁবেদারদের সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা ভাঁজছিলেন এবং তাঁর সেই পরিকল্পনা সার্থকও হয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

পোল্যাণ্ডের সীমানা সম্পর্কিত সমস্যাকে কেন্দ্র করেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় আঞ্চলিক দাবীর ( territorial claims ) ভিত্তি রচিত হচ্ছিল; আর গণতন্ত্রের ঠিকাদার উইনস্টন চার্চিল ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট রাশিয়ার বায়নাক্কায় সায় দিয়ে চলেছিলেন। ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত 'তেহেরান সম্মেলনে' চার্চিল ও রুজভেল্ট অবস্থার গুরুত্ব ও শেষ পরিণতি যুদ্ধ-শেষে কি দাঁড়াতে পারে আঁচ না করে স্তালিনের কাছে প্রস্তাব করলেন—পোল্যাণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল রাশিয়াকে ফেরৎ দিয়ে পোল্যাণ্ডের রাশিয়ার মধ্যস্থিত সীমানাকে আরও পশ্চিমে সরিয়ে এনে রাশিয়াকে সন্তুষ্ট করা হোক; আর জার্মানী তার বিস্তীর্ণ অংশ পোল্যাণ্ডকে ফিরিয়ে দেবে ওডার সীমানা পর্যন্ত।

এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে গেলে অনিবার্যভাবেই লক্ষ লক্ষ জার্মানবাসীকে বাস্তুচ্যুত হতে হবে। তাই সই। এই রকম সীমানা-সম্বলিত পোল্যাণ্ডকে বরাবরের মত রুশ আশ্রয় ও খবরদারির ওপর মূলত নির্ভর করে

থাকতে হবে তার নিজের নিরাপত্তা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার জন্য। এই ধরনের সীমানার কৃত্রিম অদল-বদল যে বিভিন্ন জটিল সমস্যার সৃষ্টি করবেই এবং একে কার্যকরী করতে গেলে ব্যাপক জন-সঞ্চালন ( large population movements ) অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বেই সে-কথা চার্চিল-রুজভেল্ট কি উপলব্ধি করেননি? তাঁরাও নিজেদের ভাগের বখরা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ইতিহাসের লুব্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসী লোভের বলি স্বাধীনতাকামী শান্তিপ্রিয় পোল্যাণ্ডের কথা ভেবে-ভেবে তাঁদের নিশীথরাতের সুখ-স্বপ্নের ব্যাঘাত ঘটাতে তাঁরা উৎসাহী ছিলেন না। এইসব ভাগ-বাঁটোয়ারা ও সীমানা পুনর্বণ্টনের ব্যাপারে হতভাগ্য পোল্যাণ্ডের মতামতেরই বা কি দাম থাকতে পারে? খ্যাতনামা মার্কিন কূটনীতিবিদ জর্জ কেনান ঠিকই বলেছিলেন: "To put Poland in such borders was to make it perforce a Russian protectorate whether its own Government was Communist or not." [ George Kenan : Russia And West Under Lenin And Stalin. ]

এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্যি হয়েছে। স্বাধীন পোল্যাণ্ডকে এইভাবেই রাশিয়ার দিকে অসহায়ভাবে ঠেলে দেওয়া হল। 'আটলান্তিক চার্টার'-এর নীতি-বিরুদ্ধ এই প্রস্তাব পূর্ব-ইউরোপের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে যে অস্থিরতা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করবে সেটা কি রুজভেল্ট ও চার্চিল বোঝেননি? এই ঘৃণ্য চক্রান্তের মুখ্য নায়ক ছিলেন পুঁজিবাদী দুনিয়ার দুই মহারথী রুজভেল্ট-চার্চিল যতটা, স্তালিন ততটা নন। স্তালিন যা চেয়েছিলেন তাই তিনি পেয়ে গেলেন।

পোল্যাণ্ড ব্যতিরেকে ইউরোপে বাল্টিক রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ যুদ্ধজয়ের মধ্যে দিয়েই রাশিয়া নির্ধারিত করে ফেলেছিল। তুরস্ক ব্যতিরেকে সমগ্র বলকান রাজ্যের ভবিষ্যৎ রুশ সামরিক বিজয়ের মধ্য দিয়েই কতকটা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল—আর 'পশ্চিমী গণতান্ত্রিক' 'স্বাধীন দুনিয়া' এ ব্যাপারে রাশিয়াকে বিব্রতও করতে চায়নি।

১৯৪৫ সালের 'ইয়াল্টা সম্মেলনে' রুজভেল্ট ও চার্চিল তোষণনীতির পরিণতি কি দাঁড়াতে পারে হয়ত কিছুটা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁরা ইয়াল্টা বৈঠকের ঘোষণাপত্রে স্তালিনকে বাঁধতে চেয়েছিলেন তাঁর সম্মতি আদায় করে। নাৎসী শাসনমুক্ত যুদ্ধোত্তর ইউরোপের মুক্ত দেশগুলিকে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হল। সেই ঘোষণার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে চতুর স্তালিনের অসুবিধা হয়নি। চার্চিল অবশ্য ইয়াল্টা

বৈঠকে অতীতের স্তালিন-তোষণনীতি কিছুটা পরিহার করার চেষ্টাও করেছিলেন, বিশেষ করে পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ সরকার কিভাবে গঠিত হবে সে সম্বন্ধে স্তালিনের কাছে প্রতিশ্রুতি দাবী করে। চার্চিল বলেছিলেন:

"Poland is the most important question before the conference and I don't want to leave without it being settled." 'এই সম্মেলনে পোল্যাণ্ডের প্রশ্নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেইসব সমস্যার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা না করে আমি এই সম্মেলন ছেড়ে যাচ্ছি না।'

স্তালিনও পোল্যাণ্ডে রাশিয়ার মৌলিক স্বার্থ কতটা জড়িত সেকথা বিশেষ জোরের সঙ্গে বললেন। চার্চিল দাবী করলেন স্বাধীন বাধামুক্ত নির্বাচন মাধ্যমে পোলীশ রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান (Free and unfettered election)। পোল্যাণ্ড নিয়ে স্তালিন-চার্চিলের মতভেদের আর একটি বিষয় ছিল যুদ্ধের সময় লণ্ডনে অবস্থিত 'নির্বাসিত' পোলীশ সরকার তথা পোল্যাণ্ডের গোপন বিপ্লবীসংস্থা Armija Krajowa ও রুশ প্রভাবাধীন মস্কো পরিচালিত Lublin Committee, এই দু'য়ের মধ্যে ভবিষ্যৎ যুদ্ধোত্তর মুক্ত পোল্যাণ্ডের সরকারে কাদের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করা হবে? রুশ লালফৌজের আশ্রয়ে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল 'লুবলিন সরকার'। লণ্ডন থেকে পরিচালিত 'Armija Krajowa'-সংস্থা এই 'লুবলিন কমিটির' ও পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাশিয়ার অর্থের প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ করতে কসুর করেনি। অবশ্য এতে স্তালিন খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং নির্বাসিত পোলীশ সরকারের নির্দেশে পোল্যাণ্ডে অবস্থিত গুপ্ত-মুক্তিযোদ্ধাদের সংস্থা 'আর্মিজা ক্রাজোয়া'-কে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে এবং এর উত্তরাধিকারী হিসাবে আর একটি গুপ্ত সমিতি স্থলাভিষিক্ত হয়—নাম 'Niepodbglosc' (এর অর্থ 'স্বাধীনতা'—'Independence')। সংক্ষেপে বলা হত—'NIE'। জেনারেল ওকুলিকি (Okulicki) এই বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির নেতা ছিলেন। এই সংস্থার হাতে 'আর্মিজা ক্রাজোয়া'-র যাবতীয় সরঞ্জাম, লড়াইয়ের সরঞ্জাম, রেডিও বেতার প্রচারের ব্যবস্থাও ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে সমগ্র পোল্যাণ্ডে রুশ লালফৌজ প্রবেশ করে গোটা দেশ দখল করে নেবার পরও এই গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা তার প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছিল। রুশ খবরদারির বিরুদ্ধে নিজেদের দেশের অখণ্ড স্বাধীনতার অনুকূলে এই বিদ্রোহী সংস্থাকে বিচূর্ণ করার মতলবে রাশিয়া এক নতুন ফাঁদ রচনা করল। পোল্যাণ্ড সম্পর্কিত ইয়াল্টা চুক্তি ও সিদ্ধান্ত নিয়ে আলাপ-আলোচনা

ও চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য এই বিপ্লবী গুপ্তসমিতির একজন নেতাকে মস্কোয় আমন্ত্রণ জানান হল। প্রতিনিধিদল আমন্ত্রণ পেয়ে মস্কো রওনা হলেন—কিন্তু কোন হোটেল বা সম্মেলন দরবারে তাঁদের দেখা গেল না—তাঁদের সরাসরি গ্রেপ্তার করে বন্দী করা হল। এঁদের মধ্যে ছিলেন—Okulicki, Jan Jankowski, Adam Ben এবং Stanislaw Jasiu Kowicz, Puzak (সমাজতন্ত্রী নেতা গোপন পার্লামেণ্টের সভাপতি)। বাকী ক'জন ছিলেন গোপন সরকারের (Underground Government) সদস্য। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে এবং শতাধিক লালফৌজের সৈন্য অফিসার হত্যার অভিযোগে স্তালিন মস্কো শহরে এক নাটকীয় বিচারের ব্যবস্থা করলেন যা এই শতাব্দীর ত্রিশ দশকের ভয়াবহ নীতি-বিগর্হিত 'Purge Trials'-এর সঙ্গে তুলনীয়। আর বিচারপতিও ছিলেন সেই কুখ্যাত বিচারক জেনারেল উল্‌বীর্খ্। এই ব্যক্তিই স্তালিন-বেরিয়ার ত্রিশ দশকের সাজান আজগুবি অভিযোগ-ভিত্তিক পার্জ-ট্রায়ালেও বিচারকের কাজ করেছিলেন। আরও আশ্চর্য রকমের যোগাযোগ এই যে, ১৯৩০-৩৮ সালে যে-সব কুখ্যাত বিচারের নামে মর্মান্তিক প্রহসন আদালত-কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পোল্যাণ্ডের মুক্তি-যোদ্ধাদেরও বিচার হয়েছিল সেই একই কক্ষে (Pillard Hall)। বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাজা হয়ে গেল। মৃত্যুদণ্ড হল না, আট থেকে দশ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন বিচারক। এদের আর কোন খবর জানা যায়নি। যদিও শোনা গিয়েছিল ১৯৫৬ সালে এদের 'মুক্তি' দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে জেনারেল ওকুলিকি রুশ কারাগারে ১৯৪৭ সালে বন্দী হিসাবেই মৃত্যুবরণ করেন। যাঁরা স্বদেশে ফিরে এসেছিলেন রাশিয়া থেকে তাঁরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় কমিউনিস্ট সরকারের হাতে অভিযুক্ত হন ও পরে তাঁদের নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল (liquidated)। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীর গণ-অভ্যুত্থানের সময় ও আলাপ-আলোচনার জন্য তৎকালীন হাঙ্গেরীয় প্রধানমন্ত্রী Imre Nagy-কে আমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে গিয়ে রুশ গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে, গোপনে বিচারের প্রহসন করে হত্যা করেছিল 'সমাজতান্ত্রিক' লেনিনবাদী রুশ সরকার। ইতিহাসের ছাত্রদের সেকথা নিশ্চয়ই স্মরণ আছে।

মস্কো বিচারের সময় পোলীশ মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল ওকুলিকি বিচারকদের স্মরণ করিয়ে দিতে ছাড়েননি যে, বিগত ১৩৩ বছরের ইতিহাসে পোল্যাণ্ড রাশিয়ার জারদের কাছে পেয়ে এসেছে অবিচার ও অত্যাচার এবং দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের পরও পোল্যাণ্ডের জনগণ সুবিচার পাবে না এই আশঙ্কাই তাঁদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিকে বাঁচিয়ে রেখে সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকতে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

যুদ্ধকালীন আর একটি ঘটনাও উল্লেখ্য : পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ' নগরীর অভ্যুত্থান (The Warsaw Rising)। ১৯৩৯ সালে জার্মানী যখন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেছিল, স্বাধীনতাকামী পোলরা তার বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করেছে। আবার অভাবনীয়ভাবে অতর্কিতে রাশিয়া যখন পূর্ব-পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেছে তখন তাদের মুক্তিসংগ্রামের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেনি বামপন্থীরা। এই 'ওয়ারশ' অভ্যুত্থানের' নেতা ছিলেন Bor-Komaroski এবং লণ্ডন পোল সংস্থার নেতারা। ২৩শে জুলাই লালফৌজ লুবলিন দখল করল। আর ১লা আগস্ট (১৯৪৪) ওয়ারশ' বিদ্রোহ সুরু হল। রুশ বাহিনী ওয়ারশ' অভিমুখে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে না আসায় নাৎসী জার্মানবাহিনীর হাতে ৩,০০,০০০ পোলবাসী নিশ্চিহ্ন হল। এই বিদ্রোহীরা দু'মাস ধরে জার্মানবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন, তবু এলো না মস্কোর কোন সাহায্য। অথচ লুবলিন দখলের সময় মস্কো বেতার থেকেই প্রথম দখলকার জার্মানবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আহ্বান রুশ-সরকারই জানিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে খাদ্য, যুদ্ধসরঞ্জাম অন্যান্য সরবরাহ বিমানে পাঠাবার প্রস্তাব স্তালিন ব্যর্থ করে দিলেন। ওয়ারশ' মুক্তিযোদ্ধাদের বিমানে সরবরাহ পাঠাতে হলে রুশ দখলীকৃত পোল্যাণ্ডের এলাকায় বিমান অবতরণ করতে দেওয়া প্রয়োজন ছিল। এতে স্তালিন রাজী হননি। রুশ বিমানঘাঁটি ব্যবহারের সুযোগও দেওয়া হয়নি। এই সময় স্তালিন-চার্চিলের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ পত্র-বিনিময় হয়েছিল তা থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একগুয়েমিই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

রুজভেল্ট ও চার্চিল এক জরুরী যৌথ বার্তায় স্তালিনকে রাশিয়া-আমেরিকা-ব্রিটেনের যৌথ চেষ্টায় নাৎসী-বিরোধী মুক্তিকামী বিদ্রোহী পোলদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে প্রসঙ্গত লিখেছিলেন, পোল্যাণ্ডের নাৎসী-বিরোধীদের এইভাবে পরিত্যাগ করলে বিশ্বের জনমতের ধিক্কার কি এড়ান যাবে? স্তালিন তাঁর উত্তরে জানান : পূর্বাঞ্চলের মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল। তাই পূর্ব অঞ্চলকে নৃশংস গোপন পুলিশ সংস্থা (NKVD ,-র ওপর অধিকৃত এলাকার প্রশাসনের ভার রাশিয়া অর্পণ করেছিল, লক্ষ লক্ষ নাগরিকদের রাশিয়ার অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল (deportation), ১৪,০০০

পোলীশ সৈন্যবাহিনীর স্থায়ী ও রিজার্ভ অফিসারদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—যাদের হদিস আজও মেলেনি ( কয়েক সহস্র Katyn Forest-এর 'mass grave' থেকে উদ্ধার করা সৈন্যের মৃতদেহ ছাড়া )।

নাৎসীদের কবল থেকে ইউরোপকে মুক্ত করার প্রচণ্ড লড়াই যখন চলেছে তখন থেকেই ইউরোপের জমিদারীর ভাগ-বখরা নিয়ে গোপন পাঁয়তারা ভাঁজা হচ্ছিল। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসের শেষাশেষি রাশিয়া লুবলিনকে মুক্ত করল। সেই সঙ্গেই রাশিয়া যুদ্ধোত্তর পোল্যাণ্ডের প্রতি তাদের কি মনোভাব হবে সে সম্বন্ধে একটি ইস্তাহার ( manifesto ) প্রকাশ করে এবং 'পোলীশ জাতীয় মুক্তি কমিটি' ( Polish National Liberation Committee ) নামক একটি সংস্থা স্থাপন করেছিল। এই কমিটিই 'লুবলিন কমিটি' বলে ইতিহাসে পরিচিত। এই সমিতি গঠন করে রুশ-সরকার সরাসরি লণ্ডনস্থিত পোল সরকারকে ( Polish emigre Government in London ) অস্বীকার করেন।

লুবলিন দখলের পর রুশ লালফৌজ ওয়ারশ' নগরীর কাছাকাছি ভিস্তুলা নদীর পারে এসে অপেক্ষা করে থাকল। অথচ পোল্যাণ্ডের মুক্তি-যোদ্ধারা আশা করে আছে লালফৌজ দ্রুত পদক্ষেপে রাজধানীর দিকে এগিয়ে যাবে নাৎসী জার্মানবাহিনীর প্রতিরোধ চূর্ণ করে, তাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন হবে। রুশ লালফৌজের অধিনায়ক জেনারেল রকোসভস্কীর ছাউনি রাজধানীর অদূরেই ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা জার্মান দখলদারবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফেটে পড়ল—তাদের দৃঢ় আশা ছিল রুশ লালফৌজ এগিয়ে আসবে। "Sooner or later truth about the handful or power-seeking criminals who launched the Warsaw adventure will be out..." ( Aug. 22, 1944. ) ওয়ারশ' অভ্যুত্থানের স্তালিনী ভাষ্য হল: কতিপয় ক্ষমতালোলুপ দুষ্কৃতকারী শয়তানের খোকামী এই অভ্যুত্থান। এইভাবেই স্তালিন পোল্যাণ্ডের মুক্তিকামী অ-কমিউনিস্টদের জার্মানবাহিনীকে দিয়েই নির্মূল করার ব্যবস্থা করেছিলেন—যাতে ভবিষ্যতে লুবলিন পোলরা এককভাবে লুবলিন কমিটির নামে যুদ্ধোত্তর পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রুশ-তাঁবেদার হয়েই থাকতে পারে। 'লণ্ডন পোল' আর 'লুবলিন পোলে'র ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তিন লক্ষ ওয়ারশ'বাসী পোল বলি হলেন। পশ্চাদপসরণকারী নাৎসী জার্মানদের রাহুগ্রাস থেকে ওয়ারশ' নগরীকে মুক্ত করার ওয়ারশ'বাসীরা যে দুর্জয় বেপরোয়া সংগ্রাম করেছিলেন ইতিহাসে সেটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আলেকজান্দার ওয়ের্থ এই ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন :

"3,00,000 Poles lost their lives in Warsaw. When the Russians finally entered Warsaw in January 1945 more than nine-tenths of the city had been almost as completely destroyed as had been the Warsaw Ghetto in 1943." [ Russia At War : 1941-45 ; P. 790. ]

রুশ লালফৌজ ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে যখন ওয়ারশ' নগরীতে প্রবেশ করল, তখন সমগ্র রাজধানীর দশ ভাগের নয় ভাগই সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

সোভিয়েট অনুরাগী লেখক ওয়ের্থ আরও বলেছেন :

"Once more in Poland's history this valliant struggle ( meaning Warsaw Rising ) for independence was defeated by the over riding although conflicting great power interests of other states. Still, with Moscow determined, ever since the beginning of the war and especially since April 1943, to control the future destinies of Poland, Bor-Komarovski would have been eliminated one way or another by the Russians as they managed a few years later to rid themselves of Mikolajezyk." যুদ্ধের সূচনা থেকেই রাশিয়া পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। রাশিয়ার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে।

স্তালিন স্পেনের গৃহযুদ্ধে বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধারের প্রচণ্ড প্রতিরোধ আন্দোলনকে শ্রদ্ধার চোখে আদৌ দেখেননি বলেই তাদের ধীরে ধীরে প্রজাতন্ত্রীদের পথ বর্জন করে বিপ্লবের শিখাকে প্রজ্বলিত থাকতে দেননি। পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ' অভ্যুত্থানে—স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের শিক্ষার ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ওয়ারশ' নগরীর উপকণ্ঠে বিজয়ী লালফৌজ অপেক্ষা করে থাকল দিনের পর দিন; নাৎসী জার্মানবাহিনীর হাতে তিন লক্ষ নাগরিক নিশ্চিহ্ন হল—সশস্ত্র নগরী বিধ্বস্ত হল, তবু স্তালিন বললেন, এই অভ্যুত্থান কতিপয় ক্ষমতালোভী শয়তানের ধোকাবী।

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে' তারা সমদোষী। দিনক্ষণ পাঁজি-

পুথি দেখে তো লেনিনও বিপ্লবের ডাক দেননি। সংগ্রামের ডাক যখন তিনি দিয়েছিলেন তখন তো তিনি একা হয়ে পড়েছিলেন। পৃথিবীর বিপ্লবীরা, বিদ্রোহীরা মুক্তির আহ্বানে যুগে যুগে আঁধারের বুকে ঝাঁপ দিয়েছেন। ভারতের মুক্তিসংগ্রামের অনন্য মহানায়ক সুভাষচন্দ্র দেশ ছেড়ে যখন পাড়ি দিয়েছিলেন—তখন যে-ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি সমস্ত বিপদকে বরণ করে নিয়ে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য, তার তুলনা গোটা পৃথিবীর ইতিহাসেও মিলবে না। যুদ্ধে বিজয়ীর রায়ই শেষ রায় নয়।

স্তালিনের প্রধান চিন্তা ছিল : যুদ্ধোত্তর পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে কোন্ শক্তি? লুবলিন কমিটি বা সোভিয়েট তাঁবেদার পোল-রা রাজশক্তির অধিকারী যাতে হয় সেটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। 'ওয়ারশ অভ্যুত্থানের' নায়করা সফল হলে ইউরোপের রাজনীতিতে বিপুল মর্যাদার অধিকারী হবেন—পোল্যাণ্ডের যুদ্ধোত্তর যুগের রাজনীতিতে তাদের উপেক্ষা করা অসম্ভব হবে। মস্কোর এই নীতি আজও অব্যাহত রয়েছে। যতক্ষণ না রুশ নেতারা সুনিশ্চিত হচ্ছেন কোন দেশের আন্দোলন বা বিপ্লব তাঁদের নির্দেশমত পরিচালিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রাশিয়ার সাহায্য আসবে না। আর বিদেশী শক্তিশালী রাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে বিপ্লব পরিচালনার অর্থই হল সফল বিপ্লবের পর দেশকে সম্পূর্ণভাবে সেই রাষ্ট্রের অনুগত তাঁবেদার রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলা—রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্বকে বিসর্জন দিয়ে। এক দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সাময়িকভাবে 'মুক্ত' হয়ে আর এক দাসত্বের শৃঙ্খলকে বরণ করে নিতে হবে। রুশ লালফৌজ যে-দেশে 'বিপ্লবীদের' রাজক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করবে অনিবার্যভাবেই সেই লালফৌজের কাছেই বিপ্লবীরা বাঁধা পড়ে থাকবেন, তার পাশব শক্তির বিরুদ্ধে নতুন করে লড়বার ক্ষমতা থাকবে না বিপ্লবীদের। আর রাইফেলই যখন ক্ষমতার উৎস! ক্ষমতা-মত্ত বিজয়ী লালফৌজের ভ্রূকুটির সামনে সব প্রতিবাদ প্রতিরোধ-স্তব্ধ হয়ে যাবে। দৈত্য (giant) ও বামনের (dwarf) অলীক মৈত্রীর দিকে অট্টহাসি হাসবে দেশব্রতীদের পরাভূত ক্ষাত্রশক্তি, জলে জলে নিঃশেষ-হওয়া বিদ্রোহের মশালের দগ্ধশেষ ভস্মরাশি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পূর্ব-ইউরোপে একমাত্র যুগোশ্লাভিয়া তার হৃত-স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেছে মার্শাল টিটো-মিলোভান-জিলাসের নেতৃত্বে নিজস্ব মুক্তি-ফৌজের সাহায্যে। সোভিয়েট লালফৌজ এসে সে দেশের রাজক্ষমতায় টিটো-পন্থীদের বসিয়ে দিয়ে যায়নি, যদিও সে-সময় মার্শাল টিটো ছিলেন অন্যতম কট্টর স্তালিনবাদী। এই একটিমাত্র প্রধান কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে

স্তালিনের মাতব্বরি ও প্রভুসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পেরেছিলেন—নিজের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবীতে সোচ্চার হতে পেরেছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সার্বিক সাফল্যের জন্য চাই জাতীয় মুক্তিফৌজ। ভারতের মুক্তিযুদ্ধের জন্য সেইজন্যই সুভাষচন্দ্র তাঁর অনন্য কীর্তি রেখে গেছেন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করে, আর সেই সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। বিপ্লবের নেতৃত্ব-প্রেরণা-পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব থাকা চাই দেশভক্তদের হাতে—রুশ-ভক্ত, চীন-ভক্ত, ইংরেজ ও মার্কিন-ভক্তদের হাতে কখনই নয়।

# ১৭

## (ক) ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজম-এর সমঝোতা

ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজম-এর মৈত্রী চুক্তি ( হিটলার-স্তালিন দোস্তি, ১৯৩৯, আগস্ট ) দীর্ঘস্থায়ী করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তৎকালীন সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ বলেছিলেন, এই চুক্তি কোন সাময়িক স্বার্থ পরিপূরণের ভিত্তিতে হয়নি, এই মৈত্রী চুক্তির ভিত্তি নাকি ফ্যাসীবাদী ও 'সাম্যবাদী' দুই রাষ্ট্রের মৌল রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ( 'fundamental state interest' ) ঐক্য। ফ্যাসিবাদী চিন্তাধারা ও সমগ্রতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রী কমিউনিজম-এর মধ্যে কতকগুলি ব্যাপারে যে মিল আছে সেটা প্রসঙ্গত আগে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং মলোটভের বিবৃতিকে অস্বাভাবিক বলে মনে করার যুক্তি নেই। কমিউনিস্টরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যেরূপ বিরামহীন তর্জন-গর্জন করেন তাঁদের ক্যাডারদের ও জনসাধারণকে কখনও সামলাবার, কখনও বা চাঙ্গা করার জন্য, সেটা যে কত প্রতারণামূলক সেটা দেখাবার জন্য হিটলার-স্তালিন মৈত্রীর বিষয়—ফ্যাসীবাদ ও সর্বস্ববাদী একনায়কতন্ত্রী ভাবধারার মধ্যে আচরণ ও পদ্ধতিগত মিল-এর কথাটা তুলে ধরা হচ্ছে। গণতন্ত্র-বিরোধী স্তালিনবাদী কমিউনিস্টদের কাছে ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতাটা একটা নিছক মুখোশ। এই মুখোশকে দেখে যে সব দেশের দেশভক্তরা সমাজতন্ত্রীরা বিশ্বাস করেছে তাদের মাথায় বিপর্যয়ের দুর্যোগ ভেঙে পড়েছে।

শুধু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দু'টি আপাতঃ পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্র—নাৎসী জার্মানী ও কমিউনিস্ট রাশিয়া চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল তাই নয়, জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের উত্থানে ও ফ্যাসিস্টদের ক্ষমতা দখলের কাজে কমিউনিস্টদের বিশেষ করে জার্মান কমিউনিস্টদের কি ভূমিকা ছিল সেটা কিছুটা পর্যালোচনা করা দরকার। নাৎসী দল জার্মানীতে ক্ষমতা দখল করার আগে থেকেই স্তালিন জার্মান কমিউনিস্টদের পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন নাৎসীদের নয়, সোস্যাল ডেমোক্রাটদের—সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রীদের পয়লানম্বর শত্রু বলে বিবেচনা করে তাঁদের কর্মসূচী নির্ধারণ করেন।

হিটলারের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ওয়ালটার শেলেনবুর্গ তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, কাইজার-সরকারের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের তৎকালীন কর্তা কর্ণেল নিকোলাই তৎকালীন জার্মান চ্যান্সেলার জেনারেল ভন্ শ্লীচার (Von Schleicher)-কে ১৯৩২ সালে ৪২,০০০,০০০ মার্ক মুদ্রাখণ্ড দিয়ে সাহায্য করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর সেটা নাকি সোভিয়েট রাশিয়ার ইঙ্গিতেই হয়েছিল। স্তালিনের মূল লক্ষ্য ছিল: গণতান্ত্রিক হ্বাইমার প্রজাতন্ত্রকে (Weimar Republic) খতম কর যেভাবে হোক। আর এ কাজে নাৎসীদের জুরী আর কেউ ছিল না। তাই নাৎসীদের শক্তিবৃদ্ধিতে তিনি উৎসাহ জুগিয়েছেন। জার্মানীকে দিয়ে পশ্চিমের বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেবার মতলবে ছিলেন স্বয়ং স্তালিন।

"According to Schullenburg, Colonel Nikolai once the head of Kaiser's military intelligence service advised General Von Schelicher, then German Chancellor to advance Hitler 42,000,000 Marks in 1932. This was done on Soviet prompting. Stalin believed that Nazis could be built up to the necessary strength to destroy Weimar Republic but that Hitler would turn to the Soviet Union as a fellow conspirator against Western democracy as a huge expanding market for German industrial products and even as a lasting ally." [ Germans Against Hitler : P. 139. ]

হিটলার ও তাঁর নাৎসী দল ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই জার্মান কমিউনিস্টরা নাৎসী-বিরোধীদের সঙ্গে জোট বেঁধে চলা অথবা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলাও বন্ধ করেছিলেন। হিটলার ক্ষমতায় আসার পর তারা অন্যান্য নাৎসী-বিরোধীদের সঙ্গে সমস্ত প্রকার সম্পর্কই ত্যাগ করেছিলেন। কেন? কেন নাৎসীদের প্রতি জার্মান কমিউনিস্টদের, সোভিয়েট রাশিয়ার বা লেনিনের মন্ত্রশিষ্য স্তালিনের এই দুর্বলতা? নাৎসী দলের বীভৎস অত্যাচারের নীরব দর্শক ও সমর্থকের ভূমিকা নিয়েছিলেন ইতিহাসের এক সঙ্কট মুহূর্তে। জার্মান কমিউনিস্টদের স্বাদেশিকতা দেশপ্রেম কেন রহস্যজনকভাবে উবে গেল প্রয়োজনের সময়? লিউ শাও চি তাঁর বহু প্রচারিত "জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ" (Nationalism and

Internationalism) গ্রন্থে যে দেশ ও জাতীয়তাবাদের কথা বলেছেন সেটা যদি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের অপরিহার্য অঙ্গই হয় তাহলে সেই মূল তত্ত্বকথা লিউ শাও চি-র ব্যক্তিগত আত্মোপলব্ধির বিষয় নিশ্চয়ই নয়, পৃথিবীর সর্বদেশের মার্কসবাদীদের বিশেষ করে কট্টর মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের তো জানা থাকারই কথা। জার্মান কমিউনিস্টরা কেন এত দেউলিয়া হয়ে হিটলারতন্ত্রের উদ্ভবে সাহায্য জোগালেন—সমাজতন্ত্রীদের নিধন-যজ্ঞে উস্‌কানি দিয়ে গেলেন নাৎসীদের?

"The German Communist dissociated themselves very largely from Hitler's other opponents before he came to power and almost completely afterwards. They took order from Moscow. Their attitude to the other groups of Germans who opposed Hitler was mainly one of contempt and innate distrust" [Germans Against Hitler—July 20, 1944, P. 139-40.]

জার্মান কমিউনিস্টরা, বিশ্ব-বিপ্লববাদী পুঁজিবাদের 'সবচেয়ে বড় শত্রুরা' (যেমন ভারতে বিড়লার 'বন্ধুরা') নিজেদের দেশের জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিলেন সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় স্বার্থের তাগিদে—অথচ সেই জার্মানীতেই হিটলারের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সমাজের একটা অংশের বড় রকমের প্রতিরোধ চলছিল সেই সময়। নাৎসী দল ক্ষমতায় আসবার একবছর আগে জার্মানীর কমিউনিস্ট দল নির্বাচনে ৫০ লক্ষ ভোট পেয়েছিল এবং রাইখস্ট্যাগে—তাদের পার্লামেণ্টে ১০০ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন—সে দেশে দলের সভ্যতালিকায় ৩,৬০,০০০ সদস্য ছিলেন এবং কলকারখানায় ১০ থেকে ১২ হাজার পার্টি সেল্ ছিল। জার্মান রাজনীতিতে এই কমিউনিস্ট দল ছিল বড় ও ক্রমবর্ধমান শক্তি (major and growing force in German politics)। এই 'বিপ্লবী দল' যারা রোজা লাক্সেমবুর্গ ও কার্ল লিবনিখটের আদর্শবাদ ও মানবতাবাদের মহৎ উজ্জ্বল ভাবধারায় সেদিনও অনুপ্রাণিত ছিলেন তাত্ত্বিক দিক থেকে—১৯৩২-৩৩ সালে ক্রমান্বয়ে একের পর এক ভুল নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন। তাঁরা Social Democrats-দের সর্বতোভাবে পরিহার করার নীতি গ্রহণ করেন। শেষে কমিউনিস্ট সক্রিয় সভ্যরা নাৎসী দলের খাতায় নাম লেখাতে সুরু করলেন এবং প্রায় শতকরা ৭০ জন কমিউনিস্ট সদস্য নাৎসী দলের সভ্য হয়ে যান। (ডায়েলেকটিক্‌সের অন্যতম সূত্র—সংখ্যাগত পরিবর্তন—গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করে—quantitative change leading to qualitative change.)

হিটলারের নাৎসী দলেও বোধকরি গুণগত পরিবর্তন সূচিত হল। [ভারতবর্ষেও প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির বহু বিশিষ্ট সভ্যদের মুসলীম লীগের সদস্য হয়ে পাকিস্থান দাবীর যৌক্তিকতা প্রচারের ও তাকে জনপ্রিয় করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।] জঙ্গী-সর্বহারা বিপ্লবী শ্রমিক-শ্রেণী হিটলারের দলের সঙ্গে সন্ধি করে নিল। কমিউনিস্ট ও নাৎসী সহযোগিতার একটা বড় দৃষ্টান্ত হল ১৯৩২ সালের সম্মিলিত পরিবহণ কর্মীদের সাধারণ ধর্মঘট ( General Transport Strike ), ভন প্যাপেনের দক্ষিণপন্থী সরকারের পতন ঘটানোর উদ্দেশ্যে। নাৎসী দল ক্ষমতায় আসার পর জার্মান অর্থ নৈতিক অবস্থা—শ্রমিক-শ্রেণীর অবস্থা কি হবে—খাদ্য-পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে তা নিয়ে জার্মান কমিউনিস্টরা যে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছিলেন তাও ফলেনি। যেমন, ১৯৩৫ সালের ব্রুসেল্‌সে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট কংগ্রেসে ওঁরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন ব্যাপক বেকারী, দারুণ খাদ্যাভাব (near starvation) দেখা দেবে এবং শ্রমিক-শ্রেণীকে ভিক্ষাবৃত্তি করতে হবে। কিন্তু এই সময়ে প্রথম তিন বছরে বেকারী শতকরা ৭৫ ভাগ কমে যায়—দেশে কোন খাদ্য-সঙ্কট ও খাদ্য-ঘাটতি ছিল না।

"In reality unemployment had been cut by 75 per cent in under three years by the Nazis, there was no food shortage at all, and the working class was living an enchanted life in a spring time of more jobs, more new homes, the cheap holidays and excursions of the 'strength through joy' movement and a jingoistic atmosphere of false of patriotism and promised revenge for the Versailles Treaty." [ Germans Against Hitler : P. 141 ]

এর পর মস্কোতে অনুষ্ঠিত অষ্টম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানান হল—স্পেনের গৃহযুদ্ধে ইণ্টারন্যাশন্যাল বিগ্রেডে যোগদানের আহ্বান জানান হল। তখন জার্মান কমিউনিস্টরা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এর পরই ২১শে ও ২২শে মার্চ রাইখস্ট্যাগের কমিউনিস্ট সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হল এবং রাইখের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হল না। জার্মানীতে নাৎসীরা নির্যাতন আর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিল—বহু কমিউনিস্ট গা-ঢাকা দিলেন, অন্য রাজ্যে পালিয়ে গেলেন। তারপর ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর

মাসে রাইখস্ট্যাগে আগুন লাগাবার কল্পিত অভিযোগে Reichstag Fire Trial সুরু হয়।

স্তালিনের নাৎসী-কমিউনিস্ট দোস্তির যে কোনই ভিত্তি নেই এটা জার্মান কমরেডরা উপলব্ধি করলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা সকল কমরেডদের গোপন ইস্তাহার দিয়ে নির্দেশ দিলেন ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের জন্য (anti-fascist cells or 'Antifa') এবং নাৎসীদের দলে 'অনুপ্রবেশের' নির্দেশও দেওয়া হল। বলা হল 'আসন্ন লাল অক্টোবর বিপ্লবের' ('coming Red October') কথাও শোনান হল। কমিউনিস্টরা পরে স্বীকার করেছেন যে, নাৎসীদের আমলে জার্মানীতে ৩,৪০,০০০ কমিউনিস্টকে নানান ধরনের সাজা দিয়ে জেলে আটক করা হয় ["History of the German Anti-Fascist Resistance Movement"—পূর্ব-জার্মানীর কমিউনিস্ট সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য।]

১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্ন শহরে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হল: নাৎসী শাসন-ব্যবস্থা ধ্বংস করাই কমিউনিস্টদের মূল লক্ষ্য। এর পরই কিন্তু মার্কসীয় ডায়েলেকটিক্-এর অমোঘ লীলারূপে এল ১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মান মৈত্রী চুক্তি (Hitler-Stalin Pact)। জার্মান কমিউনিস্টদের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে নেওয়া হল। এর অব্যবহিত পূর্বে জার্মানী যদি যুদ্ধ বাধায় তাহলে সেই যুদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজন ও যুদ্ধের সর্বব্যাপী বিরোধিতা করার আহ্বান জানাবার উদ্যোগপর্ব চলছিল—কলকারখানার উৎপাদন ব্যাহত করা ('go slow'—'sit down strike'—সাবোতাজ-এর পরিকল্পনা রচিত করে কমিউনিস্ট গোপন নির্দেশ ছড়িয়ে দিলেন)। কিন্তু হঠাৎ স্তালিন-হিটলারের দোস্তির (Robbers, Pact) প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায় 'বিপ্লবের' শিখা নির্বাপিত হল। হিটলার কমিউনিস্ট বন্দীদের কারামুক্তি দিলেন। সর্বপ্রকার নাৎসী বিরোধিতা বন্ধ হয়ে গেল—যতক্ষণ না হিটলার সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করেন (১৯৪১, জুন)। উল্‌ব্রীখ্‌ট্ (Ulbricht) মস্কোর হুকুম তালিম করার বিশ্বস্ত ভূমিকা নেন—জার্মান কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল আশা-আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্যের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত—ভারতের কমিউনিস্ট দলের কি ঠিক একই ভূমিকা ছিল না? এই সময় জার্মান কমিউনিস্ট নেতা Ulbricht-এর কি ভূমিকা ছিল—কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত যাঁরা তাঁরা ভালভাবেই জানেন। জার্মান কমিউনিস্টদের অন্যতম আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক নেতা থ্যাল্‌ম্যান

( Ernst Thalmann ) নাৎসীদের হাতে বার্লিন শহরে গ্রেপ্তার হলেন। তিনি তখন আত্মগোপন করে ছিলেন। উল্‌ব্রীখ্‌টের গোপন দূত তাঁর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে দেখা করতে আসেন। সেই দূত ও থ্যাল্‌ম্যান দু'জনেই গ্রেপ্তার হলেন—অবশ্য দূতটি পরে ছাড়া পান। থ্যাল্‌ম্যান ছাড়া পেলেন না। উল্‌ব্রীখ্‌ট্‌ ছুটলেন মস্কোতে স্তালিনের সাহায্যের জন্য। বার্লিনের মোয়াবিত ( Moabit ) জেলের প্রকোষ্ঠে বন্দী থ্যাল্‌ম্যানের পলায়নের পরিকল্পনা তৈরী হল। সেলের প্রহরীর কাছে দু'টো চাবি রাখার ব্যবস্থা ছিল। থ্যাল্‌ম্যান সেই দ্বিতীয় চাবি দিয়ে তালা খুলে পালাবেন ঠিক হল। কিন্তু যে-দিন এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে ঠিক তার আগের দিন কারারক্ষীকে কমিউনিস্ট সংস্থা থেকে জানান হল—জেল থেকে পালাবার কোনই উপায় নেই। কারারক্ষী তখন আত্মহত্যা করেন ( Moritz )।

১৯৩৯ সালের মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হবার পর না মস্কো, না উল্‌ব্রীখ্‌ট্‌—না কোন দেশের কমিউনিস্ট নেতা, থ্যাল্‌ম্যানের মুক্তির জন্য কেউই কিছু করলেন। শেষে থ্যাল্‌ম্যানকে ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে বুকেনওয়াল্ড ( Buchenwald)-এ হত্যা করা হয়। বর্তমানে বুকেনওয়াল্ড পূর্ব-জার্মানীতে অবস্থিত। এখন সেটা কমিউনিস্টদের 'পীঠস্থান' হয়েছে—তাঁরা গর্ব করে বলেন 'এখানে থ্যাল্‌ম্যান শহীদ হয়েছিলেন।' স্তালিনের হাত ছিল এর পেছনে—কেননা স্তালিন বুঝেছিলেন থ্যাল্‌ম্যানের মত প্রাচীনপন্থী আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক কমিউনিস্টরা যাঁদের ডায়েলেক্‌টিকসের সুবিধাবাদী আঁকাবাঁকা পথ বা স্তালিনবাদী যুযুৎসুর প্যাঁচ বোঝার মত প্রখর স্থিতিস্থাপক ( elastic ) মস্তিষ্ক—সুবিধাবাদী বুদ্ধি নেই ( 'Old guard Communists' ), তাঁরা আদৌ স্তালিনের প্রতি আস্থাবান নন। সোভিয়েট সম্প্রসারণবাদের ও জাতি-স্বার্থ বোধের ( National self-interest ) কাছে তাঁরা নিজের দেশ ও দেশপ্রেমকে জবাই করবেন না। থ্যাল্‌ম্যানের মত প্রায় এক ডজন বাঘা-বাঘা পুরাতনপন্থী জাঁদরেল জার্মান কমিউনিস্ট নেতাদের ১৯৩৩-৪১ সালের মধ্যে রাশিয়াতেই হত্যা করেন স্তালিনের জহ্লাদরা। ১৯৩৩ সালে Max Holz রহস্যজনকভাবে নদীতে ডুবে মারা গেলেন, ১৯৩৭ সালে Willi Mungenberg—যিনি লেনিনের সঙ্গে ১৯১৭ সালে sealed train-এ রাশিয়া গিয়েছিলেন--তাঁকে ১৯৪০ সালে হত্যা করা হয় রহস্যজনকভাবে। হিটলারের বন্দী-শিবির থেকে আর একজন কমিউনিস্ট নেতা Hans Beimler পালিয়ে ১৯৩৮ সালে প্রজাতন্ত্রী স্পেনে যান—সেখানেও তাঁকে বন্ধুরা পেছন থেকে 'ভুল করে' (?) গুলি

করেন—তিনি উল্‌ব্রীখ্‌ট্ কর্তৃক স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ অনুসৃত পার্জ-এর বিরোধিতা করেছিলেন। এই উল্‌ব্রীখ্‌টই ১৯৩৯ সালের 'দস্যুদের চুক্তি'-কে পূর্ণ সমর্থন জানালেন এবং এই চুক্তি জার্মান ও সোভিয়েট জনগণের বন্ধুত্বের প্রতীক বলে ঘোষণা করেন এবং বলেছিলেন দুই দেশের শ্রমিক-শ্রেণীর বন্ধুত্ব বিনিময় সার্বিক হল এই চুক্তি দ্বারা। চেক ও পোল জাতিদ্বয়কে তিনি 'Peoples affiliated with German national State' বলে মন্তব্য করলেন—কেননা 'বন্ধু' হিটলার যে তখন ঐ দু'টি দেশের স্বাধীনতা হরণ করে অকথ্য অত্যাচার করে গ্রাস করে নিয়েছেন! এর চাইতে বড় ভণ্ডামী আর কি হতে পারে? রুশ-সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে কমিউনিস্ট নেতা Ulbricht হিটলারের সাম্রাজ্যলিপ্সা ও গণহত্যাকে বেমালুম হজম করে নিলেন। তবেই না সেই উল্‌ব্রীখ্‌টকে পূর্ব-জার্মানীর নিরঙ্কুশ নেতৃত্বে বসিয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া! আবার যে-মুহূর্তে ১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলেন সেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী উল্‌ব্রীখ্‌ট্ ঘোষণা করলেন হিটলার জার্মান জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

"Stalin was ruthless in the way he sacrificed the German Communists to the Soviet expansionist aims; indeed he went so far as to do what was not even necessary, when he handed over to Hitler many German Communists who had taken refuge in Russia. After he had humiliated the German Communist Party in this way it was impossible for him after the German attack on Russia had been launched, to revive Communist underground activities in Germany on a large scale···It was therefore by no means a matter of chance that Stalin should have addressed his appeal in the first place to groups with middle class rather than working class associations"···[ Germans Against Hitler—P. 290, July 20, 1944. ]

ক্রুশ্চেভ Balance of Forces-এর কথা বলেছিলেন—তা নিয়ে আগে কিছুটা আলোচনাও করা হয়েছে। প্রশ্ন, এই হিটলার-স্তালিন চুক্তির ফলে Balance of Forces-এর পাল্লা কোন্ দিকে ঝুঁকে পড়েছিল? সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-বিপ্লবের

দিকে? জার্মান-বিপ্লবের দিকে? না জার্মান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে? ইউরোপে সেদিন রাজনৈতিক শক্তির যে ভারসাম্য ঘটল এই চুক্তির ফলে, তাতে করে গোটা ইউরোপ রক্তের সাগরে নিমজ্জিত হল। অথচ স্তালিন যা কিছু করেছেন সবকিছুই সোভিয়েট রাষ্ট্রের নামে করলেও স্তালিনবাদীরা প্রচার করেছেন যে, এটাও নাকি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামেই—এবং মার্কসবাদও এই আচরণকে নাকি সমর্থন করে! দু'টো পরস্পর-বিরোধী সমাজ-ব্যবস্থার স্থিতাবস্থার স্থায়ীকরণের ফলে ( Stabilisation of the systems ) স্তালিন যেমন দম নিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পেলেন, তেমনি আবার ইউরোপের বিশেষ করে জার্মানী-পোল্যাণ্ড-ফ্রান্স-চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দেবার সুযোগ এসে গেল হিটলারের হাতে। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নামে দু'টি দেশই—একটি ফ্যাসিবাদের নামে—অপরটি আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের নামে—পরস্পরের প্রভাব ও প্রভুত্বের পরিধি ( spheres of influence ) বাড়িয়ে নিল—বলি হল বিপ্লব ও কয়েকটি দেশের স্বাধীনতা।

জার্মানীতে নাৎসী শক্তির উদ্ভবে জার্মান কমিউনিস্টদের ও বিশেষ করে স্তালিনের ভূমিকা সম্বন্ধে কূটনীতিবিদ জর্জ কেনান বলেছেন:

"প্রতি পর্যায়ে জার্মান কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক। ব্রুনিং-সরকারের প্রতি তাদের নেতিবাচক আচরণ তাঁকে পরিষদীয় পদ্ধতিতে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারী কাজ পরিচালনার পরিবর্তে আপৎকালীন ডিক্রী জারী করে প্রশাসন চালু রাখার পথ সুগম করে দিয়েছিল। এর ফলে পরিষদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে এমন সব অগণতান্ত্রিক নজীর তৈরী হল যা পরবর্তীকালে হিটলার নিজের মতলব হাসিল করতে বেপরোয়া-ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। কমিউনিস্টদের হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ, যখন-তখন পথে-ঘাটে হল্লাবাজী ও হাঙ্গামার রাজনীতি, সমাজতন্ত্রী ও নাৎসীদের সঙ্গে সংঘর্ষ ইত্যাদি পরিণামে অনিবার্যভাবে দক্ষিণপন্থী শক্তিদের হাতই শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছিল—এই অরাজকতা সৃষ্টির সুযোগ নিয়ে দক্ষিণপন্থীরা রাজনৈতিক ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকার অর্জন করলেন এবং পরিশেষে এই ব্যাপক পুলিশীক্ষমতা দেশের মৌলিক স্বাধীনতার দলনেই ব্যবহৃত হয়েছে। [(…"Eeventual monopolisation of police power by right-wing elements and its use against Liberties of the Republic—indeed for Nazi violence of all sorts.") Russia And West Under Lenin And Stalin.] নাৎসী হিংসাত্মক রাজনীতির উদ্ভব

আসলে এইভাবেই হয়েছে। ১৯৩১ সালে জার্মানীর দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি জোট বেঁধে সমাজতন্ত্রী-নিয়ন্ত্রিত ব্রুম-সরকারকে, সে যুগে যে শক্তি গণতন্ত্রের আশা-ভরসা ছিল, গণভোটের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করেছিল—তখন জার্মান কমিউনিস্টরা সেই দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিল এই সঙ্কীর্ণ ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে এবং সেই গণভোটে গণতান্ত্রিক শিবিরের বিপক্ষে যে মোট অগণতান্ত্রিক শক্তির ভোট পড়েছিল, তার সঙ্গে ২৫ লক্ষ কমিউনিস্ট ভোট যুক্ত হয়েছিল। আবার পথে-ঘাটে যত্রতত্র কমিউনিস্ট জিঘাংসা ও ধ্বংসের তাণ্ডব ভন প্যাপেনকে উৎসাহিত করেছিল সে-সময়ের নরমপন্থী সরকারকে খারিজ করতে, ১৯৩২ সালে। ১৯৩২ সালের ৬ই নভেম্বর যখন পুনরায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল—তখন নাৎসীদের প্রাপ্য ভোটের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেল। সে দেশে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার হয়ত একটা বড় শেষ সুযোগই হাতে এসে গিয়েছিল। তখন কমিউনিস্টরা কি করলেন? তাঁরা মনে করলেন নাৎসী দলের আর কোনই সম্ভাবনা নেই—সুতরাং নাৎসী দলের কাছ থেকে ভয় পাবার কিছুই নেই। তারা তখন সমাজতন্ত্রীদের খতম করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। সমাজতন্ত্রীরা এইসময় হিটলারের চরম ক্ষমতা দখলের তিনমাসেরও আগে উপায়হীন হয়ে শেষ পর্যন্ত বার্লিন শহরে অবস্থিত সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা বার বার অনুরোধ জানালেন, সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত যেন জার্মান কমিউনিস্টদের সোস্যালিস্ট বিরোধিতার পথ পরিহার করে নাৎসী-বিরোধী সংগ্রামে সোস্যালিস্টদের সঙ্গে সামিল হবার পরামর্শ দেন। কিন্তু তাঁদের সমস্ত অনুরোধ, আবেদন-নিবেদন নেহাৎই অরণ্যে রোদন হয়েছিল। নেতিবাচক উত্তর এলো দূতাবাস থেকে। হিটলার জার্মানীর চান্সেলারের পদে আসীন হবার অব্যবহিত পূর্বে সোভিয়েট দূতাবাসের সচিবের কাছ থেকে নির্মম উত্তর এল: "মস্কো মনে করে কমিউনিস্ট জার্মানীর বিপ্লবের রাজপথ হিটলারের দ্বারাই নির্মিত হবে—আর সেই রাজপথ বেয়ে সাম্যবাদের বিজয়রথ এগিয়ে আসবে।" ["...The blunt answer given by the Secretary of the Soviet Embassy Moscow was convinced the road to Soviet Germany lay through Hitler." George Kenan: Russia And West Under Lenin And Stalin: P. 288-289.]

জার্মানীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দারুণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। ভয়াবহ বেকারী, ভার্সাই চুক্তির অসহনীয় ও অপমানজনক

সর্তাবলী, একটি বিজিত জাতির শায়িত শ্রান্ত-ভগ্ন দেহের ওপর বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের উন্মত্ত তাণ্ডব, যুদ্ধের বিপুল ক্ষতিপূরণ আদায়ের অজুহাতে একটা শিল্পোন্নত বিরাট জাতিকে চিরতরে পঙ্গু খর্ব করে রাখার ষড়যন্ত্র—মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিহিংসা-পরায়ণতা সমগ্র জাতির জীবনে, বিশেষ করে যুব-সমাজের কাছে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থার পটভূমিতে সুরু হয়েছিল সেদেশে এক গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের পরীক্ষা। ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হ্বাইমার প্রজাতন্ত্র ( Weimar Republic ) সে-যুগের শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক পরীক্ষার সূচনা করেছিল নিঃসন্দেহে। জর্জ কেনান বলেছেন :

"The Republic represented a desperate sort of bet on the faith and the enlightenment and the responsibility of the average man in Germany. It represented an experiment which would have tested to the utmost the resources of the German people even had all segments of German political life been united in the desire to see it succeed." [ P. 290—Kenan. ]

জার্মানীর আলোকপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল সচেতন নাগরিকদের বিশ্বাস উন্নত চেতনা ও দায়িত্ববোধের ওপর শেষ ভরসা নিবদ্ধ রাখার প্রয়াসেরই প্রতিফলন হয়েছিল হ্বাইমার প্রজাতন্ত্রে। এই শুভবুদ্ধির ওপর নির্ভর করেই যেন এই মহৎ গণতান্ত্রিক পরীক্ষায় হার-জিতের বাজী ধরা। এই গণতান্ত্রিক পরীক্ষাকে সফল করার চেষ্টায় জার্মানীর সকল রাজনৈতিক শক্তিগুলি হাত মেলালে—সেটা নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হত। কিন্তু কমিউনিস্টদের ধ্বংসাত্মক মারমুখী রাজনীতি সবকিছু বানচাল করে দিয়েছিল। হ্বাইমার রিপাবলিক-এর ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত অন্য গণতান্ত্রিক খাতে, বইত কমিউনিস্ট বামেরা ধ্বংস ও হিংসার পথ সমাজতন্ত্রী নিধনের পথ পরিহার করে এই গণতান্ত্রিক পরীক্ষাকে বাঁচাবার সঙ্কল্পে যদি কমিউনিস্টরা তাঁদের বিপুল সমর্থন ( আনুমানিক ২৫ থেকে ৫০ লক্ষ ) নিয়ে সমাজতন্ত্রীদের পাশে এসে দাঁড়াতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ২৫ থেকে ৫০ লক্ষ কমিউনিস্ট সমর্থকদের বিরোধিতারই সম্মুখীন হতে হয়েছে হ্বাইমার প্রজাতন্ত্রকে। মস্কোর নির্দেশেই কমিউনিস্টরা এই বিরোধিতার ভূমিকা নিয়ে এসেছে। দেশের স্বার্থ—জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে তাদের বাধেনি। জর্জ কেনান আরও মন্তব্য করেছেন :

"But for the moderate German leadership of the 1920, and

the early 1930's to have to bear in addition to all the handicaps I have listed, the hostile pressure of a whole section of German political life, namely the Communist Party, commanding anywhere between two and five million adherents violently oriented against the whole success of the experiment and utterly unscrupulous in its determination to wreck it at any cost: this represented an added burden of no small dimension. At the very outset in 1918 it was unrestrained use of violence by the Communist Left which more than any other factor forced the moderate socialist leaders to accept the services of the German Army for the preservation of order in the republic and to pay an appropriate price in catering to the interests prejudices of the anti-Republican officers corps......" [ George Kenan : Russia And West Under Lenin And Stalin : P. 291 ]

কেন এই ২৫ থেকে ৫০ লক্ষ কমিউনিস্টদের নিরবচ্ছিন্ন একটানা বিরোধিতা? গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও সংবিধান কি 'সাম্যবাদের' প্রতিবন্ধক? কার ইঙ্গিতে এই অদ্ভুত ভূমিকায় কমিউনিস্টরা নেমেছিলেন? জর্জ কেনান তার উত্তরে বলেছেন:

"...The fact that it was ( meaning 2 to 5 million votes ) so subtracted and so mobilised was largely Moscow's doing. The fact that no change was made in this situation even in the years when the star of Nazi power was rising on the German political sky was also the clearest possible expression of the Soviet political will"

হিটলারের ক্ষমতায় আসা বন্ধ করতে স্তালিন ও স্তালিনবাদীরা কি করেছিলেন ইতিহাসের ঘটনাগুলি খোলা মন নিয়ে বিচার করলেই সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোন স্তালিনবাদী কি হিটলারকে এভাবে ক্ষমতায় আসতে দেবার কাজের নিন্দা করেছেন? সমাজতন্ত্রীদের অন্ধ বিরোধিতার শোচনীয় পরিণতির কথা বিবেচনা করে কোন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কি অতীতের এই সব কাজের নিন্দা করেছেন? না। কেন? দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধে রুশ-জার্মান যুদ্ধে রাশিয়ার প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ; ২ কোটি নরনারী নিশ্চিহ্ন হয়েছে, অগণিত শহর-জনপদ-কলকারখানা ধ্বংস হয়েছে যুদ্ধে—সব সত্যি। কিন্তু মানচিত্রের দিকে চোখ ফেরালে বোঝা যাবে রাশিয়ার ভৌগোলিক আয়তন ১৯৩৯ সালে রুশ-জার্মান চুক্তির প্রাক্কালে যা ছিল তার চাইতে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাশিয়ার জনসংখ্যার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল ২ কোটি ৩০ লক্ষ লোক। সমগ্র ইউরোপের প্রায় অর্ধেক আজ রাশিয়ার মুঠোর মধ্যে।

হিটলার ও নাৎসী দলের অভ্যুত্থানের স্থযোগ দিয়ে স্তালিন পশ্চিমের বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সমঝোতার পথ রুদ্ধ করতে সাহায্য করেছিলেন। স্তালিন চেয়েছিলেন জার্মানী ফরাসীদেশ ও ব্রিটেনের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে জড়িয়ে নিজের শক্তি ক্ষয় করুক। ক্রুশ্চভ ১৯৫৬ সালের ঐতিহাসিক বিংশতিতম কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে স্তালিনের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। লেনিনের শবাধারের পাশ থেকে স্তালিনের নশ্বর দেহকে সারিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ইতিহাস থেকে নানাভাবে স্তালিনের নাম মুছে দেবার চেষ্টা হল। কিন্তু স্তালিনের পররাজ্য-গ্রাসের কোন সমালোচনা তো তিনি বা তাঁর দলের আর কেউ করেননি? এ যেন ইংরেজের ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ইম্‌পিচমেণ্ট-এর মতন অনেকটা। ইংরেজ জাতি সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন ও শোষণের বখরাটা নিল—কিন্তু ধিক্কৃত করল ওয়ারেন হেস্টিংসকে। ব্রিটিশ গণতন্ত্রের পক্ষে ধন্য-ধন্য রব পড়ে গেল। কলোনীগুলির বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে এইসব তথ্য অবশ্য-পাঠ্যও হল। এ এক ধরনের রাজনৈতিক শঠতা মাত্র।

[ স্তালিনের সমালোচনার কোন অর্থই হবে না যদি যে-সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা হরণ করেছিলেন তিনি—তার সমালোচনা না করা হয়—লুঠের বখরা যদি ফিরিয়ে দেওয়া না হয়। লেনিনের প্রচারিত ও বিজ্ঞাপিত আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণ বিলুপ্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জঙ্গী উগ্র রাষ্ট্রীয়তাবাদের আকাশ-ছোঁয়া উদ্ধত ইমারত। ]

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা কি জানেন হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় স্তালিন আদৌ উদ্বিগ্ন বা আতঙ্কিত হননি! জর্জ কেনানের ভাষায় 'Road to Soviet Germany lay through Hitler'—হিটলার-তন্ত্রই নাকি সাম্যবাদের রাজপথ তৈরী করে দেবে—সেই পথ দিয়ে ছুটে আসবে 'মুক্তি'-বাহিনী বিপ্লবের নামে বিশ্ব-প্রভুত্বের আমমোক্তারনামা নিয়ে। হিটলার তাঁর গেস্তাপো (Gestapo) বাহিনী দিয়ে জার্মান কমিউনিস্টদের নির্মূল করার আয়োজন করেছিলেন। সেই প্ল্যান-মাফিকই কাজ হয়েছে—তাতেও স্তালিন রুষ্ট হননি।

বরং তিনি বলেছিলেন এইসব ঘটনা দুই দেশের মৈত্রী স্থাপনে অন্তরায় হতে পারে না। স্তালিনের এই আচরণের মধ্যে কি কোন আন্তর্জাতিক বিপ্লববাদীর চরিত্র ফুটে উঠেছে ?

স্তালিনের দৃষ্টি সেই সময় জাপানের ওপর পড়েছিল। কেননা, জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল তাঁর মনে নূতন উদ্বেগ সঞ্চার করেছিল। তাই তিনি তখন সাম্রাজ্যবাদী জাপানকে খুশি করার জন্য মাঞ্চুরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত জাপ তাঁবেদার সরকারকে—চীনের পূর্বাঞ্চলের রেল ( Chinese Eastern Railway ) বিক্রী করে সোভিয়েট দূরপ্রাচ্যের সীমানাকে সম্ভাব্য জাপ-আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যস্ত। সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিরামহীন চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। লেনিনের জীবদ্দশায় ১৯২১ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত এই চেষ্টা চলে, পরে তাঁর মৃত্যুর পরও ১৯২৪ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়। ১৯৩০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে রাশিয়ার রপ্তানী বাণিজ্যের আর্থিক মূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। তারপর ১৯৩৩ সালে এই দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হল —ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হবার পর। 'মার্কসিস্ট' স্তালিন ক্যাপিটালিস্ট্ রুজভেল্টের সঙ্গে দোস্তি স্থাপনের বিশেষ উদ্যোগী হয়ে পড়েছিলেন—জাপ-সম্প্রসারণবাদীদের হাত থেকে নিজের দেশের সীমান্তকে রক্ষা করার জন্য।

হিটলার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৩৪ সালের ২৬শে জানুয়ারি পোল্যাণ্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি ( Non-Aggression Pact ) সম্পাদিত হল। এই ঘটনাতে স্তালিন কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। র‍্যাপালো চুক্তির ( Rapallo Treaty ) অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী নূতন পথে পা বাড়াবার ইঙ্গিত ছিল এই চুক্তির মধ্যে। এর পরই জার্মান-পোলীশ সীমানা পুনর্বিবেচনার প্রশ্ন তুলে ইউক্রেন থেকে ( পোলীশ ইউক্রেন ) পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ড পোল্যাণ্ডকে দিয়ে 'পোলীশ করিডর'-এর অবলুপ্তি ঘটান হল। স্তালিন তখন সাম্রাজ্যবাদী ফরাসী সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন ( Franco-Soviet Pact—ভাষান্তরে Laval-Stalin Pact )। সেই সঙ্গে কমিণ্টার্নের ফ্যাসিবাদ সম্পর্কিত নীতিরও পরিবর্তন সূচিত হল ;—বিপ্লবের স্বার্থে আদৌ নয়—রুশ জাতীয় স্বার্থ ও সেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তাজনিত তথা কৌশলগত কারণে ( strategic consideration and state security reasons )।

১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে লাভাল-স্তালিন চুক্তি (Laval-Stalin Pact) ফরাসী সরকার অনুমোদন করলেন। স্তালিনের উদ্দেশ্য ছিল হিটলারকে বাইরে থেকে কিছুটা সংযত করা। কিন্তু আদৌ ফল হয়নি। এই চুক্তির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে হিটলার স্তালিন-লাভাল চুক্তি অনুমোদনের কিছুদিনের মধ্যে রাইনল্যাণ্ড দখল করে নিলেন। হিটলারের এই রাজ্যলিপ্সার বিরুদ্ধে কি ব্রিটেন কি ফরাসী সরকার কেউই রুখে দাঁড়াল না। হিটলারের এই প্রাথমিক সাফল্য একদিকে যেমন পররাষ্ট্রনীতিতে হিটলার তোষণের মনস্তত্ত্ব তৈরী করতে সাহায্য করল, অন্যদিকে রাশিয়াতে স্তালিনের সমালোচক, সম্ভাব্য সকল প্রতিদ্বন্দ্বীদের গণতান্ত্রিক চিন্তাসম্পন্ন নেতা ও নাগরিক বুদ্ধিজীবিদের নির্মূল করার পটভূমিও রচিত হল।

রাশিয়াতে নিজের দলের কাছে—বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী আদর্শবাদী ও উদারনৈতিকদের কাছে স্তালিনের পররাষ্ট্রনীতির রিক্ততা পরিষ্কার হয়ে উঠছিল ক্রমেই। সুরু হল রাশিয়াতে রাষ্ট্র-পরিচালিত উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক বিচার প্রহসনের পালা (Treason trials)। এই সব সাজান মিথ্যা মামলায় কল্পিত অবিশ্বাস্য আজগুবি অভিযোগের পর অভিযোগ উত্থাপন করে রাজনৈতিক বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে স্তালিন নিজের ব্যক্তিগত প্রভুত্ব ও একনায়কত্ব আরও নিষ্করুণ ও নিরঙ্কুশ করলেন। কমিণ্টার্ণ-কে সম্পূর্ণ তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে আনলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হল—খুবই সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে রহস্যজনকভাবে বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গর্কীরও মৃত্যু-সংবাদ পরিবেশিত হল (১৯৩৬, জুন)।

ভার্সাই চুক্তির সর্ত অনুযায়ী লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডের অনুকূলে যে-সব 'জার্মান অঞ্চল' পরিত্যাগ করতে জার্মানী সে সময় বাধ্য হয়েছিল, হিটলার সেই সব অঞ্চলকে পুনরায় জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করার স্বপ্ন দেখছিলেন। যেমন দেখছিলেন অস্ট্রিয়া ও সুদেতেন অঞ্চল, মেমেল, ডান্‌জিগ দখলের স্বপ্ন। অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরস্থ জার্মানদের দিয়ে নানাবিধ গণ্ডগোল সৃষ্টি করার ব্যবস্থা হল চতুর পরিকল্পনা মাফিক। হিটলার একটা ছুতো খুঁজছিলেন। অস্ট্রিয়ার ক্যাথলিক রক্ষণশীল সরকারের চ্যান্সেলার ছিলেন সেই সময় Kurt Von Schuchnigg। বিশ্ববাসীর বুঝতে অসুবিধা হল না অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। ১৯৩৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি হিটলার রিবেনট্রপকে অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত করে পাঠালেন। তারপরই হিটলার ১১ই মার্চ (১৯৩৮) অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলারকে চরমপত্র দিলেন। ১২ই মার্চ জার্মান সেনাবাহিনী দখল করার অভিযান চালাল।

জার্মানীর অতৃপ্ত রাজ্যলিপ্সা নাৎসীদের যতই উদ্ধত করে তুলল, বিশ্ব-বিপ্লব-কাতর স্তালিন ততই নাৎসীদের বন্ধুত্বের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে পড়লেন। হিটলার-স্তালিন বন্ধুত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হল। 'সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের' স্রোত ধীরে ধীরে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের মোহনায় মিলিত হবার জন্য গড়িয়ে চলল। এদিকে বিপ্লবী মার্কসবাদী ক্যাডাররা দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ-শোষিত উপনিবেশ, আধা উপনিবেশ ও স্বাধীন অ-কমিউনিস্ট দেশগুলিতে ফরমাস্ মাফিক গলা-ফাটান চীৎকার করছেন—'ফ্যাসিবাদ ধ্বংস হোক, সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক।'

হিটলারের প্রাণও উতলা হয়ে উঠেছিল 'স্তালিনের বন্ধুত্বের বন্ধনের পিয়াস লাগি।' কেননা, তাঁর পরের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল চেকোশ্লোভাকিয়া। এর পরই সম্পাদিত হল কুখ্যাত মিউনিক চুক্তি ( Munich Agreement )। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন, ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঃ দালাদিয়েয়র হিটলার তোষণের অভিপ্রায়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা হরণের নীরব দর্শকের জঘন্য ভূমিকা গ্রহণ করে বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দিলেন। বোহেমিয়া, মোরাভিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জার্মানীর দখলে চলে গেল। চেম্বারলেন হিটলারের সঙ্গে গোডেস্‌বার্গ-এ ( Godesberg ) এক বৈঠকের পর ঘোষণা করলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল জার্মানীরই পাওয়া উচিত। এই সময় কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে ফরাসী ও রুশ-সরকারের যে-চুক্তি বলবৎ ছিল তাতে ঘোষণা করা হয়েছিল, আক্রান্ত হলে একে অপরকে সাহায্য করবে। কিন্তু সাহায্য আসেনি। সকল গ্যারান্টি, প্রতিশ্রুতি কাগজের মধ্যেই বন্দী হয়ে রইল। এর পরই ডান্‌জিগ-কে রাইখের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জার্মানী পোল্যাণ্ডের ওপর চাপ দিল। পোল্যাণ্ডের নেতারা বাধা দিয়েছিলেন যথাসাধ্য। পোল্যাণ্ডের কাছে আপোষে ডান্‌জিগ পেতে বাধা পেয়ে হিটলার ক্রুদ্ধ হয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার বাকী অংশটুকু দখল করে নিলেন। স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্র বিলুপ্ত হল পৃথিবীর মানচিত্র থেকে।

মিউনিক চুক্তিতে হিটলার গ্রেটব্রিটেনকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, পোল্যাণ্ডের সীমানা লঙ্ঘিত হবে না। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে তিনি পোল্যাণ্ডের ওপর চাপ দিতে থাকেন। এদিকে পোল্যাণ্ডকে গ্যারান্টি দিল পোল সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে। পোল-সরকার রুশ ও ফরাসী সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালালেন স্বদেশের সীমান্ত ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য। হিটলার নিঃসন্দেহে অসুবিধায় পড়লেন কিছুটা। মার্কসিস্ট

রাশিয়াকে নিরস্ত ( Neutralise ) করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ল। কেননা, ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশকে জার্মানী আক্রমণ করলে পেছনের দিক থেকে রাশিয়া যাতে আক্রমণ করতে না পারে সে বিষয় আশ্বস্ত হওয়ার প্রয়োজন ছিল জার্মানীর দিক থেকে। তাই ফ্যাসিবাদী ও সাম্যবাদী শিবিরের দু'পক্ষেরই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হবার।

রাশিয়ায় অষ্টাদশ কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে এই ঘটনার ছয় সপ্তাহ পরই স্তালিন লিটভিনভকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে মলোটভকে সে জায়গায় বসালেন। লিটভিনভ ছিলেন ইহুদী। হিটলারের ইহুদী বিদ্বেষের কথা স্তালিন ভালভাবেই জানতেন, আর তিনি নিজেও ছিলেন চরম ইহুদী-বিদ্বেষী। ১৯১৮ সালের পর এই প্রথম পলিটব্যুরোর সদস্যকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করা হল রাশিয়ায়। রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আসন্ন বোঝা যাচ্ছিল। চার্চিল এই পরিবর্তন সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন :

"The eminent Jew, the target of German antagonism was flung aside for the time being like a broken toy and without being allowed a word of explanation was bundled off the stage to obscurity, a pittance and police supervision." ( Churchill )

হিটলারও ১৯৩৯ সালের ২২শে আগস্ট তারিখের ঐতিহাসিক জার্মান সেনাপতি ও রণ-বিশারদদের সমাবেশে ঘোষণা করলেন : "Litvinov's dismissal was decisive. It came to me like a cannon shot, like a sign that the attitude of Moscow towards the Western powers had changed." [ Russia At War ; P. 27 : Alexander Werth. ] লিটভিনভ যুগের পররাষ্ট্রনীতির অবসানের সূচনা ঘটল।

হিটলার নিজেই অবস্থা বুঝে রুশ-জার্মান বৈঠকের ইঙ্গিত দিলেন। স্তালিন লুফে নিলেন এই প্রস্তাব। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ( Hitler-Stalin non-aggression Pact ) বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দিল। বিগত কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর কমিউনিস্টরা নাৎসীদের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ এই চরম রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতা বিশ্ব-বিপ্লব আদর্শের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলেই বিবেচিত হবে। দ্বান্দ্বিক জড়বাদ সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ ও বিশ্ব-বিপ্লব তত্ত্বের কোন সম্পর্ক এই সুবিধাবাদী আচরণের সঙ্গে আছে কিনা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ছাত্ররাই তা বিবেচনা করে দেখবেন।

## (খ) ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজম

ফ্যাসিবাদ ও মার্কসীয় কমিউনিজম-এর মধ্যে আদর্শগত সংঘাত মৌলিক হওয়া সত্বেও দু'টি চরমপন্থী ( extremist ) মতবাদের মধ্যে প্রয়োগের বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কতকগুলি রীতি বা কাঠামোগত অদ্ভুত মিল ( basic structural similarities ) লক্ষ্য করা যাবে। কমিউনিজম-এর বাস্তব রূপ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া ও বিভিন্ন কমিউনিস্ট দেশের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতেই হবে। যেমন—জার্মানী ও ইতালীর অভিজ্ঞতাকে ফ্যাসিবাদের আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে হয়। দু'টি মতবাদই (১) হিংসাত্মক, হিংসার কার্যকারিতায় বিশ্বাসী, (২) সর্বস্ববাদী সমগ্রতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পর্যবসিত ( totalitarian system ) ফ্যাসিজম্ ও সর্বস্ববাদী একনায়কতন্ত্রী কমিউনিজম্ ( all-to the one-fold-ism )। কর্ম-কৌশলের মধ্যেও মিল আছে : ব্যাপক নিষ্ঠুরতা ও শাসক শ্রেণীর ভয়াল ভ্রূকুটি দ্বারা সমাজে ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করা, নিষ্ঠুর বীভৎসতা, অত্যাচার নিপীড়ন গা-সহা করে তোলা, গোটা জাতিকে উদাসীন আত্মকেন্দ্রিক করে তোলা। হিটলার ও স্তালিন প্রায় একই পদ্ধতিতে দু'টো দেশকে সম্পূর্ণ বশীভূত করেছিলেন। দুই দেশেই যে-কোন প্রতিবাদের প্রয়াসকেই অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হয়েছে। রাশিয়া ও জার্মানী দু'টো দেশের বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক বিজ্ঞানীদের মানবিক দায়িত্ববোধ ও নীতিবোধকে ভোঁতা করে দেওয়া হয়েছে নূতন পদ্ধতিতে। কমিউনিস্ট চীনেও 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' নামে একই জিনিস হয়েছে। হিটলার ও স্তালিনের আমলে নাকি ব্যাপকভাবে একেবারে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত খুনোখুনির নারকীয় কাণ্ডেরই দুই দেশের বুদ্ধিজীবিরা, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা 'শ্রেণী-সচেতন' সর্বহারা শ্রেণী মৌন দর্শক ছিলেন। সমগ্রতান্ত্রিক (totalitarian) কমিউনিজম্-এর ও ফ্যাসিজম্-এর সাংগঠনিক নীতির ( organisation principle ) মধ্যেও যথেষ্ট মিল রয়েছে। যেমন, (১) গোপনীয়তার নীতি ( secrecy ), (২) সংখ্যালঘিষ্ঠগোষ্ঠী কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর শাসন পরিচালনা ও সার্বিক নিয়ন্ত্রণ, (৩) সামরিকতন্ত্রবাদ ( militarism ),

(৪) কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্ব ( centralised authority ), (৫) উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বে-আইনী পদ্ধতির যথেচ্ছ প্রয়োগ। [ 'To combine legal with illegal work'; 'illegal work is particularly necessary in the army, navy and the police'—Lenin ]. [ পশ্চিমবাংলায় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক সরকারী প্রশাসন-যন্ত্র পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে বে-আইনীভাবে দলীয় প্রভাব, ক্ষমতা বিস্তারের এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার অমার্জনীয় হিংসাত্মক কাজে ব্যবহার করেছিলেন—সেটা, কোন আকস্মিক গজিয়ে-ওঠা স্থানীয় বিচ্যুতি নয়; ওটা একটা সুপরিকল্পিত প্যাটার্ণ অনুযায়ীই অনুসৃত হয়েছে। এই অবৈধ প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতাকে গভর্ণরের তকমা পরা কোন সাংবিধানিক গোপাল ভাঁড় 'পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রশাসকের' 'দক্ষতার' ছদ্মবেশ পরিয়ে জাহির করলেও ভুলে গেলে চলবে না—স্তালিন রাশিয়াতে, হিটলার জার্মানীতে, মুসোলিনি ইতালীতে, ফ্র্যাঙ্কো স্পেনে, মাও-সে-তুঙ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে চীনে—অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গেই অবৈধভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলিকে ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করেছেন। ]

ইতিহাসের পাতাগুলো ওল্টালে-পাল্টালেই দেখা যাবে—লেনিনবাদী-স্তালিনবাদী কমিউনিস্টরা ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীরা কোনদিনই সোদরপ্রতিম শক্তিরূপে গণতান্ত্রিক শিবিরকে শক্তিশালী করতে পারেনি। লেনিনবাদী-স্তালিনবাদীরা কোনদিন সমাজতন্ত্রীদের বরদাস্ত করেনি। তবে আমাদের মত দেশে নির্বাচনে আসন বণ্টন-ভিত্তিক 'বৈপ্লবিক' সমাজতন্ত্রের দেশে ভোটের ঘাটে বাঘে-গরুতে একই সঙ্গে জল খায়। ভোটে জেতার গরজ বড় বালাই। তাই ভোটের লোভে, গদীর মোহে ইতিহাসের শিক্ষার দিকে চোখ বুজে থাকেন দেশের সমাজতন্ত্রীরা, গণতন্ত্রীরা। ইতিহাস বড় নির্মম বিচারক—সে কাউকে ক্ষমা করে না।

মাও-সে-তুঙ-লিন পিয়াও-এর 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস-তত্ত্ব' উলঙ্গ পাশব ক্ষমতা-তত্ত্বেরই নামান্তর ( Naked power )। নাৎসীবাদ বা জার্মান ফ্যাসিবাদও নিছক পাশব শক্তি-তত্ত্বের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। হিটলার বন্দুকের জোরেই গোটা বিশ্ব পদানত করতে চেয়েছিলেন। ব্রেজনভ মাও-সে-তুঙ নিক্সন্ তাই চান। লিন পিয়াও তাই চেয়েছিলেন।

চীনের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে মস্কোর একটি পত্রিকায় বলা হয়েছে, "military, bureaucratic Bonapartistic system of Mao-Tse-Tung

and Lion Piao." "The Marxist do not conceal their intention to impose their hegemony by war which they extol in every way." [ Statesman, Sept. 5, 1952 ; P. 13 ]

(৫) এক পার্টি শাসন-ব্যবস্থাই কমিউনিস্ট ও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের অন্যতম মূল ভিত্তি।

(৬) দু'টি মতবাদই নেতাবাদী ( leader principle )। যদিও তত্ত্বের ক্ষেত্রে কমিউনিজম-এ নেতাবাদ ও ব্যক্তিপূজার কোন স্থান নেই।

(৭) কি ফ্যাসিস্ট কি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' ও 'গণতন্ত্রের' কোন স্থান নেই।

(৮) দুই ব্যবস্থাতেই গোয়েন্দা-পুলিশ ( Secret Police : Gestapo : N. K. V. D. ) ও ভীতিপ্রদর্শন ( terror ) শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি। ভাষান্তরে ফ্যাসিস্ত ও সর্বস্ববাদী আধুনিক কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। [ "Truncheon ! Beat Beat and beat again"— Stalin. ]

(৯) দুই রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল 'সব কিছুই রাষ্ট্রের জন্য' 'কোন কিছুই রাষ্ট্রীয় স্বত্তার বাইরে নয়।' দুই ব্যবস্থার লক্ষ্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন। দুই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাতেই সামাজিক ও ব্যক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক সকল প্রকার সম্পর্কের ও সম্বন্ধের উপর কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-নিরপেক্ষ কোন সম্পর্ক বা চিন্তার স্থান নেই ( Totalitarian control over all social and individual relations )। দুই সমগ্রতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই উদারনৈতিক মূল্যবোধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য সবসময়েই সমষ্টিতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে বলি হয় ( anti-liberal and anti-individualistic )। সমস্ত সমাজ যেন,—দুই ব্যবস্থাতেই—একতারাতে বাঁধা—কেবল একটিমাত্র সরকারী নির্দিষ্ট সুরই ঝঙ্কৃত হবে সেই একতারা থেকে।

(১০) দু'টি ব্যবস্থাতেই 'লক্ষ্য' ( Ends ) সাধনের জন্যে যে কোন 'উপায়' ( Means ) অবলম্বনকেই সমর্থন জানান হয়। লক্ষ্য যদি 'মহৎ' হয় ( দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে )। সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার পথটা যদি নৈতিক দিক থেকে গর্হিত হয় তাতেও কিছু আসে যায় না ( end justifies the means )।

(১১) কি জার্মান ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে, কি ইতালীয় 'করপোরেট' রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় শিল্পপতিদেরও স্বার্থকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের অধীনস্থ করে রাখা হয়েছিল

( Subordinated to state interest )। 'শ্রম' একটা আবশ্যিক কর্তব্য বা ধর্ম দুই ব্যবস্থাতেই ( labour—a compulsory service ), বাজারের 'অরাজকতা' রাষ্ট্রীয় মধ্যস্থতা দ্বারা দূরীকরণের নীতিতে দুই ব্যবস্থাই আগ্রহী তত্ত্বগতভাবে ( removal of the anarchy of the market )।

(১২) দুই রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাতেই 'মহৎ জীবনের' ( good life ) চাইতে 'মহৎ মৃত্যু' ( good death ) বেশি আদরণীয় লক্ষ্য।

(১৩) উভয় ব্যবস্থাতেই পরিষদীয় গণতন্ত্র ঘৃণিত বস্তু।

(১৪) কমিউনিস্টরা 'শ্রেণীশত্রু' খতমের কথা বলে থাকেন, হিটলার জাতি-রক্তের কৌলিন্য-তত্ত্ব প্রচার করে লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন নাৎসীদের দিয়ে নিজের দেশে ( Herrenvolkism : Racial superiority of Nordic race )। স্তালিনও ছিলেন চরম ইহুদী-বিদ্বেষী। মার্কসবাদীদের যেমন 'ইতিহাসের শ্রেণী ব্যাখ্যা', জার্মান ফ্যাসিস্টদের কাছে তেমনি ইতিহাসের উন্নত জাতির ব্যাখ্যা ( Racial interpretation of history )। চরমপন্থী নাৎসীদের ( extremists ) মধ্যে কি স্তালিন তাঁর ক্রূরতম চরমপন্থা ও হিংসাত্মক রাজনীতির প্রতিফলন লক্ষ্য করে উৎসাহিত হয়েছিলেন? পুনরুজ্জীবিত শক্তিশালী জার্মানীকে পশ্চিমের 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রগুলিকে আক্রমণে নৈতিক সমর্থন দিয়ে, জার্মানী ও পশ্চিমের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে দুই দলকে আটকিয়ে রেখে, তাদের শক্তিক্ষয় ও বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে স্তালিন কি সমগ্র ইউরোপে নতুন রাজনীতির খেলায় মাততে চেয়েছিলেন? স্তালিন কি জানতেন না পশ্চিমের 'মিত্রশক্তি'রা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই-চুক্তির কি অবমাননাকর সর্ত পরাজিত জার্মানীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন? গোটা জার্মানীকে তার অর্থনীতি-শিল্প-বাণিজ্য সবকিছুকে ভেঙে তছনছ করার জন্য কি প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণ ও নির্মমতা 'মিত্রপক্ষ' দেখিয়েছিলেন তা কি তিনি জানতেন না? কিন্তু ইতিহাসের ছাত্ররা এসব কথা জানেন।

আর স্তালিনের কাছে যদি 'ফ্যাসিবাদ' কোন দেশের রাজনৈতিক দল ও 'জনগণের রুচি ও সুবিধার ব্যাপারই' মাত্র হয় ( matter of taste and convenience ) তাহলে চেকোশ্লোভাকিয়ার, যুগোশ্লোভিয়ার 'উদারপন্থী' 'সমাজতান্ত্রিক' গণতন্ত্র—পশ্চিম জার্মানী, দক্ষিণ কোরিয়া বা তিব্বতের ধর্মগুরু দলাইলামা—তাঁর অনুরাগী খাম্পা বৌদ্ধলামাদের আকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ওইসব দেশের জনগণের—স্ব-স্ব 'অভিরুচি' ও 'সুবিধার

'বস্তু' বলেই বা কেন বিবেচিত হবে না? সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার 'বড় কর্তা' হিসাবে রাশিয়া অথবা চীন বিশেষ ধরনের 'রুচি'-কে জোরপূর্বক সমাজতন্ত্রের নামেই বা কেন চাপাবার চেষ্টা করছে? ফ্যাসিবাদকে শুধুমাত্র 'রুচি ও সুবিধার বিষয়' বলে তার সঙ্গে দোস্তী করা যদি যায় তাহলে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গেই বা সহনশীলতা ও শান্তিপূর্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ সহবস্থানের নীতি অনুসরণের পথে তাত্ত্বিক বা নৈতিক বাধা কি থাকতে পারে? ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজম-এর মধ্যে সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করে চলা যদি সম্ভব হয়, উগ্রপন্থী কমিউনিজম-এর সঙ্গে উদারপন্থী কমিউনিজম-এর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সৌহার্দ্য কেন সম্ভব ও আবশ্যিক হবে না? আর সেটা সম্ভব হবে কিনা সেটা কি নির্ভর করবে রাশিয়া ও চীনের মার্কসবাদী নেতাদের খেয়াল-খুশির ওপর? না তাত্ত্বিক মতবাদের বিচারের ওপর?—না সেইসব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পরিস্থিতি ও স্বকীয় জাতীয় ঐতিহ্য ভাবধারা, জাতীয় স্বার্থের স্ব-স্ব মূল্যায়নের ওপর?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে জার্মানী-ইতালী-জাপানকে নিয়ে যে অক্ষশক্তি চক্র (Rome-Berlin-Tokyo Axis) রচিত হয়েছিল তার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ বলেছিলেন:

"...The Treaty, of course, does not pursue any aggressive aims against America. Its exclusive purpose is rather to bring the elements pressing for America's entry into the war to their senses by conclusively demonstrating to them that if they enter the present struggle they will automatically have to deal with the three great powers as adversaries." [Nazi-Soviet Relations—1939-1941. Documents from the Archieves of the the German Foreign Office; Raymon J Sontag and James S Beddie, Editors; P. 195.] অর্থাৎ, আমেরিকার বিরুদ্ধে কোন আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য এই অক্ষশক্তির নেই আদৌ। তবে যারা এই যুদ্ধে আমেরিকাকে অংশগ্রহণ করার জন্য চাপ দিচ্ছে তাদের পরিষ্কার বুঝে নিতে হবে যে, সে-ক্ষেত্রে সেইসব রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেককেই যুদ্ধে যোগ দেওয়া মাত্রই অনিবার্যভাবে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবে জার্মানী-ইতালী-জাপান এই তিনটি রাষ্ট্রের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে—এই কথাটা বোঝানই এই চুক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য।

জার্মানী রাশিয়াকেও এই চুক্তির আওতায় আনতে চেয়েছিল। পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের অভিমুখে অভিযান সুরু করার আগে রাশিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া-সমঝোতার দরকার হবে বুঝেছিলেন হিটলার। জাপানও প্রতিশ্রুতি চেয়েছিল রাশিয়ার কাছে প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপ-মার্কিন যুদ্ধে রাশিয়া যেন ১৯০৪ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধের (Russo-Japanese War, 1904) অপমানের বদলা না নিয়ে বসে জাপানকে আক্রমণ করে।

জাপানের কাছ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা অমূলক ছিল কিনা সেই প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় ও আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরেই স্তালিন যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাক।

স্তালিনের সেই বেতার-ভাষণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ১৯০৪ সালে জাপানের হাতে জার সম্রাটের সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর পরাজয়ের গ্লানি ও অপমানের প্রতিশোধ ৪০ বছর পরে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া নিয়েছে। যেন এই প্রতিশোধ নেবার অপেক্ষায় রুশজাতি দিন গুনছিল। তিনি বলেন, ১৯০৪-৫ সালের রুশ-জাপ যুদ্ধে জাপান পোর্ট আর্থার বন্দরে রুশ-নৌবহরকে আক্রমণ করেছিল—আর তার ৩৭ বছর পর ঠিক একইভাবে পার্ল হারবার বন্দরে জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। যুদ্ধের এই সব ঐতিহাসিক ঘটনা তখনকার মত 'শ্রেণী-ব্যাখ্যার' ওপর আদৌ নির্ভরশীল ছিল না। 'মার্কসবাদী' 'আন্তর্জাতিক' বিপ্লববাদী স্তালিন জার-সম্রাটের পরাজয়কে সমাজতান্ত্রিক দেশের পরাজয় বলেই একাত্মতা অনুভব করেছিলেন। রাজায় রাজায় যুদ্ধে রক্ত ঝরানোর ইতিহাসের এই 'বুর্জোয়া' ব্যাখ্যাকেই (Kings-and-battles-interpretation of history) স্তালিন তাঁর দেশের জাতীয় স্বার্থে গ্রহণ ও ব্যবহার করলেন! স্তালিন প্রসঙ্গত বলেছিলেন:

"Russia was defeated in that war. As a result Japan grabbed Southern Sakhalin and firmly established herself in the Kuriles, thus padlocking our exits to the Pacific······ This defeat of the Russian troops in 1904 left a bitter memory in the minds of our people. Our people waited and believed that this blot would someday be erased. We, people of the older generation, waited for this day for forty years. Now this day has come." (Stalin)

স্তালিন ১৯০৪ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের বদলা হিসাবে ১৯৪৫ সালের জাপানের পরাজয়কে দেখেছিলেন ( 'Forty years have we —the people of the old generation—waited for this day'— Stalin )। কিন্তু ইতিহাস তো সে সাক্ষ্য বহন করে না। কেননা রাশিয়ার প্রবীণেরা, কি বলশেভিক, মেনশেভিক, উদারপন্থীরা ১৯০৪ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয়ে উল্লসিতই হয়েছিলেন। লেনিন নিজেই এই ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "The European bourgeoisie has its reason to be frightened. The Proletariat has its reason to rejoice." অর্থাৎ 'ইউরোপের বুর্জোয়া-শ্রেণী এই ঘটনায় ভীত সন্ত্রস্ত বোধ করবেন যেমন, সর্বহারা-শ্রেণী তেমনি এতে উল্লসিত হবেন।' তিনি আরও বলেছিলেন: "The disaster that befell our worst enemy means not only that Russian freedom has come nearer. It foreshadows a new revolutionary upsurge of the European proletariat."

সেদিন কিন্তু স্তালিনও অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

অথচ স্তালিন সে-সব কথা বিস্মৃত হলেন। সাম্রাজ্যবাদী জারতন্ত্রী রাশিয়ার পরাজয়ের গ্লানিকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের গ্লানি বলে বোঝাতে চাইলেন। এ সম্বন্ধে আইজ্যাক ডয়েট্শার তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে [ Stalin ] লিখেছেন:

"His new view of history, his newly found sorrow for Russian's past humiliation, nevertheless fitted in well with that traditionalist spirit in which he was framing his policy. He now appeared on the Pacific coast, as he had previously done on the Baltic, as the Collector of old Russian possessions, the inheritor of the Czarist patrimony. In such terms he presented his aspirations to Roosevelt and Churchill disclaiming any revolutionary ambition in Asia. Not only was he to put up with the United States virtually exclusive control over Japan. At Potsdam he went so far as to disavow the Chinese Communists opposed Chiang Kai-Shek and to say that the Kuomintang was the only political force capable of ruling China." [ Stalin ;—By Deutscher—P. 515. ]

"স্তালিন সনাতনপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তাঁর পররাষ্ট্রনীতি রচনা করছিলেন। এ ব্যাপারে বুর্জোয়া-রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে স্তালিনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কিছু ছিল না। বাল্টিক সমুদ্রোপকূলবর্তী দেশগুলি সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে সে সময় তিনি যে মনোভাব নিয়েছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া আক্রান্ত হবার পর প্রশান্তমহাসাগর উপকূলবর্তী দেশ ও অঞ্চল সম্বন্ধে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিলেন—সাম্রাজ্যবাদী জারতন্ত্রী রাশিয়ার উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রনায়করূপে। তেহরান, ইয়াল্টা, পট্স্ডাম শীর্ষ বৈঠকে স্তালিন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের কাছে এশিয়ায় বিপ্লব ছড়াবার কোনই অভিলাষ যে তাঁর নেই সেটা তুলে ধরেছিলেন পরিষ্কারভাবে। পট্স্ডাম শীর্ষ সম্মেলনে স্তালিন রুজভেল্ট-চার্চিলের কাছে একথা ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেননি যে, চীনের কমিউনিস্ট দল নয়—দক্ষিণপন্থী চিয়াং কাইশেক পরিচালিত কুয়োমিন্টাঙ্ দলই চীনের শাসনভার নেওয়ার যোগ্য অধিকারী (the only political force capable of ruling China)। স্তালিন কখনও বা বিপ্লবী স্লোগানের, আবার কখনও বা সনাতনপন্থী বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্রয় নিয়েছেন—রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পাল্লা ভারী কিসে হয় সেই মূল্যায়নের বিচারেই। স্তালিনের অনুগামী ও বিরোধীরা সমভাবেই বিব্রত বোধ করেছেন তাঁর এই অদ্ভুত নীতিদ্বারা।" (ডয়েট্শার ;—স্তালিন)

স্তালিন একজন সাচ্চা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তানায়ক। তিনি কি করে বললেন: "আমরা পুরাতন যুগের প্রবীণ বলশেভিকরা গত ৪০ বছর ধরে ১৯০৪ সালের ('সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের' কিন্তু!) পরাজয়ের অপমানের প্রতিশোধ নেবার অপেক্ষায় ছিলাম। এতকাল পরে সেই প্রতিহিংসা নেবার পুণ্য লগ্ন উপস্থিত।" এই উক্তির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে একজন পাকা সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি-চালিত উগ্র জাতীয়তাবাদী ন্যাশন্যাল্ শভিনিস্টের মনোভাব।

জাপানের আত্মসমর্পণ তো কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার ছিল মাত্র। জাপ আত্মসমর্পণের গোপন প্রস্তাব সাটোর মাধ্যমে মলোটভের কাছে গিয়েছিল ২রা আগস্ট (১৯৪৫)। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও হিরোসিমা-নাগাসাকি শহরে আণবিক বোমা বর্ষিত হল, লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারী শিশু নিশ্চিহ্ন হল। তারা কি যুদ্ধের জন্য দায়ী ছিল? দু'টি আণবিক বোমায় এত বিপুল ধ্বংস নেমে এল। মার্কসবাদী, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদী (!) স্তালিন ও তাঁর মতো বিপ্লবীযুগের প্রবীণ মার্কসবাদীরা এই নির্বিচার গণহত্যার জন্য অপেক্ষা করে ছিলেন? এই হত্যা-তাণ্ডবে তাঁর ও তাঁর দেশের 'শ্রেণী-সচেতন' জনগণের

বৈপ্লবিক আত্মার পরিতৃপ্তি হয়েছিল কি? লেনিন যখন ব্রেস্ট-লিটভ্স্ক্ চুক্তিতে সামিল হয়ে সন্ধির কথা বলেছিলেন তখন তিনি বিশ্বাস করেছিলেন বিপ্লবের শিখা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়বে—জার্মান সৈন্যরাও যুদ্ধের রণাঙ্গনের পরিখায় বসেই বিপ্লবের জয়গান গাইবে। তিনি 'brotherhood' সৌভ্রাতৃত্বের (bratanîye) কথা বলেছিলেন—কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল প্রত্যেক দেশের সৈন্যরা যুদ্ধের জাতীয় সীমারেখা অতিক্রম করবে—পরস্পরকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করবে। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক চেতনার বাষ্পমাত্রও কি স্তালিনের এই বক্তৃতায় পাওয়া যাবে? তাঁর 'সমাজতন্ত্রে' দীক্ষিত লালফৌজ প্রতিহিংসাপরায়ণতার আদর্শে কি আস্থাবান?

জাপানের ওপর আণবিক বোমা বর্ষণের নিন্দা কমিউনিস্টরা করেননি—ভারতের কমিউনিস্টরা তো নিশ্চয়ই নয়। ভিয়েৎনামে বীভৎস মার্কিন নাপাম বোমা বর্ষণের নিন্দা করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু জাপানে আণবিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করা চলবে না;—কেননা ওতে যে সুবিধা হয়েছে রাশিয়ার, চীনের! ভিয়েৎনামে মার্কিন বোমা বর্ষণের কুৎসিত বীভৎসতার ন্যায়সঙ্গত নিন্দায় আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়, কিন্তু বিয়েফ্রার ৮০ লক্ষ আফ্রিকান ইবো সম্প্রদায়ের 'মুক্তি-সংগ্রামে' ৩০ লক্ষের ওপর নরনারী শিশুকে ত্রিশ মাসের গৃহযুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের সর্বপ্রকার সাহায্যে নিশ্চিহ্ন করে তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হল—কিন্তু হয়নি কোন প্রতিবাদ এই অমানুষিক-বর্বরতার বিরুদ্ধে—পৃথিবীর মার্কসবাদী বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মহল থেকে। ভারতের বামপন্থীরা, বুদ্ধিজীবীরা নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে—কি ভারতে—কি ইউরোপে বিয়েফ্রার লক্ষ লক্ষ নরনারীর ক্রন্দন কোনই সাড়া জাগায়নি। ভিয়েৎনামের মাই-লাই গ্রামের আদিম হিংস্রতার বিরুদ্ধে এত ধিক্কার ধ্বনিত হচ্ছে, কিন্তু বিয়েফ্রায় ও বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে অনুষ্ঠিত নারকীয় বর্বরতার তুলনা আধুনিককালের ইতিহাসে মিলবে না। রাজনৈতিক ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থের চাপে সব প্রতিবাদের কণ্ঠই আজ স্তব্ধ। প্রতিবাদ হতো, যদি 'সমাজতান্ত্রিক' রাশিয়া বা চীন বিয়েফ্রার পক্ষে থাকত আর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন থাকত নাইজিরিয়ার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষে। 'প্রগতিশীল' মিশর সরকার মস্কোয় শিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ বৈমানিকদের ভাড়া দিয়েছিলেন নাইজিরিয়া সরকারকে 'সমাজতান্ত্রিক' 'বৈপ্লবিক' পদ্ধতিতে যুদ্ধরত বিদ্রোহী ইবো সম্প্রদায়ক 'জনগণতন্ত্রের' মুক্তিদাত্রী বোমা নিক্ষেপ করে নিশ্চিহ্ন করার কাজে। মস্কো-আলেকজান্দ্রিয়া-লণ্ডন-কলকাতা-বোম্বাই-নিউইয়র্কে নাইজিরিয়ার

রাজধানীতে হয়ত পথে পথে শোভাযাত্রা হয়েছে—স্লোগান : 'দুনিয়ার মেহনতী মানুষ এক হও!' তখন ভিয়েৎনাম ও বিয়েফ্রার যুদ্ধে নরমেধ যজ্ঞপর্ব পুরোদমে চলছিল। সেই একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে 'বাংলাদেশের' মুক্তিযুদ্ধে। মুজিবর রহমান-পন্থী লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নিরস্ত্র মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে চলেছিল মার্কিন-রুশ-ব্রিটিশ ও চীনের অস্ত্রশস্ত্রপুষ্ট পাকিস্তান জঙ্গীশাহী। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে সেদিন। কই, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিবেক তো জাগ্রত হল না? অনেক দেশের ব্যাপক গণহত্যার কাহিনী বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে পাক সামরিক শাসন ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক অনুষ্ঠিত গণহত্যার ভয়াবহতা ও ব্যাপকতার কাছে ম্লান হয়ে গেছে। গণতন্ত্রের মুখোসধারী কপট ভণ্ড প্রেসিডেন্ট নিক্সন-প্রশাসন নির্লজ্জভাবে সকল প্রতিবাদ, মানবতার দাবী উপেক্ষা করে প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে ঢালাও অস্ত্র সাহায্য পাঠিয়েছে। বিশ্ব-বিপ্লববাদী সাচ্চা (!) লেনিনবাদী কমিউনিস্ট চীন সর্বপ্রকার সাহায্য পাঠিয়েছে জঙ্গীশাহী হত্যাকারী পাক-সেনাবাহিনীকে। একটা 'সমাজতান্ত্রিক'-রাষ্ট্র ক্ষমাহীন শঠতার পরিচয় দিয়েছে গণহত্যার অপরাধে অপরাধী একটি জঙ্গীশাহীকে—ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। বঙ্গবন্ধু মানবতাবাদী জাতীয়তাবাদী মুজিবর রহমান নাকি সি. আই. এ.-র চর! তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু মুজিবের অনুগামী মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মূল করার জন্যই কমিউনিস্ট চীনের দোস্ত পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীকে অঢেল মারণাস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দিয়ে চলেছে। আমেরিকা ও সম্প্রসারণবাদী চীনের অদ্ভুত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান! গণতন্ত্রের সাচ্চা (!) রক্ষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন-প্রশাসনের ও কমিউনিস্ট চীনের আচরণ বুঝতে গেলে একটি ক্যাথলিক পত্রিকার মন্তব্য উল্লেখ্য। ক্যাথলিক দৈনিক 'রিলিজিয়ান' (ভেনিজুয়েলা-র) সম্প্রতি একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিল :

"Jesus would have trembled in horror at the nightmare and hell let loose by Pakistan on the people of Bangladesh... It would be insulting to human intelligence to call the repression as an internal affair. The problem was of international dimensions and a challenge to human conscience. Before this grim tragedy, this gruesome Dante-like spectacle, other tragedies like Hungary, Biafra, Congo, Vietnam become insignificant. To find a parallel one has to look towards

the extermination camps of Hitler or perhaps towards the days of Chengiz Khan or Tamerlane. Its best sons, its intellectuals, writers, journalists, professors, the youth are being hunted like rats ;—this repression, massacre, the reign of terror must cease. The nightmare, this hell must come to an immediate end.……" [ July 3, 1952—Catholic Daily—Religion of Caracas. Venezuela. ]……

চীনে আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলনেতা ও শাসকগোষ্ঠীর মতে 'বাংলাদেশের' ব্যাপক গণহত্যা নাকি সে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ! ভিয়েৎনাম কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়—তাই সেখানে আমেরিকার হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন ! অদ্ভুৎ আচরণ রাষ্ট্রসংঘের সনদ ( U. N Charter ) ও মানবিক অধিকার সংক্রান্ত সনদ ( Declaration of Human Rights ) আজ প্রতি পদে পদদলিত শক্তিমান রাষ্ট্রের মত্ত সৈন্যবাহিনীর ভারী বুটের তলায়।

যেকথা হচ্ছিল। জাপানের আত্মসমর্পণের জন্য আণবিক বোমা বর্ষণের তো কোনই প্রয়োজন ছিল না—যেমন ছিল না শেষ মুহূর্তে রাশিয়ার পক্ষে এশিয়ার যুদ্ধমঞ্চে অবতীর্ণ হবার। স্তালিন বলেছিলেন যে, ১৯০৪-৫ সালে জাপানের হাতে রুশ-পরাজয়ের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে জাপ-আত্মসমর্পণে, সেটা নেহাৎই ফাঁকা দম্ভোক্তি ! তিনি ভুলেই গেলেন জাপানের সঙ্গে অনাক্রমণ-চুক্তির জন্য তিনিই জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাৎসুওকাকে রাশিয়ায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। জাপানই 'ভদ্রলোকের চুক্তি' অনুযায়ী রাশিয়াকে প্রচণ্ড জার্মান আক্রমণের মুখে কোনরূপ বিব্রত করেনি। ইতিহাসের মোড় ঘুরে যেত যদি সেদিনের সাম্রাজ্যবাদী জাপান পেছন থেকে রাশিয়াকে আক্রমণ করে বসত। ইতিহাসে বিজেতারাই জয়মাল্য পরে এসেছে যুগে যুগে। ইতিহাস বিজেতাদের মনমতই লেখা হয়ে থাকে। আর স্তালিন নিজেই বলেছিলেন এক সময় :

'Paper will put up with anything written on it.'

মনে রাখতে হবে এই জাপানের ভীতি এক সময় ( দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ) আমেরিকা ও রাশিয়াকে কাছাকাছি করেছিল। আবার সেই জাপানের ভীতি কমিউনিস্ট চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কাছে টেনেছে। চীন ভারতকে হুমকী দেখাতে পারে ; কিন্তু জাপানকে ভয় করে সে। তাই মার্কিন বন্ধুত্ব প্রয়োজন। তেমনি আমেরিকার চীনকে প্রয়োজন জাপানকে ঠেকিয়ে রাখার

জন্য। জাপানের অবিশ্বাস্য বৈষয়িক উন্নতি, জাতীয় শৃঙ্খলাবোধ, জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ, অধ্যবসায় ও সমগ্র জাতির শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা চীন, আমেরিকা, রাশিয়ার ঈর্ষার কারণ। জাপান ইচ্ছে করলে অনেক সহজেই একটি পূর্ণাঙ্গ আণবিক যুদ্ধ-ভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারে। [ভারতবর্ষও পারে। তবে দেশের স্বার্থান্ধ-ভ্রান্ত রাজনীতিবিদ্‌রাই তার প্রতিবন্ধক।] শক্তির কাছে সবাই মাথা নোয়ায়। জাপানের বৈষয়িক ও শিল্পোন্নয়ন মার্কিন পুঁজিপতিদের দারুণ ঈর্ষার কারণ আজ। চীনের বাজার (market) আমেরিকার শিল্পপতিদের বহু দিনের স্বপ্ন। চীন জাপানের কাছে 'ছোট' হবে কেন? সে খোদ আমেরিকার কাছ থেকে উন্নত টেকনলজী শিক্ষা করবে মার্কিন সাহায্যে নিজের আরও বৈষয়িক উন্নয়ন ঘটাবে। তাই চীন-মার্কিন আঁতাত হবেই।

আগে বলেছি জাপানও রাশিয়ার কাছে প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছিল যে, ১৯০৪ সালের প্রতিশোধের অছিলায় রাশিয়া যেন এশিয়া রণাঙ্গনে আক্রমণ করে তাকে বিব্রত না করে। এদিকে ১৩ই অক্টোবর (১৯৪০) রিবেনট্রপ আবার স্তালিনকে এক চিঠিতে লিখলেন:

"...The historical mission of the Four Powers—the Soviet Union, Italy, Japan and Germany is to adopt a long range policy and to direct the future development of their peoples into the right channels by delimitation of their interests on a world-wide scale." [Nazi-Soviet Relations, 1939-41, P. 213.] সোভিয়েট রাশিয়া, ইতালী, জাপান ও জার্মানী এই চতুঃশক্তির ঐতিহাসিক লক্ষ্য হল এমন একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করা—যাতে করে এই চারটি দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সুপরিকল্পিতভাবে সুনিশ্চিত করা যায়—আর তার ভিত্তিই হবে সারা বিশ্বে তাদের স্ব-স্ব স্বার্থের যথোচিত বণ্টনের দ্বারা।

এই প্রস্তাব নিয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য মলোটভকে বার্লিন শহরে প্রেরণের প্রস্তাবও তিনি করেন। মলোটভ যথারীতি এসেও ছিলেন। ইয়াল্টা সম্মেলনের মত এও একটা দুনিয়া ভাগ-বাঁটোয়ারার গোপন বৈঠক ছিল। ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে ২৬শে হিটলারের কাছে মলোটভ যে নোট পাঠান সেটা সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দলিল। যদিও দর নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে উঠল না তবু

সাচ্চা মার্কসবাদী মহাবিপ্লবী স্তালিনের মনোভাবই তাতে ব্যক্ত হয়েছিল। এ সম্পর্কে খ্যাতিমান লেখক ও কূটনীতিবিদ্ জর্জ কেনান বলেছেন :

"It is one of the most interesting developments in the history of Soviet foreign policy showing clearly that Stalin still thought that he was in a position to exact a high price for lining with the Axis in a Four Power Pact and that all this palaver was only a form of preliminary bargaining." [ Russia And The West Under Lenin And Stalin ; P. 344. ]

তবু স্তালিন বলেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাকি সুরু থেকেই ছিল ফ্যাসী-বিরোধী ও গণমুক্তির সংগ্রাম ( anti-fascist war—a war of liberation )! অক্ষশক্তি জোটের ( Axis Powers ) শরিক হবার কি প্রচণ্ড লোভই না স্তালিনের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল! ফ্যাসিস্ট শক্তিজোটের স্থায়ী চতুর্থ অংশীদার হবার শর্ত স্বরূপ তিনি মলোটভ মারফৎ যে চড়া দর হেঁকেছিলেন চতুর হিটলার তাতে সরাসরি রাজী হতে পারেননি। হিটলার রাজী হলে ইতিহাসের মোড় ঘুরে যেত। এই প্রস্তাবিত চতুঃশক্তি চুক্তিতে ( Four Power Pact ) সেদিন রাশিয়ার সামিল না হবার পেছনে ডায়লেক্‌টিকের কোন অমোঘ নিয়ম কাজ করেনি। আকস্মিকতা ( Chance element ) ইতিহাসে কত অঘটন ঘটিয়ে দেয়, কত অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে তার একটা প্রমাণ এতে মিলবে। ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণবাদী ব্যাখ্যার অসারতার প্রমাণও মিলবে।

## ১৮

## ফিনল্যাণ্ড পরিস্থিতিঃ আগ্রাসন রাজনীতির বলি ফিনল্যাণ্ড

"লেনিনবাদের সমস্যাবলী," "লেনিনবাদের ভিত্তি" (Problems of Leninism & Foundations of Leninism)-এর লেখক, লেনিনের মন্ত্রশিষ্য স্তালিন যে শুধু পোল্যাণ্ডকেই হিটলারের সঙ্গে গোপন লেন-দেনের রাজনীতির ভিত্তিতে যোগসাজসে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীর' ভূমিকায় তাই নয়—আন্তর্জাতিক রাজনীতির সেই সঙ্কট মুহূর্তে ফিনল্যাণ্ডকেও তিনি গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিলেন একটি পাকা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রেরই মত। বিশ্ব রাজনীতির ছাত্রদের সেই আচরণ কতটা "সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ" ও বিশ্ব-বিপ্লবের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তা বিচার করে দেখা দরকার। বিচার করে দেখা দরকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিরই বা ভূমিকা কি ছিল সে সময়।

আজকের এশিয়ায় 'যৌথ নিরাপত্তা'-চিন্তা-কাতর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রুশ-নেতৃত্বের এই 'গভীর উদ্বেগ' ও 'দুশ্চিন্তার' প্রকৃত মূল্যায়ন এশিয়ার গণতন্ত্রী ও প্রগতিপন্থীদের করা একান্ত প্রয়োজন স্তালিনবাদীদের অতীত আচরণের পটভূমিকায়। লিথুয়ানিয়া, ল্যাট্ভিয়া, এস্তোনিয়াকে নিয়ে কোন বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়নি, কেননা সে দেশগুলো শুধু খুব ছোটই ছিল না, ছিল খুবই দুর্বলও। কিন্তু ফিনল্যাণ্ড নিরপেক্ষ (Neutral) দেশ হলেও তার ছিল শক্তিশালী সেনাবাহিনী।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর নতুন রুশ সরকার সে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিশ্বে নতুন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। স্তালিনকেই পাঠান হয়েছিল ১৯১৭ সালে হেলসিঙ্কিতে সে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য। আবার সেই স্তালিনই সে দেশে গিয়ে তলে-তলে সে দেশের তৎকালীন প্রচলিত সরকারকে উৎখাত করার জন্য চক্রান্ত করলেন, যদিও স্বাধীনতাকামী ফিনরা সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছিল। স্তালিনের প্রশ্রয়-পুষ্ট সেই কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়েছিল, রুশ সেনা-

বাহিনীকে বিপুল খেসারত দিতে হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে ফিনল্যাণ্ডের প্রতিনিধি কুৎসী প্যাসীকিভিকে (Kutsi Passikivi) স্তালিন—ভয় হুমকী তোয়াজ—শেষে নানা প্রলোভন দেখিয়ে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত করার জন্য চাপ দিলেন। প্যাসীকিভি কোন চাপের কাছেই মাথা নত করতে রাজী হননি। এই রাষ্ট্রনীতিবিদের সেদিনের দেশপ্রেম ও দুর্জয় সাহস স্বাধীনতাকামী সকল দেশের মানুষেরই অসীম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। প্যাসীকিভি সুস্পষ্টভাবেই জানান যে, তাঁর দেশের দীর্ঘ দিনের নিরপেক্ষতা তিনি কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন না এই ধরনের চুক্তি সম্পাদন করে। স্তালিন-মলোটভ সেদিন ফিনল্যাণ্ডের নেতাদের ওপর দাবী জানালেন যে, লেনিনগ্রাডকে রক্ষা করার জন্য ও রুশ-সীমান্ত নিরাপত্তার জন্যে ফিনল্যাণ্ডের কয়েকটি অঞ্চলে, যথা, Gulf of Finland-এর কয়েকটি দ্বীপ, হ্যাংকোয় নৌ-ঘাঁটি রুশ সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে দিতে হবে—ফিনল্যাণ্ড থেকে যে সব অঞ্চল রুশ-নেতৃত্ব দাবী করে বসলেন—তার 'বিনিময়ে' নিজের এলাকার কিছু কিছু অঞ্চল, যেমন ক্যারেলিয়ার পূর্ব অঞ্চল ফিনল্যাণ্ডকে 'দান' করা হবে এ প্রস্তাবও রাশিয়ার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীন 'নিরপেক্ষ' ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রতি সেদিনের স্তালিন-বাদীদের নিষ্ঠা দেখে ফিন নেতারা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন—কিন্তু নতি স্বীকার না করে জানিয়ে দিলেন Hanko ও Gulf of Finland ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের কোন দ্বীপকেই রুশ সরকারের কাছে 'ইজারা' তাঁরা কিছুতেই দেবেন না। কেননা তাতে শুধু তাঁদের দেশ নয়, সুইডেনের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে। ভারতের যশলোভী তোষণবাদী দুর্বল নেতারা স্বাধীন তিব্বতকে তার সুদীর্ঘ ইতিহাস কৃষ্টি ধর্ম ঐতিহ্য সবকিছু উপেক্ষা করে 'আন্তর্জাতিক সর্বহারা' শিবিরের সার্টিফিকেট পাবার লোভে এবং তাদের লেখা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 'প্রগতিশীল' বলে চিহ্নিত হয়ে থাকার লোভে—'স্বাধীন' তিব্বতকে 'চীনের একটি অঞ্চল' (a region of China) বলে সেই নিরপরাধ দেশকে ও তার জনগণকে লালচীন কর্তৃক গ্রাস করার ঘৃণ্য চক্রান্তের নীরব দর্শক ছিলেন। এমন কি তিব্বতের স্বাধীনতা লুণ্ঠিত হলে ভারতের স্বাধীনতাও যে বিঘ্নিত হতে পারে এসব চিন্তাও এদেশের ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের ছিল না।

ছোট্ট ফিনল্যাণ্ড দুর্ধর্ষ সোভিয়েট শক্তি ও স্তালিন-মলোটভের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করেছিল তার দেশাত্মবোধ চেতনার বলে বলীয়ান হয়েই। প্যাসীকিভি দুই দেশের নেতা ও কূটনীতিবিদ্‌দের ঐতিহাসিক আলোচনার

সময় নির্ভীকভাবে স্তালিনকে তাঁরই একটি স্মরণীয় উক্তি তাঁর দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন। স্তালিন বলতেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে :

"We do not want a crumb of foreign territory but neither do we want to cede an inch of our territory to any one."

"আমরা কোন পররাজ্যের যেমন এক টুকরো জমিও চাই না, তেমনি নিজের দেশের এক ইঞ্চি ভূখণ্ডও কোন দেশকে ছেড়ে দেব না।" কিন্তু প্যাসীকিভি বোঝেননি, যখন নীতি ঘোষণা করেছিলেন তখন স্তালিন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে তা করেছিলেন—এখন তো তিনি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নন—এখন দরকার তাঁর পররাজ্য দখল। নিজের দেশের তথাকথিত নিরাপত্তার জন্য এখন তিনি হিটলারের পরম বিশ্বস্ত দোস্ত। ফিনল্যাণ্ডের সর্বহারাদের (প্রলিটারিয়েট) স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিরাপত্তার বিনিময় (exchange) করতে হবে অপ্রমত্ত রুশ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। স্তালিনের আরও একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। স্তালিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন ফিন-প্রতিনিধিদের :

"You ask why do we want Koivisto? I will tell you why. I asked Ribbentrop why Germany went to war with Poland. He replied, 'We had to move the Polish border farther from Berlin.' Before the war the distance from Posen to Berlin was about 200 Kilometres. Now the border has been moved to 300 Kilometres farther east. We ask that the distance from Leningrad to the border should be 70 Kilometres. This is our minimum demand and you must not think that we are prepared to reduce piece by piece. We can't move Leningrad so the border has to move. Regarding Koivisto you must bear in mind that if sixteen-inch guns were placed there they could entirely prevent the movement of our fleet in the inner most extremity of the Gulf. We ask for 2,700 Square Kilometres and offer more than 5,500 in exchange. Would any Great power do that? No. We are the only ones that simple." (Stalin)

ফিনল্যাণ্ডের কৈভিষ্টোতে রুশ ঘাঁটি করতে কেন চেয়েছিলেন তার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে সর্বহারাগতপ্রাণ বিশ্ব-বিপ্লবকাতর স্তালিন পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে

সামরিক অভিযানের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯৩৯ সালে রিবেনট্রপ তাঁকে কি বলেছিলেন সেইটাই স্তালিনবাদী কায়দায় শুনিয়ে দিলেন। স্বাধীন পোল্যাণ্ডের সীমানা জার্মানীর রাজধানী বার্লিন শহরের খুব কাছাকাছি ছিল। এটা নাৎসী নেতাদের ভাল মনে হয়নি—২০০ কিলোমিটারের ব্যবধান বাড়িয়ে ৩০০ কিলোমিটার করা হল। এ হিটলারের মতন যুক্তিই বটে। কিন্তু তিনি বিশ্বের পরিত্রাতার কপট ভূমিকা নেননি—তিনি নির্ভেজাল সাম্রাজ্যলিপ্সু ছিলেন—নর্ডিক জাতির বিশ্ব প্রভুত্ব ছিল তাঁর স্বপ্ন। কিন্তু স্তালিন? তিনি মার্কসবাদী লেনিনবাদী! তিনিও ফিন প্রতিনিধিদের জানালেন—হিটলারী কায়দায়—যে লেনিনগ্রাড থেকে ফিনল্যাণ্ডের সীমানার মধ্যে অন্তত ৭০ কিলোমিটারের ব্যবধান থাকা চাই—নচেৎ রুশ-নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে। তাই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ফিনল্যাণ্ডের কিছু অংশে রুশ সামরিক ঘাঁটি বসাতে দিলেই। ব্রেজনভ-কোসিগিন কি বলবেন পিকিং নেতৃত্বকে যে, চীনের সীমানা ব্লাডিভস্টক বন্দরের খুব কাছাকাছি রাখা চলবে না? অতএব সিংকিয়াং-এ চীনাদের ঘাঁটি হটাতে হবে এবং সেখানে রুশ আণবিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ দিতে হবে? না, চীন সেরকম একটা পাল্টা মাওবাদী যুক্তি নিক্ষেপ করবেন মস্কোর নেতৃত্বের মুখের ওপর? এ দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্ববিপ্লববাদীর—না নিছক লুণ্ঠনকারী পররাজ্যলোভীর?

স্তালিন বললেন: "আমরা ফিনল্যাণ্ডের কাছে চাইছি ২,৭০০ কিলোমিটার জমি, আর বিনিময়ে আমরা ফিনল্যাণ্ডকে দিতে চাইছি ৫,৪০০ কিলোমিটার জমি। পৃথিবীর কোন বৃহৎ শক্তি আমাদের মত এত বদান্যতা দেখাবে কখনও? কখনই না। আমাদের মত এত সরল সাদাসিধে ভালোমানুষ লোক দুনিয়ায় নেই।"

লেনিনগ্রাডের চাকা বা পা বা পাখা কোনটাই নেই যে, সে সরে এসে ফিনল্যাণ্ড ও রাশিয়ার সীমানার ব্যবধান সঙ্কুচিত করতে পারে! কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের সীমান্তের পা-পাখা-চাকা বোধ করি সবই ছিল—তাই স্তালিনের অভিলাষ পূরণের জন্য সীমানা চলমান হয়ে ভিতরে ঢুকে এসে দুই দেশের দুই সীমান্তের অভ্যন্তরস্থ ব্যবধান সঙ্কুচিত করতে পারত!

ফিনল্যাণ্ডের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হল। ৩০শে নভেম্বর প্রত্যূষে স্থল, জল ও বিমানপথে ফিনল্যাণ্ডের ওপর সোভিয়েট 'মুক্তি' ফৌজ ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্যাসিস্ত ইতালী খুব রুষ্ট হলেন রাশিয়ার এই কাজে এবং হিটলারকে দিয়ে চাপ দেবার চেষ্টাও হল। কিন্তু হিটলার তখন স্তালিনের বড় বিশ্বস্ত

দোস্ত। তাছাড়া জার্মান যুদ্ধে সরবরাহ আসছিল রাশিয়া থেকে। তাই তিনি স্তালিনকে চাপ দেবার কথা ভাবতেই পারেন না। ফিনল্যাণ্ড কোন দেশের কাছ থেকেই কোন সাহায্য পেল না এই প্রবল যুদ্ধে। অমিত বিক্রমে তাদের জনগণ ও সেনাবাহিনী লড়াই করে গেল। পরিশেষে সন্ধি করতে বাধ্য হল। স্তালিন-মলোটভ ষোলআনা প্রাপ্য বুঝে নিতে ছাড়েননি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীদের বিগতদিনের ইতিহাসকে বুঝতে হবে নিজ নিজ দেশের নীতি নির্ধারণের সময়। এই যুদ্ধ থেকে সমাজতন্ত্রীদের, দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের অনেক কিছু শিক্ষার আছে।

ফিনল্যাণ্ডের মত একটি ছোট্ট নিরপেক্ষ দেশেও সেদিন ২,৪৬,০০০ সৈন্য যুদ্ধ করেছিল দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য অমিত বিক্রমে। তারা দেখিয়ে দিয়েছিল প্রতাপান্বিত পররাজ্যের বন্ধুত্বের জন্যও নিজের দেশের এক কিলোমিটার জমি পরিত্যাগ করা যায় না। ফিনল্যাণ্ড পরাজিত হয়েছিল সত্যি কথা, কিন্তু রাশিয়ার প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতিও হয়েছিল। রাশিয়ার খুব বেশি একটা লাভ হয়নি। রুশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে যায় এবং স্তালিন এই যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিয়ে লালফৌজকে পুনর্গঠিত করেছিলেন। ভিয়েৎনামের লড়াই একদিন বন্ধ হবেই—সেদেশের স্বাধীন মানুষের বিদেশী হস্তক্ষেপ ও মাতব্বরী-নিরপেক্ষ নিজের দেশ পুনর্গঠনের ও সরকার নির্ণয়ের শাশ্বত মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকে কেউ রুখতে পারবে না। মার্কিন-ভাড়াটে সৈন্যদের দেশে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে ফিরে যেতেই হবে। কিন্তু কে জানে এই কুৎসিত বীভৎস ভিয়েৎনাম যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে, পৈশাচিকতা ও ধ্বংসের বিনিময়ে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন নিজ নিজ সামরিক শিক্ষার সূত্র আবিষ্কার করে নিল কিনা,—নূতন নূতন মারণাস্ত্রের কার্যকারিতা ও যুদ্ধকৌশল বা রণনীতি যাচাই করে নিল কিনা তাদের নিজ নিজ প্রভাবাধীন এলাকার সীমানা সংরক্ষণ, পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের জন্য! ক্ষমতামত্ত বিশ্বের দুই শক্তিদানবের কাছে এশিয়া-আফ্রিকার কোটি কোটি শোষিত-বঞ্চিত নরনারী 'একস্‌পেন্‌ডেবল্ হিউম্যান মেটিরিয়াল' মাত্র—'সভ্য' পশ্চিমের ধুরন্ধরদের, কূটনীতিকদের—পরীক্ষা-নিরীক্ষার মানুষ আকৃতিধারী গিনিপিগ—আমাদের বিনিময়ে ওরা বিশ্বপ্রভুত্বের সূত্র আবিষ্কার করবে!

১৯৩৯ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৪ই নভেম্বরের মধ্যে ইউরোপীয় রাজনীতিতে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে গেল যার ফলে নরওয়ে-সুইডেন-ফিনল্যাণ্ড এই তিনটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে উঠল।

এই ঘটনাগুলি হল : (১) হল্যাণ্ডের প্রতি জার্মান আক্রমণের হুমকী, (২) ইংলণ্ডের সঙ্গে তুরস্কের চুক্তি সম্পাদন, (৩) ফিনল্যাণ্ডের ভূখণ্ডের ওপর রাশিয়ার দাবী, (৪) বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি থেকে বাল্টিক জার্মানদের দলে দলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। জার্মানবাসীরা বাল্টিক রাজ্য লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া থেকে চলে আসার সাথে সাথেই রুশ লালফৌজ ঐসব দেশে প্রবেশ করে। অবশ্য জার্মানরা চলে আসায় স্থানীয় অধিবাসীরা খুশিই হয়েছিল। কেননা জারদের আমলে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ও অধিক সুবিধাভোগী অবস্থাপন্ন জার্মানরা—এই বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগের বিনিময়ে স্থানীয় বাল্টিক জাতিগুলির ওপর জারতন্ত্রের উৎপীড়ন-অত্যাচার সমর্থন করে আসছিল। কিন্তু রাশিয়ার দিক থেকে জার্মানবাসীদের ব্যাপক স্বদেশে প্রত্যাগমনে খুশি হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। নিরঙ্কুশ রুশ আধিপত্যের পথ সুগম হল এর ফলে। এর পরই রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডের দিকে লোলুপ দৃষ্টি ফেলল।

রাশিয়া আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানালো ফিন সরকারের প্রতিনিধিদের। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন,—প্যাসীকিভি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম. এরক্কো (M. Erkko), রাষ্ট্রপতি Kallioo, অর্থমন্ত্রী M. Tarnner। আলোচনাকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম. এরক্কো ঘোষণা করলেন নিজের দেশের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রকর্তৃক স্বাধীন নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোন দাবীই সে দেশ মেনে নিয়ে স্বদেশের আত্মমর্যাদাকে বিকিয়ে দেবে না (২৭শে অক্টোবর ১৯৩৯)। এর পরই ঘোষিত হল সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভের বিবৃতি। তিনি বললেন :

"It is untrue that the Soviet Government is demanding the Aaland and other islands from Finland. What Russia wants is a mutual assistance pact alone on the lines of those negotiated with other Baltic States The Soviet Government has asked Finland to move back some kilometres from the frontier in the Leningrad area and take part of Karelia in exchange. Soviet government also sought to rent some islands and create naval bases in the northern part of the Gulf of Finland···If the Fins continue in their failure to meet Soviet requirements it will be harmful to the cause of peace and to the Fins themselves."

রাশিয়া চাইছে, অতএব ফিনল্যাণ্ডকে তার আন্তর্জাতিক সীমানাকে সরিয়ে আনতে হবে। একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ আর একটি স্বাধীন দেশের অঞ্চল সামরিক ঘাঁটি করার জন্য ইজারা চাইবে, আর তা মেনে না নিলেই আসবে যুদ্ধের হুমকী! হলও তাই।

মলোটভ সরাসরি হুমকী দিলেন—রাশিয়ার দাবী মেনে না নিলে ফল ভাল হবে না—শান্তি বিঘ্নিত হবে। নূতন রেষারেষি সুরু হল—একদিকে রাশিয়ার প্রেস্টিজ, অপরদিকে ফিনল্যাণ্ডের জনমতের চাপ। ফিনল্যাণ্ড তার দীর্ঘকালের 'নিরপেক্ষতা' রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যে-কোন মূল্যে রাশিয়াও তার আগ্রাসী নীতিতে অবিচল। রাশিয়ার পত্রিকা ট্রুড-এ [ Trud ] ফিনল্যাণ্ডের দেশভক্ত নেতাদের তীব্র সমালোচনা করে লেখা হল :

"This little State ( Finland ) of 36,50,000 people wants to triumph over the Soviet Union with its 18,30,00,000 people. It is absurd. British and French imperialism stands behind the Fins".

সামরিক দিক থেকে রাশিয়ার দাবী মেনে নিলে অনিবার্যভাবেই ফিনল্যাণ্ডকে তার বহু-কথিত 'ম্যানারহায়েম লাইন' ( Mannerheim Line ) প্রতিরক্ষা-ব্যূহ পরিত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকত না।

ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের যে-দ্বীপগুলি রাশিয়া দাবী করেছিল সেটা মেনে নিলে হেলসিঙ্কি, ভিপুরি ও মিক্কেলী ( Strategic triangle ) এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নগরীর ( garrison towns ) নিরাপত্তা বিপন্ন হত। এই শহরগুলিতে ফিনল্যাণ্ডের সামরিক ঘাঁটিও ছিল। হ্যাঙ্কোতে সোভিয়েট সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের দাবী স্বীকার করে নিলে সুইডেন থেকে ফিনল্যাণ্ডে জরুরীকালীন যে-কোন সরবরাহ ব্যবস্থা চিরতরে বন্ধ হয়ে যেত। আর সেই সরবরাহ বন্ধ হলে যে-কোন আক্রমণকারী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালান অসম্ভব হয়ে পড়ত। আর্কটিক্ অঞ্চলের Rybachi Peninsulá ( রীব্যাচী উপদ্বীপ ) সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকূলে পরিত্যাগ করলে ফিনল্যাণ্ডের একমাত্র বরফ-মুক্ত ( Ice-free ) বন্দর হাতছাড়া হয়ে যেত। শুধু তাই নয়, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও ধাতব সম্পদ থেকে ( যথা, নিকেল ) দেশ বঞ্চিত হত এবং ফিনল্যাণ্ডের সমগ্র বহির্বাণিজ্য নির্ভর করত রুশ দাক্ষিণ্যের উপর।

রাশিয়ার এই দাবীর প্রতিক্রিয়া নরওয়ে, ডেনমার্ক, আইসল্যাণ্ডের ওপর কিরূপ হয়েছিল রাজনৈতিক মানচিত্রের দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়।

Aaland দ্বীপপুঞ্জে রাশিয়ার ঘাঁটি স্থাপিত হলে সুইডেনের মূল ভূখণ্ড ও স্টকহল্‌ম্‌-এর নিরাপত্তা বিপন্ন হত। উত্তর মহাসাগর ও আর্কটিক্‌ অঞ্চলের নরওয়ের Ice-free বন্দরগুলির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হত। ২০শে অক্টোবর স্টকহল্‌ম্‌ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ফিনল্যাণ্ড আক্রান্ত হলে ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াবে।

মার্কসবাদী রাশিয়া ৪,০০,০০০ সৈন্যপুষ্ট লালফৌজ নিয়ে নিরপেক্ষ শান্তিপ্রিয় ছোট্ট ফিনল্যাণ্ড রাষ্ট্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—কয়েকটি সীমান্তের ঘটনার অজুহাতে। সাম্রাজ্যবাদীরা আক্রমণের অজুহাত হিসাবে এই ধরনের ছোট-খাট ঘটনা আবিষ্কার করেই থাকে। সমাজতন্ত্রী রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা ( without any declaration of war ) না করেই ৩০শে নভেম্বরের নির্মল এক প্রত্যূষে নিরীহ ফিনল্যাণ্ডবাসীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বহারাদের আন্তর্জাতিকতার পতাকা উড্ডীন করল—নাৎসীবাহিনীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের কায়দার অনুকরণে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে।

ফিনল্যাণ্ডের সেনাবাহিনী বিনা বাধায় টেরিজোকি ( Terijoki ) ও কয়েকটি ছোট গ্রাম পরিকল্পনা অনুযায়ীই পরিত্যাগ করে চলে এল। দুই লক্ষ সৈন্যপুষ্ট দক্ষ সেনাবাহিনী অমিত বিক্রমে প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করে শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন করেছিল। ডিসেম্বরের যুদ্ধে রুশ-বাহিনী পর্যুদস্ত হয়েছিল। কোনরূপ বহিঃশক্তির সাহায্য না পেয়ে একাই আত্মধর্মী প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছে ফিনল্যাণ্ড। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধে রুশ স্থলবাহিনী চার লক্ষ সৈন্য আক্রমণ ব্যূহ রচনা করেছিল। প্রতিদিন ৫০০ থেকে ৮০০ রুশ বিমান আকাশপথে যুদ্ধ চালিয়েছে, বেপরোয়াভাবে বোমা বর্ষণ করেছে; রেডক্রস, হাসপাতাল, বেসামরিক জনপদ কিছুই রেহাই পায়নি।

সমগ্র যুদ্ধে রাশিয়া ২,৫০০ বিমান নিয়োগ করেছিল, সংখ্যায় ফিনল্যাণ্ডের বিমানবাহিনীর সাত গুণ বেশি। রাশিয়ার ৮৫,০০০ সৈন্য যুদ্ধে নিহত হয়, ১৫,৭০,০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সাঁজোয়া গাড়ি, ১,০০,০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের জঙ্গীবিমান ধ্বংস হয়। 'লালফৌজ অজেয়' ( Invincibility ) এই ধারণার মূলে কুঠারঘাত করেছিল ফিনল্যাণ্ডের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী—পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী ছোট দেশগুলির স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দুর্জয় প্রেরণা জুগিয়েছে।

সামগ্রিক বিপর্যয় ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত ফিনল্যাণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ১৩ই মার্চ ( ১৯৪০ )।

'মিত্রপক্ষ' ফিনল্যাণ্ডের সাহায্যার্থে সেনাবাহিনী পাঠাবার প্রস্তাবও করেছিল। কিন্তু সুইডেন, নরওয়ে তাদের ভৌগোলিক সীমানার মধ্য দিয়ে সৈন্য চলাচলের কোনরূপ সুযোগ দিতে রাজী হল না। নরওয়ে ও সুইডেনের কাছে সাহায্যের আবেদন-নিবেদন সবই নিষ্ফল হল। কোন দিক থেকে কোন সাহায্যই এসে পৌঁছল না। শেষ পর্যন্ত একটা শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হল—তার মূল সর্ত ছিল :

"Cession by Finland of the whole of Karelian Isthmus, including Viipuri and the whole shore of Lake Lagoda.

Soviet to lease the port and territory of Hanko for 30 years at a rent of £ 25,000 to establish a naval base there.

Cession of Fishermen's peninsula in far North.

Finns to retain Pestamo ( i.e only ice-free port on the Arctic Ocean ) but to demilitarise the district.

Finland not to maintain in the North Atlantic warships, submarines or war planes, except small coast defensive ships."

ফিনল্যাণ্ডকে সমগ্র ক্যারেলিয়ান উপদ্বীপ, ভিপুরী এবং সমগ্র ল্যাগোডা হ্রদ ও তার উপকূলবর্তী জমি রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে হল। হ্যাঙ্কো বন্দর তথা নৌঘাঁটি ও সংলগ্ন হ্যাঙ্কোর ভূখণ্ডটিকে রাশিয়ার কাছে ৩০ বছরের জন্য ইজারা দিতে হল ২৫,০০০ পাউণ্ড খাজনার বিনিময়ে। দূর উত্তরাঞ্চলের ফিশারমেন্‌স্ উপদ্বীপ রাশিয়াকে উপঢৌকন দিতে হল। আর্কটিক্ মহাসাগরের বন্দর পেস্টামো ফিনল্যাণ্ডের দখলে থাকল বটে, তবে সমগ্র অঞ্চলটির নিরস্ত্রীকরণের সর্ত ফিনল্যাণ্ডকে মেনে নিতে হল। উত্তর অতলান্তিক মহাসাগরে ফিনল্যাণ্ড সরকার কোন রণপোত, ডুবোজাহাজ রাখতে পারবে না। শুধুমাত্র আত্মরক্ষাত্মক ছোট ছোট জাহাজ রাখতে পারবে মাত্র। কোন বিমানঘাঁটিও রাখা চলবে না।

এইভাবে দুর্বিনীত বিজয়ীর আক্রমণাত্মক আগ্রাসী সর্তগুলি বিজিতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল সেই সনাতনী সাম্রাজ্যবাদীদের কায়দাতেই। রাশিয়ার জিদই বজায় রইল শেষ পর্যন্ত। যুদ্ধের আগে ফিনল্যাণ্ডের প্রতিনিধিদের কাছে যে-দাবী স্তালিন-মলোটভ রেখেছিলেন—যুদ্ধের পর তার অনেক বেশিই তাঁরা ফিনল্যাণ্ডের কাছ থেকে গ্রাস করেছিলেন।

এই শান্তিচুক্তিতে সই করেছিলেন রাশিয়ার পক্ষে মলোটভ ও ঝান্‌ভ আর ফিনল্যাণ্ডের পক্ষে ডঃ রাইতি, ডঃ প্যাসীকিভি, সেনাপতি ওয়ালডেন প্রভৃতি।

এই চুক্তির বলে সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে 'সমাজতান্ত্রিক' রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডকে পর্যুদস্ত করে দিল। একটি চুক্তি সম্বন্ধে মন্তব্যে বলা হয়েছিল :

"Finland lost large timber resources and saw-mills, the whole lower part of the Vuoksi industrial system, Viipuri and numerous magnificent cellulose and other industrial undertakings. More serious still were the loss of natural defensive positions and the need for resettlement of 4,00,000 people received from Russian occupied territories. Flags in Helsinki were flown at halfmast when the peace terms were made known. Women cried; while men sat in stony silence." [ The Second Great War : Vol. II, Hanmerton, P. 758. ]

বিরাট কাষ্ঠসম্পদ, বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চল, অগণিত উন্নত-মানের কলকারখানা, স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিনিময়ে এই শান্তি ক্রয় করতে হয়েছিল। এর ওপর ৪,০০,০০০ ফিনল্যাণ্ডবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থার দারুণ সমস্যার গুরুভার সে দেশের ওপর ন্যস্ত হল। রুশ-অধিকৃত অঞ্চলগুলি থেকে এই উদ্বাস্তদের সরিয়ে আনতে হয়েছিল। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছিল জাতীয় শোকের নিদর্শন স্বরূপ। মেয়েরা কেঁদেছিলেন—পুরুষেরা নির্বাক স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের পরাহত পৌরুষের ব্যর্থতার দুঃসহ গ্লানি; জানিয়েছিলেন মৌন ধিক্কার। ফিন সেনাবাহিনীর জনপ্রিয় সর্বাধিনায়ক ফিল্ড্ মার্শাল ম্যানারহেম্ শেষ দিনের বার্তায় ঘোষণা করলেন :

"Soldiers of the glorious Finnish Army peace has been concluded between our country and the Soviet Union······ an exacting peace which has ceded to Soviet Russia nearly every battle-field on which you have shed your blood on behalf of everything we hold dear and sacred. You did not want war. You loved peace but were forced to a struggle in which you have done great deeds which shine for centuries in the pages of history······"

পররাজ্যের উপর বিনা প্ররোচনায় হামলা করে তার স্বাধীনতা হরণ করেই শান্তিবাদী মার্কসবাদী রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ব্যবস্থা করে নিল। ফিনল্যাণ্ডের উপর এই রুশ-আক্রমণ ও জোরপূর্বক সেই স্বাধীন

রাষ্ট্রের অঞ্চলগুলিকে রুশ অন্তর্ভুক্ত করার সম্প্রসারণবাদী রাজনীতি লিট্‌ভিনভ্-এর বহু-প্রশংসিত সহাবস্থান নীতির ক্যারিকেচার-এর নামান্তর মাত্র। ভার্সাই চুক্তির বলদর্পী বিজয়ী শক্তির অপমানজনক সর্তগুলিও একদিন বিজিত জার্মানীর উপর বেয়নেটের জোরেই জোরপূর্বক চাপিয়া দেওয়া হয়েছিল সেই দেশকে চিরতরে খর্ব করে রাখার জন্য। ইতিহাস এমনটি ঘটেছে বহুবার।

ফিনল্যাণ্ডের পরাজয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল—(১) নিরপেক্ষতাবাদী ( Neutral ) শান্তিপ্রিয় একটি রাষ্ট্র তার স্বাধীনতা ভৌগোলিক আঞ্চলিক অখণ্ডতা, তার নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি রক্ষার জন্য তার জনগণের দেশপ্রেম শৌর্য-বীর্য, সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ ও দক্ষতাই যথেষ্ট নয়। আক্রান্ত হলে দুর্যোগের দিনে বন্ধুরাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। (২) বৈরী, ভিন্ন আদর্শ-ধর্মী শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিবেশী রাষ্ট্র কর্তৃক নিরপেক্ষতার নামে তোষণ নীতি ( Appeasement policy ) অনুসরণ করে চললে পরিণাম ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য। শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার বিনিময়েই কিন্তু তাঁবেদার রাষ্ট্রের আশ্রয়ী, রাষ্ট্রের আত্মগ্লানি নিয়েই থাকতে হয়। (৩) প্রতিবেশী পরাক্রান্ত শক্তিশালী ভিন্ন-মতাবলম্বী 'বন্ধুত্বকামী' রাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি—ফর্মুলা প্রকারান্তরে একটি চতুর রাজনৈতিক ফাঁদরূপে দেখা দিতে পারে। ফিনল্যাণ্ড ছোট দেশ হলেও তার দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব সেকথা বুঝেই যৌথ-নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সাহায্য প্রস্তাবে রাজী হয়নি। (৪) নিজের দেশের সামান্যতম জমিও অন্যদেশকে যৌথপ্রতিরক্ষার নামেও ইজারা দেওয়া যায় না। এই ধরনের প্রস্তাব স্বাধীনতার ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের উপর প্রচণ্ড আঘাতেরই সমতুল্য। ( ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পরলোকগত পণ্ডিত নেহরু হিমালয়ের সংলগ্ন ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের কয়েকটি অংশে চীনের দাবী সম্পর্কে শোনা যায় মন্তব্য করেছিলেন: ওসব অঞ্চলে একটি ঘাসও জন্মায় না। তাই বলে কি অন্য দেশ তা দখল করে নিলেও দেশের কিছু আসে যায় না? বিশাল এই দেশের এই নেতার মনোভাবের সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের নেতাদের তথা কূটনীতিবিদ্‌দের আচরণের গুণগত মৌলিক ভেদ বিশেষভাবে স্মরণ করা দরকার। )

ফিনল্যাণ্ড আক্রমণের মধ্য দিয়েই একটি 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী আচরণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অপর রাষ্ট্রে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা পররাজ্যের ব্যাপারে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ না করার বহু প্রচারিত মৌল নীতি নিষ্ঠুরভাবে দলিত হয়েছে। ৩রা ডিসেম্বর

(১৯৩৯) বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘের (League Of Nations) সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে ফিনল্যাণ্ডের স্থায়ী প্রতিনিধি এক জরুরী চিঠিতে জানালেন :

"The Union Of Soviet Socialist Republic with which Finland since the signature of the Treaty of Peace at Tartu in 1920 has maintained neighbourly relations and signed a Pact of non-aggression which should have expired only in 1945, unexpectedly attacked on the morning of November, 1939…"

১৯৪৫ সাল পর্যন্ত অনাক্রমণ চুক্তির মেয়াদ বলবৎ থাকা সত্ত্বেও ১৯২০ সালের শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর নিরবচ্ছিন্নভাবে বন্ধু প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা সত্ত্বেও রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করেছে। সেক্রেটারী জেনারেল ৪ঠা ডিসেম্বর রুশ সরকারকে টেলিগ্রাম পাঠালেন। তাতে রাষ্ট্রসংঘ সনদের ১১ ও ১৫ ধারা মতে রাশিয়ার এই অভিযোগের জবাবে কি বলার আছে জানতে চাইলেন : "The parties will communicate to me, as promptly as possible a statement of their case with all the relevant facts and papers".

এর জবাবে মলোটভ জানালেন :

"The U. S. S R. is not at war with Finland and does not threaten the Finnish nation with war. Consequently reference to Art. 11, paragraph 1 is unjustified. Soviet Union maintains peaceful relations with the Democratic Republic of Finland whose government signed with the U. S.S. R. on December 2nd Pact of Assistance and Friendship. This pact settled all the questions which the Soviet government had fruitlessly discussed with the delegates of former Finnish government now divested of its power.

By its declaration of December 1st the government of the Democratic Republic of Finland requested the Soviet government to lend assistance to that republic by armed forces with a view to the joint liquidation at the earliest possible moment of the very dangerous seat of war created in Finland by its former rulers. ….."

যখন জল স্থল ও আকাশপথে বেপরোয়া আক্রমণাত্মক যুদ্ধ রাশিয়া চালিয়ে যাচ্ছে ফিনল্যাণ্ডের ওপর, তখন চিঠির উত্তরে বলা হচ্ছে : রাশিয়া শান্তিতে সহাবস্থান করছে গণতান্ত্রিক ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে নূতন এক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য চুক্তির ভিত্তিতে! ১লা ডিসেম্বর সেই নূতন সরকার ফিনল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে রুশ সেনাবাহিনী পাঠিয়ে সে-দেশকে সাহায্য করার আবেদন জানিয়েছে—প্রাক্তন সরকার যে বিপজ্জনক যুদ্ধ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল তার মোকাবিলার জন্যই সেনাবাহিনী পাঠান হয়েছে।

যে নূতন সরকারের কথা বলা হল সেটা ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট নেতা অটো কুসেনিন পরিচালিত একটি পাল্টা রুশ তাঁবেদার সরকার মাত্র। ঘরশত্রু বিভীষণদের দেশদ্রোহী সরকার ( Finnish Peoples' Government of Terijoki ) রুশ-ফিন যুদ্ধের প্রথমেই পরিত্যক্ত টেরিজোকির ( সমুদ্রকূলবর্তী একটি নগর ) এই তাঁবেদার সরকার রুশ সরকার স্থাপন করে এবং সেই তাঁবেদার সরকারের সঙ্গেই এই তথাকথিত নূতন সৈন্য প্রেরণের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল।

১৯৩৯ সালের জুলাই মাসের ১লা ও ২রা তারিখে ফিনল্যাণ্ডে যে সাধারণ নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে যে সরকার গঠিত হয়েছিল—তার প্রতিনিধিরাই সোভিয়েট রাশিয়ার দাবী স্বীকার করে নেননি। কি করে মলোটভ সেই নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে উপেক্ষা করে লালফৌজের রাইফেল বেয়নেটের জোরে বসিয়ে দেওয়া অটো কুসেনিনের ( Otto Kuusinnen ) তাঁবেদার সরকারকে ( puppet government ) সে দেশের জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার বলে মেনে নিতে পারলেন? এই যুক্তিতে তো কমিউনিস্ট চীন বহির্মঙ্গোলিয়াতে চীনা মুক্তিফৌজ ( PLA ) পাঠিয়ে দিয়ে একটি তাঁবেদার সরকার গঠন করে সে দেশকে পারস্পরিক মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে? রাশিয়াও অনুরূপভাবে চীনের সিংকিয়াং-কে দখল করার চেষ্টা করতে পারে? সে ধরনের প্রচেষ্টা যেমন আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়, ফিনল্যাণ্ডে সৈন্য প্রেরণের ব্যাপারটাকেই বা কি করে সমর্থন করা যাবে?

অবশ্য এখানে একটি সনাতনী লেনিনবাদী যুক্তি মার্কসবাদী-লেলিনবাদীরা প্রয়োগ করতে পারেন এই প্রকার নগ্ন পাশবিক আক্রমণাত্মক আচরণের সাফাইরূপে। সেটা হল : যুদ্ধের প্রকৃতি নির্ভর করবে কোন্ শ্রেণী-রাষ্ট্র কর্তৃক কোন্ শ্রেণী-রাষ্ট্র 'আক্রান্ত' হচ্ছে? 'আক্রমণকারী' ও 'আক্রান্ত' রাষ্ট্রের তথাকথিত 'শ্রেণী-চরিত্র' নির্ণয়নই মূল বিচারের মাপকাঠি। যেহেতু ফিনল্যাণ্ড একটি

'বুর্জোয়া' রাষ্ট্র—এবং আক্রমণকারী রাষ্ট্র সর্বহারাদের 'শ্রেণী-রাষ্ট্র' রাশিয়া, সেইহেতু—এ আক্রমণ আক্রমণ নয়—এ হল মুক্তি দান করার মহৎ প্রয়াস ( War of Liberation )!

টেরিজোকি-তে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত ফিন-জনগণের সরকারের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতার চুক্তি সম্পর্কিত রুশ সরকারী ঘোষণা যে কি প্রচণ্ড মিথ্যা সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল, যখন ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে রাশিয়া সন্ধি-চুক্তি ( Peace Treaty ) সম্পাদন করল প্যাসীকিভি, ট্যানার এরকোর পরাজিত সরকারের সঙ্গে। অতএব গণতান্ত্রিক সরকারের আমন্ত্রণে রুশ লালফৌজ ফিনল্যাণ্ডে প্রবেশ করেছে সে দেশকে রক্ষা করার জন্য, সম্মিলিত জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে লেখা মলোটভের এই জবাব যে কত অসত্য তা প্রমাণিত হয়ে গেল এই শান্তিচুক্তির মধ্য দিয়ে। সমাজতান্ত্রিক দেশও পররাজ্য গ্রাস করার জন্য সনাতনী সাম্রাজ্যবাদী যুক্তি আবিষ্কার করে থাকে।

১৯৬৮ সালের ২১শে আগস্ট যখন রাশিয়া ওয়ারশ জোটভুক্ত দেশগুলির 'সহযোগিতায়' ৬ লক্ষ সৈন্য নিয়ে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করল, তখনও কিন্তু রাশিয়ার পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছিল স্তম্ভিত হতবাক স্বাধীনতাকামী চেকবাসীদের কাছে যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও জাতীয় সরকারের নেতাদের আহ্বান ও আমন্ত্রণেই নাকি সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করেছিল! অথচ আজ পর্যন্ত রাশিয়া এই বক্তব্যের সমর্থনে কোন প্রমাণই উপস্থিত করতে পারেনি। কোন্ কোন্ চেক নেতারা রুশ সেনাবাহিনীকে চেকোশ্লোভাকিয়ায় বন্যার স্রোতের মত প্রবেশ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত সে সব নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। অটো কুসেনিনের মত ব্যক্তিদের সাম্রাজ্যবাদীরা যুগে যুগেই সুযোগ অনুসন্ধান করে ফিরেছে। রাশিয়া পাশব শক্তির বলে—রাইফেলের নলই যখন ক্ষমতার উৎস—চেকোশ্লোভাকিয়ার সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পরীক্ষাকে ভূলুণ্ঠিত করে সে দেশের স্বাধীনতার উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে সত্যি—কিন্তু সে-দেশের জনমনকে শৃঙ্খলিত করতে পারেনি। [ The Czech Black Book—Edited by Robert Littell Praegar. ]

১৯৩৯ সালের ৩০শে নভেম্বর ফিনল্যাণ্ড আক্রমণের আগের দিন সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ ঘোষণা করলেন "Soviet Union regarded Finland. no matter what its regime was, as an independent and foreign state." ( Molotov, Nov. 29, 1939. )

সোভিয়েট রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্বের বিরোধী। সেদেশে কি ধরনের সরকার চালু আছে, কারা শাসনক্ষমতার অধিকারী এইসব তর্কের ওপর সেই মৌলিক প্রশ্ন আদৌ নির্ভরশীল নয়। কিন্তু এই ঘোষণা যে কত কপটতাপূর্ণ তা পরিস্ফুট হয়ে উঠল ঠিক এই উক্তির তিন দিন পর, যখন রাশিয়া অটো কুসেনিনের নেতৃত্বে টেরিজোকিতে একটি বিকল্প তাঁবেদার সরকার স্থাপন করলেন। সেই সরকারের পররাষ্ট্র ও প্রধানমন্ত্রী হলেন একাধারে কুসেনিন। তিনি অনেকদিন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ( Comintern ) সভ্য ছিলেন। রাশিয়া এই দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারীদের সরকারকে ফিনল্যাণ্ডের জনগণের সরকার বলে প্রচার করতে সুরু করে দিল। এই দুই সরকারের মধ্যে ৩রা ডিসেম্বর ( ১৯৩৯ ) যে তথাকথিত চুক্তি সম্পাদিত হল ( Mutual Assistance and Friendship Pact ) তাতে রাশিয়ার পক্ষে সই করেছিলেন কানভ, ভরোশিলভ্ ও স্তালিন।

টেরিজোকির সোভিয়েট তাঁবেদার সরকার গঠনের ব্যাপারটা সত্যিই যে কত হাস্যকর সেটা বুঝতে বিশ্ববাসীর বিশেষ বিলম্ব হয়নি। যে সরকারকে 'ফিনল্যাণ্ডের জনগণের সরকার' বলে প্রচার করা হল সেটা যে আদৌ ফিনল্যাণ্ডেরও নয়—জনগণের সরকারও নয়—সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল যখন রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধ শেষে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হল। এই শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হল রাশিয়া ও ১৯৩৯ সালের জুলাই নির্বাচনে গঠিত ফিন সরকারের মধ্যে—রাশিয়ার কাছে যে সরকার পরাজিত হল শেষ পর্যন্ত সেই সরকারের সঙ্গেই সন্ধি স্থাপিত হল।

লেন-দেন ও ভাগ-বাঁটোয়ারার রাজনীতিতে ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে সম্পাদিত রুশ জার্মান চুক্তি ( Stalin-Hitler Pact ) দুই দেশকেই কতটা সাহায্য করেছিল তার প্রমাণ রুশ-ফিন যুদ্ধেও ( Soviet-Finnish war ) মিলেছিল। এই দুই দেশের মধ্যে রক্তক্ষয়ী প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ চলাকালে রাশিয়া ও জার্মানীর পারস্পরিক সম্পর্ক বেশ সন্তোষজনকই ছিল। এই সময় রাশিয়ার সংবাদপত্রগুলিতে পশ্চিমী বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে ( নাৎসী জার্মানী নয় ) তীব্র সমালোচনা ও কড়া মন্তব্য করা হচ্ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্চনার জন্য এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে বন্ধু হিতৈষী রাষ্ট্র জার্মানীকে উস্‌কিয়ে দেবার তথাকথিত রাজনীতির বিরুদ্ধে।

১৯৪০ সালের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে প্রাভ্দা পত্রিকায় সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশগুলির নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন করার ইঙ্গ-ফরাসী ষড়যন্ত্রের কথাও বলা

হয়েছিল। ঐ বছরের ৩০শে জানুয়ারি হিটলার এক বক্তৃতায় রুশ-জার্মান মৈত্রীচুক্তির তারিফ করে বলেছিলেন যে, এই চুক্তির ফলে জার্মানী তার পশ্চাৎদেশ সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন ( free rear )। কেননা, পূর্ব অঞ্চলে রাশিয়ার কাছ থেকে আক্রান্ত হবার কোন ভয় ছিল না। প্রাভ্‌দা এই বক্তৃতাও খুব ফলাও করে ছাপিয়েছিল সম্ভবতঃ হিটলার-রিবেনট্রপকে দেখাবার জন্য যে, কত আন্তরিকতার সঙ্গে এই মৈত্রীচুক্তি পালন করা হচ্ছে।

১৯৪০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে জার্মানী-রাশিয়ার মধ্যে এক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনের চুক্তি সম্পাদিত হল ( Soviet-German Economic Agreement ), যখন রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে। এই চুক্তি সম্বন্ধে প্রাভ্‌দা পত্রিকায় লেখা হল ঃ

"Present day Germany is a highly developed industrial power requiring many raw materials ; and that the Soviet Union can largely supply. We are also a great industrial power..... Our trade with Britain and France has dwindled and the increase in our trade with Germany is only to be welcomed. The new economic agreement has been welcomed by Völkischer Beobachter and other German papers."

"আধুনিক জার্মানী খুবই শিল্পোন্নত রাষ্ট্র—তার প্রয়োজন প্রভূত কাঁচা-মালের। আর সেইসব কাঁচামাল রাশিয়া সরবরাহ করতে সক্ষম। আমাদের দেশ রাশিয়াও একটি বৃহৎ শিল্পোন্নত শক্তি।...বিট্রেন ও ফরাসী দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য এখন পড়তির দিকে, তাই জার্মানীর সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের উন্নতি অভিনন্দনযোগ্য। তাছাড়া জার্মানীতেও এই নতুন অর্থনৈতিক চুক্তি অভিনন্দিত হয়েছে।"

'প্রতিক্রিয়াশীল' 'প্রতিবিপ্লবী' ফ্যাসিস্ট জার্মান রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী পররাজ্য লুণ্ঠনকারী আগ্রাসী রাজনীতিকে সক্রিয় রাখতে 'সমাজতান্ত্রিক' মার্কসবাদী রাষ্ট্রকে কাঁচামাল সরবরাহ করতে হবে। দুই রাষ্ট্রই পরস্পরকে 'great power' ( বৃহৎ শক্তি ) বলে সুড়সুড়ি দিয়ে নিজেদের মতলব হাসিল করে এসেছে ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে। ফ্যাসীবাদ-স্তালিনবাদ যেন গৌর-নিতাই ভাই ভাই !

মার্চ মাসে ( ১৯৪০ ) রুশ-ফিনিশ যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ এক বক্তৃতায় বললেন ঃ

সোভিয়েট রাশিয়া ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট মৈত্রী আলোচনা ভেঙে যাওয়ায় কোন দুঃখ নেই। রাশিয়া ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির জার্মান-বিদ্বেষী যুদ্ধে রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ হাসিলের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জড়িয়ে দেবার বিরোধিতা করে এসেছে তার বিশ্লেষণ করেন।

"Soviet Union had been determined not to become a tool in the hands of the Anglo-French imperialists in their anti German struggle for world hegemony .....The Anglo-French imperialists wanted to turn the war Finland into a war against the Soviet Union. But they failed in this and the Soviet Union's relation with Germany continued to be good"

'জার্মান-বিরোধী' ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্ব প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠার জন্য চক্রান্তের ক্রীড়নক রাশিয়া হবে না। জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়াকে লড়িয়ে দেবার কুমতলব হাসিল করার চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছে রাশিয়া। জার্মানীর সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ।

ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করে রাশিয়া বিশ্ব-বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছিল, বিশ্ব-সৌভ্রাতৃত্বের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করেছিল—আর হিটলার রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যলিপ্সায় বাধা সৃষ্টি না করে বিশ্ববিপ্লব ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শকে রূপায়িত হতে সাহায্যই করেছিলেন বোধ হয়!

রুশ-ফিন যুদ্ধের সময় রাশিয়ার ভয় ছিল নরওয়ে-সুইডেনের মধ্য দিয়ে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্য পাঠাতে পারে লালফৌজের আক্রমণকে পর্যুদস্ত করার জন্য। জার্মানী মৌন সম্মতি দিলে স্কান্দিনেভীয় দেশগুলির মধ্য দিয়ে সাহায্য গিয়ে পৌঁছুতে পারত এবং সেক্ষেত্রে রুশ-ফিন যুদ্ধের পরিণতি কি হত তা সহজেই অনুমেয়। রুশ-ফিনের যুদ্ধ ছিল দানব ও বামনের লড়াই। তবু স্বাধীনতাকামী ফিনরা যেভাবে বীরের মত লড়াই করে রাশিয়ার দুর্ধর্ষ লালফৌজের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করেছিল—তা স্বয়ং স্তালিন ও রুশ সেনাপতি ঝুকভ বুঝেছিলেন। এর ওপর যদি ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি প্রত্যক্ষ সামরিক সাহায্য পাঠাত এবং জার্মানী নিরপেক্ষতার ভান করে সেই সাহায্য প্রেরণে সমর্থন জানাত তাহলে ইউরোপের রাজনীতিতে একটা মোড় ঘুরে যেতে পারত।

নরওয়ে-সুইডেন ভয় পেয়েছিল যে, ফিনল্যাণ্ডে যদি কোন সামরিক সাহায্য

ও সেনাবাহিনী ( expeditionary force ) তাদের ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে যাবার অনুমতি পায় তাহলে এই দুই দেশ নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করেছে এই অজুহাত দেখিয়ে জার্মানী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর প্রধানত এই ভয়েই নরওয়ে ও সুইডেন তাদের দেশের মধ্য দিয়ে কোনপ্রকার সাহায্য-সরবরাহ পাঠাতে দেয়নি। সেই জন্যেই রাশিয়া বার বার বলে এসেছে রুশ-ফিন যুদ্ধের সময় রুশ-জার্মান সম্পর্ক খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল।

রুশ-ফিন যুদ্ধ সমাপ্তির পর জার্মানীর আক্রমণের পালা সুরু হল। নরওয়ে, ডেনমার্ক ও সুইডেনের সীমান্তে সামরিক কূটনৈতিক তৎপরতা সুরু হল। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগেই জার্মানী ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণ করে দু'টি দেশই দখল করে নিল। অথচ আক্রমণের পূর্বাহ্ণে জার্মানী ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে নরওয়ের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগ আনল। রাশিয়াও সেই অভিযোগ ( Anglo-French of violation Norwegian Sovereignty ) সমর্থন করে বসল। অথচ এদিকে জার্মানী দু'টি দেশই গ্রাস করে নিল। এই যুদ্ধে ( Scandinavian war ) রাশিয়া 'নিরপেক্ষ' ( Neutral ) থাকল পুরোপুরি, যেমন, রুশ-ফিন যুদ্ধে (Russo-Finnish war) জার্মানী নিরপেক্ষ থেকে রাশিয়াকে পররাজ্য গ্রাস করতে সাহায্য করেছিল।

স্তালিন রিবেনট্রপকে বলেছিলেন: "আমরা খুব গাম্ভীর্য ও আন্তরিকতার সঙ্গেই রুশ-জার্মান মৈত্রীচুক্তি ( Hitler-Stalin Pact ) গ্রহণ করেছি।" এই আন্তরিকতার প্রমাণ পোল্যাণ্ড ফিনল্যাণ্ড লিথুয়ানিয়া ল্যাটভিয়া এস্তোনিয়া নরওয়ে ডেনমার্ক বেসারাবিয়া বুকোভিনা এবং ফরাসী দেশের ওপর যখন আক্রমণের তাণ্ডব বয়ে গিয়েছে—তখন পাওয়া গিয়েছে। যেমন ফ্যাসিস্ট আন্তরিকতা, তেমনি মার্কস্‌সিস্ট আন্তরিকতা!

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতির পটভূমিতে শান্তিবাদী দেশের 'নিরপেক্ষতা নীতি'-র ছুঁৎমার্গের 'কি পরিণাম হতে পারে তার অন্যতম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক। নিরপেক্ষ ফিনল্যাণ্ড বা নিরপেক্ষ নরওয়ে ডেনমার্কের চরম সঙ্কটের মুহূর্তে তাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতাকে বাঁচাবার জন্য পৃথিবীর কোন দেশ থেকেই এল না কোন সাহায্য। ফ্যাসিস্ট জার্মানী ও কমিউনিস্ট রাশিয়ার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি বাইশ মাস চালু রইল অনেকগুলি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে।

র‍্যাপ্যলো চুক্তির মত নাৎসী জার্মানী ও কমিউনিস্ট রাশিয়ার মত

দু'টি পরস্পর আদর্শ-বিরোধী রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব চুক্তি সম্পাদিত হল। রুশ কমিউনিস্ট নেতারা এই বন্ধুত্বের যৌক্তিকতা তুলে ধরার জন্য নানাবিধ সুচতুর প্রচার সুরু করেছিলেন। রুশ নেতারা প্রকাশ্যে নাৎসী জার্মানীর সমর্থনে বক্তব্য রাখছিলেন।

মলোটভ এক ঘোষণায় বললেন :

"During the last few months such concepts as 'aggression' and 'aggressor' have acquired a new concrete content, have taken on another meaning……Now it is Germany that is striving for a quick end to the war, for peace, while England, France, who only yesterday were campaigning against aggression, are for the continuation of the war and against concluding a peace. Roles, as you see, change……The ideology of Hitlerism, like any other ideological system, can be accepted or rejected—that is a matter of one's political views. But everyone can see that an ideology can not be destroyed by force …..Thus it is not only senseless It is criminal to wage such a war as a war for 'the destruction of Hitlerism' under the false flag of a struggle for democracy'. [ Moscow, 1939 : Quoted from : Let History Judge, P. 442-43,—By Roy Medvedev ].

মলোটভের এই ভাষণের পর স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত স্তালিনের অতিবিশ্বস্ত সঙ্গী বেরিয়া একটি গোপন নির্দেশ দেন স্বরাষ্ট্রসংস্থা GULAG-কে এই মর্মে যে, রাশিয়ার কয়েদীদের 'ফ্যাসিস্ট' বলে আর অভিহিত করা চলবে না। অবশ্য এই নির্দেশ ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্মানী কর্তৃক রুশ আক্রমণের সাথে সাথে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

ঝানু পররাষ্ট্রনীতিবিদ তথা কূটনীতিবিদ কমিউনিস্ট নেতা মলোটভের মতে (অতএব রুশ কমিউনিস্ট পার্টির মতেও)—রাশিয়া ও নাৎসী জার্মানীর মধ্যে বন্ধুত্ব চুক্তির সাথে সাথেই 'আক্রমণ' ও 'আক্রমণকারী' এই সব শব্দের ও তর্কের অন্তর্নিহিত অর্থেরও রূপান্তর ঘটেছে। মলোটভের মতে এখন জার্মানীই শান্তির জন্য আগ্রহী এবং দ্রুত যুদ্ধ নিরসনের জন্য চেষ্টা করছে। আর এখন ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারই যুদ্ধবাজের ভূমিকায়—তারা শান্তি

চায় না। তাহলেই দেখা যাচ্ছে—মলোটভ ঘোষণা করলেন: ভূমিকার রদ-বদল হচ্ছে ( Roles change )। ফ্যাসিস্ট নেকড়ে বাঘ এখন শান্তিপ্রিয় নিরীহ মেষশাবকমাত্র—রক্তে তার চরম অনীহা: দুধ-কলা-মিষ্টি দিয়ে তৈরী সিন্নীই তার প্রিয় আহার। ভূমিকার তাহলে রদ-বদল ঘটে! কমিণ্টার্ণের বিপ্লবী অগ্নিবর্ষী উদ্গীরণগুলির দিকে মলোটভের এই উক্তি অট্টহাসী হেসে ব্যঙ্গ করছিল সেদিন।

মলোটভ বলেন: ফ্যাসিবাদ ভাল কি মন্দ—গ্রহণযোগ্য কিনা সেটা মতামতের ব্যাপার। তাহলে ফ্যাসি-বিরোধিতার কোনই নৈতিক কারণ বা আদর্শগত বা তত্ত্বগত ভিত্তিই নেই, যার যা অভিরুচি সে তাই হতে পারে—ফ্যাসিস্ট, ক্যাপিটালিস্ট, রেসিস্ট, মিলিটারিস্ট, এ্যাডভেঞ্চারিস্ট। রাশিয়ায় জাতি-রাষ্ট্র-স্বার্থের কষ্টিপাথরেই সব বিচার হবে কিনা! কোন মতবাদ বা আদর্শকে পাশব শক্তি দিয়ে ধ্বংস করা যায় না। [ হাঙ্গেরীতে ১৯৬৬ সালে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় ১৯৬৮ সালের আগস্টে, তিব্বতে ১৯৫১ সালে কি হয়েছিল? বেয়নেট, ট্যাঙ্ক, রাইফেলের মুখেই তো কমিউনিস্ট সম্প্রসারণ সাধন হয়েছিল নগ্ন পদ্ধতিতে ভিয়েৎনামের বিদেশী মার্কিন সৈন্যদের মতই।] ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার হুমকী শুধু অর্থহীন প্রগলভতাই নয়, মলোটভের মতে ঘৃণ্য আসামীর মানসিকতা।

মলোটভের এই ঘোষণা 'তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের' ( কমিণ্টার্ণ ) ৭ম অধিবেশনে (7th Comintern Congress) গৃহীত প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই ঘোষণার অব্যবহিত পরই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের তাদের প্রচার অভিযান ও আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ফ্যাসিবাদ নতুন কৌলিন্য অর্জন করল। এইরূপ হঠাৎ ভোল-পাল্টান নীতির ফলে রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল। অথচ এর আগে এই পার্টির শক্তি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ইউরোপের অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রচণ্ড আঘাত খেল। Roy Medvedev লিখেছেন:

"The logic of the directive required the Communists in those countries ( i.e, Great Britain, France ) to take a defeatist stand or at least to refuse support to the military efforts of their bourgeois governments." [ Defeatism refers to the Leninist programm in World War I: Stand for defeat of one's own country. ] [ See—Let History Judge, P. 443. ]

ফরাসী দেশে কমিউনিস্ট দল সেদিনও ছিল খুব শক্তিশালী। এই অদ্ভুত নীতি গ্রহণের ফলে ১৯৪০ সালে নাৎসী আক্রমণের মুখে ফরাসী দেশে ফ্যাসি-বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার্থে প্রতিরোধ সংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়ল। দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হল, দেশ পরাজিত হল। লেনিনের শ্লোগান অনুযায়ী নাৎসী দস্যুদের হাতে নিজের দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে নিজের দেশের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে বিপ্লবী রাজনীতিরই পরিচয় দিয়েছিল! ফরাসী ঘর-সন্ধানী বিভীষণদের এই আচরণ হিটলারকে উৎসাহ জুগিয়েছিল।

চীন বা কোন বিদেশী রাষ্ট্র ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে ভারতের কমিউনিস্টদের লেনিনবাদীরূপে ধর্ম হবে নিজের দেশের মুক্তিসংগ্রাম স্বাধীনতা তথা প্রতিরোধ আন্দোলনকে ভিতর ও বাইরে থেকে দুর্বল করে ভারতের পরাজয়কে ডেকে আনা: Stand for the defeat of one's own country। ধন্য রাজনীতি, ধন্য দেশপ্রেম।

# ১৭

## বাল্‌টিক রাজ্য ও রাজনীতি

১৯৩৯ সালে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লুণ্ঠন-পর্ব পরিসমাপ্তির পরই রাশিয়া লিথুয়ানিয়া, ল্যাট্‌ভিয়া, এস্তোনিয়া এই তিনটি বাল্‌টিক রাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। রাশিয়া এই তিনটি দেশের নেতাদের আমন্ত্রণ করে রুশ-প্রস্তাবিত পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তিপত্রে ( Treaties of Mutual Assistance ) সই করিয়ে নিল। সর্তগুলি আগেই লেখা হয়েছিল। এই ছোট ছোট দেশগুলির ক্ষমতা বা সাহস দু'য়ের কোনটাই ছিল না তা প্রতিরোধ করার। তার ওপর তখন রাশিয়ার বন্ধু দুর্ধর্ষ জার্মানী। এইসব পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সহযোগিতার নামে সেই সব দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন ও রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করা।

এস্তোনিয়ার সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তার তিন নম্বর ধারায় ছিল :

"Art. 3. The Estonian Republic assures the Soviet Union of the right to maintain naval bases and several aerodromes for aviation on lease terms at reasonable prices on the Estonian islands of Oesel and Dago and in the town of Paldiski ( Baltiski port ).

The exact sites for the bases and aerodromes shall be allotted and their boundaries defined by mutual agreement. For the protection of the naval bases and aerodromes Soviet Union has the right to maintain at its own expenses on the sites allotted for the bases and aerodromes Soviet land and air armed forces of a strictly limited strength, their maximum numbers to be determined by special strength."

পররাজ্যের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের ছাড়পত্র ছলে-বলে-কৌশলে রাশিয়া আদায় করে নিল। যে কোন 'বুর্জোয়া' রাষ্ট্র যদি

এই ধরনের চুক্তি করে বসে অন্য কোন 'মিত্র' রাষ্ট্রের সঙ্গে—সাথে সাথে তুমুল প্রতিবাদের তুফান উঠবে—গেল! গেল! রব উঠবে কমিউনিস্ট মহল থেকে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অথবা পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপন—সেই সব দেশকে কুক্ষিগত করার চক্রান্তেরই স্ট্র্যাটেজি বলা হবে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক কোন রাষ্ট্র সেই একই নীতি গ্রহণ করলে তার নিন্দা হবে না কেন?

রাশিয়া নিজের খরচে এস্তোনিয়ায় সামরিক—জল, স্থল ও নৌ-বাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করার অধিকার লাভ করল।

ল্যাটভিয়ার সঙ্গে অনুরূপ যে চুক্তি হল তার ৩নং ধারায় ছিল:

Art. 3. "Latvia grants the right to the Soviet Union to establish naval bases for the Russian navy in the ports of Liepaja ( Liban ) and Ventspils ( Windan ), and to build several aerodromes for the Soviet Air Force according to special arrangements. Further, the Soviet Union is entilted to, for the defence of the gulf of Riga, to set up artillery bases along the coast between Ventspil and Pitrages ( Petrgge ). At the naval bases and aerodromes Soviet Union may maintain a certain number of troops whose strength will be fixed in a separate agreement."

[ From "The Text of the Soviet-Latvian Treaty of Mutual Assistance". Signed on October 5, 1939. ]

কোন্ কোন্ জায়গায় রাশিয়া ঘাঁটি স্থাপন করবে—নিজের জল, স্থল ও নৌ-বাহিনীকে সেই সব ঘাঁটিতে রাখবে তারই ব্যবস্থা হল এই চুক্তিতে। এই চুক্তির ফলে ল্যাটভিয়ার স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব বলে কি কিছু অবশিষ্ট রইল? স্তালিনবাদীরা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সোল্লাসে সমর্থন জানিয়েছেন এই সব স্বাধীনতা-হরণকারী সামরিক চুক্তিগুলিকে।

লিথুয়ানিয়ার সঙ্গেও অনুরূপ চুক্তি হল। সেই চুক্তির ৪নং ধারায় ছিল:

Art. 4. "The Soviet Union and the Lithuanian Republic undertake jointly to effect the protection of the state boundaries on Lithuania. For this purpose the Soviet Union is granted the right to maintain at its own expense

at points in the Lithuanian Republic established by mutual agreement, Soviet land and air armed forces of strictly limited strength. The exact locations of these troops and the boundaries within which they may be quartered, their strength at each particular points and all other questions, economic and administrative and questions of jurisdiction arising in connection with the presence of Soviet armed forces on Lithuanian territory under the present treaty shall be regulated by special agreements. Sites and buildings necessary for this purpose shall be allotted by the Lithuanian Government on lease terms at a reasonable price".

[ From "Text of Soviet Lithuanian Treaty of Mutual Assistance." Signed on October 10, '39. ]

এই সব চুক্তির মধ্যে একটা বড় রুশ বদান্যতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে : এই সব দেশে রাশিয়া তার সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করবে—তবে নিজের খরচেই। স্বাধীন দেশের জমি বন্দর বিমানঘাঁটি নৌঘাঁটি ইজারার ভিত্তিতে 'ন্যায্য মূল্যে' রাশিয়াকে দেবার ব্যবস্থা পাকাপাকি হল। বাল্‌টিক দেশগুলির এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর বাল্‌টিক সাগর রুশ দরিয়ায় পরিণত হল। জার্মানীর আর সেখানে কোন প্রভাব আদৌ রইল না। পোল্যাণ্ড ভাগাভাগি করে নেবার রাজনীতিতে প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ারই লাভ বেশি হয়েছিল—কেননা পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত তৈলখনি অঞ্চল Lwow রাশিয়ার ভাগে পড়েছিল। রুমানিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার একই সাধারণ সীমানা ( Common Frontier ) রচিত হল। ফলে রাশিয়ার ইচ্ছা অনুযায়ী দক্ষিণ অভিমুখে অভিযান চালাবার সুযোগও এসে গিয়েছিল।

১৯৪০ সালের ৫ই জুন জার্মানী ফরাসী দেশ আক্রমণ করল। ফরাসী অভিযানে জার্মানবাহিনীর প্রচণ্ড সাফল্যে স্তম্ভিত রাশিয়া কালক্ষেপ না করে সরাসরি লিথুয়ানিয়া এস্তোনিয়া ল্যাটভিয়া দখল করে নিল ১৯৪০ সালের জুন মাসের মধ্যেই। বেস্যারাবিয়া, উত্তর বুকোভিনা সম্পূর্ণভাবে রুশ সেনাবাহিনী দখল করে নিল। আর এই আক্রমণের অজুহাত ছিল : বাল্‌টিক রাজ্যগুলি সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তির সর্তাবলী

লঙ্ঘন করেছে—"Grossly violated their mutual assistance pacts with the Soviet Union."

সমাজতান্ত্রিক লেনিনবাদী রাশিয়া দাবী জানাল যে, এই সব বাল্‌টিক রাষ্ট্রে এমন সরকারকেই রুশ-সরকার প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায় যে, সরকার 'পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি' অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। রাশিয়া আরও দাবী করল যে, বাল্‌টিক রাষ্ট্রগুলিতে বিনা বাধায় অবলীলাক্রমে রুশ সেনাবাহিনীকে চলাফেরার অবাধ অধিকার দিতে হবে, যাতে করে 'পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি-'র সর্তাবলী ঠিকমত পালন করা হচ্ছে কিনা সেটা তদারক করা যায়।

জার্মানী যখন ফরাসী অভিযানে ব্যস্ত সেই অবসরেই স্তালিন বাল্‌টিক রাজ্য-গুলি এবং বেসারাবিয়া ও উত্তর বুকোভিনা লালফৌজ পাঠিয়ে দখল করে নিলেন। এতে জার্মানী ও রাশিয়ার সম্পর্ক কিছুটা তিক্ত হবার সূচনা হল। পশ্চিমের 'বুর্জোয়া' দেশগুলিতে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ল রাশিয়া জার্মানীর ফরাসী অভিযানের প্রচণ্ড সাফল্যে সন্তুষ্ট নয়ই বরং খুবই উদ্বিগ্ন; রাশিয়া মতলব বুঝতে পারছে, তাই জার্মান সীমান্ত বরাবর রাশিয়া ১০০ থেকে ১৫০ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করেছে সম্ভবত মোকাবিলার জন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। বাস্তববাদী সুচতুর রুশ সরকার রুশ সরকারী সংবাদ সরবরাহ সংস্থা তাস (Tass)-এর মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্বাভাবিক সরকারী বিবৃতি ঘোষণা করল:

"In connection with the entry of Soviet troops into the Baltic States there are peristent rumours in the Western press about 100 or 150 Soviet divisions being concentrated on the German frontier. This is supposed to arise from the dissatisfaction in the Soviet Union over Germany's military successes in the West and to point to a deterioration of Soviet-German relations.

Tass is authorised to state that this is totally untrue. There are only eighteen to twenty Soviet divisions in the Baltic countries and they are not concentrated on the German border but are scatterd throughout the Baltic countries........."

"পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সংবাদপত্রে এই ধরনের মিথ্যা গুজব ছড়ান হচ্ছে, উদ্দেশ্য—জার্মানী ও রাশিয়ার বন্ধুত্বে ফাটল ধরান। সমগ্র বাল্‌টিক রাজ্যগুলিতে

মিলিয়ে মাত্র ১৮।২০ ডিভিসন রুশ সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। জার্মানী কর্তৃক ফরাসী দেশ বিজয়ে রাশিয়ার অসন্তোষের কোনই কারণ নেই।" 'তাস'-প্রচারিত বিবৃতিতে আরও বলা হল :

"There is a deliberate attempt to cast a shadow on Soviet-German relations. In all this there is nothing but wishful thinking on the part of certain British, American, Sweedish and Japanese gentlemen........They seem to be incapable of grasping the obvious fact the good neighbourly relations between the Soviet Union and Germany can not be disturbed by rumours and cheap propaganda since these relations are based not on temporary motives of an ad hoc character but on the fundamental state interests of the U.S.S R. and Germany." [ June 23, 1940—TASS. ]

জার্মানী ও রাশিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে ধ্বংস করতে চাইছেন এক শ্রেণীর ব্রিটিশ-মার্কিন-সুইডীশ ও জাপানী রাজনীতিবিদরা। তাঁরা ভাবতেই পারবেন না যে, এই পারস্পরিক মধুর সম্পর্ককে গুজব ও অপপ্রচারের দ্বারা নষ্ট করা কখনই যাবে না, বিশেষ করে যখন এই পারস্পরিক সৌহার্দ্য কোন সাময়িক স্বার্থের ওপর নয়—দুই রাষ্ট্রের মৌল রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য ও স্বার্থের ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত।"

তাহলে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার দৃষ্টিতে সাম্যবাদী রাশিয়া ও ফ্যাসিবাদী জার্মানীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পারস্পরিক সম্প্রীতির ভিত্তি হল এই দুই রাষ্ট্রের মৌল লক্ষ্যের মতৈক্য ? তাহলে ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজম-এর মধ্যে মৌলিক ঐক্য রয়েছে ? আর ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র যদি নিছক পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রই হয়, তাহলে দুই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক স্বার্থের মিল কি করে থাকতে পারে ? যদি সেই মৌলিক ঐক্য সত্যিই থাকে তাহলে দুই পরস্পর-বিরোধী ব্যবস্থার মধ্যে অনিবার্য সংঘর্ষতত্ত্ব ( Inevitable collision ) কি নস্যাৎ হয়ে যায় না ? এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে একটি মার্কসবাদী রাষ্ট্রের চরম সুবিধাবাদী আচরণই ফুটে উঠেছিল, ফ্যাসিস্ট জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়া তার 'বন্ধুত্ব' সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য যে কত আগ্রহী ছিল তাও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

বাল্‌টিক রাজ্য লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়াকে সোভিয়েট রাশিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা হিসাবে সরকারীভাবে সোভিয়েট পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মলোটভ যা বলেছিলেন সেটাও উল্লেখ্য। মলোটভ বলেছিলেন :

"The mutual assistance pacts we had with Lithuania, Latvia and Estonia did not produce the desired results......... the anti-Soviet 'Baltic Entente' between Latvia and Estonia was latterly extended to Lithuania, therefore, specially in view of the international situation we demanded a change in the Government personnel of Lithuania, Latvia and Estonina and introduction into these countries of additional Red army formations. In July free parliamentary elections took place in all these countries and we can now note with satisfaction that the peoples of Lithuania, Latvia and Estonia in a friendly elan elected representatives who have since unanimously declared themselves in favour of the introduction of the Soviet system in all three countries and for their incorporation in the U.S.S.R.. Ninetyfive percent of all these people had previously formd part of the U.S.S.R."

মলোটভের নাম উহ্য রাখলে বুঝতেই পারা যাবে না এ বিবৃত্তি কোন উলঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনেতার কিনা।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে—অতএব লিথুয়ানিয়া ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়ার প্রশাসকদের রদবদল দরকার—শাসনব্যবস্থায় রুশ-পন্থী রাজনীতিবিদ দরকার—যেমন দরকার পশ্চিম দুনিয়ায় মার্কিন-অনুরাগী রাজনীতিবিদ মার্কিন রাজনীতির স্বার্থে। আর সেই অদ্ভুত সাম্রাজ্যবাদী আবদার মেটাতে হবে দেশের স্বাধীনতা, স্বকীয়তার বিনিময়ে। প্রতিবেশী স্বাধীন দেশে আর একটি রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর অবাধ টহলের দাবী করার অর্থ কি সেই দেশের স্বাধীনতা হরণ করে নেওয়া নয়? মলোটভ সেই দাবীই করেছিলেন। আর সে দাবী না পূরণ করার অজুহাতে লালফৌজ পাঠাতে হবে। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে ঐ তিনটি দেশে স্বাধীন গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নির্বাচিত সরকার গঠনে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু দখলকারী বিপুল লালফৌজের উপস্থিতিতে 'স্বাধীন' মার্কা মুক্ত গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয়েছে বলে দাবী করে নিছক পরিহাস করেছিলেন মলোটভ। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতিতে যদি সে-দেশের নির্বাচন নিছক প্রহসন হয়, রুশ লালফৌজের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন কেন স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক

নির্বাচন বলে গণ্য হবে? ১৯৪০ সালের জুন মাসে রুশ-অনুরাগী জাতীয় স্বার্থ পরিবর্জনকারী নেতা ও প্রশাসকদের লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার দাবী জানিয়েছিল—সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লববাদী রাশিয়া ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে চেকোশ্লোভাক সরকারের প্রশাসক ও নেতারূপে পেতে চেয়েছিল রুশ-পন্থী চেক জাতীয় স্বার্থবিরোধী রাজনীতিবিদদের—ঘরসন্ধানী বিভীষণদের। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে মাত্র। বিপুল-সংখ্যক রুশ লালফৌজের ভয়াল ভ্রূকুটির কাছে স্বাধীনতাকামী চেকবাসীদের সকল প্রতিবাদ-প্রতিরোধ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

১৯৩২ সালের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিট্ভিনভ তাঁর স্মরণীয় ভাষণে বলেছিলেন: রাশিয়া তার নিজের ভৌগোলিক সীমানা বিস্তৃত করার প্রয়োজন অনুভব করে না। পররাজ্যে হস্তক্ষেপ করারও সম্পূর্ণ বিরোধী সে—এবং সেই জন্য সোভিয়েট রাশিয়া সেনাবাহিনী রাখার কোন প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করবে না। ১৯১৮ সালে ব্রেস্টলিটভস্ক চুক্তির সম্মতি দিয়েছিলেন 'রুশ-বিপ্লবের স্বার্থে'—প্রতিদানে রাশিয়াকে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। আবার ১৯৪০ সালে সেই 'সমাজতান্ত্রিক' 'লেনিনবাদী' রাশিয়ার ভৌগোলিক আয়তন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেল—জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল—একটার পর একটা পররাজ্য গ্রাস করে, বিশ্ব-বিপ্লবের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে।

"Molotov reckoned that since September 1939 the population of the Soviet Union had increased by about twenty-three million people, all of which meant an important increase in our might and territory." [ Russia At War, 1940-45 ; P. 109. ]

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪০ সালের জুন মাসের মধ্যে রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার সঙ্গে সংযোজিত হল আরও ২ কোটি ৩০ লক্ষ অধিবাসী। এটা সম্ভব হয়েছে পররাজ্য গ্রাস করে। লিট্ভিনভের সমাধি ক্ষেত্রে কফিনে-ঢাকা তাঁর শবদেহ নড়ে-চড়ে উঠবে মলোটভের এই সদম্ভ নিষ্ঠুর ঘোষণায়।

এইভাবে লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া তাদের সার্বভৌমত্ব খোয়াল।

১৯৪০ সালের ৩রা আগস্ট লিথুয়ানিয়াকে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করা হল সরকারীভাবে। এই প্রসঙ্গে মহামতি লেনিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি উদ্ধৃত করে দেখান যেতে পারে লেনিনবাদী রাশিয়া লেনিনের আদর্শ কতটা মেনে চলেছেন। লেনিন বলেছিলেন:

"If any nation whatsoever is detained by force within the boundaries of a certain state, and if (that nation) contrary to its expressed desire……is not given the right to determine the form of its state life by free voting and completely free from the presence of troops of the annexing or stronger state and without any pressure, then the incorporation of that nation by the stronger state is annexation, i e. seizure by force and violence." [Collected Works, 3rd Russian Edition, Vol XXII, P. 14.]

অর্থাৎ যদি কোন জাতিকে তার ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বলপূর্বক বন্দী করে রাখা হয় এবং সেই জাতিকে যদি তার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় জীবন-পদ্ধতি ও ধারা সর্বপ্রকার আক্রমণকারী বা শক্তিশালী পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতিমুক্ত নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারণ করার পূর্ণ সুযোগ না দেওয়া হয়—তাহলে সেই জাতিকে ও তার রাষ্ট্রীয় স্বত্বাকে শক্তিশালী বা আক্রমণকারী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করাটা হবে নিছক বলপূর্বক হিংসাত্মক উপায়ে পররাজ্য গ্রাস বা লুণ্ঠন। লেনিনের এই নীতির বিচারে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার আচরণ কি নিছক সম্প্রসারণবাদী ও আক্রমণাত্মক বলে গণ্য হবে না? চীনের তিব্বতের স্বাধীনতা হরণ—রাশিয়ার চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ ও দখল কি আক্রমণাত্মক ও নিছক সম্প্রসারণবাদী বলে ধিকৃত হবে না?

ইতিহাস বার বার একটা শিক্ষা দিয়ে এসেছে: শান্তি বলহীনের পক্ষে লভ্য নয়। শক্তির পথেই শান্তির সাধনা। সঙ্কটের সময় বিদেশী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার গ্যারান্টি কখনই কার্যকরী হয় না। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পররাষ্ট্রের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরতার পরিণাম মারাত্মক।

## ২০

# ডেনমার্ক-নরওয়ের পতন : ঘরসন্ধানী বিভীষণদের দেশদ্রোহিতা

হিটলার-স্তালিন দোস্তির আড়ালে ইউরোপের আরও দু'টি দেশ আক্রান্ত হয়ে স্বাধীনতা হারাল : নরওয়ে ও ডেনমার্ক। সংক্ষেপে দু'টো দেশের কথাই আলোচনা করা যাক। উত্তর সাগরের ( North Sea ) সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের অভাব জার্মানীর নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই অনুভব করে আসছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উত্তর সাগরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্রের অভাবে জার্মান নৌবহর ও বাণিজ্য-জাহাজগুলি খুবই অসুবিধায় পড়েছিল। মানচিত্রের দিকে তাকালেই ব্যাপারটা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাবে। গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে সম্ভাব্য যে কোন যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে মোকাবিলা করতে হলে নরওয়েতে জার্মানীর ঘাঁটি স্থাপন করা চাই—জার্মান রণপণ্ডিতরা একথাটা বুঝে নিয়েই জার্মানীর পরবর্তীকালের কৌশল ও পদক্ষেপ কি হবে তা স্থির করছিল। নরওয়ের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল জার্মানীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকলেই ব্রিটিশ নৌবহর কর্তৃক রচিত অবরোধের সঙ্কটজনক পরিণতি থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। তাই হিটলার ও নাৎসী রণপণ্ডিতরা নরওয়ের দিকে তাঁদের লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। জার্মান নৌবহর-বিশারদরা রাশিয়ার সাহায্যেই নরওয়েতে নৌঘাঁটি স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। নরওয়েতে জার্মান সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অন্য কয়েকটি জোরাল কারণেও অনুভূত হয়েছিল।

সুইডেন থেকে আমদানী করা লৌহের ওপর জার্মানী খুবই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। আনুমানিক এক কোটি টন লৌহ প্রতি বছর সুইডেন থেকে জার্মানীতে আসত বাল্টিক সমুদ্র-পথে ( Baltic sea )। কিন্তু শীতকালে বাল্টিক সমুদ্রে পড়ার পথটি অবরুদ্ধ থাকত। ফলে সুইডেনের খনিজ লৌহ নরওয়ের বন্দর নারভিক-এ রেলপথে আসত। সেখান থেকে জাহাজে এই খনিজ লৌহ পাঠান হত জার্মানীতে। এই যে নরওয়ের বন্দর থেকে

জাহাজযোগে জার্মানীতে খনিজ লৌহ আসত, সেটা সম্পূর্ণ নরওয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন —অন্য দেশের সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব-নিরপেক্ষ জলপথেই আসত। ব্রিটিশ রণতরী বা সাবমেরিণের কোনই ভয় ছিল না। প্রথম দিকটায় হিটলার নরওয়ের 'নিরপেক্ষতার' সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাশিয়া ১৯৩৯ সালের ৩০শে নভেম্বর ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করার পরই জার্মান, ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের কাছে নরওয়ের ভৌগোলিক গুরুত্ব অনুভূত হল। রাশিয়া যখন ফিনল্যাণ্ডে আক্রমণাত্মক প্রচণ্ড যুদ্ধ চালাচ্ছিল তখন ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার একমাত্র নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্য দিয়েই সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে সাহায্য করতে পারত ফিনল্যাণ্ডের মুক্তিযোদ্ধাদের। হিটলার যদিও রাশিয়া কর্তৃক ফিনল্যাণ্ড আক্রমণে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তবুও তিনি বুঝেছিলেন ব্রিটিশ ও ফরাসীবাহিনীকে যদি নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্য দিয়ে যাতায়াতের অনুমতি (transit facility) দেওয়া হয় তাহলে কোন-না-কোন ছুতোয় এই সেনাবাহিনী নরওয়ে ও সুইডেনে স্থায়ী আস্তানা পেতে বসতে পারে। ফলে সুইডেনের বিপুল খনিজ লৌহ নিরুপদ্রবে আর জার্মানীতে আসতে পারবে না। বিশেষ করে যুদ্ধের সাফল্য যখন বহুলাংশে এই খনিজ লৌহের জোগানের ওপর নির্ভর করছে। [ See : The Challenge of Scandinavia, P. 115-116—By William L. Shirer. ] হিটলারের অনুমান ঠিকই ছিল। ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার সুইডেনের খনিজ-অঞ্চলগুলি ফিনল্যাণ্ডের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যদানকারী প্ররোচিত সেনাবাহিনীকে দিয়ে দখল করার গোপন পরিকল্পনা রচনা করেছিল। সুতরাং নরওয়েকে দ্রুত জার্মান প্রভাবাধীন অঞ্চলে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা রচনার কাজে হাত পড়ল।

হিটলার নরওয়েতে একটি তাঁবেদার সরকার স্থাপনের পরিকল্পনাকে স্বাগত জানালেন। নরওয়েতে আবিষ্কৃত হল ঘর-সন্ধানী বিভীষণ Vidkun Abraham Lauritz Quisling ( কুইস্‌লিঙ্‌ )। রাজনীতির ছাত্ররা এই নামটির সঙ্গে খুবই পরিচিত। কুইস্‌লিঙ্‌ সামরিক বাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্যে আকৃষ্ট হয়ে তিনি কমিণ্টার্ণের আশীর্বাদ-ধন্য নরওয়ের শ্রমিক দলে যোগদানের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন, কিন্তু বিফল হন। পরে তিনি একটি নাৎসী প্যাটার্ণের দল প্রতিষ্ঠা করেন ( Nasjonal Samling )। কিন্তু সে দেশে এই দলকে জনগণ নিজেদের বলে মনে করতে পারেনি, কেননা গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব ছিল সে দেশে যথেষ্ট। কুইস্‌লিঙ্‌ পার্লামেণ্টের নির্বাচনে জয়লাভ করতেও পারেননি।

কুইস্‌লিঙ্‌কে নাৎসী ভাবধারার প্রেরণা জোগালেন নাৎসী দলের অন্ততম বিশিষ্ট তাত্ত্বিক আলফ্রেড্‌ রোজেনবুর্গ। জানা যায়, রোজেনবুর্গকে কুইস্‌লিঙ্‌ই নরওয়ে দখলের পরামর্শ দেন। নরওয়েতে একটি ষড়যন্ত্রমূলক 'অভ্যুত্থান'-এর মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের মতলব করছিলেন কুইস্‌লিঙ্‌। এই অভ্যুত্থান সংঘঠিত হলেই জার্মানীর সেনা ও নৌ-বাহিনী বাইরে থেকে সাহায্য করবে। ঠিক অস্ট্রিয়ার ক্ষেত্রে যে কায়দায় 'Anschluss' বা জার্মানীর সঙ্গে পূর্ণ মিলন সম্ভব করে তোলা হয়েছিল—সেই কায়দায় কুইস্‌লিঙ্‌ তাঁর পরিকল্পিত তথাকথিত অভ্যুত্থানকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন।

জার্মান নৌবহরের ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা নরওয়ের স্থিতাবস্থা রাখার পক্ষে ছিলেন। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য সেনাবাহিনী দিয়ে ওই দেশ দখল করার বিপক্ষে ছিলেন। কোনমতে নিরাপদে নরওয়ের বন্দর থেকে খনিজ লৌহ জার্মানীতে আমদানী যাতে অব্যাহত থাকে সেটাই দেখা দরকার, এটাই ছিল তাঁদের অভিমত। হিটলার সেনাপতিদের এই দ্বিধাগ্রস্ততায় ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি জেনারেল কাইটেলকে খুব জরুরী ও গোপন নির্দেশ দিলেন নরওয়ে অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলার জন্য। হিটলারের নরওয়ে অভিযানের পিছনে মূল যুক্তি ছিল এই যে, নরওয়ের দরিয়ায় ( Norwegian territorial waters ) ব্রিটিশ রণতরী ও নৌবহরের উপস্থিতি প্রতিরোধ করার মত সাহস ও ক্ষমতা—এ দু'টোর কোনটাই সরকারের নেই। জেনারেল ব্রাউচিৎস ও জেনারেল হাল্‌ডার যখন পশ্চিমের আসন্ন রণ-প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত তখন হিটলারের জরুরী নির্দেশে সেনাপতি ফকেনহরস্ট নরওয়ে ও ডেনমার্ক অভিযানের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। হিটলারের গোপন নির্দেশে বলা হয়েছিল :

"The development of the situation in Scandinavia require the making of all preparations for the occupation of Denmark and Norway. This operation should prevent British encroachment on Scandinavia and the Baltic. Further it should guarantee our ore base in Sweden and give our Navy and Air force a wider starting line against Britain." ( Top Secret )

এদিকে ফিনল্যাণ্ডের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মার্শাল ম্যানারহাইমকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আইরনসাইড ( Gen. Ironside )

৭ই মার্চ জানিয়ে দিলেন যে, মিত্রপক্ষের তরফ থেকে।৭৫,০০০ সৈন্য ফিনদের পাশে থেকে মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করার জন্য আসছে—তবে এটি নির্ভর করছে নরওয়ে ও ডেনমার্কের মধ্য দিয়ে এই সৈন্য-চলাচলের অনুমতি দেবার ওপর। নরওয়ে-ডেনমার্ক দখল অভিযানের এটি আশু দ্বিতীয় কারণ। অবশ্য ১২ই মার্চ রুশ-ফিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। এতে একদিকে বাল্‌টিক সমুদ্রের দিকে রুশ সম্প্রসারণ যেমন বন্ধ হল সাময়িকভাবে, অন্যদিকে আবার নরওয়ে-ডেনমার্ক দখলের যৌক্তিকতা হিটলারের দিক থেকে অনেকটা ক্ষুণ্ণ হল। হিটলার অজুহাত খুঁজছিলেন শান্তিপূর্ণ আক্রমণের।

হিটলার অতর্কিতভাবে এবং আচমকা এই দু'টি দেশ দখল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এপ্রিল মাসের (১৯৪০) প্রথম সপ্তাহ থেকেই নরওয়ের উপকূলে জার্মান যুদ্ধজাহাজ আনাগোনা স্বরু করেছিল। এই অভিযানের দায়িত্ব তিনি জেনারেল হাইমার (General Himer)-এর ওপর অর্পণ করলেন। নরওয়ের সরকার ও সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে বিনা রক্তপাতে এই দু'টি দেশ দখল করার মতলবে নির্দেশ দেওয়া হল—জার্মানীর সৈন্যবাহী রণতরীগুলিতে ব্রিটিশ জাতীয় পতাকা শোভা পাবে। বিভিন্ন জাহাজে বিভিন্ন ব্রিটিশ জাহাজের নাম লেখা হল [ যেমন, Koelin—H.M S. Cairo; Koenigsbarg—H M.S. Calcutta ]। নরওয়ে অভিযানে এই চতুরতা ও শঠতার আশ্রয় নিল জার্মান নৌবহর। নরওয়ে সরকার মনে করবে ব্রিটিশ জাহাজ উত্তর সমুদ্র ও বাল্‌টিক সমুদ্রে সমবেত হচ্ছে। আর সেই অজুহাতে জার্মান সেনাবাহিনী ব্রিটিশ আক্রমণের হাত থেকে রাজা ও দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে গোটা দেশ দখল করে নেবে। ১৯৪০ সালের ৯ই এপ্রিল রাজধানী অস্‌লো ও কোপেনহাগেনে জার্মান দূতাবাস মাধ্যমে চরমপত্র পৌঁছে দেওয়া হল দুই দেশের সরকারের কাছে। সে দেশে কে জানত সেদিনের প্রভাত-সূর্য রুদ্রসাজে প্রলয়ের তূর্য বাজিয়ে আসছে? চরমপত্রে বলা হল :

তৃতীয় রাইখ-এর আশ্রয় দুই দেশের সরকারকেই চাইতে হবে এবং বিনা প্রতিরোধে জার্মান সৈন্যদের উপস্থিতিকে মেনে নিতে হবে। বলা হল জার্মান সৈন্যরা এসেছে এই দুই দেশকে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে।

চরমপত্রে নির্লজ্জভাবে আরও বলা হল :

জার্মান সৈন্যরা শত্রুরূপে এই দেশের মাটিতে পদার্পণ করেনি আদৌ। জার্মান সরকার দখল-করা ঘাঁটিগুলিকে সামরিক অভিযানের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার

করতে চান না, যদি না ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার এ কাজে তাকে বাধ্য করে। দুই দেশের (নরওয়ে ও জার্মানী) মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আগের মতই অব্যাহত থাকবে। নরওয়ের ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করার কোনই অভিপ্রায় নেই জার্মান সরকারের। যেহেতু জার্মান সরকারের উদ্দেশ্য অতি সাধু ও শান্তিপূর্ণ, সেইহেতু জার্মান সরকার আশা করেন যে, নরওয়ের সরকার ও জনগণ কোনরকম প্রতিরোধ বা বাধা দেবেন না। আর বাধা দিতে গেলে তা চূর্ণ করা হবেই, পরিণাম হবে অহেতুক রক্তস্নান।

শান্তিপূর্ণ বন্ধু রাষ্ট্রের আচরণই বটে!

ডেনমার্ক বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু নরওয়ের ক্ষেত্রে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি অবশ্য ঘটেনি। সেখানে প্রতিরোধ গড়ে উঠল। দেশের রাজা এবং পার্লামেণ্টের সদস্যরা রাজধানী অস্‌লো পরিত্যাগ করে পালিয়ে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিলেন। জার্মান নৌ-বাহিনী অতি সহজেই গুরুত্বপূর্ণ নারভিক বন্দরটি দখল করে নিল। আগেই বলা হয়েছে, এই নারভিক বন্দর দিয়েই সুইডেনের খনিজ লৌহ জার্মানীতে আমদানি হত। ব্রিটিশ রণতরীর বিস্তীর্ণ ব্যূহের চোখে ধুলা দিয়ে দশটি জার্মান ডেস্ট্রয়ার—মাত্র দুই ব্যাটেলিয়ান নাৎসী সৈন্য অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে বন্দরটি দখল করে নিল। এমনি করে বার্জেন ( Bergen ) বন্দর, ট্রন্‌ড্‌হীম বন্দর একের পর এক তারা দখল করে নিল। অল্প-স্বল্প প্রতিরোধ এখানে-সেখানে অবশ্য হয়েছিল। নিকটেই শক্তিশালী ব্রিটিশ নৌবহর মোতায়েন ছিল। কিন্তু সমুদ্রে পাতা মাইন ও বোমারু-বিমানের আক্রমণের আশঙ্কায় জার্মান নৌবহরের প্রতিরোধে এগিয়ে এলো না। নরওয়ের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিমানঘাঁটি সোলা ( Sola airfield ) অনায়াসে জার্মান সেনাবাহিনী দখল করে নিল। নরওয়ের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ছিল অতি দুর্বল। বিমান-বিধ্বংসী কামানের ব্যবস্থাও ছিল না। এই বিমানঘাঁটিটি দখল করার ফলে ব্রিটিশ ও ফরাসী সেনাবাহিনীর পক্ষে ব্যাপকভাবে নরওয়েতে সৈন্য অবতরণ করিয়ে লড়াই চালাবার পথও বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জার্মান সৈন্যরা পাঁচটি বড় বড় বন্দর ও বৃহত্তম বিমানবন্দর দখল করে নিল। রাজধানী অস্‌লো দখলের পথে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল নিঃসন্দেহে।

আত্মসমর্পণের জন্য জার্মান সরকার রাষ্ট্রদূত ডঃ ব্রয়ার মারফৎ সে দেশের রাজা ও পার্লামেণ্টের সদস্যদের উপর চাপ দিতে লাগলেন। এমন সময় কুইস্‌লিঙ্‌ দেশবাসীর প্রতি এক নির্লজ্জ বেতার-ভাষণে তাঁর নেতৃত্বে সরকার

গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। আর সেই সঙ্গে সকল প্রকার প্রতিরোধ বন্ধ করার আহ্বান জানালেন। এ অবস্থায় জার্মান রাষ্ট্রদূত রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রস্তাব দিলেন, তিনি যেন কুইস্‌লিঙ্‌ সরকারকে মেনে নেন।

হিটলারের মতলব ছিল নরওয়ের রাজাকে বন্দী করা। কিন্তু অস্‌লোতে জার্মান ছত্রী সেনার অবতরণের আগেই সরকারী পররাষ্ট্র দপ্তরের যাবতীয় দলিলপত্র—ব্যাঙ্ক অব নরওয়ের সঞ্চিত সমস্ত মজুত স্বর্ণ তেইশটি মোটর ট্রাক ভর্তি করে রাজা, পার্লামেণ্টের সদস্যবৃন্দ, সরকারী অফিসাররা উত্তরে আশি মাইল দূরে পালিয়ে গিয়ে সেখান থেকেই সরকারী কাজ চালাচ্ছিলেন। হিটলারের সে চেষ্টা এভাবেই ব্যর্থ হয়। রাজধানী অস্‌লোতে লড়াই চালাবার মত কোনরকম প্রস্তুতিই এই শান্তিপ্রিয় জোট-নিরপেক্ষ দেশটির সেদিন ছিল না।

রাজা হাকন্‌ (Hakon) ডঃ ব্রয়ারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। কুইস্‌লিঙ্‌-নেতৃত্বে গঠিত পুতুল সরকারকে তিনি স্বীকার করতে অস্বীকার করলেন। নরওয়ের রাজা ছিলেন জনগণের ভোটে নির্বাচিত। তিনি পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিদের বোঝালেন যে, জনগণের আস্থাভাজন রাজা হিসাবে তিনি এভাবে নতি স্বীকার করতে রাজী নন। অবার এও ঠিক, প্রতিরোধের অর্থই হল ধ্বংস ও রক্তস্নান। তাই তিনি পদত্যাগ করতে চাইলেন। দেশবাসী, পার্লামেণ্টের সদস্যগণ এবং সরকার পক্ষের সকলেই তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করলেন। রাজার মর্যাদা আরও বেড়ে গেল দেশবাসীর কাছে।

এদিকে নরওয়ের দুর্বল রাজার এই আচরণে রিবেনট্রপ ক্ষুব্ধ হলেন। যে গ্রামে রাজা ও তাঁর দলবল আশ্রয় নিয়েছিলেন জার্মান বোমারু বিমানবাহিনী নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে সেই অঞ্চলটিকে ধ্বংস করে ফেলল। রাজা ও পার্লামেণ্টের সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য সকলেই আগে থেকে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সমস্ত অঞ্চল ছিল বরফাবৃত। সেখান থেকে যতটা সম্ভব প্রতিরোধ আন্দোলন চলল। সরকার পক্ষের আশা ছিল কিছু সময় কাটাতে পারলে ব্রিটিশ ও ফরাসী সেনাবাহিনী এসে পড়বে। তখন তাদের সাহায্যে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা যাবে।

নরওয়ের নারভিক বন্দর পুনর্দখলের লড়াই শুরু করে জার্মান নৌবহরের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করল। ২৮শে মে বিপুল সৈন্যবহর নিয়ে মিত্রপক্ষের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে জার্মানরা এই গুরুত্বপূর্ণ বন্দরটি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হল। অনেকেরই মনে হয়েছিল জার্মানী তার একান্ত প্রয়োজনীয় খনিজ লৌহের সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হবে এবং নরওয়ে দখলের পরিকল্পনাও শেষ

পর্যন্ত ব্যর্থ হবেই। হিটলার এই চাপকে প্রতিহত করার মানসে একই সময় বিপুল শক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে পশ্চিম রণাঙ্গন উন্মুক্ত করলেন। মিত্রপক্ষ পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধে মোকাবিলার জন্য নারভিক বন্দর পরিত্যাগ করল। সব সৈন্যদের পশ্চিম রণাঙ্গনে তলব করা হল। জার্মান সেনাপতি Dietl, যিনি নারভিক ছেড়ে পালিয়ে সুইডেনের সীমান্তে আত্মগোপন করে ছিলেন, তাঁর সৈন্যদল নিয়ে পুনরায় ৮ই জুন নারভিক বন্দর-নগরী পুনর্দখল করলেন। নরওয়ের সংগ্রামরত সৈন্যরা পরিষ্কার বুঝলেন ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার তাদের বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। রাজা হাকন্ ও সরকার পক্ষের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ব্রিটিশ জাহাজে লণ্ডনে সরিয়ে আনা হল, ৭ই জুন তারিখে—এখানে বলে রাখা দরকার জার্মান সরকার কুইস্‌লিঙ্‌কে ও তাঁর অস্থায়ী সরকারকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় দেন অল্পদিনের মধ্যেই ( ১৫ই এপ্রিল ), তার জায়গায় একটি ৯ জন সদস্য-বিশিষ্ট প্রশাসনিক পরিষদ গঠিত হয়। এর পর অবশ্য ১৯৪২ সালে তিনি আবার প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন। তবে জার্মান-প্রভুরা তাঁকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়েই রাখে। ১৯৪৫ সালে অক্টোবর মাসে যুদ্ধপরাধী রূপে তাঁর বিচার হয়। দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

নরওয়ে ও ডেনমার্ক অভিযানে জার্মান সাফল্য তৃতীয় রাইখের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করল। হিটলার ও তাঁর সৃষ্ট তৃতীয় রাইখ পৃথিবীতে অপ্রতিরোধ্য বলে পরিগণিত হল। ডেনমার্ক ও নরওয়ের স্বাধীনতা হরণের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হল, শুধু নিরপেক্ষতার (Neutrality) মাদুলি বেঁধেই সঙ্কটের দিনে রক্ষা পাওয়া যায় না। জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতার গ্যারান্টিও নয় নৈষ্ঠিক নিছক নিরপেক্ষতাতত্ত্ব। দেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা শান্তিপ্রিয়তার নামে দুর্বল করে রাখার অর্থ জাতীয় আত্মহত্যা। প্রতিবেশীর সঙ্গে, বিশেষ করে সে প্রতিবেশী যখন প্রবল পরাক্রান্ত—শান্তিতে সহবস্থান করার অর্থ প্যাসিফিজম্-এর আফিম খেয়ে বুঁদ হয়ে ভাই-ভাই নগর সঙ্কীর্তনে গা ভাসিয়ে দেওয়া নয়। ক্রম-নির্ভরশীল দুনিয়ায় ভাব ও আদর্শের মিতালি আদর্শবাদ ও অবিভাজ্য সৌভ্রাতৃত্ব বোধের সেতু গড়ে তোলার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নতুবা প্রয়োজনের তাগিয়ে বিপদের মুহূর্তে বন্ধু রাষ্ট্ররূপে যে সব দেশ পাশে এসে দাঁড়াবে—সে-রাষ্ট্র সরকার তার নিজের জাতীয় স্বার্থ বোধের তাগিদে সঙ্কট-মুহূর্তে সাহায্যপ্রার্থী রাষ্ট্র ও তার জনগণকে বিপদের মুখে ছেড়ে দিয়ে সরে পড়তে দ্বিধা করে না। নরওয়েতে প্রতিরোধ আন্দোলনের

সময় যেভাবে ব্রিটিশ ও ফরাসী সেনাবাহিনী নারভিক বন্দর-নগরী পুনর্দখল করেও হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল পশ্চিম রণাঙ্গন সামলাতে, তাতে নরওয়ের প্রতিরোধ-রচনাকারী সৈনিকদের মনে এই প্রশ্ন কি প্রসঙ্গত জানিয়ে দেয়নি ?

জাতির সঙ্কট-মুহূর্তে বামপন্থী বিপ্লবীদের ভূমিকাটি কি ছিল সেটাও জেনে রাখা ভাল। নরওয়ে যখন আক্রান্ত হল তখন সে-দেশের কমিউনিস্ট পার্টি আক্রমণকারীদের সহযোগিতায় সে-দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ব করার চেষ্টা করেছিল। বরকেনো বলেছেন :

"Norway became the testing ground for an attempt of the Communists to jockey themselves into power on the back of the invanding Nazi army." [ European Communism—P. 253. ]

স্থানীয় কমিউনিস্টদের আক্রমণের সময়কার একটি বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :

"There can be no doubt that broad outline plans for striking at Germany through Scandinavia········had been completed in the earliest days of the war by A.H.Q. And equally there can be little doubt that the blow was timed from the very first for delivery in the spring of this year. At the same time it is obvious that Germany was well aware of these plans and had everything prepared to counter them immediately when they were put into operation." [ World News and Views : 20th April, 1940. ]

মিত্রপক্ষই জার্মানীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার যাবতীয় পরিকল্পনা অনেক আগে থেকেই তৈরী করেছিল। আর বাস্তবকালেই, অর্থাৎ ঠিক যে সময় নরওয়ে জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হল সেই সময়ই জার্মানীর ওপর আক্রমণের মতলব আঁটা হয়েছিল। জার্মানী ভিতরে ভিতরে সবই সঠিকভাবে জানত এবং তার প্রতিহত করার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করেছিল। জার্মানীর নরওয়ে আক্রমণ করে সে-দেশের স্বাধীনতা হরণের ঘৃণ্য চক্রান্তের অদ্ভুত সাফাই গাইলেন খোদ কমিউনিস্ট কর্মীরা। ঘটনার দিক থেকেও কিন্তু কমিউনিস্টদের বক্তব্য সত্য নয়। জার্মান সামরিক শক্তি ও গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষতার সাফাই গাইলেন নরওয়ের কমিউনিস্ট পার্টি। জার্মানবাহিনী আক্রমণের প্রথম দিনেই রাজধানী অস্‌লো

দখল করে নিল। সে-দেশের শ্রমিক দলের (Labour Party) নেতারা প্রাণভয়ে নগরী ছেড়ে পালালেন। কমিউনিস্টরা আক্রমণের অগ্রিম নোটিশ পেয়েছিলেন। তারা জার্মান বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই রাজধানীতে থেকে গেলেন। নাৎসী সৈন্যরা তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করল না, তাদের দলের ও পত্রিকার অফিসে হামলাও করল না। এমন কি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ আন্দোলন যাতে না হয় সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হল। বলা হল :

"It is time to make an end of *franctireur* activities which only help to bring disaster upon the civilian population. But organised resistance is of no greater use for ourselves and our people......... It is therefore in the interest of the Norwegian people that this resistance cease."

সে-দেশে সে-সময় যে প্রতিরোধ আন্দোলন চলছিল নাৎসীদের বিরুদ্ধে তা যাতে বন্ধ করা হয় তারই ওকালতি করা হল। কেননা, প্রতিরোধ বা মুক্তিসংগ্রাম চালালে রক্তক্ষয় হবে, তাতে দেশের ধ্বংস ও ক্ষতি সাধিত হবে। এ এক অদ্ভুত যুক্তি! ধ্বংস ও ক্ষতি হবে, অতএব দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করার দরকার নেই, আত্মসমর্পণ কর! এ ভূমিকা ঘর-সন্ধানী বিভীষণের ভূমিকা [অস্‌লো কমিউনিস্ট পত্রিকা Arbeideren]। আমেরিকার কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত নরওয়ের নাবিকদের ক্লাবগুলির পক্ষ থেকে এক আবেদনে নরওয়ের কমিউনিস্টদের কুইস্‌লিঙ্‌ পরিচালিত নরওয়ের তাঁবেদার সরকার ও স্বাধীন নিয়মতান্ত্রিক সরকারের দু'য়ের কোন পক্ষকেই সমর্থন না করার আবেদন জানান হল (Strictest neutrality between the two Norwegian Governments)। এরকম আবেদনের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হল নরওয়ের বন্দরে ব্রিটিশ ও নরওয়ের এ্যাডমিরাল্যালটির নির্দেশ জাহাজের নাবিকদের উপেক্ষা করা।

নরওয়ের শ্রমিকের মধ্যে ও ট্রেড-ইউনিয়নের আন্দোলনের মধ্যে প্রাক্তন কমিউনিস্টদের (ex-communist) ও বিক্ষুব্ধ উচ্চাভিলাষী কিছু ব্যক্তির একটা সংগঠিত গোষ্ঠী ছিল। বারজেনের (Bergen) অধিকাংশ ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা ও কর্মী একসময় কমিউনিস্ট ছিলেন। এই সব ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : Honkon Meyer (ex-communist), Halvard Olsen ন্যাশন্যাল ট্রেড-ইউনিয়ন ফ্রন্টের প্রাক্তন সভাপতি এবং সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে একসময়

সংশ্লিষ্ট ছিলেন Jems Tangen প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এই গোষ্ঠী জার্মানীর গোয়েন্দাবাহিনী গেস্তাপোর জ্ঞাতসারেই নরওয়ের কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। পর-পর কমিউনিস্টদের সঙ্গে যৌথভাবে একটি ডেপুটেশন নিয়ে গেলেন দখলদার জার্মানবাহিনীর কর্তৃপক্ষের (German occupation authorities) কাছে। প্রস্তাব : দেশের ট্রেড-ইউনিয়ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। জার্মান দখলদার কর্তৃপক্ষ এই সাধু প্রস্তাব মেনে নিলেন। ধীরে ধীরে দেশের ট্রেড-ইউনিয়ন সংস্থাগুলি একটি কমিটির হাতে ছেড়ে দেওয়া হল, আর তার সভাপতি হলেন Tangen। এই কমিটি নিয়ন্ত্রিত হত যাঁর দ্বারা সেই বীর নেতা হলেন ব্রেণ্ডবার্গ (Brendberg), কমিউনিস্ট পলিটব্যুরোর ট্রেড-ইউনিয়ন সেক্রেটারী এবং নরওয়ের কমিউনিস্ট দলের একজন প্রথম সারির নামজাদা নেতা। কুইস্‌লিঙ্‌-সরকারের পত্রিকা Fritt Folk এবং কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা Arbeideren পাল্লা দিয়ে নাৎসী জার্মানীর তোষামোদ করে চলছিল। ট্রেড-ইউনিয়ন ফ্রণ্টে কুইস্‌লিঙ্‌-এর সাঙ্গপাঙ্গরা কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে যাবার নীতি গ্রহণ করে। দুই দলের মধ্যে অবশ্য পার্থক্য ছিল, তবে দুই দলের অর্থাৎ কুইস্‌লিঙ্‌ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছিল কে কত বেশি জার্মানীর দাক্ষিণ্য প্রসাদ লাভ করতে পারে (Competition for German favour)। বরকেনোর ভাষায় : "From the very beginning the Communists attacked Quisling while courting the Germans. Their policy was to present themselves as the better, the more influential supporters of the occupation"

কমিউনিস্ট ও বিরোধীদের সহযোগিতায় নরওয়ের জনগণের সমর্থন পাবার যে আশা দখলদার বাহিনী পোষণ করেছিল তা কিন্তু ব্যর্থ হল, কেননা কমিউনিস্টদের কেউ আর বিশ্বাস করত না সে সময়। অবশেষে কুইস্‌লিঙ্‌কেই জার্মান সরকার ২৬শে সেপ্টেম্বর সে দেশের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করল। নাৎসী-কমিউনিস্ট মোহব্বতের পালা তখনই শেষ হল না কিন্তু। আরও দু' মাস লেগেছিল 'তালাক্' দিতে। নাৎসী-অনুরাগী কতিপয় ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা কমিউনিস্টদের ছেড়ে সরাসরি কুইস্‌লিঙ্‌-এর শিবিরে যোগ দিলেন (যেমন, Olsen, Meyer ইত্যাদি), আর বাকী কমিউনিস্টরা ও Tangen ধীরে ধীরে অবস্থার চাপে নাৎসী-বিরোধী শিবিরে ভিড়তে লাগলেন। নরওয়ের জনগণ কিন্তু কমিউনিস্টদের উপেক্ষা করে, ট্যানজেন ও বিরোধী

গোষ্ঠীর বামপন্থী ধোঁকাবাজীতে আদৌ কান না দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছিলেন। নাৎসীদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের যুক্তফ্রন্টের রাজনীতি এবং দখলদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ক্রূর চক্রান্ত ব্যর্থ হল। যুক্তফ্রন্টের রাজনীতির পালা সাঙ্গ হল—দলের ভাবমূর্তি দেশদ্রোহিতার কালিমায় মসীলিপ্ত হল। কমিউনিস্টরাই শুধু যে নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল তা অবশ্য নয়। নাৎসী জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর থেকেই কমিউনিস্টদের ওপর নাৎসী নিপীড়ন নেমে এল। রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থের যূপকাষ্ঠেই কমিউনিস্টদের বলি দেওয়া হল। জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত নরওয়ের কমিউনিস্টরা নিষ্ঠার সঙ্গে সে দেশের মুক্তিসংগ্রামীদের (Resistance movement) বিরোধিতাই করে গেছে একটানা। তারা ধর্মঘট অথবা বিক্ষোভ বা শোভাযাত্রার বিরুদ্ধে ছিল। বরকেনোর ভাষায়: "Once again Stalin had succumbed to his Oriental preference for fantastic intrigue."

২১

## বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের পতন

নরওয়ে ও সুইডেন দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই হিটলার তাঁর রক্তাক্ত হাত প্রসারিত করলেন পশ্চিম ইউরোপে। তাঁর বড় ভরসা সোভিয়েট রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত অনাক্রমণ চুক্তির গ্যারান্টি। পূর্ব-ইউরোপ থেকে আক্রমণের কোন ভয়ই নেই—অতএব নিশ্চিন্ত মনে জার্মানী পশ্চিম-ইউরোপ গ্রাস করতে পারবে—বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের দিকে। ১৯৪০ সালের ১০ই মে তারিখ প্রত্যুষে উইলহেলস্ট্রাস-এ ডাক পড়ল হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের জার্মানীতে অবস্থিত রাষ্ট্র-দূতদ্বয়ের। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভন রিবেনট্রপ কোনরকম চক্ষুলজ্জার তোয়াক্কা না করেই জানিয়ে দিলেন, এই দুই দেশে জার্মানবাহিনী অবিলম্বে প্রবেশ করবে এই দুই দেশের নিরপেক্ষতা রক্ষা করার জন্য। ব্রিটিশ ও ফরাসী আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যই জার্মানীকে তার সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে হচ্ছে। এই চরম-পত্রে আরও জানিয়ে দেওয়া হল, কোনরকম প্রতিরোধ করার চেষ্টা যেন না হয়। প্রতিরোধের অর্থই ধ্বংস ও রক্তপাত। ব্রাসেল্স ও হেগ-এ যখন চরমপত্র নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন জার্মান বোমারু-বিমানগুলো ত্রাস সঞ্চারকারী প্রচণ্ড গর্জন করে উড়তে থাকে। জার্মানী ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর বেলজিয়াম রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা রক্ষার গ্যারান্টি দিয়েছিল। ১৯১৪ সালের মত ১৯৪০ সালেও সেই গ্যারান্টি লঙ্ঘিত হল। বেলজিয়ামের কোন অপরাধই ছিল না। হ্বাইমার প্রজাতন্ত্রও নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। হিটলারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি কখনই এ দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না। তিনি বলেছিলেন: "German Government has further given the assurance to Belgium and Holland that it is prepared to recognize and to guarantee inviolability and neutrality of these territories".

( January 30, 1937, )

বেলজিয়াম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নিরপেক্ষতার নীতি বর্জন করেছিল। কিন্তু পরে জার্মানীর সামরিক পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে পুনরায় 'নিরপেক্ষতার নীতি'

অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের সরকারও এই নিরপেক্ষতা রক্ষা করার গ্যারাণ্টি দিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে রাজা লিওপোল্ড (তৃতীয়) ঘোষণা করলেন—ফরাসী দেশের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি আর বহাল থাকবে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের মত বেলজিয়াম নিরপেক্ষ ( Neutral ) থাকবে। লোকার্নো চুক্তি ও উত্তর-লোকার্নো চুক্তি অনুযায়ী ফরাসী দেশ ও ইংলণ্ড বেলজিয়াম আক্রান্ত হলে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে প্রতিশ্রুত ছিল। লিওপোল্ডের এই ঘোষণার ফলে ফরাসী ও ব্রিটিশ সরকার বেলজিয়ামকে চুক্তির দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহিত দিল, তবে বেলজিয়াম জার্মানী দ্বারা আক্রান্ত হলে ফরাসী দেশ সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে—এই অঙ্গীকার কিন্তু অব্যাহত রইল। এই মর্মে ১৯৩৭ সালে দুই দেশের সরকার এক যুক্ত ঘোষণা জারী করল।

হিটলার কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের সময় থেকেই এই দু'টি দেশ গ্রাস করার মতলব ভাঁজছিলেন। আগে থেকেই সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করার খবরও এই দু'টি দেশের সরকার পেয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় জার্মানী যখন যুদ্ধপ্রস্তুতি চালিয়েছে পুরোদমে, তখন ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার সম্ভাব্য চরম পরিস্থিতির জন্য কোনরকম প্রস্তুতির ব্যবস্থাই নেননি। আক্রমণ ঘটে গেল অতি অতর্কিতে। অবশ্য ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার বিগত দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে চেষ্টা করছিলেন যাতে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড তাদের সঙ্গে যৌথ সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় রাজী হয়। কিন্তু এই দু'টি দেশের কোনটিই এই প্রস্তাবে রাজী হয়নি সে সময়। শেষে পাঁচ দিনের যুদ্ধে হল্যাণ্ডেরও পরাজয় ঘটল। ইংলণ্ডের রাজনীতিতে পরিবর্তন ঘটেছিল—রক্ষণশীল দলের নেতা উইনস্টন চার্চিল গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হলেন ( ১০ই মে )। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিপুল শক্তিশালী ফরাসী সেনাবাহিনী জার্মান সেনাবাহিনীর কাছে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হল। চার্চিল নিজেই স্বীকার করেছিলেন এই অসামান্য সাফল্যে তিনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন।

"I was dumbfounded. I admit that this was one of the great surprises I have had in my life." [ Churchil : Their Finest Hour : P. 46-47. ]

প্রকৃতপক্ষে এই পাঁচ দিনের প্রচণ্ড যুদ্ধে বেলজিয়ামের ভাগ্যও চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। পলায়নপর বেলজিয়াম ও ফরাসী সেনাবাহিনী জার্মানবাহিনীর হাতে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল। বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড ( তৃতীয় ) ২৮শে মে আত্মসমর্পণ করলেন।

## ২২

### (ক) ফরাসী দেশের পরিস্থিতি

জার্মান সরকার যেভাবে অস্ট্রিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার জার্মান সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল গ্রাস করে নিল—সেটা যে শুধু ইউরোপের মানুষকে বিস্মিতই করেছিল তাই নয়, ফরাসী দেশের সেদিনের দালাদিয়্যের ( Daladier )-এর সরকারের নীরবতা ও চরম নিষ্ক্রিয়তা ফরাসী সরকারের দুর্বলতাকেই বহির্বিশ্বে প্রকাশ করেছিল। আর তার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন হিটলার। ফরাসী সরকারের ও দেশের রাজনৈতিক দলগুলির চরম নিষ্ক্রিয়তা, ঘরমুখী স্বার্থপরতা, শান্তির নামে অন্তঃসারশূন্য 'প্যাসিফিজম্', আত্মবিশ্বাস উৎপাদনকারী দেশপ্রেমের অভাব এবং দেশের একটি বড় গোষ্ঠীর জার্মান নাৎসীদের প্রতি মনে মনে সমর্থন,—এইসব মিলিয়ে যে সামগ্রিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল—ফরাসী দেশের রাজনীতির বন্ধ্যাত্ব তারই ফলশ্রুতি। সমাজতান্ত্রিক দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল—দেশের জনগণের ও সরকারের যুদ্ধকালীন আশু কর্তব্য সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীকে কেন্দ্র করে। সমাজতন্ত্রী দলের সেক্রেটারী জেনারেল পল ফ্যরে ( Paul Faure ) শান্তিবাদী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আক্রমণকারী জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিপক্ষে তিনি সরাসরি মত ব্যক্ত করলেন। ট্রেড-ইউনিয়ন গোষ্ঠীটিও ( C. G. T. ) অনুরূপ মত পোষণ করেছিলেন। আবার সংস্কার-বিমুখ ও সামাজিক পরিবর্তন পরাঙ্মুখ জাতীয়তাবাদীরাও ফ্যাসিস্ট ও নাৎসীদের বিরোধিতার পথ পরিহার করেছিলেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর ( ১৯৩৯ ) চেম্বারলেন, দালাদিয়্যের, মুসোলিনি ও হিটলার মিলিত হয়েছিলেন। হিটলারের হুমকী ও ব্ল্যাকমেল-এর কাছে নতি স্বীকার করলেন দালাদিয়্যের ও চেম্বারলেন। দালাদিয়্যের যখন এই চতুঃশক্তি বৈঠক শেষ করে বিমানে প্যারিস-এ ফিরে এলেন তখন তাঁর মনে ভয় ছিল, দেশের জনগণ তাঁকে আত্মসমর্পণের জন্য ধিক্কার জানাবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অপেক্ষমান জনতা তাঁকে অভিনন্দন জানাল এই ভেবে

যে, তিনি যুদ্ধের হাত থেকে ফরাসী দেশকে বুঝি বাঁচিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা লিয়ঁ ব্লুম (Leon Blum) দলের পত্রিকায় ভূয়সী প্রশংসা করলেন দালাদিয়্যের ও চেম্বারলেনের। চেম্বারে একজন ব্যতিরেকে সকল সমাজতন্ত্রী সদস্যরা সরকার পক্ষকে ভোট দিয়ে সমর্থন জানালেন। কমিউনিস্ট সদস্যরা অবশ্য সরকারের বিরোধিতা করলেন—মিউনিক-ষড়যন্ত্রের ও বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য। দেশের মানুষ ধরে নিলেন যে, ফরাসী কমিউনিস্ট দল বুঝি যুদ্ধের সমর্থনকারী দল (War party)।

দেশে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয়ে উঠতে লাগল। দালাদিয়্যের সর্বময় কর্তৃত্ব সংবিধান অনুযায়ী পদ্ধতিতেই নিজের হাতে নিলেন (Plenary power)। পপুলার ফ্রন্ট-বিরোধী পল রেঁনোদ্-কে (Paul Renaud) তিনি অর্থমন্ত্রী মনোনীত করলেন। নতুন অর্থমন্ত্রী নতুন করের (new taxation), প্রস্তাব আনলেন, সরকারী প্রশাসনে কর্মচারী নিয়োগের সংখ্যা কমিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন,—শ্রমিকদের জন্য সপ্তাহে কাজের মোট সময়ও বাড়াবার প্রস্তাব করলেন (increase in the length of working week)। অর্থমন্ত্রীর মুল লক্ষ্য ছিল ফরাসী মুদ্রা (Franc) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেন নতুন আস্থা অর্জন করতে পারে। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি এইসব কর্মসূচীর প্রতিবাদে একদিনের সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিল। দেশের জনমত ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ছিল। জরুরীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল রেল ও সরকারী অফিস চালু রাখার জন্য। ধর্মঘট সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। দেশের অর্থনীতিতে কিছুটা উন্নতির ছাপ পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল। দেশের পুঁজিপতিরা মনে জোর পেল। তারা নূতন করে জোটও বাঁধল। অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের পরিবেশে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে এ্যালবার্ট লেব্রঁন (Albert Lebran) দেশের রাষ্ট্রপতিরূপে (President) পুনর্নির্বাচিত হলেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধও তখন প্রায় সমাপ্তির মুখে। ফরাসী চেম্বারে যেখানে সদস্যদের ভোটে পপুলার ফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল—সেই সদস্যদের ভোটে (৩৬৩-২৬১) স্পেনের ফ্যাসিস্টরূপে চিহ্নিত ফ্র্যাঙ্কো-সরকারকে স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। ফরাসী দেশের বিখ্যাত যোদ্ধা মার্শাল পেঁতা-কে স্পেনের রাষ্ট্রদূত করে পাঠান হল।

বেশ বোঝা যাচ্ছিল তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের (Third Republic) আয়ু ফুরিয়ে আসছিল।

এদিকে জার্মানী মিউনিক-চুক্তির সর্ত উপেক্ষা করে ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে চেকোশ্লোভাকিয়ার অংশ দখল করে নিল। যুদ্ধের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসতে

লাগল ঘরের কাছে। তখন ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার বুঝলেন ইউরোপের সামরিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার একমাত্র পথ রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন। মস্কোতে একটি সামরিক মিশনও পাঠান হল। তবে তার আগে হিটলার-স্তালিন মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে ( আগস্ট, ১৯৩৯ )।

পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হল—ফরাসী ও ব্রিটিশ সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তোষণ-নীতির পরিণাম কি হতে পারে ইতিহাস চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিল। ফরাসী দেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় চরম শূন্যতা ফুটে উঠল। দালাদিয়েরের চাননি দেশের কলকারখানার শ্রমিকরা প্রথমেই ফ্রণ্টে লড়াই করতে যাক। কৃষকদের পরিবারের ছেলেদেরই কামানের তোপের খাদ্য হিসাবে ফ্রণ্টে পাঠান হচ্ছিল। ফ্রান্সের দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো লাইন দেশের জনমানসে একটা আত্মতুষ্টি ও অর্থহীন নির্ভরতার ভাব জাগিয়েছিল। দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো লাইনও দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে, পরাজয়ের গ্লানি থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

নিরপেক্ষ ছোট্ট দেশ ফিনল্যাণ্ডের ওপর রুশ আক্রমণের মোকাবিলায় ফরাসী সরকার যত বেশি আগ্রহ প্রকাশ করলেন—জার্মান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ততটা আগ্রহ দেখানই হল না। দেশে দালাদিয়েরের-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিল। মন্ত্রিসভার পতনও ঘটল। তাঁর জায়গায় এলেন পল রেঁনোদ্। দালাদিয়েরের র‍্যাডিক্যাল সোশ্যালিস্ট পার্টির সমর্থন নিয়ে প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্বে রয়ে গেলেন।

১৯৪০ সালের মে মাসে জার্মানী বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ড আক্রমণ করল। ব্রিটেন ও ফরাসী বাহিনী নিজ নিজ ঘাঁটি ছেড়ে বেলজিয়াম অভিমুখে ছুটল। রেঁনোদ্ এই সময় তাঁর মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত করলেন কিছু দক্ষিণপন্থী সদস্যকে নিয়ে। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম জার্মানীর কাছে পরাজিত হল। তীব্র জার্মান আক্রমণ ফরাসী দেশের দিকে উদ্যত হল, বোঝাই যাচ্ছিল। দেশের সামরিক পরিস্থিতি প্রায় আয়ত্তের বাইরেই চলে গিয়েছিল। অপরদিকে ডানকার্ক থেকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পলায়ন ব্রিটিশ ও ফরাসী দেশের দুই সরকারের তীব্র মন-কষাকষি সৃষ্টি করল। ফরাসী বাহিনীকে বিপদের মুখে ফেলে ব্রিটিশ সেনাদলের পলায়ন ( desertion ) ফরাসী বাহিনীর মনোবলকে ভেঙে দিল। রেঁনোদ্ সিরিয়ার রণাঙ্গন থেকে দক্ষ ফরাসী সেনাপতি Weyland-কে ফিরিয়ে আনলেন যুদ্ধ-পরিচালনার দায়িত্ব নেবার জন্য। স্পেন থেকে প্রবীণ বিখ্যাত যোদ্ধা মার্শাল পেতাঁ-কেও ফিরিয়ে আনা হল

স্বদেশে। তাঁরা বুঝলেন অবস্থা আয়ত্তের বাইরে। এই দুই যোদ্ধা সেনাপতি রায় দিলেন, দেশের এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের রাজনীতিবিদরা। ফরাসী দেশের পরাজয় কিন্তু দ্বিবিধ: রাজনৈতিক ও সামরিক, মার্শাল পেঁতা বা সেনাপতি ওয়েল্যাণ্ড স্বীকার করুন আর না-ই করুন। ওয়েল্যাণ্ড চেয়েছিলেন যুদ্ধ চালিয়ে আর লাভ হবে না, সন্ধি স্থাপন করা হোক—আর সেই সন্ধি চুক্তিতে সামিল হতে হবে সরকারকে—সেনাবাহিনীকে নয়। রেঁনোদ্ কিন্তু তা চাননি। তিনি চেয়েছিলেন: সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডার সন্ধি করুক। আর সরকার উত্তর-অস্ট্রিয়ায় পালিয়ে গিয়ে সেখান থেকে লড়াই চালিয়ে যাবে। কিন্তু পেঁতা ও ওয়েল্যাণ্ড দৃঢ়মত ব্যক্ত করে বলেন, কিছুতেই দেশের মাটি ছেড়ে চলে যাওয়া যাবে না। মাটি আঁকড়িয়ে পড়ে থাকতে হবে। তাঁদের আশঙ্কা ছিল যুদ্ধের পরই কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান ঘটবে, তার মোকাবিলা করার জন্য তখন দেশে সরকার থাকা প্রয়োজন হবে।

১৪ই জুন (১৯৪০) সরকার স্থানান্তরিত হল বোরদোঁ শহরে। সেখানেই এই পর্যায়ের নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হল। ব্রিটেনের সঙ্গে ফরাসী সরকারের সম্পর্ক তিক্ততর হচ্ছিল। Chantimps-এর নেতৃত্বে কয়েকজন মন্ত্রী সন্ধি স্থাপনের (Armistice) দাবী তুললেন। রেঁনোদ্ এই চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে পদত্যাগ করলেন (১৬ই জুন)। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন বৃদ্ধ সেনাপতি মার্শাল পেঁতা। তিনি স্থলাভিষিক্ত হবার পরও জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতির প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করলেন। এতে সেনাবাহিনীর নৈতিক মনোবল একেবারে ভেঙে পড়ল। দালাদিয়্যের ও ম্যানডেল (Mandel) উত্তর-আফ্রিকায় পালিয়ে গিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে এলেন। দ্য-গল তখন সেনাপতি পদে উন্নীত হয়েছেন। তিনি ইংলণ্ডে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। দ্য-গল বীরের মত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আহ্বান জানালেন দেশবাসীর কাছে।

২২শে জুন তারিখে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল দুই দেশের মধ্যে। হিটলার এর মধ্যেও একটু নাটক করেছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল অতীত অপমানের প্রতিশোধ নেবার মানসিকতা। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অপমানজনক যুদ্ধবিরতি-চুক্তির সর্তগুলি যে ট্রেনের কামরায় জার্মান প্রতিনিধিদের কাছে উপস্থিত করেছিলেন ফরাসী সরকার—ঠিক সেই একই ট্রেনের কামরায় ১৯৪০ সালের যুদ্ধবিরতি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই যুদ্ধবিরতি-চুক্তির

ফলে ফরাসী দেশ দু'টি ভাগে বিভক্ত হল 'স্বাধীন' ও 'অধিকৃত' অঞ্চল (Occupied and unoccupied zones)। পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের সমৃদ্ধ শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলি—উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ফরাসী সেনাবাহিনীকে অস্ত্রচ্যুত করা হল—ভেঙে দেওয়া হল। এই চুক্তির দু'টি মারাত্মক সর্ত ছিল: (১) অধিকৃত অঞ্চলের বিপুল ও অনির্দিষ্ট দখলদার সেনাবাহিনীর যাবতীয় ব্যয়ভার ফরাসী দেশকে বহন করতে হবে, (২) বিশাল ফরাসী সেনাবাহিনী জার্মানীর হাতে যুদ্ধবন্দীরূপে থাকবে—যতদিন না শান্তি ফিরে আসে। 'স্বাধীন' ফরাসী-খণ্ডের রাজধানী স্থানান্তরিত হল ভিশি-তে (Vichy)। ভিশি ফরাসী দেশে একটি স্বাস্থ্যপ্রদ বিরাম-নগরী।

জার্মানী চাপ দিয়ে ভিশি-সরকারের কাছ থেকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা আদায়ের ফন্দি-ফিকির করে চলছিল, আবার ভিশি-সরকার কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে জার্মানীর কাছ থেকে কিছু পাবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে লাভাল (Laval) সরকারের প্রধানের ভূমিকায় এলেন। এই নেতা নাৎসী অনুরাগী ছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যুদ্ধে জার্মান-বিজয় সুনিশ্চিত। অতএব জার্মানীর সঙ্গে রফা করে চললে লাভ অনেক বেশি। ফরাসী দেশ আবার ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা ফিরে পাবে। যুদ্ধ-বিরতি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার আগে তিনি বিশ্বাস করতেন জার্মানী ও ফ্রান্সের ভাগ্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। লাভাল-এর নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট অপ্রতিরোধবাদিতা (Passifism) নাৎসীদের সম্প্রসারণবাদী রাজনীতির সহায়কই ছিল। তাঁর ধারণা ছিল বিশ্বের প্রভুত্বের লড়াই হবে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদের সঙ্গে কমিউনিজম-এর। তিনি এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে নাৎসী শিবিরকেই বেছে নেবার পক্ষে ছিলেন।

'স্বাধীন' ফরাসী সরকারের (Vichy France) পক্ষে সবচেয়ে বড় পুঁজি ছিল বৃদ্ধ সেনাপতি মার্শাল পেঁতা। তাঁকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে নেতাপূজা সুরু হয়েছিল। যেমন, হিটলার, মাও-সে-তুঙ, স্তালিনকে নিয়ে হয়েছে। দেশের সর্বত্র তিনি ঘুরে ঘুরে তাঁর জনপ্রিয়তা যাচাই করে নিলেন। তিনিই দেশকে পরিত্রাণ করতে পারবেন—জনমনে এই ধারণা জন্মেছিল। ব্যক্তিগত-ভাবে তিনি ছিলেন খুব সৎ এবং ব্যক্তি-জীবনে আড়ম্বর জাঁকজমক পরিহার করে চলতেন। তাঁর নিজের সম্বন্ধে আন্তরিকতা যথেষ্ট ছিল। রাজনীতি আদৌ বুঝতেন না। নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাধারাও তাঁর ছিল না। তাঁর ধারণা হয়েছিল যুদ্ধ এড়িয়ে তিনি দেশে শান্তি স্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। নিজের

সরকারের মধ্যেই যে মতভেদ ছিল, তার পরিণতি সম্বন্ধে খুব সজাগ ছিলেন না। যেমন, লাভাল চেয়েছিলেন জার্মানীর সঙ্গে ফরাসী দেশের মিত্রতা স্থাপিত হোক। কিন্তু সরকারেরই আর একটি পক্ষ, যেমন—দারলান (নৌবহরের প্রধান সেনাধ্যক্ষ) স্বাধীন নীতি অনুসরণের পক্ষে ছিলেন। পেঁতা জার্মানীর সহযোগীরূপে কাজ করার পক্ষে মত ব্যক্ত করলেন। কিন্তু আলসাস্-লোরেন-এ জার্মান নীতি জার্মান-ফরাসী দোস্তির মূলে নাড়া দিয়েছিল প্রচণ্ডভাবে। এই দু'টি প্রদেশে জার্মান সম্প্রসারণ চূড়ান্ত করা হয় ( Germanization of Alsace and Lorraine )। লাভালের জার্মানীর কাছে দেশকে ধীরে ধীরে বিক্রী করার রাজনীতির বিরুদ্ধে পেঁতা-সরকারের অপর গোষ্ঠী এমনভাবে রুখে দাঁড়াল যে, শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা থেকে লাভালকে সরিয়ে দেওয়া হল। লাভালের জায়গায় এলেন দারলান। স্বাধীন ফরাসী ভূখণ্ডে প্রাক্তন কমিউনিস্ট নেতা Doriot এবং প্রাক্তন সমাজতন্ত্রী নেতা Marul Deat জার্মানীর সঙ্গে সমঝোতার পক্ষে মত সংগঠন করতে লাগলেন। দারলানও লাভালের পথ ধরলেন। পেঁতার জাতীয় বিপ্লবের বেলুন ১৯৪২ সালের শেষ ভাগ থেকেই চুপসিয়ে আসছিল। দেশের মানুষ তাঁর সরকারকে কোন স্বাধীন দেশের সরকার বলে মনে করছিল না। যুদ্ধের ব্যয়ভার দিন দিন বাড়ছিল—শেষে প্রতিদিন যুদ্ধের ব্যয় বাবদ ৫০ কোটি ফ্রাঙ্ক স্বাধীন ফরাসী সরকারকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে হল নাৎসী জার্মানীকে। ফরাসী দেশের ৬ লক্ষের বেশি পুরুষ-শ্রমিক জার্মানীর বিভিন্ন কারখানায় নিযুক্ত ছিল। নানাভাবে জার্মানী ফরাসীদের শোষণ করে যাচ্ছিল। ফরাসী দেশে সুরু হল প্রতিরোধ আন্দোলন নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে। [ Ref. A History of Modern France : Vol. 3 : By Alfred Cobban. ]

## (খ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফরাসী দেশের পতন

(১)

ডানকার্কের ঐতিহাসিক পতনের পর এবার এল ফরাসী দেশের পালা। তখনও কিন্তু জার্মান-রুশ অনাক্রমণ ও সহযোগিতার চুক্তি বলবৎ রয়েছে। জার্মানী পশ্চাৎদেশ থেকে আক্রান্ত হচ্ছে না এই চুক্তির বলে। ৫ই জুন ৪০০ মাইল ফ্রণ্ট জুড়ে ব্যাপকতম জার্মান আক্রমণ সুরু হল—১৪৩ ডিভিসন জার্মান সেনাবাহিনী দিয়ে। এর বিরুদ্ধে ফরাসী দেশ মাত্র ৬৫ ডিভিসন সৈন্য

নিয়ে প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হল। ফরাসী সেনাধ্যক্ষ ও সেনাবাহিনীর উপরমহলে পরাজয়সুলভ মনোভাব পেয়ে বসেছিল। ১৪ই জুন প্যারিস শহরের পতন ঘটল। প্রধানমন্ত্রী রেঁনোদ্ বোঁরদোতে তাঁর সরকার স্থানান্তরিত করলেন। কিন্তু তারপরই তিনি পদত্যাগ করলেন। তাঁর জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হলেন মার্শাল পেঁতা ( ১৬ই জুন )। পেঁতা তার পরদিনই স্পেনের রাষ্ট্রদূতের মারফৎ সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। হিটলার তখন ফরাসী সরকারের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিতে ছাড়লেন না। তিনি তাঁর বন্ধু মুসোলিনির সাথে পরামর্শ না করে কিছু করবেন না। মুসোলিনিও যুদ্ধের বখ্রার জন্য অত্যন্ত লালায়িত।

নাৎসী জার্মানী কর্তৃক ফরাসী দেশ আক্রমণের পটভূমিতে ফরাসী দেশের সর্বহারা শ্রেণীর সাচ্চা শরিক ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি কি চোখে হিটলার-স্তালিন বন্ধুত্ব চুক্তিকে দেখেছিল সেটা একটু জেনে রাখা দরকার। নাৎসী আক্রমণের মুখে বিপ্লবী ফরাসী কমিউনিস্টদের আচরণ ও ভূমিকা কি ছিল সেটা জানা দরকার। এই চুক্তির সাফাই গেয়ে ফরাসী কমিউনিস্টদের খ্যাতনামা পত্রিকা 'L' Humanite'-এ কমিউনিস্ট নেতা থোরেজ ( Thorez ) ও ডুক্লস ( Duclos ) এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

"The signature of the Nazi-Soviet Non-Aggression pact on August 23, 1939 created the conditions for peace in Eastern Europe Daladier, Chamberlain, however, wanted war They encouraged the Polish Government to resist a peaceful settlement of the Danzig question. Then when Poland was attacked these fine fellows in Paris and London did not so much as lift a finger in its behalf. They lived in the hope that the course of military events in Poland would smash the Nazi-Soviet Non-Aggression pact and pit the Nazi Army against the Red Army. This hope has been disappointed". [ September, 1940—Special Number. ]

অর্থাৎ, এই নেতাদের মতে চুক্তি পূর্ব-ইউরোপে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। চেম্বারলেন ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়েরই যুদ্ধের জন্য দায়ী—হিটলার নন। তাঁরাই যুদ্ধ চেয়েছিলেন। তাঁরাই তৎকালীন পোল-সরকারকে ডানজিগ-সমস্যার সমাধানের সূত্ররূপে হিটলারের প্রস্তাব

নাকচ করতে ইন্ধন জুগিয়েছেন। আবার যখন পোল্যাণ্ড নাৎসী বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হল তখন ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার নীরব দর্শক সেজে রইলেন। তারা নাৎসী বাহিনীকে লালফৌজের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু হায়, সে আশা চূর্ণ হয়ে গেল।

ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির এই অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত চুক্তির সমর্থনে প্রথম ব্যাখ্যা ছিল: রাশিয়া তো ফরাসী দেশ ও গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গেই এই ধরনের একটা চুক্তি করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই দুই রাষ্ট্রই রাশিয়াকে তাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার কোনরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হয়নি। তারা বরাবরই জার্মানীকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে উদ্যত ছিল।

আক্রান্ত হয়ে পোল্যাণ্ড ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। তবু থোরেজ-এর মতে দোষটা পোল্যাণ্ডেরই। কেন সে হিটলারের বায়নায় সায় দিতে রাজী হল না?

ফরাসী কমিউনিস্টদের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ছিল: রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি করেছিল বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই। রাশিয়াই তো শান্তির দেশ। রাশিয়া সর্বহারাদের পিতৃভূমি। অতএব রাশিয়া যখন নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করেছে তখন সেটা শান্তিরই সহায়ক এবং তা সর্বহারা শ্রেণীরই সহায়ক।

তৃতীয় ব্যাখ্যা: রাশিয়া এই চুক্তি করে কিছুটা সময় হাতে পেয়ে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করার সুযোগ পেল। আর বিশ্ব-বিপ্লবের জন্য এই শক্তি-বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল।

এই তিনটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে একটির সঙ্গে অপরটির সঙ্গতি নেই। তর্কের খাতিরে যদি কোন একটি ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে সেই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে অপর দু'টিকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে হয়। অথচ ফরাসী কমিউনিস্টরা তিনটি ব্যাখ্যাকেই একসঙ্গে একই দলিলে উপস্থিত করেছিলেন। মরিস থোরেজ ও তাঁর অগণিত সহকর্মীরা প্রেরণা পেয়েছিলেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভের বক্তৃতা থেকেও।

মলোটভ ১লা আগস্ট (১৯৪০) এক ভাষণে বলেছিলেন:

"......Our relations have gone forward as envisaged in the pact. This pact, which the Soviet Government has observed to the letter has eliminated the very possibility of friction

between our two countries......It therefore provides Germany with assurance against difficulties on its eastern flank. The march of events in Europe, far from weakening the pact has underlined the importance of keeping it alive and of developing it further still. The foreign press particularly the press in England and the pro-English press everywhere has again recently indulged in speculation what possible difference between the Soviet Union and Germany . ...we and the Germans as well have on many occasions exposed this scheme and declared that we would have none of it······ the relations of friendship and good neighbourliness do not rest upon chance elements belonging to the immediate situation but upon deep-rooted interests of state—ours and Germany's."

ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি ফরাসী দেশ সম্বন্ধে হিটলারের আসল মনোভাব কি ছিল তা কি জানত না? তাঁর আত্মজীবনীতেই তিনি লিখেছিলেন:

"The pitiless mortal enemy of the German people is France now and in future. No matter who was or will be ruling in France, whether Bourbons. Jacobins, Napolionists or middle class democrats, classical republicans or Red Bolsheviks : the final goal of their foreign political activities will always be the attempt to seize the Rhine frontier and to secure this river for France by dissolving and smashing Germany." [ Mein Kampf ]

হিটলার ১৯২৬ সালের এক ভাষণে বলেছিলেন: [ Speech in Bamberg Conference of Leaders on February 14, 1926. ]

"France is permanently our nearest and most unconditional deadly foe for, its mentality always remains the same, whether its Govt. be nationalist, Marxist or democratic."

[ See "One Man Against Europe" By Knorad Heiden,
P. 75. ]

ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি চেয়েছিল অনুরূপ চুক্তি রুশ ও ফরাসী দেশের মধ্যে সম্পাদিত হোক, যখন ফরাসী দেশ জার্মান কর্তৃক আক্রান্ত হল পরাজিত ফরাসী দেশে আক্রমণকারী জার্মানীর সাহায্যে অনুরূপ চুক্তির বলে সেদেশে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির শাসন প্রবর্তিত হোক। জার্মানীর সঙ্গে কমিউনিস্ট রাশিয়ার কর্তৃত্ব বহাল থাকলে, রাশিয়ার তদ্বির থাকলে আক্রান্ত ফরাসী দেশে কমিউনিস্ট সরকার চালু করা সম্ভব। এই মানসিকতা সমগ্র 'বিপ্লবী' ফরাসী কমিউনিস্ট দলকে সেদিন পেয়ে বসেছিল। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে যখন জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে একটা পৃথক বাণিজ্য-চুক্তি হল তখন ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি এই ঘটনাকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করে সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির আর একটি বড় জয় বলে ঘোষণা করা হল ( of considerable importance—a further achievement of Soviet foregin policy —a genuine triumph )। ফ্যাসিস্ট জাপানের ও রাশিয়ার মধ্যে একটি আক্রমণ-চুক্তি ও বাণিজ্য-চুক্তি হল। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি এই ঘটনাকেও শান্তির জয়যাত্রা বলে বরণ করল। অথচ তখন চীন ভূখণ্ডে রক্তক্ষয়ী চীন-জাপান যুদ্ধ চলেছে। ( চীনের কমিউনিস্টরা তখন সর্বশক্তি পণ করে সাম্রাজ্যবাদী তৎকালীন জাপ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছিল। )

হিটলার-স্তালিন অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন এবং ফরাসী কমিউনিস্টদের এই চুক্তির অকুণ্ঠ সমর্থন ফরাসী দেশে এক চরম পরাজয়সুলভ মনোভাব সৃষ্টি করেছিল সেদিন। ফরাসী কমিউনিস্টরা তাদের অকারণ বক্তৃতা, ইস্তাহার, প্রচার ইত্যাদি দ্বারা জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধের মানসিকতা একেবারে চূর্ণ করে দিয়েছিল। নিজের দেশের পরাজয়ের অসম্মান তাদের অন্তরে বেদনা ও প্রতিশোধের মানসিকতা তৈরী করল না। যুদ্ধে নিজের দেশের পরাজয়কে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির পরাজয় এবং এ পরাজয় সর্বহারা শ্রেণী শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করবে বলে তারা অবিশ্বাস্য ঘৃণ্য প্রচারে মেতে ছিল সেই জাতীয় সঙ্কটের দিনে। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির ধ্যান-জ্ঞান ছিল সেদিন রাশিয়া। অথচ রাশিয়া ফরাসী কমিউনিস্টদের জন্য বিন্দুমাত্রও ভাবত না। ফরাসী কমিউনিস্টদের ধারণা ছিল ঠিক সময়মত রুশ সরকার ফরাসী কমিউনিস্টদের পক্ষ নিয়ে কথা বলবে জার্মানীর সঙ্গে এবং ফরাসী দেশে হয়ত কমিউনিস্টদের সঙ্গে জার্মান নাৎসীদের একটা বোঝাপড়া হয়ে যেতে পারে। ( ফরাসী কমিউনিস্টদের এই যুগের আত্মঘাতী আচরণ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন বিভিন্ন পুস্তকে A. Rossi বিশেষ করে তাঁর "A Communist

Party in Action"-বইতে। Rossi ইতালীয় সোস্থালিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। সেই দল-ভাঙার মুখে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। মুসোলিনি যখন রোম অভিযান করেন তখন Rossi রাশিয়ায় ছিলেন। তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। লেনিন, ট্রট্স্কী, স্তালিন, বুখারীন, র‍্যাডেক প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত থেকে একসময় কাজ করেছিলেন। ১৯২৮-২৯ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্য ছিলেন। ১৯২৯ সালের শেষভাগে কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।) নাৎসী জার্মান ও কমিউনিস্ট রাশিয়ার অনাক্রমণ চুক্তির পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত কমিউনিস্টদের ফ্যাসি-বিরোধিতা সর্বাত্মক ছিল। ফরাসী কমিউনিস্টরা স্তালিনকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঘোষিত বৈপ্লবিক সংগ্রামে মূল নেতা বলে মনে করতেন। সমগ্র ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণভাবে রুশ অনুগত ও নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

ফরাসী দেশ পরাজিত হবার অব্যবহিত পরই ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি একটি ইস্তাহারে পরাজয়ের জন্য দায়ী করল 'দুইশত পরিবার'কে—তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য, যারা বিশ্বাসঘাতকতা করল বিপ্লবের নামাবলী পরিধান করে তারাই বিচারকের ভূমিকা নিল। ইস্তাহারে বলা হল :

"People of France unite ! Fight for a government, the French people will suppoṙt ! Fight for a government that will strick at fascism and reaction ! Fight for a government that will strike at those who have betrayed the working class ! Fight for a government capable of coming to an immediate understanding with the Soviet Union for the re-establishing of peace the world ove". [18th June, 1940.]

জার্মান সেনাবাহিনী যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশের বুকের উপর তখন কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণী, বুদ্ধিজীবী ও যুব-সমাজকে মৃত্যুপণ করে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য আবেদন জানালো না কেন? ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এতকাল এত বক্তৃতা তাঁরা করলেন অথচ আসল সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে জাতির এই সর্বনাশ ডেকে আনতে সাহায্য করলেন কেন? তাঁরা আহ্বান জানালেন এমন একটা সরকার গঠন করা হোক, যে সরকার রাশিয়ার সঙ্গে অন্তত মীমাংসায় আসতে পারবে বিশ্বে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য।

কমিউনিস্ট রাশিয়া তো জার্মানীর তখন অকৃত্রিম দরদী মিত্র। ফরাসী কমিউনিস্টরা রাশিয়া ও রুশ-স্বার্থকে তাদের জপের মালার রুদ্রাক্ষ করে

রেখেছিল। তাহলে এ হেন বিশ্বস্ত অনুগামী ফরাসী কমিউনিস্টদের ও তাদের নেতৃত্বাধীন ফরাসী দেশের সর্বহারাশ্রেণীকে আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই বা কমিউনিস্ট রাশিয়া এগিয়ে এল না কেন? কেন সেদিন জার্মানীর ঔদ্ধত্যের যোগ্য জবাব রাশিয়া দিল না? কেন সে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল সেদিন? পরিষ্কারভাবে আবার প্রমাণিত হল, রাশিয়ার স্বার্থ আর পৃথিবীর অন্যদেশের সর্বহারাদের স্বার্থ সব সময় এক নয়। তা যদি হত তাহলে ফরাসী কমিউনিস্টদের পাশে রুশ লালফৌজ সেদিন এসে দাঁড়াতই।

ফরাসী জাতির এই শোচনীয় পরাজয়ের পর ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি কর্মীদের প্রতি যে-সব নির্দেশনামা জারী করেছিল তার একটি নমুনা উদ্ধৃত করা যাক:

"French imperialism has just sustained greatest defeat in its history. In every imperialist war the real enemy is within, and that enemy in France is today stretched full length on the ground. The working class not only in France but the world over should regard this development as a victory for its interests because it means one enemy less.

...To put it briefly, the interests of the French people coincide with those of German imperialism in the latter's struggle against French imperialism; and it is not, from this point of view, too much to say that for the moment German imperialism is the French peoples ally. The man who does not grasp this is no revolutionary." ( June, 1940 )

[ "A Communist Party in Action" By A. Rossi, P. 15. ]

( অনুরূপ নির্দেশ ফরাসী কমিউনিস্ট নেতা থোরেজ এডুক্লোস "Letter to Communist Militants" শিরোনামায় জারী করেছিলেন। )

ফরাসী কমিউনিস্ট তত্ত্ব-বিশারদদের মতে:

ফরাসী জাতির এই শোচনীয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ইতিহাসে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের চরমতম পরাজয়ই সূচিত হয়েছে। প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রকৃত শত্রু জাতির ভিতরেই, দেশের অভ্যন্তরেই থাকে। ফরাসী দেশে সেই শত্রু আজ সম্পূর্ণ ধরাশায়ী। এই পরাজয়কে ফরাসী দেশের শ্রমিকশ্রেণী শুধু ফরাসী দেশেই কেন, সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী তাদের স্বার্থেরই জয় সূচিত

করেছে। কেননা ইতিহাসের একটা শত্রু তো খতম হল! আজ জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ফরাসী জনগণেরই সত্যিকারের বন্ধুর কাজ করে দিয়ে গেল। এখানে ফরাসী জনগণের স্বার্থ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের মালা-বদল হল। যিনি এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারেন না তিনি কখনই 'বিপ্লবী' বলে গণ্য হতে পারেন না।" অদ্ভুত যুক্তি! যে জাতি আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে প্রচণ্ড মার খেয়ে নিজের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব খোয়াল—সে জাতিকে এই পরাজয়কে তার বিপ্লবী স্বার্থের জয় বলেই মনে করে নিতে হবে? কি আত্মঘাতী জাতি-বিধ্বংসী মতবাদ! নাৎসী জার্মানীর বর্বর আক্রমণের মুখে জীবন দিয়ে প্রতিরোধ না করে জাতির পরাজয়কে ত্বরান্বিত করতে যে রাজনৈতিক দল সাহায্য করল সেই দল এই মর্মন্তুদ অপমানকে ফরাসী ও বিশ্বের শ্রমিক-শ্রেণীর সহায়ক কাজ বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করল না! নাৎসী বাহিনীকে ইউরোপে হিটলার-স্তালিন মৈত্রীচুক্তির আড়ালে প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসের ও নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন করতে দিয়ে ইউরোপ তথা ফরাসী দেশের সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছিলেন স্তালিন। এরই নাম মার্কসীয় ডায়েলেক্‌টিক। তাই সহজেই উপলব্ধি করা যায় জার্মান আক্রমণের মুখে ফরাসী দেশের কমিউনিস্টদের কি কুৎসিত ভূমিকা ছিল। ভারতবর্ষের প্রতিটি স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের কমিউনিস্টরা রাশিয়ার স্বার্থে দেশের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষেই কাজ করে এসেছেন। এ সম্বন্ধে আমার অন্য একটি বই-এ আলোচনা করেছি। [মার্কসবাদ-লেনিনবাদ—তত্ত্বে ও প্রয়োগে।] যাঁরা জাতীয় কংগ্রেস ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী সংগ্রামের সহায়ক ছিলেন, ভারতের তথা বাংলার কমিউনিস্টরা তাঁদের ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের সাথে হাত মিলিয়ে গ্রেপ্তার করিয়ে দিয়েছে। যাঁরা মুক্তিসংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের ফ্যাসিস্ট বলে চিত্রিত করেছে।

ফরাসী জাতি যখন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল, সমগ্র জাতির সম্মান ভূলুণ্ঠিত হল তখন কমিউনিস্টরা ভিশি সরকারের ( Vichy Government ) সহযোগিতায় ফরাসী দেশের 'পুনর্জন্ম' পুনর্গঠনের দাবী তুললেন ( Re-birth or Restoration of France )। দাবী জানান হল ফরাসী দেশের সকল কলকারখানা, দোকানপাট এখনি খোলা দরকার, কাজ চালু করতে হবে ( Every shop in France resume production at once ; getting France back to work etc. )

[ভারতে ঐতিহাসিক 'আগস্ট-বিপ্লবে'র সময় ভারতের অবিভক্ত

কমিউনিস্ট পার্টি অনুরূপ কর্মসূচী নিয়েছিলেন। ইংরাজ সরকার সৃষ্ট পরিকল্পিত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ যখন পথে মৃত্যুর মিছিল রচনা করেছিল তখন বাংলার বুকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতায় শহরে শহরে লঙরখানা খুলে খিচুড়ি পরিবেশন করে বিপ্লবের আগুনে ঠাণ্ডা জল সিঞ্চনে ব্যস্ত। লাখে লাখে মানুষ না খেয়ে মরেছে—জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতারা, বামপন্থী বিপ্লবীরা তখন ব্রিটিশ কারাগারে। কমিউনিস্টরা অগণিত খাবারের গুদামে খাদ্যশস্য মজুত থাকা সত্ত্বেও গুদাম ভেঙে খাবার বার করে মানুষকে বাঁচাবার আবেদন সেদিন জানায়নি। কেন এই আবেদন জানায়নি? কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কোনক্রমে ভারতের কমিউনিস্টরা বিব্রত হতে দেবে না। কেননা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বিব্রত হলে যুদ্ধের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে, রসদ সরবরাহ ব্যাহত হবে, তাতে তো রাশিয়ার ক্ষতি হবে। তাই কমিউনিস্টরা ইংরেজের সহযোগিতায় বাংলায় লঙরখানা খুলে খিচুড়ি পরিবেশনের বৈপ্লবিক মার্কসীয় লেনিনবাদী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল! নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেদিন ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম পরিচালনা করছেন তাঁর মুক্তিবাহিনী নিয়ে। সুভাষচন্দ্র তখন ইংরেজের সবচেয়ে বড় শত্রু। সুভাষচন্দ্রের বাংলাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী বাঙালীদের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে দেবার জন্য ব্রিটিশ সরকার অবিভক্ত বাংলায় চক্রান্ত করে বঞ্চনার নীতি অনুসরণ করে (Denial Policy) ইতিহাসের এই ঘৃণ্যতম পরিকল্পিত বাংলার দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিল। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছিল সেদিন। কমিউনিস্টরা এত বড় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। খিচুড়ি পরিবেশন, লাইনে বসে কোনরকম বিশৃঙ্খলা না করে ইংরেজ প্রভুর অসুবিধা সৃষ্টি না করে মুখ বুজে অল্প খিচুড়ি ভক্ষণের পরামর্শ, দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহযোগিতা, এই সব কথা দেশবাসীকে শোনান হয়েছিল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর সৃষ্ট আজাদ হিন্দ্ ফৌজ যখন মরণ-পণ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বুক থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে উৎখাত করার জন্য বিপ্লবী সংগ্রামে লিপ্ত, তখন ভারতের কমিউনিস্টরা সেই মহাবিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে 'ফ্যাসিস্ট' বলে জনমানসে চিত্রিত করে সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক স্বার্থকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছিলেন।

এই সময় রুশ নেতরাও ফরাসী কমিউনিস্টদের ও অন্যান্য কমিউনিস্টদের

অনুরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোনমতেই যেন রুশ-জার্মান মৈত্রীতে এতটুকু ফাটল না ধরে। মলোটভ ১৯৪০ সালের ১লা অক্টোবর এক ফারমান জারী করলেন :

"The French people now confront the difficult task of rebuilding their country. First, they must heal the wounds they have sustained in the war ; then they must devote themselves to reconstruction. But this regeneration cannot be accomplished by familiar methods "

মলোটভও ফরাসী কমিউনিস্টদের দেশ 'পুনর্গঠনের' কাজে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানালেন। আক্রমণকারীদের সহযোগিতায় এক কাঠপুতুল সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পরাধীনদেশে 'মুক্তি আন্দোলন' 'বিপ্লবী প্রতিরোধ আন্দোলনের' পরিবর্তে কিনা দেশ পুনর্গঠনের কাজ! পরাধীন ভারতবর্ষে—বিপ্লব-প্রস্তুতি, মুক্তি-আন্দোলন জোরদার করার কাজ ছেড়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে মদত দিতে হবে! সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ তাই 'জনযুদ্ধে' রূপান্তরিত হল। কেননা, তাতে যে রাশিয়ার স্বার্থ জড়িত ছিল। সেদিন ইংরাজ সরকার ভারতে বিপন্ন হলে রাশিয়ার বিপদ ছিল। সেদিন কিন্তু ভারতের জাতীয়তাবাদীরা 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে এক পাই-ও না এক ভাই-ও না,' ('not a man not a pie in this imperialist war') 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' এই ধ্বনি তুলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন চালিয়েছিলেন। অগণিত মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দিয়েছে। হাজার হাজার বীর কারাবরণ করেছিলেন। নেতাজী সুভাষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীন 'আজাদ হিন্দ' সরকার প্রতিষ্ঠিত করে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়েছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধারা যখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিলেন তখন ভারতের কমিউনিস্টরা ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পূর্ণ সহযোগিতা করার আহ্বান জানালেন (All for the successful prosecution war)। যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নির্মমভাবে ভারতবাসীর রক্তশোষণ করছিল তখন ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার-শোষণ-লুণ্ঠন ভুলে গিয়ে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকা ভারতবাসীর কাছে তুলে ধরার রাজনীতিতে মত্ত হয়েছিল। অথচ সেই সময় জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে কমিউনিস্ট রাশিয়ার এক অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। 'সাম্রাজ্যবাদী

যুদ্ধ' রাশিয়ার যাদুস্পর্শে ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে 'জনযুদ্ধ'রূপে রূপান্তরিত হয়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশ রক্ষার লুঠের বখরা ভাগাভাগির লড়াই কিনা ভারতের কাছে 'জনযুদ্ধ'রূপে (Peoples' war) দেখা দিল! প্রকৃতপক্ষে ভারতের জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক 'জনযুদ্ধে' আত্মনিবেদন করেছিলেন। ফরাসী দেশেও যখন নাৎসী জার্মানী সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের লক্ষ্য সামনে রেখে সে দেশের স্বাধীনতা হরণের কাজে ব্যাপৃত, তখন ফরাসী দেশের সমকালীন ইউরোপের সর্ববৃহৎ ও সংগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি আক্রমণকারী জার্মান সরকারের বিরুদ্ধে জনতার ঘৃণা, ক্রোধ ও প্রতিরোধের আগুন প্রজ্বলিত না করে দলের নেতা থোরেজ ও ডুক্লোর নেতৃত্বে 'The enemy is within' অর্থাৎ জাতির আসল শত্রু নাৎসী জার্মানরা নয়— ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার নেতারা—এই আওয়াজ তুললেন। [জার্মান কমিউনিস্ট নেতা কার্ল লিবনীখ্‌ট্‌ একদিন নিজের দেশে এই শ্লোগান তুলেছিলেন।]

ফরাসী কমিউনিস্টরা দু'মুখো নীতি অনুসরণ করে চলছিলেন:

(১) নাৎসী জার্মানীর দখলদার বাহিনী ও তাদের ফরাসী দেশ দখলের কুৎসিততম কাজকে সহনশীলতার দৃষ্টিতে দেখা আর এই সহনশীলতার ঘুষ দিয়ে নাৎসীদের কাছ থেকে ফরাসী দেশে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায় করা রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায়,—সেইসঙ্গে (২) ফরাসী জাতির মনে যে জার্মান বিদ্বেষ ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়েছিল তলে তলে সেটাকেও চতুরভাবে কাজে লাগান। অর্থাৎ যাতে দু'কূলই বজায় থাকে।

কারা ফরাসী দেশের এই পতনের জন্য দায়ী? ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করলেন:

"In our country the guilty ones are the two hundred families plus their confidential agents who head up the political parties that form a holy alliance at the beginning of every war." [১৯৪০ সালের জুন মাসে প্রকাশিত পার্টির একটি পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃতি—See: A Communist Party in Action: P. 70, By A. Rossi.]

## (গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি ও জাতীয় স্বাধীনতা

১৯৩৯-৪০ সালে ব্রিটিশ ও ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধ-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী মূলত একই ছিল বলা যেতে পারে। তবে দুই দেশের দুই কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা একরকম ছিল না। ব্রিটেনে কমিউনিস্টদের শক্তি উল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু ফরাসী দেশে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি ছিল একক সর্ববৃহৎ দল। সুতরাং সেই দলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ভূমিকার প্রভাব গোটা দেশে ও জনমানসে ব্যাপক হতে বাধ্য। তাই ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ে আলোচনার বিশেষ গুরুত্ব আছে। দেশের বামপন্থী ও বুদ্ধিজীবীরা এই দলের জঙ্গী বামপন্থী স্লোগান ও বিজ্ঞাপিত বক্তব্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, হিটলার-স্তালিন মৈত্রীচুক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব যতটা ফরাসীদের ওপর এসে পড়েছিল ততটা ব্রিটিশ কমিউনিস্টদের ওপর এসে পড়েনি। তৃতীয়ত, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ও অনুরাগীরা আগাগোড়াই রাশিয়া ও স্তালিনের অন্ধ স্তাবকতার পরিবেশ ও মানসিকতার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিলেন।

যুদ্ধের সুরুতেই দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দিল। অনেক সদস্য দল পরিত্যাগ করলেন। একজন সেনেটার পদত্যাগ করলেন। পলিটব্যুরোর সদস্য Marcel Gitton পদত্যাগ করলেন। পরে এঁকে পুলিশের চর বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। দলের মধ্যে একটা সঙ্কট দেখা দিল। যুদ্ধ ও দেশ-সম্পর্কিত দলের নীতি নিয়ে সর্বত্র প্রশ্ন ও বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছিল। দলের নেতারা খুব অসুবিধায় পড়ে গেলেন। কিন্তু ঠিক সময় ফরাসী সরকার দলের পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ করলেন। দলের ওপর নিষেধাজ্ঞার ফাঁস নেমে এল। ফলে জনসাধারণকে নানাবিধ জটিল প্রশ্নের জবাব দেবার গুরু দায়িত্ব থেকে দল রেহাই পেয়ে বেঁচে গেল।

দলের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে তারা বা সেইসব গোষ্ঠী কোন সমর্থন বা সাড়া পাননি। তার ওপর তড়িঘড়ি করে ধর-পাকড় সুরু হয়ে গেল। ফলে বিদ্রোহ চাপা পড়ে গেল। সরকারই কমিউনিস্ট প্রভাবকে বাঁচিয়ে রেখেছিল নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা। বরকেনো এই প্রসঙ্গে আক্ষেপ করে বলেছেন:

"France was rapidly approaching the worst collapse of her history. No wonder that during a period of deep dis-

integration, French society could not succeed in integrating into the national body politic so vast a movement of revolt."

[ European Communism—P. 298. ]

দেশের প্রতি কর্তব্য ও বিবেকের আহ্বানে এই যে একটি বিপুল শক্তি বিদ্রোহ করেছিল—জাতির এই বিশৃঙ্খলা ও অবক্ষয়ের মুখে তাকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত করতে ব্যর্থ হল ফরাসী সমাজ। জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। আমলাতান্ত্রিক নেতিবাচক ও চিরাচরিত নিপীড়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গী সেদিনের শাসকগোষ্ঠী আঁকড়িয়ে ধরে ছিলেন।

১৯৩৯ সালের যুদ্ধের সূচনাতে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি "Humanite" পত্রিকায় ঘোষণা করেছিল :

"If Hitler dare to take the step he is contemplating the French Communists, who never ceased to proclaim the indivisibility of peace and to preach firmness against any fascist aggression will be in the first ranks of the dependers of the independence of nations of democracy, and of the threatened French republic..."

তখনও পর্যন্ত পার্টি পোল্যাণ্ডের অনুকূলে মনোভাব ব্যক্ত করছিল। এখানে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা পোল্যাণ্ডের জন্য চোখের জল বর্ষণের ব্যাপারে ব্যঙ্গ করতে দ্বিধা করেনি। কমিউনিস্ট সেনেটার Cachin দলের সভ্যদের আবেদন জানালেন এই মর্মে :

"The French Communist Party declares that the French workers are confronted with an elementary duty : to accept the military measures requested by the government for the defeat of Hitler and the safety of the country. We repeat that French Communist are and will always be in the first ranks of the fighters against the author of the criminal attempt against peace. The mobilised Communist deputies, with Maurie moreover at their head, have joined their units."

বলা হল : ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে দেশের শ্রমিক-শ্রেণী আজ এক মৌল কর্তব্যের সম্মুখীন। সরকার প্রতিরক্ষার জন্য যে-সব সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করেছে হিটলারকে পরাজিত করার ও দেশের নিরাপত্তার

জন্য সেগুলি সমর্থন করতে হবে। ফরাসী কমিউনিস্টরা দাবী করছে যে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শান্তির শত্রু নাৎসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা প্রথম সারির যোদ্ধারূপেই পরিচিত হবে।

পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট আচরণ থেকে অনেকের ধারণা হয়েছিল সরকারী দমননীতির হাত থেকে বাঁচার তাগিদেই এত সুন্দর সুন্দর কথা বলা হয়েছিল। কেননা, রাশিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার পরই রাজনীতি নূতন মোড় নিল ফরাসী দেশে। ফরাসী কমিউনিস্ট নেতা Raymond Guoyt মস্কো থেকে নূতন ফারমান নিয়ে ফিরে এলেন (২০শে সেপ্টেম্বর)। এখন থেকে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি নিজের দেশের সরকারের নিন্দায় নেমে পড়লেন। ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারকেই যুদ্ধের জন্য দায়ী করা হল। শুধু তাই নয়—দাবী তোলা হল, এখনই শান্তি চাই, যুদ্ধ চাই না। হিটলারের নিন্দা করা হল না। এই পরিস্থিতিতে 'Immediate peace'—আশু শান্তির অর্থই হল হিটলারের কাছে আত্মসমর্পণ। এই বিশ্বাসঘাতক রাজনীতির প্রতিবাদে ব্যাপক হারে দলের সভ্যরা দলত্যাগ করতে লাগলেন। এর আগে দল দেশাত্মবোধক মনোভাব নেওয়ায় মস্কো ক্ষুব্ধ হন এবং দলের নেতৃত্বকে তিরস্কার করেন। ঠিক ব্রিটেনেও ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা হ্যারি পলিট ও ক্যামবেল অনুরূপভাবে তিরস্কৃত হন। এর আগে ফরাসী দেশের পার্লামেণ্টে (Chamber) দলের সভ্যরা যুদ্ধের ব্যয়-মঞ্জুরী প্রস্তাব সমর্থন করার অপরাধেও তিরস্কৃত হলেন। বলা হল:

"Grievous mistakes have been committed. There was no appeal to the workers vigorously to depend the party and its press. The parliamentary group foiled to use the only meeting of the Chamber for a protest against Daladier's and the Socialist, policy of reaction and war. It voted the war creditor. The Central Committee failed to understand the significance of the sudden change in the international situation at the end of August and at the beginning of the war. Since Hitler had been obliged to renounce the idea of war against the U.S.S.R. the imperialist provocator's of Paris and London engaged themselves in a conflict with Germany. Therefore they could no longer be any question

of a peace front, of collective security or of mutual assistance."

১লা অক্টোবর দলের পার্লামেণ্টারী গ্রুপের দুই নেতা Florimond Bonte এবং A. Ramette পরিষদীয় গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে স্পীকারকে চিঠি লিখে পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বানের দাবী জানালেন। কেননা, এই সভায় একটি শান্তির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে হবে। প্রশ্ন উঠল: হিটলার কোন শান্তির প্রস্তাব দেননি, ফরাসী সরকার কিছুই জানল না—অথচ ফরাসী কমিউনিস্টরা জার্মানীর অন্দরমহলের খবর কি করে রাখল? আশ্চর্যের বিষয়, এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই হিটলারের কাছ থেকে যুদ্ধ বন্ধের এক প্রস্তাব এল। যার ভিত্তি হল পোল্যাণ্ডের ধ্বংসসাধন ও তার স্বাধীনতা হরণ কার্যকে সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া। কমিউনিস্টরা এই শান্তি-প্রস্তাবের জন্য পার্লামেণ্টের বৈঠক আহ্বানের দাবী জানিয়েছিলেন। শুধু চরম বিশ্বাসঘাতকতার রাজনীতি। দলের নেতা মরিস থোরেজ সেনাবাহিনী থেকে সরে দাঁড়ালেন। হাজার হাজার ইস্তাহার বিলি করে সকলকে জানান হল থোরেজ যুদ্ধে যাবেন না সৈনিক হিসাবে, কেননা এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ—এ যুদ্ধ জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে। প্রত্যেক সৈনিককে সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে আসার উস্‌কানি ও প্ররোচনা দেওয়া হল। কমরেড থোরেজ বেলজিয়াম যান এবং সেখান থেকে যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার অভিযান (anti-war propaganda) চালাতে থাকেন কিছুকাল—হিটলার ও নাৎসী দস্যু-রাজনীতির সহায়করূপে। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন অন্যান্য নেতারা। যেমন, Duclos, Ramette, Monmonsseau, Fajon, Guyot, Peri, Semard, Andre Marty এবং আর একজন নেতা মস্কো পালালেন। সেখান থেকে নিজ দেশের ও সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার চালাতে লাগলেন। ২১ জন পার্লামেণ্ট সদস্য দল থেকে ইস্তফা দিলেন দেশদ্রোহী ভূমিকার প্রতিবাদে। দলের উপর নিপীড়ন নেমে এল। ৩৪ জন চেম্বার-সদস্য গ্রেপ্তার হলেন। ১৭ জন চেম্বার-সদস্য আত্মগোপন করলেন। ফরাসী দেশের কমিউনিস্ট বিশ্বাসঘাতকতা বামপন্থী বিপ্লবী রাজনীতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় অধ্যায় বলেই ঘৃণিত হবে।

এদের প্ররোচনায় সেনাবাহিনী থেকে দলে দলে সৈনিকরা পালিয়ে আসতে থাকে। এরই সাথে সাথে সাবোতাজ—অন্তর্ঘাতমূলক কাজ শুরু হয়ে গেল। "When they prompted sabotage of war production they instigated real acts of sabotage. A frighteningly large part

of the armaments issuing from Paris factories whose workers were under Communist influence were duds, or worse, were sabotaged so as to produce mortal accidents···The generals were convinced that Communist propaganda was the major factor in the rapid collapse of the army." ( Borkeneu, P. 304. ) অস্ত্র-নির্মাণ কারখানা থেকে যুদ্ধের জন্য যে-সব অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হয়েছিল রণাঙ্গনের জন্য সেগুলো অকেজো করা হচ্ছিল সাবোতাজ নীতি অনুসরণে। কি ভয়াবহ, কি কুৎসিত চক্রান্ত! নাৎসী জার্মানী থেকে কমিউনিস্টদের দেশাত্মঘাতী ইস্তাহার, প্রচারপত্র ছাপা হয়ে আসছিল এও আর আজ অজানা নেই। হিটলার ও স্তালিন দুই নেতাই সাম্রাজ্যবাদীদের ভর্ৎসনা করে চলেছেন, আর-এক মুখে আবার শান্তির দাবী জানিয়ে যেতে লাগলেন।

ফরাসী জাতির সঙ্কট মুহূর্তে ( ১৯৪০, জুন—১৯৪১, ২২শে জুন ) ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি শান্তির জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। মুখে জাতির মুক্তির সঙ্কল্পের কথা বলা হত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাইরে থাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। সাম্রাজ্যবাদী অক্ষশক্তি (Axis Power) ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থের লড়াইয়ের বাইরে ফরাসী দেশকে রাখার জন্য পার্টি অবিরাম প্রচার চালিয়েছিল। 'যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই' শ্লোগান উঠল ( "our cities and factories will become targets for aerial bombardment and the people will once more pay in blood and tears for the criminal policy of governments made up of scoundrels and traitors" )। দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল আমরা শান্তি চাই। আর সেই শান্তি দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবে। এর জন্য চাই 'জনগণের সরকার' প্রতিষ্ঠা (Govt. of the people)। নূতন ন্যাশন্যাল ফ্রন্টের হবে সেই লক্ষ্য। একথার মধ্যে যে শূন্যতা ও প্রচণ্ড ফাঁকি ছিল সেটা কি বুঝতে কোন অসুবিধা হয়? ধরা যাক, এইরূপ ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট একটি কমিউনিস্ট আকাঙ্ক্ষিত জনগণের সরকার স্থাপনে সফল হল কোনপ্রকারে। প্রশ্ন করা যাক, তখন এই জনগণের সরকারের নীতি ( Policy ) কি হবে যুদ্ধ সম্পর্কে? এই জনগণের সরকার কি জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে? নিশ্চয়ই নয়, কেননা, ফরাসী কমিউনিস্টদের অন্যতম Our chief objective in our fight for peace must be this: to prevent our people,

our national resources, territory from being used in the conflict between Germany and England". অর্থাৎ 'আমাদের অন্যতম মূল লক্ষ্য জার্মানী ও ইংলণ্ডের সংঘর্ষে কোনমতেই আমাদের দেশের সম্পদ রসদ সৈন্য ব্যবহৃত হতে দেব না। আমাদের ভূখণ্ডে যুদ্ধের আগুন ছড়াতে দেব না।' ফরাসী কমিউনিস্টদের শ্লোগান ছিল : "Neither Churchill nor Hitler, neither London nor Berlin, neither a British dominion nor a German protectorate." দ্য গলের নিন্দাধিকারে কমিউনিস্টরা মুখর। তিনি নাকি দেশের শত্রু। দ্য গল কিন্তু তাঁর দলবল নিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়েই যাচ্ছেন। কমিউনিস্টরা তখন 'peace' (শান্তি) ও 'absolute neutrality' (সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার) শ্লোগান দিচ্ছে : "The agents of de Gaulle (that in the resistance hurvent within France) who are determined to get Frenchman killed in order to help England in its war with Germany."

আসল কথা হল জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে স্তালিন বিব্রত হবেন, তাঁর দেশ অসুবিধায় পড়বে। হিটলারের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে রাশিয়ার অনেক সুবিধা হয়েছে। ফরাসী জনগণকে রুশ জাতীয় স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলির ছাগ হতে হবে যে! অথচ এই একই ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি সেই একই নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ১৯৪১ সালের ২২শে জুনের পর অন্য মূর্তি ধারণ করল। তখন কিন্তু জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পরম বন্ধুরূপে বুকে জড়িয়ে ধরতে দ্বিধা করেনি। যে দ্য গলের বিরুদ্ধে এত বিষোদ্গার করেছিল সেই দ্য গলের নেতৃত্বে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি দেশের হৃত স্বাধীনতা পুনরুজ্জীবনের জন্য মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে এই প্রতিক্রিয়াশীল নেতা দ্য গলই জাতির প্রকৃত পরিত্রাতা ও পুরাণপুরুষরূপেই ফরাসী জাতির হৃদয়ে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসন অর্জন করেন। আর ইতিহাসে যে দল বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সেই দলই ফরাসী বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকাররূপে চিহ্নিত হল।

একদিকে এই বিপ্লববাদী দলটি শান্তি ও স্বাধীনতার নামে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে, অপরদিকে শুধু দ্য গল-পন্থীদের বিরুদ্ধাচরণ করেই ক্ষান্ত হয়নি—অন্যান্য সমাজতন্ত্রী ও প্রগতিশীল দলগুলিকে বিভেদপন্থী রাজনীতি দিয়ে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করার চেষ্টা করেছে। রাজনৈতিক বিদ্বেষ আর অন্তঃসারশূন্য বামপন্থী তত্ত্বকথার দ্বারা যাঁরা নিজেদের বিচারকে প্রভাবান্বিত না

হতে দিয়ে ইতিহাসের বাস্তব বিশ্লেষণ করবেন তাঁদের কাছে দ্য গল ফরাসী জাতির ইতিহাসে এক অনন্যসাধরণ ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত হবেন। যিনি নিজের জাতি ও দেশকে দু'-দু'বার মহাসঙ্কট থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতিহাসে খুব কম নেতার জীবনেই এই সৌভাগ্য ঘটেছে। দেশের হৃত স্বাধীনতা ছিনিয়ে দেশকে নাৎসী শাসন-মুক্ত করেন। আবার দেশকে নাৎসী-কবল থেকে মুক্ত করে (After victorious entry of frer French forces in to Paris) ফরাসী দেশের চতুর্থ প্রজাতন্ত্রকে (Fourth Republic) গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। দেশ নাৎসী-কবলমুক্ত হবার পর দ্য গল রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন সম্পূর্ণ হতোদ্যম হয়ে। দু'টি পরিস্থিতিতেই দ্য গল জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর দেশকে বাঁচিয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে নাৎসীদের সহযোগিতায় ফরাসী দেশে যে তাঁবেদার সরকার গঠিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে দ্য গলের বীরত্বব্যঞ্জক দেশপ্রেমিক ভূমিকা অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। [See,. Call of Honour, by de Gaulle.] নরওয়ে থেকে গ্রীস—ইউরোপের সর্বত্র দ্য গলের এই দেশপ্রেম নতুন প্রেরণা জুগিয়েছিল ইউরোপের সেই ঘোর অমানিশার মুহূর্তে।

ইউরোপের এই দুর্দিনে (১৯৪১ সালের ২১শে জুন পর্যন্ত) বামপন্থী কমিউনিস্টদের কাছ থেকে দেশভক্তরা কোনই প্রেরণা পাননি। তাঁরা স্তম্ভিত হয়েছিলেন কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকার ভূমিকা দেখে। দ্য গলের চরিত্রের বহু দোষ-ত্রুটি ছিল আরও অনেক বড় বড় বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী নেতাদের মত। অনেক মারাত্মক ভুলও তিনি করেছেন রাজনৈতিক জীবনে। পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের (Fifth Republic) তিনিই প্রতিষ্ঠাতা এবং ধীরে ধীরে একনায়কতন্ত্রীর ভূমিকা নেন। ফরাসী দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির জন্যও তাঁর দান অনস্বীকার্য। ন্যাটোর (NATO) কবল থেকে তিনি ফরাসী দেশকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। এর জন্য খুব বেশি সাহসী চরিত্রের প্রয়োজন হয় না। কমিউনিস্টরা, ফরাসীর দ্বিধাবিভক্ত সোস্যালিস্টরা যেখানে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেখানে দক্ষিণপন্থী 'প্রতিক্রিয়াশীল' দ্য গল দেশ ও জাতির জন্য সঙ্কটের দিনে কি করেছিলেন ইতিহাসের ছাত্ররাই খোলা যুক্তিবাদী মন নিয়ে তা বিচার করে দেখবেন।

দৃশ্যপটের পরিবর্তনের সাথে সাথে দলের সুরও পালটিয়ে গেল। আর ফরাসী দেশের 'অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের' কথা নয়—আর জনগণের নতুন

আকারের দাবী নয়, আর যে কোন মূল্যে আশু শান্তির দাবী নয়। শত্রু ঘরের ভিতরেই—'Enemy is within' এই তত্ত্ব কর্পূরের মত কোথায় উবে গেল, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী উদ্গিরণও থেমে গেল। পার্টি থেকে নতুন করে ন্যাশন্যাল ফ্রন্টের দাবী উঠল; সুরু হল জাতীয় ফ্রন্টের রাজনীতি। দেশাত্মবোধক শ্লোগান উচ্চারিত হল দলের পক্ষ থেকে:

"Struggle for wage increased, obstruct requisitions, diminish production for the occupying forces, demand more bread, more meat, more soap, prevent requisition, embarrass wherever you can the Vichy Government so as to overthrow it." [ Humanite, 12th August, 1941. ]

প্রশ্ন করা যেতে পারে ভারতবর্ষে ১৯৪২ সালে যখন জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী বামপন্থীরা বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিসংগ্রামে ( Quit India Movement ) লিপ্ত ছিলেন তখন ভারতের কমিউনিস্টরা কোন্ যুক্তিতে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থে যুদ্ধের সাফল্যের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন? কেন তাঁরা ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদীদের ব্রিটিশ সরকারের হাতে ধরিয়ে দেবার কুৎসিত চক্রান্তে মেতে দেশের সর্বনাশ করেছিলেন? কেন জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় কংগ্রেস ( National Congress )-এর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্ট ও তার স্বার্থে পুষ্ট সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলীম লীগ দলকে মদত জুগিয়েছিলেন? কেন অখণ্ড ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন? [ 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ—তত্ত্বে ও প্রয়োগে' দ্রষ্টব্য ]

ফরাসী দেশে দ্য গলের নেতৃত্বে ( National Committee ) যে নূতন মুক্তিসংগ্রাম সুরু হল তাতে এই ফরাসী কমিউনিস্টরাই আবার ধীরে ধীরে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাদের 'জাতীয় ফ্রন্ট' প্রকৃতপক্ষে দলীয় সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দলের প্রভাব ক্রমশই এত দ্রুত বাড়তে থাকে যে, দ্য গল আশঙ্কা করেছিলেন নাৎসী-মুক্ত ফ্রান্স হয়ত বা শেষ পর্যন্ত রুশ-পরিচালিত ফরাসী কমিউনিস্টদের কবলে চলে যাবে।

ফরাসী কমিউনিস্টদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীই পালটিয়ে গেল, যে মুহূর্তে জার্মানী সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করে বসল ( ১৯৪১, ২২শে জুন )। জার্মানী যে তলে তলে রুশদেশ আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিল সেকথা ব্রিটিশ সরকার তাদের প্রচার-মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানাচ্ছিলেন। তখন ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং

করপোরেশনের সেই প্রচার যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি সেটা দেশবাসীকে বোঝাতে কসুর করেনি।

"The English Radio misses no opportunity to inform its listeners of the imminence of a Nazi-Soviet conflict. The Moscow Radio, level headed as always, gives the lie to reports of a German ultimatum ...." [ L' Humanite, June 22 issue. ]

রাশিয়া আক্রান্ত হবার সাথে সাথে কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'জাতীয় ফ্রন্ট' ( National Front ) গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপরই শুধু জোর দিল না, শ্রেণী-সংগ্রাম—সর্বহারা শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ তত্ত্ব সব বিসর্জন দিয়ে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী-চেতনাকে চাঙ্গা করতে সচেষ্ট হল। দলের পক্ষ থেকে বলা হল :

"We refer to the necessity of organising a vast National Front that will bring together all Frenchmen who think like Frenchmen and wish to act like Frenchmen—which means in the present situation, helping the U.S.S.R., defeat Hitler, since victory for the land of the Soviets is a precondition of France's liberation"

বিপদে পড়ে পরিত্রাণ পাবার সময় জাতিতত্ত্ব—জাতীয় সত্তা—জাতীয়তাবাদ-দেশপ্রেম মন্ত্রের ডাক পড়ে। মহামতি লেনিন তাই করেছেন; স্তালিন, মাও-সে-তুঙ তাই করেছেন। অথচ মার্কসীয় শাস্ত্রে 'জাতীয়তাবাদ' একটি প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াতত্ত্ব মাত্র। যখন জার্মানী মাতৃভূমি ফরাসী দেশ আক্রমণ করে সে-দেশের স্বাধীনতা হরণ করল, তখন ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি একবারও বলল না ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট গঠন করে মনে-প্রাণে ফরাসী যারা—তাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে অথবা হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রতিরোধ করার কথা।—'Who wish to think like Frenchmen, act like Frenchmen' এসব কথা ভুলেও উচ্চারণ করেনি। কিন্তু রাশিয়া আক্রান্ত হবার সাথে সাথে গোটা চিন্তাধারাই পালটিয়ে গেল। কি অদ্ভুত আচরণ! শুধু তাই নয়, এখন বলা হল: ফরাসী জাতির মুক্তির প্রথম সর্তই হল, সোভিয়েট রাশিয়ার জয়লাভ। নিজের জাতির ও দেশের মুক্তির জন্য হিটলারের পরাজয়ের প্রয়োজনীয়তা ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি অনুভব করেনি,—

রাশিয়ার প্রয়োজনে জার্মানীর পরাজয় একান্ত দরকার। রাশিয়ার প্রয়োজনে জার্মানী কর্তৃক ফরাসী দেশ আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি হিটলারের তাঁবেদার সরকার ভিশি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। ধর্মঘট করতে বলেনি শ্রমিকদের—অল্প বেতনে কম খেয়ে কোমরে ফাঁস বেঁধে জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সহযোগিতা করেছে। কারখানা, দোকানপাট খোলা রেখে যুদ্ধে সাহায্য করেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও অনুরূপ দেশাত্মঘাতী কুৎসিত কৃতঘ্নতার রাজনীতিতে মত্ত হয়েছিল ১৯৪০-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন তারিখের পর ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ঘোষণা করা হল: "Not one man, not one grain of wheat, not one hour of work for the assasins of the French people, the plunderers of our country……" যুদ্ধে একজন ফরাসী সৈনিক দিয়েও কোন সাহায্য করা হবে না, একদানা গম বা খাদ্যশস্য দিয়েও কোন সাহায্য নয়, কল-কারখানায় একঘণ্টার শ্রম দিয়েও যেন জার্মানীকে বা তার ফরাসী তাঁবেদার সরকারকে সাহায্য করা না হয়। এখন দাবী কর:

"We must press forward with the struggle for better wages, drive against German requisitions and with the campaign for reducing the production of goods intended for the occupying power. We must demand more bread, more meat, more soap……we must harrass the Vichy Government in order to finally drive it out of office. What helps Hitler, hurts France and what hurts Hitler helps France and the U.S.S.R. as well......Nothing for Hitler everything for freedom."

এই চমৎকার বৈপ্লবিক প্রাণমাতানো শ্লোগানগুলি কেন ১৯৪০ সালের জুন মাস থেকে ১৯৪১ সালের ২১শে জুন তারিখ পর্যন্ত ফরাসী দেশে উচ্চারিত হয়নি? ভারতবর্ষে আগস্ট-বিপ্লবের সময় (১৯৪২) অথবা ১৯৩৯-৪১ সালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে অথবা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মৃত্যুঞ্জয়ী মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে কেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বলতে পারল না ভারতবাসীর কাছে:

যুদ্ধে এক পাইও না, এক ভাইও না। উৎপাদন বন্ধ কর, শ্রম দিয়ে

কল-কারখানায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কোনরকম সাহায্য করা চলবে না। কেন বলা হল না ফরাসী কমিউনিস্টদের মতন: আরও বেশি খাদ্য দাবী কর, বেতন মজুরী বেশি করে দাবী কর। সর্বতোভাবে ব্রিটিশ সরকারকে বিপন্ন কর, যুদ্ধে ব্যাঘাত সৃষ্টি কর, ইংলণ্ড যতই বিপদে পড়বে ততই আমাদের লাভ, মুক্তির দিন তত কাছে আসবে। চার্চিলের কোন রকম সুবিধা হলেই আমাদের দেশের চরম ক্ষতি।

অথচ সুভাষচন্দ্র বসুর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল: "England's difficulty is India's opportunity"—যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে ছয় মাসের চরমপত্র ( Six months' ultimatum ) দিতে হবে। ছয় মাসের মধ্যে ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা না দিলে জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু করবে।

## ২৩

## রুশ-জার্মান যুদ্ধের সূচনা

হিটলার-ষ্টালিন বন্ধুত্ব চুক্তির বিপজ্জনক পরিণতির বৃত্ত পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে সুনিশ্চিত গতিতে এগিয়ে চলল। যে বন্ধুত্ব চুক্তির এত তারিফ কমিউনিস্ট ডিক্টেটার করেছিলেন—সেই সুচতুর ষ্টালিন কি জানতেন না ১৯২৪ সালে কারান্তরালে থেকে হিটলার তাঁর Mein Kampf ('আমার সংগ্রাম') পুস্তকে রাশিয়া সম্বন্ধে কি মন্তব্য করেছিলেন? তিনি খোলাখুলিই লিখেছিলেন:

"We stop the endless German movement toward the South and West of Europe and turn our gaze toward the lands of the East……when we speak of new territory in Europe we must think principally of Russia and her border vassal states. Destiny itself seems to wish to point out the way to us here……This Colossal empire in the East is ripe for dissolution and the end of Jewish domination in Russia will also be the end of Russia as a state." (Mein Kampf)

জার্মান সম্প্রসারণের লক্ষ্য হলো পূর্ব ইউরোপের ও রুশ সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ড। রুশ-সীমান্ত ও তার তাঁবেদার রাজ্য-সীমানা হবে জার্মান জাতির মূল লক্ষ্য। রুশ রাষ্ট্রের অবলুপ্তির লগ্ন অতি নিকটবর্তী।

হিটলার তো মার্কসবাদীদের সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ খোলাখুলিভাবেই প্রকাশ করেছেন তাঁর 'আমার সংগ্রাম' পুস্তকে। তাঁর ভাষায়:

"The National Socialist movement must strive to eliminate the disproportion between our population and our area—viewing this latter as a source of food as well as a basis for power politics……"

অর্থাৎ জার্মান জনসংখ্যার অনুপাতে দেশের ভৌগোলিক আয়তন সীমাবদ্ধ। বাড়তি জনস্ফীতির চাপ দূর করতে চাই সীমানার সম্প্রসারণ। হিটলার

লাজ-লজ্জা কাটিয়ে দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, এই বাড়তি জন-সংখ্যাজনিত সমস্যার মোকাবিলা সার্থকভাবে করতে হলে দু'টি পথ খোলা আছে। তার মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে: (১) নূতন দেশের ভূখণ্ড দখল করতে হবে—তাহলে জাতি স্বয়ংভর হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। (২) বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে নতুন নতুন উপনিবেশ স্থাপন করা সম্ভব হবে।

"Either a territorial policy or a colonial and commercial policy.……Acquisition of new soil for the settlement of the excess population possesses an infinite number of advantages…" (Mein Kampf, P. 137-138.)

"Land and soil as the goal of our foreign policy…" (649)

'ভূখণ্ড ও জমিই হচ্ছে পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য।' হিটলার তাঁর পুস্তকে জার্মান পররাষ্ট্রনীতির শাশ্বত ভিত্তি কি হবে সে বিষয়ে দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেছিলেন। স্তালিনবাদী বা মার্কসবাদীরা কি সে-কথা জানতেন না? হিটলার লিখেছিলেন:

"Never suffer the rise of two continental powers in Europe. Regard any attempt to organise a second military power on the German frontiers, even if only in the form of creating a State capable of military strength, as an attack on Germany and in it see not only the right but also the duty, to employ all means up to armed force to prevent the rise of such a State, or, if one has already arisen to smash it again…… "

(Mein Kampf, P. 664.)

"ইউরোপে দু'টি ইউরোপীয় শক্তির উদ্ভবকে কখনই বরদাস্ত করা যেতে পারে না। জার্মান-সীমান্তে এরূপ একটি সামরিক শক্তির অভ্যুত্থান বা তার অভ্যুত্থানে সাহায্য করাকে জার্মানীর ওপর আক্রমণ বলেই গণ্য করা হবে। সামরিক শক্তিসম্পন্ন এরূপ একটি রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান হচ্ছে দেখলে যে কোন প্রকারে, এমন কি সামরিক শক্তি প্রয়োগপূর্বক তাকে প্রতিহত করা নাৎসীদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যও বটে। শুধু তাই নয়, যেখানে এই ধরনের একটি রাষ্ট্র জন্ম নেবে সেখানে সে রাষ্ট্রকে ধ্বংস করাই হবে জার্মানীর কর্তব্য।" (হিটলার)

জার্মানী রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীতে আবদ্ধ হতে কেন পারে না সে সম্বন্ধে যুক্তিহীন বিদ্বেষভরা বহু মন্তব্য হিটলার তাঁর পুস্তকে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছিলেন :

"Germany is today the next great war aim of Bolshevism ......The fight against Jewish world Bolshevization requires a clear attitude towards Soviet Russia. You cannot drive out the devil with Beelzebub." (Mein Kampf)

এইসব বক্তব্যের মধ্য দিয়েও কি নাৎসী দলের মনোভাব যথেষ্ট পরিব্যক্ত হয়নি সেদিন? এইসব বক্তব্যের প্রতি চোখ ফিরিয়ে থাকার পেছনে কি কোন ডায়েলেক্‌টিক-এর নিয়ম কাজ করেছিল?

শক্তিশালী ফরাসী সেনাবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়, ব্রিটিশ বাহিনীর ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে বীর বিক্রমে স্বদেশে পলায়ন, সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে জার্মান সেনাবাহিনীর অসামান্য সাফল্য হিটলারকে এবার সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে উৎসাহিত করল। হিটলার বুঝলেন তাঁর কাজ হাসিল হয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে 'বন্ধুত্বের' প্রয়োজন ফুরিয়েছে—সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ আজ পদানত। যে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করে গেছেন সেটা সত্যিই সার্থক হয়েছে। কেননা রাশিয়া কোনভাবেই জার্মানীকে বিব্রত করেনি পেছন থেকে ছুরি মেরে।

হিটলারের সান্নিধ্য-ধন্য জার্মান সমর-বিশারদ হালডার তাঁর নিজস্ব ডায়েরীতে লিখেছেন :

"ব্রিটেনের ভরসা (হিটলার বলতেন) রাশিয়া ও আমেরিকা। রাশিয়ার প্রতি তার যে ভরসা সেটা নির্মূল করতে পারলে—আমেরিকার আশাও নির্মূল হবে সেই সঙ্গে। কেননা রাশিয়া পর্যুদস্ত হলে দূরপ্রাচ্যে জাপানের প্রভাব প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।" (Halder's Diary, July 3, 1940.)

"Britain's hope lies in Russia and America. If that hope in Russia is destroyed then it will be destroyed for America too, because elimination of Russia will enormously increase Japan's power in the Far East". (Halder's Diary)

ফরাসী দেশের দ্রুত ও শোচনীয় পরাজয় ও আত্মসমর্পণের ঘটনা থেকে হিটলারের ধারণা জন্মেছিল যে, ইংলণ্ডও আর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে না। তাকেও আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু ইংলণ্ড মরিয়া হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে

দেখে হিটলারের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ব্রিটেন রাশিয়ার ওপর যুদ্ধে অনেকটা নির্ভর করছে। তাই হিটলার স্থির করলেন—আর দেরী নয়! রাশিয়াকে আর সময় দেওয়া নয়। রুশ শক্তি চূর্ণ করতে হবে। এ ব্যাপারেও হিটলারের সেনাপতিরা তাঁর সঙ্গে একমত হননি। দুই ফ্রণ্টে যুদ্ধ করা মারাত্মক ভুল হবে বলে তাঁরা হিটলারকে একাজে পা বাড়াতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ডিক্টেটারের ইচ্ছা অভিলাষই তো সবকিছুর উৎস। অতএব কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

জার্মানী এক-একটি দেশ যুদ্ধ করে দখল করে নিচ্ছে আর অভিনন্দন আসছে 'সর্বহারাদের পিতৃভূমি' রাশিয়ার নেতা স্তালিন-মলোটভের কাছ থেকে। জার্মান সেনাবাহিনীর অসাধারণ কৃতিত্বের তারিফ করছেন তাঁরা। যখন নরওয়ে-ডেনমার্ক আক্রান্ত হল কোনরকম যুদ্ধ ঘোষণা না করেই বিনা প্ররোচনায়—তখন মলোটভ জার্মান রাষ্ট্রদূত শূলেনবুর্গকে তাঁর অফিসে ডাকিয়ে এনে সেই দিন সকালেই জানালেন :

"The Soviet Government understood the measures which were forced on Germany······We wish Germany complete success in her defensive measures."

অর্থাৎ, সোভিয়েট রাশিয়া সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছে যে, নরওয়ে-ডেনমার্ক আক্রমণজনিত পরিস্থিতি বেচারা জার্মানীর ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। নরওয়ে-ডেনমার্ক-এ জার্মান সরকার ও সেনাবাহিনী যা করছে তা নিছক আত্মরক্ষামূলক কাজ। একাজে জার্মানীর পূর্ণ সাফল্য আমরা ( রুশ সরকার ) কামনা করছি। [ রাজনীতিতে মার্কসবাদীরা তথা কমিউনিস্টরা 'সরকার' ও 'জনগণের' মধ্যে ব্যবধান দেখাবার চেষ্টা করে থাকেন। অর্থাৎ যখন কোন দেশ কোন আক্রমণাত্মক কাজে লিপ্ত হয় তখন বলা হয়—সেই দেশের 'সরকার' এই অন্যায় কাজ করেছে—'জনগণের' কোনই হাত নেই, তারা সরকারের পেছনে আছে মনে করার কারণ নেই। স্তালিন-মলোটভ যখন এই অভিনন্দন-বার্তা পাঠালেন তখন কি সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমির 'জনগণ' তথা 'সর্বহারা শ্রেণী' এই সরকারী সিদ্ধান্তের সামিল ছিলেন বলেই ধরে নিতে হবে? না ধরে নিতে হবে 'সমাজতান্ত্রিক' দেশেও জনগণ ও সরকারের মধ্যে বিভাজন রেখা সুস্পষ্ট বিদ্যমান? ]

আবার ফরাসী দেশ যখন আক্রান্ত হল তখন রিবেনট্রপের নির্দেশে ভন শূলেনবুর্গ রুশ সরকারকে জানালেন এ-যুদ্ধও নাকি জার্মানীর ওপর চাপিয়ে

দেওয়া হয়েছে (was forced upon Germany by impending Anglo-French push on the Ruhr by way of Belgium and Holland)। এর জন্য ইঙ্গ-ফরাসী জোটকে সম্পূর্ণ দায়ী করা হল। রাশিয়া এই কৈফিয়ৎকে মেনে নিল সেদিন। শূলেনবুর্গ তাঁর রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করেছিলেন :

"Molotov received the communication in an understanding spirit and added that he realised that Germany must protect herself against Anglo-French attack. He had no doubt of our success"

জার্মান সরকার নিজেদের আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে যেভাবে সমর্থন করে রিপোর্ট পেশ করলেন সেটা মলোটভ অনুভবী মন দিয়ে বুঝে নিলেন এবং জার্মানী যাতে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে সে পরামর্শও তিনি দিলেন শূলেনবুর্গকে। পরিশেষে জার্মান সাফল্যও কামনা করলেন।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, ফরাসী দেশেই ইউরোপের বৃহত্তম সংগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি সেদিনও ছিল। সেই ফরাসী দেশের এই শোচনীয় পরাজয় সেদিন রুশ কমিউনিস্ট পার্টির খুশির কারণ হয়েছিল। ১৭ই জুন যেদিন ফরাসী জাতি মার্শাল পেঁতার নেতৃত্বে সন্ধির প্রস্তাব জানালেন জার্মান সরকারের কাছে, সেদিন মলোটভ শূলেনবুর্গকে তাঁর পররাষ্ট্র দপ্তরে আহ্বান করে এনে অভিনন্দন জানালেন অভূতপূর্ব জার্মান বিজয়ে। (expressed the warmest congratulations of the Soviet Government on the splendid success of the German wermacht.)

মার্কস-লেনিনের সর্বহারাশ্রেণীর বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্ব-তত্ত্বের প্রতি অসহ্য ভেঙচি কেটে সেদিন রুশ কমিউনিস্ট পার্টি সঙ্কীর্ণ জাতি-স্বার্থ সংরক্ষণের পথ বেছে নিয়েছিল বিনা দ্বিধায়। ফরাসী জনগণের ওপর তথা 'শ্রেণী-সচেতন' (?) ফরাসী শ্রমিক-শ্রেণীর শায়িত দেহের ওপর যখন নাৎসীরা তাদের প্রমত্ত বিজয় তাণ্ডব নৃত্যে মাতোয়ারা—নূতন পরাধীনতার শৃঙ্খলের বেড়ি যখন নাৎসীরা তাদের পায়ে-হাতে পরিয়ে দিচ্ছে—তখন সেই শ্রেণী-সচেতন বিশ্ব শ্রমিক-শ্রেণীর 'পরিত্রাতা' (liberator) সমাজতান্ত্রিক রুশদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনন্দে-খুশিতে উচ্ছল, ডগমগ! সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ লাল সেলাম! লাল সেলাম!

এত করেও স্তালিন তাঁর বন্ধুর হৃদয় জয় করতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করতে বদ্ধপরিকর। বলকান ভূখণ্ডে রাশিয়ার ভূমিকা তিনি ভাল চোখে দেখেননি। এদিকে ব্রিটিশ সরকার নানাভাবে স্তালিনকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে, এবার রাশিয়ার পালা। জার্মানী অচিরে রুশ দেশ আক্রমণ করবেই। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চতুর চার্চিল স্তালিনকে এই মর্মে চিঠিও দিলেন এবং বামপন্থী শ্রমিক দলের বিশিষ্ট নেতা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে মস্কোতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত মনোনীত করে পাঠালেন। বলশেভিক নেতাদের কাছে সাড়া পাবার আশায় এরূপ একজন বামপন্থী নেতাকে পাঠান হল। কিন্তু সে গুড়েও বালি। ভবী ভুলবার নয়। স্তালিন স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের সঙ্গে কূটনৈতিক দেখা-সাক্ষাৎ করলেন। ভয় ছিল হিটলার-রিবেনট্রপ ভুল বুঝতে পারেন এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। জার্মান-রুশ বন্ধুত্বের ভিত্‌ যে কত দৃঢ় সেটা বোঝাবার জন্য স্তালিননের নির্দেশে মলোটভ জার্মান রাষ্ট্র-দূত শূলেনবুর্গকে একটি স্মারকলিপি পাঠালেন ( ১৩ই জুলাই )। ক্রিপ্‌সের সঙ্গে কি কি বিষয় আলোচনা হয়েছিল তার রুশ-ভাষ্য এই স্মারকলিপিতে ছিল। এতে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি ছিল এইরূপ ঃ

"The British Government was convinced that Germany was striving for hegemony in Europe ...This was dangerous to the Soviet Union as well as England. Therefore, both countries ought to agree on a common policy of self-protection against Germany and on the re-establishment of the European balance of power."

অর্থাৎ, ব্রিটিশ সরকার এ বিষয় সুনিশ্চিত যে, জার্মানী সমগ্র ইউরোপে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। এটা ব্রিটেন ও রাশিয়া দু'য়ের পক্ষেই বিপজ্জনক। অতএব এই দুই দেশকেই জার্মানীর বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সামিল হওয়া প্রয়োজন। আর এই যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইউরোপে ইউরোপীয় ক্ষমতার ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে।

স্তালিন হিটলারকে জানিয়ে দিলেন ইংলণ্ডের কু-মতলবের কথাটা। ইংলণ্ড জার্মানী ও রাশিয়ার বন্ধুত্বে ফাটল ধরাতে খুব চেষ্টা করছে বটে, তবে রাশিয়া সে বিষয়ে খুব সজাগ। স্তালিন এই স্মারকলিপিতে তাঁর নিজের মনোভাবটাও পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন।

**"He ( Stalin ) did not see any danger of the hegemony of**

any one country in Europe and still less any danger that Europe might be engulfed by Germany. Stalin observed the policy of Germany and knew several leading German statesmen well. He had not discovered any desire on their part to engulf European countries. Stalin was not of the opinion that German military successes menaced the Soviet Union and her friendly relations with Germany."

'স্তালিন সমগ্র ইউরোপে কোন একটি রাষ্ট্র প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারে এ আশঙ্কা করেন না—আর বিশেষ করে জার্মানীর কাছ থেকে এরূপ বিপদের কোন আশঙ্কা আছে বলে তিনি মনেই করেন না। স্তালিন জার্মান নীতি লক্ষ্য করে যাচ্ছেন এবং তিনি নেতৃস্থানীয় বহু জার্মান রাষ্ট্রনীতিবিদদের বিলক্ষণ চেনেন। ইউরোপের দেশগুলিকে গ্রাস করার কোন মতলব তাঁদের মধ্যে তিনি কোনদিন লক্ষ্য করেননি। বিভিন্ন রণাঙ্গনে জার্মানীর সামরিক সাফল্য থেকে রাশিয়া আদৌ বিপন্ন বোধ করছেন অথবা এর দ্বারা রুশ-জার্মান বন্ধুত্বও ক্ষুণ্ণ হবে না।'

অস্ট্রিয়া-চেকোশ্লোভাকিয়ার ধর্ষণ থেকে সুরু করে পোল্যাণ্ড আক্রমণ ও দখল, নরওয়ে, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফরাসী দেশের ওপর আক্রমণ ও দখল, জার্মান সেনাবাহিনীর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, ধ্বংস সাধন শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন সামরিক সাফল্যই? এই সব ঘটনা ও আচরণের মধ্য দিয়ে নাৎসী জার্মানীর আসল মতলব পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি স্তালিন-মলোটভের কাছে? একটির পর একটি দেশের উপর নির্লজ্জ আক্রমণ, ব্যাপক হত্যা-ধ্বংসের তাণ্ডব অনুষ্ঠান, তাদের স্বাধীনতা লুণ্ঠনের ভয়াবহতা সত্ত্বেও জার্মান-রুশ কূটনৈতিক দোস্তি বেশি কাম্য ছিল সেদিনও?

রাশিয়া ও তার প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলির স্বার্থ যতক্ষণ বিঘ্নিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নাৎসী জার্মানীর আগ্রাসী নীতি প্রতিহত করার কোনই প্রয়োজন নেই। জার্মান-রুশ কূটনৈতিক বন্ধুত্বের যূপকাষ্ঠে এতগুলি স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হল। তবু রাশিয়ার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতারা নিরুদ্বিগ্ন রয়ে গেলেন। জার্মানী তখনও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার কাছ থেকে সার্টিফিকেট পাচ্ছে।

হিটলার তুষ্ট হবার পাত্র নন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, জার্মানী যখন পশ্চিম ইউরোপের রণাঙ্গনে ব্যস্ত তখন সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে রাশিয়া বাল্টিক

রাজ্যগুলি কুক্ষিগত করে নেয়। তাছাড়া বল্‌কান ভূখণ্ডের রুমানিয়া রাজ্যের দু'টি প্রদেশ—বেসারাবিয়া ও বুকোভিনা দখল করে নেয়। জার্মানী রুমানিয়ার তৈলখনিগুলি থেকে যুদ্ধের অত্যাবশ্যকীয় পেট্রোলিয়ামের সরবরাহের ওপর একান্ত নির্ভরশীল ছিল। ঐ সব অঞ্চল থেকে খাদ্য সরবরাহের ওপরও জার্মানী নির্ভরশীল ছিল।

২৬শে জুন রাশিয়া রুমানিয়ার কাছে চরমপত্র পাঠাল—বেসারাবিয়া ও বুকোভিনা প্রদেশ হস্তান্তর দাবী করে। রুশ-সরকার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রুমানিয়া সরকারের কাছ থেকে সদুত্তর দাবী করলেন। ফরাসী রণাঙ্গনে জার্মানবাহিনী তখনও ব্যস্ত রয়েছে। রুমানিয়ান সরকার রিবেনট্রপের কাছে নির্দেশ চাইলেন। ভীত সন্ত্রস্ত রিবেনট্রপ ট্রেন থেকেই রাজধানী বুখারেস্টে অবস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূতকে রুশ প্রস্তাব মেনে নেবার পরামর্শ দিলেন। সোভিয়েট সেনাবাহিনী ২৭শে জুন এই সব অঞ্চল দখল করে নিল। স্তালিন জার্মান-রুশ অনাক্রমণ চুক্তির পূর্ণ সুযোগ নিলেন। তিনি জানতেন পশ্চিম রণাঙ্গনে ব্যস্ত ও বিব্রত জার্মানী এখনই রুশ অভিলাষকে প্রতিহত করতে সাহসী হবে না। সেই মতলবে আগে থেকে রাশিয়া রুমানিয়ার সীমান্তে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করেছিল।

রুমানিয়ার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ রাশিয়া দখল করে নেবার পর হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া রুমানিয়ার কিছু কিছু অংশ দাবী করে বসল। হাঙ্গেরী—রুমানিয়ার ট্রান্‌সিলভেনিয়া অঞ্চল প্রত্যার্পণের দাবী জানাল—কেননা, ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এটি হাঙ্গেরীরই অংশ ছিল। হিটলার রুমানিয়ার তৈলখনি অঞ্চলগুলি দখল করার জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। অবশেষে ভিয়েনা-তে অক্ষশক্তির মধ্যে এক চুক্তি হয় ( Vienna Award )। এই রোয়েদাদের ফলে ট্রান্‌সিলভেনিয়ার অর্ধেকটা হাঙ্গেরীকে প্রত্যর্পণ করা হয়। রুমানিয়ার অবশিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি জার্মানী ও ইতালীয় সরকার দিলেন। হিটলার রুমানিয়াতে একটি সামরিক মিশনও পাঠালেন। জার্মানী ফিনল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে সৈন্য চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন করে নরওয়েতে জার্মান সৈন্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার অজুহাতে। এই দুই ঘটনায় রুশ সরকার খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। জার্মানী ও রুশ সরকার পরস্পরকে অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন কড়া ভাষায়। রাশিয়ার অভিযোগ অনাক্রমণ চুক্তির তৃতীয় ধারা অমান্য করা হয়েছে। কেননা উক্ত ধারায় পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কে 'আলোচনার' (consultation) কথা বলা হয়েছিল।

'ভিয়েনা রোয়েদাদ'—একতরফা সিদ্ধান্তরূপে রুশ সরকারের কাছে একটি সংঘটিত ঘটনারূপে উপস্থিত করা হয়েছে। জার্মানীর পাল্টা অভিযোগ : রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে পরামর্শ না করেই রুমানিয়ার দু'টি প্রদেশ বলপূর্বক গ্রাস করে নিয়েছে, বাল্‌টিক রাজ্যগুলিকেও কুক্ষিগত করেছে। [ আন্তর্জাতিক পারস্পরিক মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তিতে আলাপ-আলোচনা-পরামর্শ করে কাজ করার অনুচ্ছেদের মর্যাদা ও গ্যারান্টি কতটুকু দুই রাষ্ট্রের আচরণ থেকেই তা বোঝা যাবে। কূটনীতি-রাজনীতিতে ভাবাবেগ, উচ্ছ্বাস ও আদর্শবাদের ছোঁয়াচটুকুও থাকে না। ]

এদিকে বার্লিন শহরে ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৯৪০) তারিখে জার্মানী-ইতালী-জাপানের মধ্যে ( রোম-বার্লিন-টোকিও চুক্তি ) এক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেল। এই চুক্তি রাশিয়ার উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল। এই সুযোগে রিবেনট্রপ স্তালিনের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন মলোটভকে বার্লিনে পাঠিয়ে হিটলারের সঙ্গে সলাপরামর্শ করার জন্য। তিনি এক চতুঃশক্তি চুক্তির প্রস্তাবের ইঙ্গিত দেন ( Four-Power Pact ) গোটা বিশ্বকে চারভাগে ভাগ-বাঁটোয়ারা করার।

"It appears to be the mission of Four Powers [ he said ]—the Soviet Union, Italy, Japan and Germany—to adopt a long-range policy..... by delimitation of their interests on a world-wide scale." [ Quoted from : Rise And Fall Of The Third Reich, P. 960. ]

উপরোক্ত প্রস্তাব-সম্বলিত চিঠিটি স্তালিনকে পাঠান হয়। মলোটভ নভেম্বর মাসে বার্লিনে এলেন আলোচনার জন্য। এই আলোচনায় রিবেনট্রপ চুক্তির এক খসড়া উপস্থিত করলেন। একটি ধারায় জার্মানী-ইতালী-রাশিয়া ও জাপানের পারস্পরিক ও স্বাভাবিক প্রভাবাধীন এলাকাগুলিকে রক্ষার প্রতিশ্রুতির উল্লেখ ছিল। অপর একটি ধারায় সকল দ্বন্দ্বের বন্ধুত্বপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রস্তাব করা হয়। এই চতুঃশক্তির কেউই অন্য কোন শক্তির সঙ্গে পৃথকভাবে জোট বাঁধতে পারবে না, ইত্যাদি। এই চুক্তিতে কোন্ কোন্ রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক আকাঙ্ক্ষা কি কি ( territorial aspirations ) তা বিজ্ঞাপিত করা হয়। রাশিয়ার ক্ষেত্রে বলা হয় 'to centre south of the national territory of the Soviet Union in the direction of the Indian Ocean'.

তখনকার পরিস্থিতিতে ভারত মহাসাগরের প্রতি রাশিয়ার খুব একটা আগ্রহ ছিল না। রাশিয়া তুরস্ক, বুলগেরিয়া ও তুরস্ক-প্রণালীর ভবিষ্যৎ ও সেখানে রুশ স্বার্থ-সংরক্ষণের গ্যারাণ্টি জার্মানীর কাছে দাবী করে। মলোটভ রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া ও পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে কি নীতি নেওয়া হবে—কার কতটা ও কি অধিকার বর্তাবে সে-সব বিষয় নিয়ে আলোচনা উত্থাপন করেন এবং সুস্পষ্ট সক্রিয় প্রতিশ্রুতি চান—শুধুমাত্র কাগুজে প্রতিশ্রুতি নয়। রুমানিয়াকে জার্মান সরকার প্রতিরক্ষার গ্যারাণ্টি দিয়েছিল। এটা রুশ সরকার আদৌ খুশিমনে নিতে পারেননি। মলোটভ জানান এই গ্যারাণ্টি দেবার অর্থ রাশিয়ার সঙ্গে চরম ভুল-বোঝাবুঝির পথ প্রশস্ততর করা। রাশিয়া বুঝেছিল রুমানিয়ার তৈলখনির জন্য জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। তাই রুমানিয়া থেকে উক্ত গ্যারাণ্টি প্রত্যাহারের দাবীও মলোটভ করেছিলেন।

স্তালিন-মলোটভ জার্মানীর সঙ্গে দর কষছিলেন। চতুঃশক্তি চুক্তির পার্টনার রাশিয়ার এতে কোন নৈতিক বা আদর্শগত বাধা নেই। প্রশ্ন, রাশিয়াকে হিটলার এর মূল্যস্বরূপ কতটা ছাড়তে পারবেন—সেটাই যাচাই করার জন্য স্তালিন মলোটভকে পাঠিয়েছিলেন। হিটলারও লোভ দেখিয়েছেন এই বলে: ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তো নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। এই সুবিস্তীর্ণ দেউলিয়া সামাজ্য এখন থেকে চারটি শক্তির মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবে—জার্মানী, ইতালী, রাশিয়া ও জাপান।

"...All the countries which would possibly be interested in the bankrupt estate would have to stop all controversies among themselves and concern themselves exclusively with the partition of British Empire......"

মলোটভের দৌত্য সফল হল না। বার্লিন থেকে স্বদেশে ফিরে এসে তিনি জার্মান রাষ্ট্রদূত শুলেনবুর্গকে জানালেন যে, রাশিয়া কয়েকটি শর্তে ফ্যাসিস্ট শিবিরের সঙ্গে একত্রে চতুঃশক্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে রাজী আছে। শুলেনবুর্গ ২৬শে নভেম্বরের ডেসপ্যাচে সেকথা তাঁর সরকারকে জানিয়েও দিলেন।

রাশিয়ার প্রস্তাবিত শর্তগুলি ছিল এইরূপ:

(১) যেহেতু ফিনল্যাণ্ড রুশ-প্রভাবাধীন অঞ্চল, সেইহেতু ফিনল্যাণ্ড থেকে সমস্ত জার্মান সৈন্য সরিয়ে আনতে হবে।

(২) তুরস্ক প্রণালীতে রুশ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য আগামী কয়েকমাসের মধ্যে রাশিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্যে একটি পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং সেখানে নৌ ও সেনাবাহিনীর জন্য সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ দিতে হবে দীর্ঘ মেয়াদী লীজ-এর ( lease ) ভিত্তিতে, আর এই ঘাঁটিগুলি বস্ফরাস ও ডারডেনেলীস্-এর পাল্লার মধ্যে হওয়া চাই।

(৩) পারস্য উপসাগরের দিকে প্রসারিত বাটুম ও বাকু-র দক্ষিণ অঞ্চল রুশ-প্রভাবাধীন অঞ্চলরূপে স্বীকার করে নিতে হবে।

(৪) উত্তর সাখালীনে জাপান কয়লা ও তৈল-সম্পদের উপর দাবী প্রত্যাহার করবে। [ Schulenburg Despatch, November 26, 1940. ]

স্তালিন আরও দাবী করেছিলেন তুরস্ক প্রণালীতে রুশ ঘাঁটি স্থাপন করে তাকে রুশ-নিয়ন্ত্রিত দরিয়ায় রূপান্তরিত করার ব্যাপারে যদি তুরস্ক সরকার বাধা দেন তাহলে চতুঃশক্তিকে তুরস্কের বিরুদ্ধে যৌথভাবে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে শায়েস্তা করতে হবে।

হিটলার বুঝেছিলেন যে, স্তালিনের এই সব শর্ত মেনে নিলে রাশিয়াকে ফিনল্যাণ্ড-বুলগেরিয়া তো ছেড়ে দিতেই হবে তার প্রভাবাধীন এলাকারূপে, তাছাড়া পারস্য ও আরব দুনিয়ার তৈল-সম্পদের পূর্ণ কর্তৃত্বভারও অর্পণ করা হবে। কিন্তু পারস্য ও আরব দুনিয়ার তেল গোটা ইউরোপের বাজার বাঁচিয়ে রেখেছিল। স্তালিন এই বিশাল তৈল-সম্পদের চাবিকাঠি নিজের শক্তমুঠির মধ্যে এনে ইউরোপের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে চাইছিলেন। এত চড়া দর দিয়ে চতুঃশক্তি চুক্তি সম্পাদনে হিটলার রাজী হলেন না। কিন্তু রাজনীতির ছাত্রদের কাছে বিশ্ব-বিপ্লববাদী সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার নেতার চরম গৃধ্নুতা ও শঠতার নগ্নরূপ প্রকট হয়ে পড়ল। হিটলার ও স্তালিন সমানতালে পাল্লা দিয়ে চলছিলেন—কে কার ওপর টেক্কা মারতে পারে!

রাশিয়াকে শায়েস্তা করতে হবে—এই মনোভাব হিটলারকে পেয়ে বসল। আক্রমণ-পরিকল্পনা নিয়ে সেনাপতিদের সঙ্গে জরুরী আলোচনা সুরু হয়ে গেল। ১৯৪০ সালের ১৮ই ডিসেম্বর হিটলারের গোপন নির্দেশ জারী হল :

অল্পদিনের সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে রাশিয়াকে চূর্ণ করতে হবে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলেছে তা শেষ করার আগেই রাশিয়াকে খতম করতে হবে। কিভাবে আক্রমণ রচিত ও পরিচালিত হবে সবটাই হিটলার স্থির করে ফেলে প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন।

জার্মানী পূর্ব-পোল্যাণ্ড সীমান্ত বরাবর সামরিক প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিল। রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, হাঙ্গেরী জার্মানীর দখলে চলে গেল একের পর এক, রুমানিয়া ও বলকান সীমান্তে প্রায় দশলক্ষ সৈন্য সমাবেশ করল। লক্ষ্য এবার সোভিয়েট রাশিয়া—যার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্ব ও অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তার দিকে। বিপদ দ্রুত এগিয়ে আসছে বুঝেও স্তালিন জার্মানীর সঙ্গে বন্ধুত্ব বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের ১৩ তারিখে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইওসুকে মাৎসুয়োকা স্তালিনের সঙ্গে স্বদেশে রওনা হয়ে যাবার পরই স্তালিন জার্মান রাষ্ট্রদূত শূলেনবুর্গকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনন্দের আতিশয্যে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন : "We must remain friends and you must now do everything to that end." "আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে থাকবই এবং আপনাদেরও লক্ষ্যের কথা স্মরণ রেখে যা কিছু করণীয় তাই করা উচিত।"

এর আগে হিটলার যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডের ওপর ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টির জন্য নির্দেশ দেন গোয়েরিং-এর ওপর। শুধু বেলগ্রেড নগরীর ওপর একটানা বোমাবর্ষণের ফলে ১৭,০০০ অসামরিক নর-নারী ও শিশু নিহত হয়। গোটা শহর একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। হিটলার এই অভিযানের নাম দিয়েছিলেন 'operation punishment'। তবু স্তালিন হিটলারের বন্ধুত্ব খোয়াতে চাননি। ৬ই এপ্রিল যুগোশ্লাভিয়া আক্রান্ত হল। অথচ ঠিক তারই আগের দিন, ৫ই এপ্রিল রাশিয়া যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে একটি 'অনাক্রমণ ও বন্ধুত্ব চুক্তি' (Treaty of Non-Aggression and Friendship) সম্পাদন করে। রাশিয়া নীরব দর্শক হয়েই রইল। শুধু তাই নয়, এর পরও স্তালিন হিটলারকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইরাকের ফ্যাসিস্ট অনুগামী রসিদ আলি-সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেন। বেলজিয়াম, নরওয়ে, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়ার কূটনীতিবিদদের রাশিয়া থেকে বিদায় দিলেন। তাদের কূটনৈতিক অফিসগুলিও বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিলেন। এমন কি যে যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ ও মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল (২০ বছরের জন্য) সেই যুগোশ্লাভ মিশনের অফিসও গুটিয়ে নেবার নির্দেশ দেওয়া হল। জার্মানীর কাজের কোনরকম সমালোচনা রুশ সংবাদপত্রে যেন না হয় তার ব্যবস্থা নেওয়াও হল। স্তালিন আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন জার্মান-রুশ যুদ্ধ এড়াবার। চার্চিল-স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ রাশিয়াকে আসন্ন আক্রমণ সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন। চারিধারে গুজব ছড়াচ্ছে। অথচ সরকারীভাবে জার্মানী এইসব গুজব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রচার করতে দ্বিধা করল না।

১৯৪১ সালের ২১শে জুন সকালে মলোটভ শূলেনবুর্গকে তাঁর পররাষ্ট্র দপ্তরে আনিয়ে নানা অভিযোগ উত্থাপন করলেন—জার্মানী কর্তৃক রুশ-জার্মান চুক্তি ভঙ্গের। সেই দিনই কিছুক্ষণের মধ্যে রিবেনট্রপ শূলেনবুর্গকে 'অতি জরুরী ও অতি গোপন' নির্দেশ পাঠালেন। তাতে রাশিয়া কতভাবে কতবার রুশ-জার্মান অনাক্রমণ ও বন্ধুত্ব-চুক্তি লঙ্ঘন করেছে তার ফিরিস্তি ছিল। রাশিয়ার আক্রমণাত্মক মনোভাব সম্বন্ধে জার্মানী সুনিশ্চিত। এ আর বরদাস্ত করা যায় না।

"To sum up the Government of the Reich declares, therefore, that the Soviet Government contrary to the obligation it assumed,

1. has not only continued, but even intensified its attempts to undermine Germany and Europe ;

2. has adopted a more and more anti-German Foreign policy ;

3 has concentrated all its forces in readiness at the German border Thereby the Soviet Government has broken its treaties with Germany and is about to attack Germany from the rear in its struggle for life Fuehrer has therefore ordered the German Armed Forces to oppose this threat with all the means at their disposal."

রিবেনট্রপ জানিয়ে দিয়েছিলেন এই নোট রুশ সরকারের কাছে পৌঁছে দিয়েই তাঁর কাজ শেষ। কোনরকম আলাপ-আলোচনায় যেন তিনি জড়িয়ে না পড়েন। শূলেনবুর্গ আবার রুশ পররাষ্ট্র দপ্তরের কার্যালয়ে এলে মলোটভের হাতে এই নোটটি দিয়ে দিলেন। মলোটভ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি শুধু বললেন : এ তো যুদ্ধের ঘোষণা! এ অপ্রত্যাশিত! ঠিক এই সময় বার্লিনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের কার্যালয়ে রুশ রাষ্ট্রদূত ডেকানোজভকে ডাকিয়ে এনে একই বিষয় জানিয়ে দেওয়া হল। নাৎসী জার্মানী ও কমিউনিস্ট রাশিয়ার বন্ধুত্বের আয়ু নিমেষের মধ্যে নিঃশেষিত হল। জার্মান কামানের গর্জন—নাৎসী সৈন্যদের ভারী বুটের সদম্ভ হুঙ্কার—বোমারু-বিমানের অশ্রান্ত বোমাবর্ষণ—২২ মাস দীর্ঘ অনাক্রমণ ও পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তির সমাপ্তি ঘোষণা—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে এক নতুন পরিণতির দিকে নিয়ে গেল—অবর্ণনীয়

হত্যা, ধ্বংস ও রক্তস্রোতের মধ্যে রাশিয়াকে নিক্ষেপ করল। এই মৈত্রী-চুক্তির পর স্তালিন বলেছিলেন :

"Friendship of the two countries has been cemented by the blood of the people······".

আবার একটু পিছনের দিকে ফিরে তাকান যাক। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন পোল্যাণ্ড জার্মানী ও রাশিয়ার আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হল মানচিত্র থেকে, তখন মলোটভ সুপ্রীম সোভিয়েটে এক স্মরণীয় ভাষণে প্রচণ্ড হাস্যরোলের মধ্যে ঘোষণা করেছিলেন : এই পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা অখণ্ডতা রক্ষার গ্যারান্টি তো গ্রেট ব্রিটেন ও ফরাসী দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এই গ্যারান্টির কি দাম? চট্‌পট্‌ জার্মান ও রুশ আঘাতে ভার্সাই চুক্তির কুৎসিত ফলশ্রুতি পোল্যাণ্ড রাষ্ট্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। (৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৯)

তিনি বললেন :

"Whole concept of 'aggression' has changed Today we cannot use the word in the same sense as three or four months ago. Now Germany stands for peace, while Britain and France are in favour of continuing the war. As you see the roles have been reversed."

'যুদ্ধ বা আক্রমণ সম্পর্কিত ধারণাটাই আজ পালটিয়ে গেছে। তিন-চার মাস আগেও এই শব্দটিকে আমরা যে অর্থে ব্যবহার করতাম বা বুঝতাম আজ আর তা যায় না। এখন জার্মানীই শান্তির প্রতীক—আর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায়। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বিশ্ব-রাজনীতিতে ভূমিকাই পালটিয়ে গেছে।' মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মলোটভ এখানেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি বললেন :

"Now Britain and France no longer able to fight for restoration of Poland, are posing as 'fighters for democratic rights against Hitlerism'. The British Government now claims that its aim is no more or no less, if you please, 'the destruction of Hitlerism.'—So it's an ideological war, a kind of medieval religious war.

One may like or dislike Hitlerism, but every sane person will understand that ideology cannot be destroyed by force.

It is therefore not only nonsensical but also criminal to pursue a war 'for destruction of Hitlerism' under the bogus banner of a struggle for 'democracy.' And what kind of democracy is it, any way, with the French Communist Party in Jail ?"

'এখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স স্বাধীন পোল্যাণ্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধনে অক্ষম হয়ে জাহির করার চেষ্টা করছে যে, তারা 'হিটলারতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার' জন্য যুদ্ধ করছে। ব্রিটিশ সরকার দাবী করছেন যে, তাঁদের এই যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য 'হিটলারতন্ত্রের ধ্বংস সাধন।' সুতরাং এটা নাকি 'আদর্শগত যুদ্ধ'— মধ্যযুগীয় একপ্রকার ধর্মযুদ্ধের মত।

'হিটলার-তন্ত্র ভাল কি মন্দ সে অন্য প্রশ্ন। এ মতবাদ কারো ভালও লাগতে পারে, কারো আদৌ ভালো নাও লাগতে পারে। কিন্তু সকলেই স্বীকার করবেন যে, কোন আদর্শকে পাশবশক্তি দিয়ে ধ্বংস করা যায় না। তাই হিটলার-তন্ত্রের ধ্বংস সাধনের জন্য ছেঁদো গণতন্ত্রের ঝাণ্ডা নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবার সঙ্কল্প শুধু অর্থহীনই নয়—মানব জাতির প্রতি অপরাধও বটে। আর এটা কি ধরনের গণতন্ত্র ( ফরাসী দেশের উদ্দেশ্যে ) যেখানে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যদের জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয় ?' [ হিটলার যেন জার্মান কমিউনিস্টদের গোকুল-পিঠে পরমান্ন খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন ! ]

ইতিহাস কখনও কাউকে ক্ষমা করে না। সর্বহারাদের পরিত্রাতা স্তালিন জীবনের সায়াহ্নে এসে সেকথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন।

আর যুদ্ধ যখন এসে গেল ঘাড়ের ওপর তখন সমগ্র রুশ জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিলেন স্তালিন, তাতে শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্রতর ও রক্তাক্ত করার কথা ছিল না, শ্রেণী-বিদ্বেষ শ্রেণী-সচেতনতার ইঙ্গিতও ছিল না। বুর্জোয়া 'দেশ-প্রেমের' আহ্বানে উদ্বুদ্ধ করলেন। এ-যুদ্ধকে দেশপ্রেমিক যুদ্ধ 'Patriotic war' বলে ঘোষণা করা হল। দেশরক্ষার যুদ্ধে সামিল হবার জন্য গোটা দেশকে তিনি ডাক দিলেন—কোন বিশেষ শ্রেণীকে নয়।

"……Our people should be fearless in their struggle and should selflessly fight our patriotic war of liberation against fascist enslavers."

এ-যুদ্ধ কি 'Ideological war' 'আদর্শগত যুদ্ধ' বলে বিবেচিত হয়েছিল তখন স্তালিন-মলোটভের কাছে ? আদর্শগত যুদ্ধ তো 'মধ্যযুগীয় ধর্মীয় যুদ্ধ।'

# ২৪

## ইঙ্গ-সোভিয়েট মৈত্রী

ইতিহাস বড় নির্মম শিক্ষাদাতা। যে গ্রেট ব্রিটেনকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য স্তালিন-মলোটভ দায়ী করেছিলেন এবং হিটলারতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাবার ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণাকে নিছক শঠতা ও ধাপ্পাবাজী বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে, সেই সাম্রাজ্যবাদী গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে ১৯৪২ সালের মে মাসে ইঙ্গ-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি ( Anglo-Soviet Alliance of May, 1942 ) স্বাক্ষরিত হল। খুব সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলে নেওয়া যাক।

এণ্টনী ইডেন ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কো এসে পৌছুলেন। স্তালিন-মলোটভ জার্মানী কর্তৃক রুশ আক্রমণের পূর্বে রাশিয়ার যে সীমানা ছিল তা মেনে নেবার দাবী জানালেন। ফিনল্যাণ্ড রুমানিয়ার সঙ্গে সৃষ্ট নতুন সীমানা বাল্‌টিক রাজ্যগুলির সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তিকরণ এগুলোকে স্বীকৃতি দেবারই দাবী এটা। চার্চিলের রাশিয়ার এই দাবী মেনে নিতে বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুব আপত্তি ছিল। ওয়াশিংটনের মতে এই প্রস্তাব অতলান্তিক সনদের ( Atlantic Charter ) ঘোষিত নীতির বিরোধী। তাছাড়া অতলান্তিক সনদের মৌল নীতির প্রতি রাশিয়ার সমর্থন ছিল। মস্কোতে এ প্রশ্নের মীমাংসা হল না। আবার ২৩শে মে মলোটভ লণ্ডন এলেন আলোচনার জন্য, তখন এই প্রশ্নটি উহ্য রেখে বিশ বছর মেয়াদী এক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। বিতর্কিত সীমানা সম্বন্ধে এই চুক্তিতে কোন উল্লেখ আর রইল না। স্তালিনের অপর গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল ইউরোপে দ্বিতীয় যুক্ত ফ্রন্ট উন্মুক্ত করা হোক। তাতে রাশিয়ার ওপর আক্রমণের চাপের তীব্রতা ও ব্যাপকতা হ্রাস পাবে। এই দাবী স্তালিন মার্কিন সরকারের কাছেও করে আসছিলেন। চার্চিলের মনে সন্দেহ ছিল শেষ পর্যন্ত জার্মান আক্রমণ কাটিয়ে উঠতে আদৌ পারবে কিনা। তাঁর ধারণা জন্মেছিল রাশিয়ার এই যুদ্ধে শেষরক্ষা হয়ত হবে না। তাই ১৯৪১ সালের শেষভাগে

উইলিয়াম বিভারব্রুক্‌কে যখন তিনি মস্কো পাঠিয়েছিলেন একটি বিশেষ দৌত্য দিয়ে তখন বিভারব্রুক্‌ রাশিয়াকে এই যুদ্ধে খুব প্রয়োজনীয় সহযোগী বলে মনে করে সেই মর্মে সরকারকে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। কিন্তু চার্চিল তাতে সে সময় খুব গুরুত্ব আরোপ করেননি।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট তাড়াতাড়ি খুলতে গেলে চাপটা গ্রেট বিটেনের উপরই এসে পড়বে—এই বুঝে তিনি ১৯৪৩ সালে ফ্রান্সে সৈন্য অবতরণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ১৯৪২ সালেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন চালু করার পক্ষে ছিলেন। মলোটভ এরপর ওয়াশিংটনও ঘুরে আসেন এই বিষয় একটা পাকাপাকি সিদ্ধান্তের জন্য। রাশিয়া মনে করেছিল দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে অন্তত ৪০ ডিভিসন জার্মান সৈন্যকে রাশিয়ার রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে আনতে ইউরোপের যুদ্ধের মোকাবিলা করার জন্য। ১৯৪২ সালের ১১ই জুন ঋণ-ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল রাশিয়া ও আমেরিকার সঙ্গে। মলোটভ ওয়াশিংটন ঘুরে আসার পরই এটা হল। এই চুক্তিতে সামিল হন রাশিয়ার পক্ষে লিট্‌ভিনভ এবং আমেরিকার পক্ষে কর্ডেল হাল্‌ ( Principles of mutual aid against aggression )। ইঙ্গ-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন ইডেন ও মলোটভ। মস্কোতে প্রচণ্ড সমারোহ করে এই চুক্তিকে অভিনন্দন জানান হল। গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে দোস্তি হয়ে গেল। ইউরোপের যুদ্ধ এবার 'আদর্শবাদের যুদ্ধে' ( Ideological war ) রূপান্তরিত হল মার্কসীয় ডায়েলেক্‌টিকের অমোঘ নিয়মে। একে আর নাক সিঁটকিয়ে ঘৃণাভরে 'মধ্যযুগীয় ধর্মযুদ্ধ' বলা চলবে না। রাশিয়া আক্রান্ত হবার সাথে সাথে ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরাও 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'কে 'জনযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করলেন। তার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা বলে এসেছিলেন ভারতের মুক্তিকামী স্বাধীনতার লড়াই-এ উৎসর্গীকৃত জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে 'এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে এক পাই-ও নয় এক ভাই-ও-নয়।' ১৯৪১ সালের ২২শে জুনের ঘটনার পর থেকে পট-পরিবর্তন ঘটল। কমিউনিস্টদের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ঘনিষ্ঠ নৈকট্য স্থাপিত হল, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী গ্রেট ব্রিটেনের ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিই যখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সমগ্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল। লণ্ডনের ও ওয়াশিংটনের সঙ্গে মস্কোর নতুন দোস্তি সেই মার্কসীয় ডায়েলেক্‌টিকের অমোঘ নিয়মেই ৪০ কোটি পরাধীন ভারতবাসীর রক্ত শোষণকারী পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হিংস্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বৈপ্লবিক কায়াকল্প ঘটল—ডোরাকাটা নেকড়ে সমাজতন্ত্রে অনুরাগী নিরীহ মেষ-শাবকে

রূপান্তরিত হল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কমিউনিস্টরা চীৎকার সুরু করলেন : এই 'জনযুদ্ধের' সফল পরিণতির জন্য যা যা করণীয় তাই করতে হবে, রক্ত দিতে হবে, অর্থ দিতে হবে। এখন এমন কোন কিছুই করা চলবে না যাতে ব্রিটিশ প্রভুদের বিব্রত হতে হয়। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে বানচাল করার জন্য ব্রিটিশরাজ ভারতবর্ষে মার্কসবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের শক্তিবৃদ্ধিতে মদত্ জোগাতে লাগলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদীরা যখন মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী ও বামপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতাদের আহ্বানে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ('Do or Die') সংগ্রামে লিপ্ত, তখন ভারতের কমিউনিস্টরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট ও পুষ্ট মুসলীম লীগের দ্বি-জাতিতত্ত্ব-ভিত্তিক পাকিস্তান সৃষ্টির দাবীকে 'ন্যায়সঙ্গত' ও 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' বলে প্রচারে নামলেন। দেশের মুক্তিযোদ্ধারা হলেন 'দেশদ্রোহী', নেতাজী সুভাষচন্দ্র হলেন 'কুইস্‌লিং'—তিনি আখ্যাত হলেন ফ্যাসিস্ট বলে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক বলে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যখন মস্কোর নির্দেশে ভারতের কমিউনিস্টরা নকল লড়াই-এ মত্ত তখন কিন্তু স্তালিন সেই ফ্যাসিস্ট জাপানের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ। জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাৎসুওকার রাশিয়ায় চুক্তি সম্পাদন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় আনন্দে বিহ্বল স্তালিন রেল স্টেশনে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে এসে বললেন "এ বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হোক। হাজার হোক আমরা তো 'এশিয়াবাসী' (We are Asiatics)।" আর এই এশিয়-শক্তি জাপানের সঙ্গে সেদিন চীনের কমিউনিস্টরাও এশিয়াবাসী হয়েই জীবন-মরণ পণ করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই করে যাচ্ছিল। ডায়েলেক্‌টিকের বৃত্ত পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

## ২৫

## বিশ্ব-বিপ্লবের নয়া কামারশালা : তেহেরান ও ইয়াল্টা সম্মেলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পার্থিব স্বার্থের তাগিদে 'সমাজতান্ত্রিক' ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার মধ্যে যে নয়াবন্ধুত্বের মঞ্জিল গড়ে উঠেছিল তাতে ফাটল ধরা সুরু করেছিল ১৯৪৩ সালের শেষাশেষি। যুদ্ধকালীন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ-বৈঠক এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : তেহেরান সম্মেলন, ইয়াল্টা সম্মেলন, পট্‌স্‌ড্যাম্‌ সম্মেলন। এই তিনটি সম্মেলনই ঐতিহাসিক; আর এই সব সম্মেলনে ব্রিটিশ, রুশ ও মার্কিন স্বার্থের সংঘাত পরিস্ফুটও হয়ে উঠেছিল।

তেহেরান সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়গুলি (নভেম্বর—ডিসেম্বর, ১৯৪৩) বিশ্ববাসীর দৃষ্টির আড়াল করে রাখা হয়েছিল। চেম্বারলেন এই সম্মেলন সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন : "Seldom was so much concealed from so many by so few." [ W. H. Chamberlin : America's Second Crusade (Chicago, 1950) : P. 179. ] তেহেরান সম্মেলনে তিন শক্তির মধ্যে পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ ও ভাবী সীমানা নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক উঠেছিল। স্তালিন ও চার্চিলের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিয়েছিল। বিতর্ক সুরু হল জার্মানীর ভবিষ্যৎ ও জার্মানী কর্তৃক যুদ্ধের জন্য দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও পদ্ধতি নিয়ে। তেহেরান সম্মেলন শেষ করে যখন চার্চিল, স্তালিন ও রুজভেল্ট ফিরে আসেন তখন দু'টি বিষয়ে তিনজনের মধ্যেই একটা মৌলিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। (১) নীতিগতভাবে তিন রাষ্ট্র-নেতাই জার্মানীর বিভক্তিকরণে ঐকমত্য হলেও ঠিক কিভাবে তা হবে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন পরিকল্পনা তখনও রচিত হয়নি। (২) পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে একটি ফরমূলা রচিত হয়—তার ভবিষ্যৎ ভৌগোলিক সীমানা সম্বন্ধে এবং উইনস্টন চার্চিলকে লণ্ডনে অবস্থিত পোলিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনজন রাষ্ট্র-নেতাই জার্মানীকে সর্বতোভাবে সর্বাধিক দুর্বল করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। আর তাঁরা জার্মানীর কাছ থেকে বৃহৎ অঞ্চলকে নিয়ে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া, এবং তার বিভক্তিকরণের (Division)

কূটনীতির মধ্যে জার্মানীকে চিরতরে দুর্বল করে রাখার সার্থক প্রতিফলন আবিষ্কার করেছিলেন। যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জার্মানী থেকে নিয়ে পোল্যাণ্ডকে দেওয়া হবে সেই সব অঞ্চলের জার্মান অধিবাসীদের কি পরিস্থিতি দাঁড়াবে, তাদের কি ভবিষ্যৎ হবে, কি-ই বা তার সমাধান, এসব নিয়ে এই রাষ্ট্র-নেতারা আদৌ ভেবে দেখলেন না তখনকার মত। জার্মানীকে শেষ করতেই হবে, এই লক্ষ্যে পৌছুবার আগ্রহে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট স্তালিনকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। কোথায় রইল মার্কসীয় দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যা! রাশিয়াও পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ড দাবী করেছিল। সেইসব অঞ্চলের পোল-বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের সমস্যাও এই বৃহৎ পোলিশ সমস্যার অংশরূপে দেখা দিয়েছিল। চার্চিল সম্মেলনের শেষে কাব্য করে বলেছিলেন :

"We came here with hope and determination We leave here friends in fact, in spirit and in purpose." অর্থাৎ 'আমরা এই সম্মেলনে আশা ও সঙ্কল্প নিয়ে এসেছিলাম। আজ আমরা সম্মেলন শেষে ফিরে যাচ্ছি প্রকৃত বন্ধু হিসাবে। আর এই বন্ধুত্ব উদ্দেশ্য ও চিন্তার সহমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত।'

এরপর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ইয়াণ্টায় জারের লিভাডিয়া প্রাসাদে এই বৃহৎ তিনশক্তির মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধকালীন সম্মেলন ( Yalta Conference ) বসল। সেই তিন নেতাই উপস্থিত। অসুস্থ মার্কিন প্রেসিডেণ্ট সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনি ইউরোপের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খুব বেশি জড়াতে চাননি। তাঁর মনস্তত্ত্বের পূর্ণ সুযোগ স্তালিন নিতে ছাড়েননি। ইউরোপের সমস্যার সমাধান তিনি ব্রিটেন ও রাশিয়ার ওপর ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমেরিকা দূরপ্রাচ্য নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন সে সময়। সম্মেলনে জার্মান-বিদ্বেষকে আবার চাঙ্গা করে তোলা হল। আগামী দিনের দুনিয়া এই তিনটি বৃহৎশক্তির পদানত হয়ে থাকবে। যদি এই তিনশক্তির মধ্যে বিশ্বশান্তির উপায় সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এই ভাবনা সেদিন তিন রাষ্ট্রের কূটনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদদের প্রভাবিত করেছিল সন্দেহাতীতভাবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্স জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা দাবী করেছিল এবং রাশিয়াকে চাপ দিয়েছিল যাতে সেও জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা ( Reparations ) দাবী করে। কিন্তু লেনিন তা অস্বীকার করেছিলেন। এবার স্তালিন সেই দাবী তুললেন। তখন রুজভেল্ট ও চার্চিল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্তালিনকে শুনিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

ইয়াল্টাতে ৮ই ফেব্রুয়ারি প্লেনারি অধিবেশনের ঠিক কিছু আগে রুজভেল্ট ও স্তালিনের মধ্যে এক গোপন বৈঠক বসে। সেখানে চার্চিল আমন্ত্রিত হননি। এই গোপন বৈঠকে রুজভেল্ট স্তালিনকে চাপ দেন লালফৌজ নিয়ে রাশিয়া যেন জাপানের বিরুদ্ধে প্রাচ্য রণাঙ্গনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মেলায়—জার্মানীর পরাজয়ের অব্যবহিত পরই। স্তালিন শুধু সময়ই চাননি—তিনি এই সুযোগে কতকগুলি বিশেষ দাবী আদায়ের চেষ্টাও করেন। তাঁর দাবী ছিল: (১) মঙ্গোলিয়ার পিপ্‌ল্‌স্‌ রিপাবলিকের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হোক ( Status quo in the Mongol Peoples' Republic ); (২) সাখালীন, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ ও পোর্ট আর্থার সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে মেনে নিতে হবে; (৩) ডাইরেন বন্দরের আন্তর্জাতিকীকরণ; (৪) পূর্ব চীন ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেল-ব্যবস্থার পরিচালনা একটি যৌথ রুশ-চীন কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এই সব দাবী থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, রাশিয়া ইয়াল্টা সম্মেলনে চেয়েছিল উত্তর চীনা-ভূখণ্ডে তার প্রাধান্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও চার্চিল স্বীকার করে নেন। [ See : The Genesis of the Order—Neisse Line : Wolfgaug Wagher ; Chapters—4, 5 & 8. ]

জার্মান সমস্যা নিয়ে যখন আলোচনা উঠল তখন স্তালিন আলোচনা করতে চাইলেন:

(১) জার্মানীর বিভক্তিকরণ ( dismemberment ); (২) জার্মানীতে হয় একটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা অথবা জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরকারের প্রতিষ্ঠা; (৩) অক্ষশক্তির তথা জার্মানীর নিঃসর্ত আত্মসমর্পণের নীতিকে ভিত্তিরূপে কার্যকরীকরণ; (৪) জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি ও ক্ষতিপূরণের অঙ্ক, ইত্যাদি।

জার্মানীতে ফ্রান্সের অধীনে কোন পৃথক অঞ্চল যাতে সৃষ্টি করা না হয় তার জন্য স্তালিন চাপ দিলেন। শুধু ব্রিটেন, রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যেই ভাগাভাগিটা সীমাবদ্ধ যেন থাকে—এই ছিল তাঁর দাবী। তবে শেষ পর্যন্ত এই দাবী টেকেনি। তখন তিনি চাপ দিলেন পরাভূত জার্মানীর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্য যে নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ( Control machinery for Germany ) তৈরী হবে তাতে ফ্রান্সের কোন সদস্যপদ থাকবে না।

জার্মানীর মোট ভারী শিল্পের ( Heavy industry ) শতকরা ৮০ ভাগ রাশিয়ার ভাগে যাতে পড়ে স্তালিন সেই দাবী করলেন। আর দু'বছরের মধ্যে এই সব শিল্পের হস্তান্তর চাই-ই। ক্ষতিপূরণ বাবদ দশ হাজার মিলিয়ান ডলার রাশিয়াকে জার্মানীর দিতে হবে।

সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর দু'টো মূল লক্ষ্য ছিল : (১) নিজের দেশে সমাজতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত করা ; (২) বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিস্ট বিপ্লবে সাহায্য যোগান ও সেই বিপ্লবকে পরিচালিত করা। আসলে সবসময় প্রথম লক্ষ্যটিই দ্বিতীয় লক্ষ্যকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে—over shadow করে এসেছে। স্তালিন নিজের দেশের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য বিশ্ব-বিপ্লবের লক্ষ্যকে উপেক্ষা করে এসেছেন। স্তালিন ছিলেন উগ্র সোভিয়েট জাতীয়তাবাদী, ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল ( conservative )। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে 'স্থিতাবস্থা' ( Status quo ) রক্ষা করতেই ইচ্ছুক ছিলেন. পুঁজিবাদী বুর্জোয়া শিবির ও কমিউনিস্ট শিবিরের মধ্যে চিরস্থায়ী বাঁটোয়ারার স্বপ্ন দেখেছিলেন। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক Isaac Deutscher বলেছেন :

"At Yalta and Tehran during the last war Stalin divided the world with Churchill and Rosevelt into Zones of influence. In October 1944 that grotesque gentlemen's agreement was concluded between Stalin and Churchill in which these noble men divided Europe in such a way that Western Europe should go to capitalism, to the Western Powers and in Eastern Europe as Churchill himself put it, Russia should exercise a ninety percent predominance. In Greece, Britain was to exercise a ninety percent predominance and in Yugoslavia the influence should be divided on a precise basis of 50—50." [ Myths of the Cold War—See : Containment and Revolution—Edited by David Horowitz. ]

স্তালিন এই ভাগ-বাঁটোয়ারাকে পুরাপুরি মেনে নিয়েছিলেন। এই 'ভদ্রলোকের চুক্তি'—আপোষে লুণ্ঠনের চুক্তির—কোন খেলাপ স্তালিন কোনদিন করেছেন একথা অতিবড় নিন্দুকও বলবেন না। আমেরিকা 'ন্যাটো' ( NATO ) সামরিক জোট তৈরী করার পর থেকেই স্তালিনের মনোভাবও

জঙ্গী হয়ে উঠল। আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি-নির্ধারক শ্রেণী আমেরিকার সামরিক ক্ষমতার দম্ভে উন্মত্ত হয়ে পূর্ব ইউরোপের যে অঞ্চলগুলিকে আপোষে 'ভদ্রলোকের চুক্তি' মাধ্যমে স্তালিনকে উপহার দিয়েছিলেন তা বোধ করি ফিরে পেতে উদ্যত হলেন। ডয়েটসার বলেছেন :

"Stalin insisted on the letter of the bargain—of the Yalta and Tehran bargain. Stalin said, 'You yielded Eastern Europe to me I am not going to give it back to you'. Stalin who in his dealing with his own people was absolutely unscrupulous and ruthless who was most ruthless and most cruel in dealing with Communists, the same Stalin was in a bizarre Byzantine was scrupulous, legalistically scrupulous in his bargains with his bourgeois allies. He claimed the advantage they had yielded to him: he gripped Eastern Europe. He stuck to the letter of the war-time agreements with Churchill and Roosevelt but he also respected his obligations. Long before the Truman Doctrine was proclaimed Stalin had very effectively saved Western Europe for capitalism; he had saved Western Europe from communism." [ Myths Of The Cold War—See P. 17. ]

লেখক বলেছেন, যে স্তালিন কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে, নিজের কমরেডদের সম্বন্ধে, নিজের দেশের জনগণ সম্বন্ধে নির্দয় হৃদয়হীন নীতিহীন আচরণ-পটু ছিলেন সেই স্তালিন আবার এই আন্তর্জাতিক ভদ্রলোকের চুক্তির সর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। বিশ্বরাজনীতিতে কূটনীতিই প্রাধান্য লাভ করল—সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ ও বিশ্ববিপ্লব-আদর্শ স্বপ্নের মত দূরে মিলিয়ে গেল। তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হল নূতন দোস্তি! চার্চিলের ঐতিহাসিক উক্তি :

"Russian policy is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma".

অর্থাৎ 'রাশিয়ার নীতি যেন একটি ধাঁধা, প্রহেলিকার গহ্বরে রহস্যের আবরণে আবৃত।' স্তালিনের সঙ্গে তেহরান ও ইয়াল্টা সম্মেলনে চার্চিলের এত তিক্ত বাদানুবাদ হল তবু সম্মেলন শেষে প্রাণ-মাতানো বক্তৃতায় তিনি

বললেন, তাঁরা অর্থাৎ বৃহৎ ত্রিশক্তি আজ 'friends in fact in spirit and in purpose'। রুশ কূটনীতি-রাজনীতির জয়জয়কার। ইতিহাসের রায় সাফল্যের নিরিখেই হয়ে থাকে যে! রাজনীতির ছাত্ররা বিচার করে দেখবেন যুদ্ধকালীন এই দুই ঐতিহাসিক সম্মেলনে দর-কষাকষির মধ্যে সর্বহারাশ্রেণীর আন্তর্জাতিক বিপ্লবের লেনিনবাদী চেতনা ও সঙ্কল্প কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছিল স্তালিনের আচরণের মধ্যে।

স্তালিন হিটলারের সাথে দোস্তি করে পোল্যাণ্ডের যেটুকু পেয়েছিলেন বখ্‌রা হিসাবে শুধুমাত্র সেটুকুকেও রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হননি, হিটলারের চাপে যেটা পাননি সেটা আদায় করার মতলব ভাঁজছিলেন। যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় সম্বন্ধে যতই সুনিশ্চিত হতে লাগলেন ততই স্তালিনের অভিলাষ মাথা চাড়া দিচ্ছিল। ১৯৪০ সালে তিনি রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ায় রুশ স্বার্থের প্রাধান্য দাবী করেছিলেন সেদিনের বন্ধু হিটলারের কাছে। যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা যতই উজ্জ্বল হতে লাগল ততই তিনি ইউরোপকে 'Zones of influence' বা 'প্রভাবাধীন এলাকারূপে' ভাগাভাগি করার স্বপ্ন দেখছিলেন।

ইউরোপকে বিভিন্ন শক্তিধর বিজয়ী রাষ্ট্রের কয়েকটি প্রভাবাধীন এলাকারূপে ভাগ করার সাম্রাজ্যবাদী প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৪ সালের জুন মাসে রেখেছিলেন। ব্রিটেন চেয়েছিল রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়া রুশ প্রভাবাধীন (Sphere of influence) বলে স্বীকৃত হোক, আর গ্রীসে ব্রিটিশ প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হোক। এ ব্যাপারে রুজভেল্ট নিরপেক্ষ ছিলেন। তখন তিনি হতাশার ব্যাধিতে ভুগছেন। তেহেরানে বুদ্ধির লড়াইয়ে তিনি যে স্তালিনের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন সেটা বুঝেছিলেন। সে খেসারত পূরণের কোন আর পথ নেই দেখে তিনি নিরপেক্ষতার পথ বেছে নিলেন। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ ও রুশ প্রধানমন্ত্রীদ্বয় পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ভাগাভাগির ভিত্তিটা পাকাপাকি করে ফেললেন।

"......Russia should have a 75-80 percent predominance in Bulgaria. Hungary and Rumania, while the British share was expressed in 20-25 percent. In Yugoslavia the countries were to exercise their influence on a fifty-fifty basis."

[Stalin—By Isaac Deutscher, Chap. 13.]

অর্থাৎ বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরীতে রাশিয়ার প্রাধান্য থাকবে শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ, ব্রিটিশ সরকারের প্রাধান্য থাকবে শতকরা ২০-২৫ ভাগ।

যুগোস্লাভিয়াতে এই দুই মিত্ররাষ্ট্রের সমান সমান, ৫০-৫০ ভাগ প্রাধান্য থাকবে।

আর এই ভাগাভাগি যে রাজনীতি-নিরপেক্ষ নয় সেটা স্তালিন নিজেও জানতেন। গোপনে এই বিষয়ে মার্কসবাদী বিশ্ব-বিপ্লববাদী স্তালিন ও সাম্রাজ্যবাদী চার্চিলের বোঝাপড়াও হয়ে যায় ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে। মার্কসবাদী পণ্ডিত খ্যাতনামা লেখক ও ইতিহাসবিদ আইজ্যাক ডয়েটসার বলেছেন:

"......They agreed confidentially that if the British found it necessary to take military action to quell internal disorders in Greece, the Soviet would not interfere. In return the British would recognise the right of the Soviets to take the lead in maintaining order in Rumania. Stalin could have had no doubt what sort of 'internal disorders' Churchill anticipated. The British had just landed in Greece and found the Communist-led partisans of E. L. A. S in virtual control of the country. Churchill was anticipating civil war and preparing for it. Stalin declared in effect his desintressement in the fate of the Greek Left. The quid pro quo—the promise that the British would not interfere in Rumania amounted to Churchill's disinterest in the fate of the Rumanian right."

এই বোঝাপড়ার দরুন গ্রীসে যদি ব্রিটিশ সরকার সামরিক অভিযান চালিয়ে সেদেশের কমিউনিস্ট প্রভাবিত ও পরিচালিত বামপন্থী আন্দোলনকে দমন করতে উদ্যত হয় রাশিয়া তাতে বাধা দেবে না। এর প্রতিদানে ব্রিটিশ সরকার রুমানিয়াতে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে অকমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট বিরোধীদের ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা করার মস্কোর অধিকার স্বীকার করে নিল। 'আভ্যন্তরীণ গোলযোগ' বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায় সেটা স্তালিন ও চার্চিল জানতেন। ঠিক সেই সময়ই গ্রীসে ব্রিটিশ সৈন্যরা কমিউনিস্ট আন্দোলনকারীদের স্তব্ধ করার জন্য অবতরণ করছিল। গোটা গ্রীসের কর্তৃত্ব প্রায় কমিউনিস্ট আন্দোলনকারীদের হাতেই এসে গিয়েছিল। গৃহযুদ্ধ আসন্ন। স্তালিন গ্রীসের বামপন্থীদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ও উদাসীন সেজে গেলেন।

চমৎকার দর-কষাকষি করে লেন-দেনের রাজনীতির মধ্যে দিয়ে ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছিল পর্দার আড়ালে গোপন শলাপরামর্শ মাধ্যমে।

ডয়েটসার আরও বলেছেন :

"This was a perfect bargain ( some may say a perfectly cynical ) if there was ever one……Having clinched it Churchill and Stalin surprised the world by the zeal with which they defended each other's actions and by the indubitable admiration with which they spoke of each other."

[ Stalin—By Isaac Deutscher ; P 502-503. ]

অর্থাৎ দুই দেশের দুই পরস্পর-মতাবলম্বী রাষ্ট্রনায়ক নিজেদের এই নগ্ন স্বার্থপর কাজের শুধু সমর্থনই করেননি,—পরস্পর পরস্পরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-কীর্তনে গোটা দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। এর নাম কূটনীতি—রাজনীতি, 'বিশ্ব-বিপ্লব' দুরন্ত ছেলেদের মন-ভোলান গান। যেন এটা কূটনীতিবিদ-রাজনীতিবিদদের কূটনীতি-রাজনীতির নাট্যাঙ্কের ফাঁকে ফাঁকে অধীর উদ্‌গ্রীব দর্শকদের মনকে ভুলিয়ে রাখার আবহ-সঙ্গীত। গানের শেষেই মঞ্চের পর্দা সরবে, পরবর্তী অঙ্ক এ্যাকশানে, জ্বালাময়ী বিপ্লবী-প্রতিবিপ্লবী সংলাপে ঠাসা। নাটকের যবনিকা পতনের পর দর্শকমণ্ডলী উত্তপ্ত বা ভগ্ন, বিষণ্ণ বা ক্রুদ্ধ হৃদয়ে প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। বাইরে সশস্ত্র সান্ত্রীর অতন্দ্র প্রহরা, ভারী বুটের পদচারণা, চারিধারে নিথর স্তব্ধ শান্তি। বন্দুকের নলই যে ক্ষমতার উৎস! "Power grows out of the barrel of a gun." প্রগতিশীল নাট্যকারের যে নাটক দর্শকরা দেখে বার হয়ে এলেন—তার মূল ভিত্তি কিন্তু ছিল : জনগণই ক্ষমতার প্রকৃত উৎস, তাদের জাগ্রত শাণিত সংস্কৃত ইচ্ছা অভিলাষ শুদ্ধ বিবেকের সুশৃঙ্খল সুনির্দিষ্ট সুসমঞ্জস বহিঃপ্রকাশই রাজনীতির মূল ভিত্তি।

কি তেহেরান, কি ইয়াল্টা, কি পট্‌সড্যাম্‌—তিন বৃহৎশক্তির ( Big Three ) বখ্‌রা ভাগাভাগি, দুনিয়ার এলাকা ভাগাভাগির কামারশালা।

## ২৬

## তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিলুপ্তি সাধন

কূটনীতির বৃত্তটি পূর্ণ হতে আরও কিছু বাকী ছিল। সেই বাকী কাজটুকু স্তালিন সম্পূর্ণ করলেন: ১৯৪৩ সালের ১৬ই মে বিশ্ব-বিপ্লববাদী লেনিন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-বিপ্লবের হাতিয়ার কমিণ্টার্ণকে ( তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ) অতলান্তিক মহাসাগরে অতলে তলিয়ে দিলেন। কমিণ্টার্ণ ভেঙে দেওয়া ( Dissolved ) হল। রাশিয়ার 'দেশপ্রেমিক যুদ্ধে' জয়লাভের স্বার্থে বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ও বুর্জোয়া দুনিয়ার পূর্ণ সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতার তাগিদে। বিশ্ব-বিপ্লব শিকেয় উঠল। যেমন চীন-মার্কিন সমঝোতা, রুশ-মার্কিন শীর্ষ বৈঠক, অস্ত্র-সম্বরণ সমঝোতার প্রয়োজনের বেদীমূলে ভিয়েৎনাম বিপ্লব শিকেয় উঠে থাকে। পিকিং মস্কোতে সৌহার্দ্য ও প্রীতিভোজের উৎসব হয় সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্যবাদী শিবিরের নেতাদের। কিন্তু ভিয়েৎনামের নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান অবলীলাক্রমে চলে। ভিয়েৎনামের সম্বলও অতীতের মত আজও অটুট সঙ্কল্প. জ্বলন্ত দেশপ্রেম, নিষ্ঠা। কিন্তু এর অদ্ভুত কৈফিয়ৎও দেওয়া হয়েছিল। কমিণ্টার্ণের মৃত্যুপরোয়ানাতেই তার উল্লেখ ছিল। ইতিহাসের ছাত্রদের সেটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার।

"The whole course of events in the last quarter of a century, and the collective experience of the Communist International have decisively shown that the form of organisation chosen by the First Congress of the Communist International to unite the working class, which corresponded to the requirements of the early period of the re-emergence of the working class, has more and more obviously outlived its usefulness, in the light of the growth of this movement and the growing complexity of its problems in every country. This form of organisation has in fact become a hindrance to

the further strengthening of national workers' parties. The world war unleashed by the Nazis has still further accentuated the difference in conditions in different countries by bringing out the sharp line of division between those countries which acted as carriers of the Nazi tyranny and the freedom-loving peoples which are united in the mighty coalition against Hitler.

"On the basis of the considerations adduced above, and having regard to the growth and political maturity of the Communist Parties and their leading cadres in the various countries and to the fact that during the present war a number of component sections have raised the question of dissolving Communist International as the main centre of the International workers' movement. The Presidium of the Executive Committee of the Communist International not being in a position to convene all its members to secure approval section by section on account of the circumstances of the world war permits itself to submit to the following proposal:

'The Communist International is hereby dissolved as the main centre of International workers' movement and the component sections of the Communist International are relieved of the obligations which they undertook on the basis of the statutes and decrees of the Congresses of the Communist International.

"The Presidium of the executive committee of the Communist International calls upon all members of the Communist International to concentrate all their strength on giving general support and active co-operation in the war of liberation of the peoples and states of the anti-Hitler coalition in order to accelerate the destruction of the mortal

enemy of all working people, German fascism and its allies and vassals."

এই ডিক্রীতে সই করেছিলেন : গট্‌ওয়াল্ড, ডিমিট্রভ, ঝানভ্, কোলারভ্, কপলেনিগ, কুসিগিন, ম্যানুইলস্কি, মারটী, পিক্, থোরেজ, ফ্লোরিন, এরকলি টেগ্‌লিয়াত্তি। স্বাক্ষরকারীরা ছিলেন ৮টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি। এঁরা কিন্তু নিজ নিজ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরূপে স্বাক্ষর দেননি, প্রেসিডিয়ামের সদস্যরূপেই দিয়েছিলেন। তাই সকল কমিউনিস্ট দেশের মতামত না নিয়েই এই আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সংস্থাটিকে ভেঙে দেওয়া হল। এত তাড়াতাড়িই বা ভাঙতে হল কেন? যুদ্ধজয়ের গরজ, কূটনীতি ও রুশ স্বার্থের কড়া তাগিদ!

বিগত ২৫ বছরের ঘটনাপ্রবাহ এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে, আন্তর্জাতিকের প্রথম অধিবেশনে বিশ্বের সকল দেশের শ্রমিক-শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সংগঠনের যে রূপ দেওয়া হয়েছিল সেটা সে যুগের শ্রমিক-শ্রেণীর পুনরভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ীই হয়েছিল। আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই ধরনের সাংগঠনিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তাই ফুরিয়ে গেছে—বিশেষ করে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিস্তৃতি, ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টি-কর্মীদের যেরূপ অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণতা ও পরিপক্কতা অর্জন করেছেন সেই পটভূমিতে। সংগঠনের বর্তমান এই রূপ বা কাঠামো জাতীয় শ্রমিক দলগুলির অধিকতর শক্তিশালী হবার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাৎসীরা যে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছে তাতে বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতির তারতম্য আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। নাৎসী অত্যাচারের সহায়ক দেশগুলি ও মুক্তিকামী হিটলার-বিরোধী জাতিগুলির মধ্যেকার ব্যবধান সুতীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। একদিকে নাৎসীশক্তি, অপরদিকে নাৎসী-বিরোধী স্বাধীনতাকামী জাতিগুলির ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট।

এইসব পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট দলের উন্নত চেতনা ও পরিপক্কতার কথা বিবেচনা করে এবং এই যুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের 'কয়েকটি সংশ্লিষ্ট শাখা আন্তর্জাতিক' শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্ররূপে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে গুটিয়ে ফেলার প্রশ্ন উত্থাপন করায় আন্তর্জাতিকের কার্যকরী সমিতির পরিচালকমণ্ডলী কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করছে। সকল শাখার উপস্থিতিতে ও তাদের সম্মতি

নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেবার মত সময় না থাকায় কার্যকরী সমিতিই এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে :

এতদ্দ্বারা এই বিশ্ব শ্রমিক-আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্ররূপে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এই সংস্থাটিকে ভেঙে দেওয়া হল। উক্ত আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও শাখাগুলিকে অতীতের আইন নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ চালিয়ে দায়-দায়িত্ব থেকে আজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। ( বিপ্লবের ছুটি হল ! )

কার্যকরী সমিতির সভাপতিমণ্ডলী আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সংযুক্ত সকলকেই আহ্বান জানাচ্ছে হিটলারের বিরুদ্ধে সংগঠিত যুদ্ধজোটকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে শ্রমিক-শ্রেণীর চরম ও মারাত্মক শত্রু জার্মান ফ্যাসিবাদ ও তার তাঁবেদারদের ধ্বংস সাধনে ব্রতী হতে।

অথচ রুশ কমিউনিস্ট নেতা স্তালিন-মলোটভ ফ্যাসিবাদকে জার্মান বা ইতালী জাতির 'রুচি ও সুবিধার' প্রশ্ন বলে একদিন দেখেছিলেন ( matter of taste and convenience )। ইউরোপে কমিউনিস্ট অনুসৃত 'পপুলার ফ্রণ্ট রাজনীতির' যুগে ফ্যাসিবাদকে চরম শত্রু বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু স্পেনের গৃহযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের পেছনে অসহায়ভাবে পরিত্যাগ করে রাশিয়া সরে আসার পর থেকে ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে রাশিয়ার ( অতএব বিশ্বের সকল কমিউনিস্টদেরও ) দৃষ্টিভঙ্গীর রূপান্তর ঘটতে থাকে। শেষে ১৯৩৯ সালের হিটলার-স্তালিন অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের পর ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা সর্বতোভাবে বর্জিত হয়েছিল। মলোটভের সুপ্রীম সোভিয়েটের সামনে সেই ঐতিহাসিক ভাষণটির উল্লেখ আগেই করেছি। ফ্যাসিবাদের হয়ে তিনি ওকালতিই করছিলেন সেদিন।

কখন রুশ নেতারা ও রুশ আশ্রিত আটটি দেশের কমিউনিস্ট নেতারা বুঝতে পারলেন বিশ্বের শ্রমিক-শ্রেণীর সবচেয়ে বড় ও জঘন্যতম শত্রু ফ্যাসিবাদ ? এ জ্ঞানোদয় কখন হল ? যখন জার্মানী চুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়ার ওপর পাশব জিঘাংসা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন। তার আগে নয়। যতদিন না রাশিয়া আক্রান্ত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার মুখোশ পরে আসর গরম করেছিলেন।

কমিণ্টার্ণ ভেঙে দেবার যে কারণগুলো দেখান হয়েছিল তার কোনটাই ধোপে টিকবে না।

জাতীয় শ্রমিক তথা সমাজতান্ত্রিক দলগুলির ( national workers'

parties ) শক্তি সঞ্চয়ের পথে এই 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবিকাশের পথে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল? তাহলে ধরে নিতে হয় মস্কো বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট তথা সমাজতান্ত্রিক বা শ্রমিকদলের স্বতন্ত্র স্বাধীন বিকাশ চায়। প্রতিটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে স্বাধীনভাবে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে যাবে এই তার দৃষ্টিভঙ্গী। যখন পৃথিবীতে কেবলমাত্র 'একটি দেশে সমাজতন্ত্র' (Socialism in one country) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন না হয় সেই দেশকেই সমাজতন্ত্রের মডেল রূপে ধরে নেবার তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা না থাকলেও মানসিকতা গড়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যখন পৃথিবীতে—যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর—একাধিক দেশে 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠিত হল তখন তো প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশের 'স্বাধীন' 'স্বতন্ত্র' পথ ধরে সমাজতন্ত্রের সাধনা করার যৌক্তিকতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দেখা গেছে যখনই কোন কমিউনিস্ট দল তার নিজদেশে স্বতন্ত্র পথ ধরে চলার চেষ্টা করেছে তখনই মস্কো বাধা দিয়েছে, কি মস্কো—কি পিকিং, কমিউনিস্ট আন্দোলন তাদের ওপর চির-নির্ভরশীল থাকুক এটাই তো চেয়েছে।

১৯৪৮ সালে যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সংঘাত ঘটল। স্তালিন মার্শাল টিটোর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নীতি বরদাস্ত করতে চাননি। শেষ পর্যন্ত 'কমিনফর্ম' থেকে যুগোশ্লাভিয়াকে বহিষ্কার করা হল। মস্কো আলবেনিয়ার স্বাতন্ত্র্য পছন্দ করেনি। পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বিভিন্ন সময় মস্কোর সংঘাত দেখা গেছে। সর্বোপরি ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় ৬ লক্ষ লালফৌজ নিয়ে রাশিয়া যখন আক্রমণ করল তখন এই অমার্জনীয় আক্রমণাত্মক আচরণকে সমর্থন করার জন্য ব্রেজনেভের সীমিত সার্বভৌমত্ব-তত্ত্ব ( Doctrine of Limited Soverignty ) আবিষ্কৃত হল। তাই জাতীয় শ্রমিক দলগুলিকে শক্তিশালী করার অজুহাতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দেওয়ার যুক্তি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। রাশিয়ার পরবর্তীকালের আচরণ থেকে এই যুক্তির সমর্থন মিলবে না।

বলা হয়েছে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি নাকি অনেক পরিপক্ক হয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে আগের মত আর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই। এই যুক্তিই কি টিকবে? ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, এশিয়ার চীন ও ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট বিপ্লবের পরিণতি বা আন্দোলনের ধারা দেখে কি বলা যায় কমিউনিস্ট পার্টি উন্নত বৈপ্লবিক মানসিকতা বা সচেতনতা

বা সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল? একের পর এক মারাত্মক ভুল তারা করেছে। একের পর এক বিপ্লব-আয়োজন ব্যর্থ করেছে। কমিউনিস্ট পার্টিগুলি চরম দেউলিয়াপনার পরিচয়ই দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের 'প্রধান কেন্দ্র' ( main centre ) আর 'একমাত্র কেন্দ্র' ( only centre ) এক জিনিস তো নয়। পরিবর্তিত কোন কোন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের 'একমাত্র কেন্দ্র'-রূপে কোন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা শিথিল হতে পারে, কিন্তু 'প্রধান কেন্দ্র'-রূপে সেই সংস্থাকে আরও কিছুকাল বাঁচিয়ে রাখতে বাধা কোথায় ছিল?

তৃতীয় আন্তর্জাতিক কি কাঠামো-সর্বস্বই ছিল? কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন নিশ্চয় হতে পারে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে। কিন্তু পরিবর্তনের সাথে তাকে যুগোপযোগী করতে বাধা কোথায়? কাঠামোর ধাঁচ যদি সময়োপযোগী না হয় তাহলে মূল সংস্থা ভেঙে দেবার যৌক্তিকতা কী থাকতে পারে? তৃতীয় আন্তর্জাতিকের যে রাজনৈতিক তত্ত্ব ও কর্মসূচী ছিল সেগুলো কি সম্পূর্ণ নস্যাৎ হয়ে গেল? বিভিন্ন জাতীয় শ্রমিক বা সমাজতান্ত্রিক দলগুলির কার্যকলাপের সমন্বয় কে করবে বা কিভাবে হবে?

১৯১৯ সালের ২রা মার্চ যখন ক্রেমলিনে কমিণ্টার্ণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৫২ জন প্রতিনিধি সমবেত হন তখন সকলেই কেন্দ্রীভূত এমন একটি সংগঠনের প্রস্তাব করেন যা আন্তর্জাতিক বিপ্লবের বাহন হিসাবে কাজ করবে এবং সেই আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থের কাছে সকল কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট রাষ্ট্র বশবর্তী হয়ে থাকবে। [ "Subordinating the interest of the movement in each country to the common interest of the international revolution"—Jane Degras, ed: The Communist International 1913-1943: Documents, Vol. I. London, Oxford University Press, 1956, P. 5. ]

তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসের সমাপ্তি-ভাষণে লেনিন ঘোষণা করেছিলেন "আন্তর্জাতিক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমিকদের বিপ্লব সফল হবার পরই।" জাতীয়তাবাদ-ভিত্তিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ( Nation-States ) বিরুদ্ধে জিনোভিয়েভ সুস্পষ্টভাবে সম্মেলনে মত ব্যক্ত করলেন। জাতীয়তাবাদ প্রগতির পরিপন্থী এবং এ যুগে অচল পচা বস্তু তাও বলা হল। কমিণ্টার্ণের মধ্যে 'সোস্যালিস্ট কমনওয়েলথ'-এর ভাব-

বস্তুটি নিহিত ছিল। ভাবের জগতে 'International Soviet Republic' ( আন্তর্জাতিক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র ) ও Socialist Commonwealth একই জিনিস এটা মনে রাখা দরকার।

স্তালিনবাদীদের দৃষ্টিতে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক তাহলে শুধু আকৃতি বা কাঠামো-সর্বস্ব? কাঠামো বাতিল করতে গিয়ে মূল অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও আদর্শের মূলে কুঠারঘাত করা হল না কি? তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কাঠামো যখন বাতিল ( Dissolution ) করা হল তখন লেনিন-কল্পিত এবং কমিণ্টার্ণের, প্রথম কংগ্রেস কর্তৃক প্রস্তাবিত 'আন্তর্জাতিক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র' ( সোস্যালিস্ট কমনওয়েল্থ্ ) প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পকে কি চিরতরে মুলতবী রাখা হল? যে-কেন্দ্রীকরণের নীতি ( Centralisation ) কমিণ্টার্ণের শুরুতেই নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছিল তা কি কমিউনিস্টরা কোন দেশে বর্জন করেছেন? রাশিয়াতে বিশ্ব-রাজনীতির সন্দেহাতীত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেও? পূর্ব-ইউরোপের যে সব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানবতাবাদ ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নীতিকে সমাজতন্ত্রের অন্যতম মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সোভিয়েট রাশিয়া কি তা প্রতিহত করতে উদ্যত হয়নি?

যে কেন্দ্রীভূত অপ্রয়োজনীয় কাঠামোর ( form ) কথা কমিণ্টার্ণ ভেঙে দেবার সময় বলা হয়েছিল সেই প্রশ্ন নিয়ে কমিণ্টার্ণের প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী রোজা লুক্সেম্বুর্গ নীতিগত আপত্তি তুলে লেনিনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। রোজা লুক্সেম্বুর্গ-এর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। লেনিন বা তাঁর কোন অনুগামীই লুক্সেম্বুর্গের যুক্তি খণ্ডন করতে পারেননি। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে সেই বিশ্ব-পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ( কমিণ্টার্ণ ) প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে তিনি বলেন: "যতদিন পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে সমাজতন্ত্রীদের গণদল ( mass party ) গড়ে না উঠছে ততদিন পর্যন্ত এই ধরনের সংস্থা স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হবে না।" তিনি বিশেষ জোর দিয়েই গণদলের সমর্থনের ভিত্তির ওপরই এইরূপ আন্তর্জাতিক সংস্থার সার্থকতার কথা বলেছিলেন। এ ব্যাপারে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির পল লেভি, লিও জোগিচেস, ইউজেন লেভাইন ( Poul Levi, Leo Jogiches, Eugen Leuine, ) রোজা লুক্সেম্বুর্গের সঙ্গে এ বিষয়ে এক মতই পোষণ করতেন। রোজা লুক্সেম্বুর্গ লেনিনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করার জন্য প্রথম প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে ( ১৯১৯ ) যোগদানকারী দু'জন জার্মান প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন ( Levine ও Higo Eberlein )

আমলাতান্ত্রিক ডিক্টেটরশিপের বিরুদ্ধে বরাবরই ছিলেন লুক্সেম্বুর্গ। "The issue of Lenin vs. Rosa Luxemburg was one of centralized dictatorship of a small group over the rest in the State Party and International as against democracy." [ The Communist International—F Borkenau, P. 88. ]

১৯১৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি লুক্সেম্বুর্গ ও কার্ল লিব্‌নীখ্‌ট্‌কে জার্মানীতে গুলি করে হত্যা করা হয় ব্যর্থ বিপ্লবের সময়। 'আন্তর্জাতিকের' প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে লেভাইন যোগদানের পূর্বে গ্রেপ্তার হন জার্মান-সীমান্তে। এবারলীন সম্মেলনে যোগ দেন, তবে ভোটদানে বিরত থাকেন। তবে তিনি প্রস্তাবের বিপক্ষে মত ব্যক্ত করে বলেন পশ্চিম ইউরোপের সকল দেশে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টির কোন অস্তিত্বই নেই। রোজা লুক্সেমবুর্গের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তিনি বুঝেছিলেন জনসমর্থন-ভিত্তিক কমিউনিস্ট বা সোস্যালিস্ট দল সর্বত্র গড়ে না উঠলে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' রুশ কমিউনিস্ট পার্টির ক্রীড়নক হয়ে পড়বে। তখন ইউরোপে বলশেভিক পার্টি ছাড়া আর কোথাও তেমন শক্তিশালী দল ছিল না—জার্মানী, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়ায় ছাড়া। রোজা লুক্সেম্বুর্গ স্পষ্ট বুঝেছিলেন এই অবস্থায় 'কমিণ্টার্ণ' প্রতিষ্ঠিত হলে তার সিদ্ধান্তগুলি নেবার এক্তিয়ার রাশিয়ার একচেটিয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এর পরই তাঁর এই গভীর আশঙ্কাকে সর্বৈব সত্য প্রমাণিত করল জিনোভিয়েভের এক উক্তি। তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন :

"Ideological hegemony in the Third International belongs unconditionally to the Russian Communist Party." তিনি আরও বললেন, "Ideological leadership of......world revolutions must belong to the Russian Communist Party." অর্থাৎ 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের' ভিতর আদর্শগত নেতৃত্ব নিঃসন্দেহে ও নিঃসর্তে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির উপর বর্তাবে। জিনোভিয়েভ যেটা বলেছিলেন প্রথম কংগ্রেসে যোগদান-কারী প্রতিনিধিরা সেটা ধরেই নিয়েছিলেন। 'তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের' অস্তিত্বের শেষদিন পর্যন্ত মতবাদ ও মতবাদ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মস্কোর বক্তব্য ও কর্তৃত্ব ছিল চরম। রুশ কমিউনিস্ট পার্টি ও রুশ জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ পরিপূরণ সংরক্ষণ ও বিস্তারেরই হাতিয়াররূপে কমিণ্টার্ণ কাজ করেছে। 'কমিণ্টার্ণ'-প্রতিষ্ঠা যেমন তাড়াতাড়ি করে হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবেই তাকে ভেঙে দেওয়া হল। প্রতিষ্ঠার সময় লেনিন কোনরকম পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাও করেননি।

নিজের খুশিমত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। স্তালিনও নিজের খুশিমত ভেঙে দিলেন। কমিণ্টার্ণ ভেঙে দেবার রুশ সিদ্ধান্ত পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে দিল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন রুশ নির্দেশেই সন্দেহাতীত ও নিঃসর্তভাবে পরিচালিত হবে। অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট দল ও ক্যাডারদের এ ব্যাপারে কোনই ভূমিকা নেই। সোভিয়েট রাশিয়ার সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ অবশ্যমান্য ও গ্রাহ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পরও দেখা গেছে যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া ও চীন ব্যতিরেকে পৃথিবীর সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিই মস্কোর উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কমিণ্টার্ণ ভেঙে দেবার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কারণ হিসাবে 'জাতীয় শ্রমিক দলগুলিকে' (National Workers' Parties) স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এটাই যদি সত্যিকারের অন্তরের কথা হয় তাহলে যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া ও চীন স্বাধীনভাবে চলতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হল কেন? শক্তিশালী স্বাধীন স্বতন্ত্র কমিউনিস্ট চীনের অভ্যুত্থানে রাশিয়ার তো তাহলে খুশি হওয়াই উচিত। [শুধু তাই নয় এতদিন রুশ-বিপ্লবকে ইতিহাসের সর্ববৃহৎ 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' এবং চীনের বিপ্লবকে 'দ্বিতীয় বৃহত্তম বিপ্লব' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এবার যে নতুন সংশোধিত ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে তাতে চীনা বিপ্লবের কোন উল্লেখ নেই। কেন?] ["Moscow: A new edition of the official edition of the Soviet Communist Party demotes the Chinese revolution from second place in the history of the world revolutionary movement. This was the position which Soviet historians accorded it after their own Bolshevik uprising of 1917. The fourth edition of the party history recently published omits a sentence in the previous edition which reads: In its importance and influence on the destinies of humanity the Chinese revolution occupies a second place after the October Revolution in the history of the world liberation movement." Moscow, Oct. 6, 1952.] [See, Statesman, Oct. 7. 1952.]

রুশ নিয়ন্ত্রণ-নিরপেক্ষ চীনের বিপ্লব ও শক্তিশালী চীনা জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যুত্থান রাশিয়ার মনঃপূত নয়। তাহলে বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না যে, কমিণ্টার্ণ ভেঙে দেবার সময় যে যুক্তি দেখান হয়েছিল সেটা আসল

যুক্তি বা কারণ নয়। শক্তিশালী জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি রাশিয়া বা চীন কেউই চায় না।

কমিণ্টার্ণ যখন এভাবে ভেঙে দেওয়া হল তখন কোন প্রতিবাদ হল না পৃথিবীর কোন কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে অথবা তাদের পাকা-পোক্ত ক্যাডার বা নেতাদের কাছ থেকে। এও এক অদ্ভুত ব্যাপার। কমিউনিস্টরা 'সাচ্চা' গণতন্ত্রের ছাড়পত্র নিয়ে দুনিয়ার মানবজাতির পরিত্রাণকল্পে অবতীর্ণ হয়েছেন বলে থাকেন। কিন্তু এই চরম অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন টু-শব্দও হল না কেন? একজন রুশপন্থী বা চীনপন্থী কমিউনিস্ট বিশ্বাস করেন সর্বপরিস্থিতিতে রাশিয়া বা চীনের নিঃসর্ত সমর্থন (unconditional support) তাঁর প্রধান ধর্ম ও কর্তব্য। প্রকৃত 'সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার' যাচাই করার কষ্টিপাথর হল এই ধরনের মগজ-ধোলাই-করা মানসিকতা। পি. ভিসিনসকির একটা উক্তি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

"At present the only determining criterion of revolutionary proletarian internationalism is: are you for or against the U S.S.R., the motherland of the world proletariat? An internationalist is one who verbally recognises international solidarity or sympathises with it. A real internationalist is one who brings his sympathy and recognition up to the point of practical and maximum help to the U S.S.R. in support and defence of the U.S.S.R. by every means and in every possible form .....The defence of the U.S.S.R. as of the socialist motherland of the world proletriat is the only duty of every honest man everywhere and not only of the citizens of the U.S.S R." [ Vyshinsky: "Communism and the Motherland" (Questions of Philosophy) No. 2. 1948. ]

অর্থাৎ, 'বর্তমানে বৈপ্লবিক সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের বিচারের একমাত্র নিরিখ হল এই: আপনি—যে-সোভিয়েট রাশিয়া বিশ্বের সর্বহারা-শ্রেণীর মাতৃভূমি তার পক্ষে, না বিপক্ষে? আন্তর্জাতিকতাবাদী তিনিই, যিনি মনে মনে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের প্রতি সত্যি আস্থাবান। প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী কিন্তু তিনিই, যিনি সোভিয়েট রাশিয়াকে সর্বপ্রকারে সর্বতোভাবে সর্বাধিক সাহায্য—প্রত্যক্ষ ও বাস্তব সাহায্য—করার জন্য শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়াচ্ছে

সক্ষম। বিশ্বের সর্বহারা-শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমিরূপে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ও তাকে সেই কাজে সাহায্য করা পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের প্রতিটি সৎ মানুষের একমাত্র কর্তব্য, সোভিয়েট নাগরিকদের তো বটেই।' নাৎসী-নেতা হিটলারও জার্মানদের উদ্দেশ্য করে এ ধরনের জাতীয়তাবাদী উৎকট উদ্গীরণ করতেন কিনা জানা নেই।

প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী যিনি হবেন তিনি তাঁর নিজের দেশের ও জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির জন্য (রাশিয়া) সবকিছু পণ করবেন! ঘটনাচক্রে সোভিয়েট রাশিয়াতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল বলে সোভিয়েট রাশিয়াকে বিশ্বের সকল দেশের সৎ কমিউনিস্টদের একমাত্র কর্তব্য হবে 'মাতৃভূমি' জ্ঞান করে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করা। অথচ সোভিয়েট রাশিয়ার জনগণ অন্য কোন দেশকে সেই আবেগ, অনুরাগ, শ্রদ্ধা দেখাবে না! এ এক অদ্ভুত অযৌক্তিক অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব, যা দেশাত্মঘাতী রাজনীতির উর্বর ক্ষেত্ররূপে কাজ করে থাকে যুগে যুগে।

'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক'কে ভেঙে দিলে রাশিয়ার সুবিধা। কেননা, বুর্জোয়া রাষ্ট্রনেতাদের, যুদ্ধকালীন মিত্র সাম্রাজ্যবাদীদের সন্দেহের নিরসন হবে রাশিয়ার বিশ্ববিপ্লব-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে, প্রতিরক্ষার কাজে সক্রিয় ও সর্বাধিক প্রত্যক্ষ বাস্তবগ্রাহ্য সাহায্য করা হবে। অতএব 'কমিণ্টার্ণের' কার্যকরী সমিতির (ECCI) সিদ্ধান্ত বিনা দ্বিধায় নিঃসর্তে স্বীকার করে নেওয়াই প্রত্যেক কমিউনিস্টের কর্তব্য! যিনি অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমস্যার বিচার করবেন, জিজ্ঞাসা করবেন, সংশয় প্রকাশ করবেন তিনি 'প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী' হতে পারেন না। তাই কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার সম্মুখীন রাশিয়ার নেতাদের হতে হয়নি কমিউনিস্ট দুনিয়া থেকে।

স্তালিনও এক সময় বলেছিলেন:

"A revolutionary is he who without arguments unconditionally, openly and honestly, without secret military consultations is ready to protect and defend the U.S.S.R. since the U.S.S.R. is the first proletarian revolutionary state in the world that is building socialism. An internationalist is he who unreservedly without hesitation, without conditions is prepared to defend the U.S.S.R. because the U.S.S.R. is the base of the world revolutionary movement and to defend, to

advance this movement is impossible without defending the U.S.S.R. Since he who thinks to defend the world revolutionary movement apart from and against the U.S.S.R. is going against the revolution and is necessarily slipping down into the camp of the enemies of the revolution [ Stalin, Works, 1949, Vol. 10, P. 51. ]

প্রকৃত বিপ্লবীর সংজ্ঞা দিলেন স্তালিন :

"বিপ্লবী তিনিই হবেন যিনি কোনরূপ তর্ক প্রশ্ন উত্থাপন না করেই বিনাসর্তে প্রকাশ্যে এবং সততার সঙ্গে কোনরূপ গোপন সামরিক শক্তির পরামর্শ না করেই রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষার জন্য তার পক্ষ অবলম্বন করতে এগিয়ে আসবেন। যেহেতু সোভিয়েট রাশিয়াই পৃথিবীর প্রথম সর্বহারাদের বিপ্লবী শ্রেণী-রাষ্ট্র এবং যেহেতু এই দেশই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে হাত লাগিয়েছে সেই হেতুই এইরূপ নিঃসর্ত সমর্থন অবশ্য কর্তব্য। আন্তর্জাতিকতাবাদী হলেন তিনিই, যিনি পরিপূর্ণভাবে বিনা দ্বিধায় অকপটে নিঃসর্তে সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন। কেননা, রাশিয়াই হচ্ছে বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের মূল ঘাঁটি। বিশ্ব-বিপ্লব আন্দোলনকে রক্ষা করতে গেলে অথবা সেই লক্ষ্যের পথে এগুতে গেলে—সোভিয়েট রাশিয়াকে সর্বতোভাবে সমর্থন করতেই হবে। যারা সোভিয়েট রাশিয়াকে বাদ দিয়ে সেই বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার কথা ভাবে তারা আসলে বিপ্লবী আদর্শের শত্রুর শিবিরভুক্তই হয়ে পড়ে। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে অথবা রাশিয়ার সম্বন্ধে উদাসীন থাকার অর্থই বিপ্লবের বিরোধিতা করা।"

এ হল স্তালিন-ভাষ্য। হাঙ্গেরীর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাকোসি স্তালিনের এই উক্তি উদ্ধৃত করে এক বিবৃতি দিলেন স্তালিনের [illegible] পরই। স্তালিন পরলোকগমন করেন ১৯৫৩ সালে ৫ই মার্চ। সেই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট নেতারা মস্কোর প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিলেন। এইসব দেশগুলিই নাকি কমিণ্টার্ণের সাংগঠনিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের ব্যাপারটিকে 'জাতীয় শ্রমিক দল' স্বাধীনভাবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে ওঠার পথে বাধা স্বরূপ মনে করেই 'কমিণ্টার্ণ' ভেঙে দিয়ে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে 'মুক্তি' দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। আর সেজন্যেই নাকি 'কমিণ্টার্ণ' ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।

রাকোসি ১২ই মার্চ তারিখের প্রাভ্‌দা-র সংখ্যায় তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন করতে গিয়ে স্তালিনের এই উক্তিটির পুনরুল্লেখ করেন। যদি কমিণ্টার্ণ ভেঙে দেবার এই যুক্তিটি ঠিকই হত তাহলে রাশিয়ার প্রতি এই অন্ধ আনুগত্য ( unconditional obedience ) দাবী করবার কি কোন যুক্তি বা নৈতিকতা আদৌ থাকতে পারে? আসলে 'কমিণ্টার্ণ' ভেঙে দেওয়াটাও ছিল একটা বড় রকমের কূটনীতি। সেই কূটনীতির যূপকাষ্ঠে বিপ্লব ও আদর্শবাদকে বলি দেওয়া হয়েছে। ইউরোপে 'দ্বিতীয় রণাঙ্গন' মিত্রপক্ষ না খুললেই নয়। রাশিয়ার সদিচ্ছা ও সততার প্রমাণ ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির ঝুনো নেতাদের কাছে দিতেই হবে যে!

চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হতে হবে, নিরাপত্তা পরিষদের সভ্য হতে হবে। তার জন্য এশিয়ার বিপ্লব বিস্তারের কাজ মুলতুবী রাখতে হবে বৈকি! 'চেয়্যারম্যানের চীনে'র পাশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসে দাঁড়াবে বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। সে তো এক কূটনীতির রাজনীতি,—জাতীয় রাষ্ট্রস্বার্থ সংরক্ষণ পরিবর্ধনের রাজনীতিরই কূটনীতি। এ নিয়ে রাশিয়ারও 'গেল গেল' করার কিছু নেই, এশিয়ার কোন রাষ্ট্রেরও নেই। রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহাবস্থানের ও শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার কথা বললে, চুক্তি করলে নীতিহীনতা হবে না, আর চীন করলেই তা হবে? ভারতবর্ষও তার স্বার্থে ইন্দ-সোভিয়েট অনাক্রমণ চুক্তি করলে ঐ ধরনের চুক্তি সম্পাদন করার যুক্তিতেই কেন সে সোভিয়েট রাশিয়ার 'উপনিবেশ' বা 'তাঁবেদার রাষ্ট্র' হয়ে যাবে? চীন পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তি করতে পারবে, আর ভারতবর্ষ নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে না? ১৯৪২ সালের ইঙ্গ-সোভিয়েট অথবা 'সোভিয়েট-মার্কিন ঋণ ইজারা চুক্তির' ফলে রাশিয়া কি ইংরেজ বা আমেরিকার 'কলোনী' বনেছিল, না ইংরেজ আমেরিকা 'সমাজতন্ত্রী' বনে গিয়েছিল? কূটনীতিকে যেন [illegible] হিসাবেই দেখার চেষ্টা হয়।

কমিণ্টার্ণ ভেঙে দেবার অন্যতম কারণ স্বরূপ বলা হল যে, 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের' প্রতিষ্ঠার পর প্রায় ২৫ বছর কেটে গেছে—এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন অনেক সুদৃঢ় ও পরিপক্ব; এখন আর কেন্দ্রীকরণ-নীতির ( centralisation ) বশীভূত একটি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সংস্থার মাধ্যমে ( as main centre ) বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালনার প্রয়োজন নেই। এই যুক্তির সারবত্তা যাচাই করে দেখার জন্য অতীতের দিকে একবার ফিরে

তাকানো যাক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর 'সারা বিশ্বে সর্বহারা-শ্রেণীর বিপ্লব আসন্ন' এ তো লেনিনেরই ধারণা ছিল। জার্মানী হাঙ্গেরী চেকোস্লোভাকিয়া অস্ট্রিয়া পোল্যাণ্ড বুলগেরিয়া ইতালী ফ্রান্স ইংলণ্ড—ইউরোপের ৭।৮টি দেশে বিপ্লবের পদধ্বনি নাকি শোনা গিয়েছিল। লেনিন তো নিজেই বলেছিলেন, আন্তর্জাতিক বিপ্লব আসন্ন :

"When we came to power in October, we were nothing more than a single spark in Europe. To be sure, the spark multiplied and those sparks emanated from us……But what we now see is a conflagration that has spread to so many countries : America, Germany, England. We know that after Bulgaria the revolution spread to Serbia. We know how these workers' peasants' revolutions passed through Austria and reached Germany. The conflagration of workers' revolution has overtaken a number of countries…we were never so close to an international proletarian revolution as at this very moment."

[ Lenin : Speech made at the 6th All-Russian Congress of Soviets, November 8, 1918. ]

সাংগঠনিক প্রস্তুতি তো অনেক দূর এগিয়েই গিয়েছিল। তাহলে তখনই বা এই অতি-কেন্দ্রীকরণ নীতির প্রয়োজন কি ছিল ? দলের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের নীতি তো লেনিনই প্রবর্তন করেছিলেন। পরবর্তীকালে চরম আমলাতন্ত্র ( বুরোক্র্যাসী ) ও অতি-কেন্দ্রীকরণ রাশিয়ার বিপ্লবী আদর্শকে গ্রাস করল। সমস্ত দোষ স্তালিনের ওপর চাপান হয়েছে—সেটা অযৌক্তিক। লেনিন [illegible]কা-ই এর জন্য নীতিগতভাবে—তত্ত্বগতভাবে দায়ী ছিলেন। রোজা লুক্সেমবুর্গ তো লেনিনের 'কেন্দ্রীকরণের নীতি' ও পেশাদারী বিপ্লবীদের' দিয়ে বিপ্লব ও দলের কাজ পরিচালনার নীতিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিলেন। রোজা লুক্সেমবুর্গের আশঙ্কা বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

তাহলে, যখন বিপ্লব-পরিস্থিতি এত অনুকূল এবং ইউরোপের অনেকগুলি দেশ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত তখন কমিন্টার্ণের মধ্যে লেনিন লৌহকঠিন শৃঙ্খলার নামে অতিমাত্রায় কেন্দ্রীকরণের নীতির জন্য কেনই বা চাপ দিয়েছিলেন ? 'কমিণ্টার্ণের' অন্তর্ভুক্ত হবার সর্ত হিসাবে লেনিনই ২১-দফা সর্তের প্রস্তাব

করেছিলেন [Twenty one-conditions of affiliation to the Comintern.]। আর এই ২১-দফা সর্ত চাপিয়ে দেবার ফলে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ও বামপন্থী আন্দোলনে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। তাহলে কমিউনিস্ট দলগুলি স্বয়ংনির্ভরশীল হয়ে ও আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবার জন্য কমিণ্টার্ণ ভেঙে দেবার কাহিনী নিছক আষাঢ়ে গল্প। লেনিনের ২১-দফা সর্তের ভূয়সী প্রশংসা করে জিনোভিয়েভ ঘোষণা করেছিলেন এই প্রস্তাব 'দ্বিতীয়' 'কমিউনিস্ট ইস্তাহারের' সঙ্গে তুলনীয়।

কমিণ্টার্ণের সদস্যভুক্ত কোন 'জাতীয় বিপ্লবী দলকেই' (কমিউনিস্ট) লেনিন কোনরকম 'স্বাতন্ত্র্য' ও 'স্বাধীনতা' ভোগ করার অধিকার দিতে রাজী হননি। এ ব্যাপারে তাঁর মনোভাব ছিল অত্যন্ত অনমনীয়। একটা দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে লেনিনের মনোভাব বোঝবার জন্য। ১৯২০ সালের ৩০শে জুলাই কমিণ্টার্ণের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে লেনিনের ২১-দফা সর্ত সম্পর্কিত প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ইতালীর সোস্যালিস্ট পার্টির প্রতিনিধি সেরাতি (Serati) ইতালীর সমাজতান্ত্রিক দলকে কিছুটা স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"Esteemed comrades, leave the Italian Socialist Party the possibility of choosing the appropriate moment to purge its own rank. We all assure you and I don't believe that any one can say we have ever broken our word—that the purge will be thorough but please leave us the possibility of carrying it out in a way that will be helpful to the masses of the workers, to the party and to the revolution that we are preparing in Italy."

অর্থাৎ 'শ্রদ্ধেয় কমরেডগণ! ইতালীর সোস্যালিস্ট পার্টি থেকে প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদীদের (মেনশেভিকদের) ছেঁটিয়ে বিদায় করা হবে, নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে আমার আবেদন, ঠিক কোন সময় তাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হবে শুধুমাত্র সেই সময়—নির্বাচনের সীমাবদ্ধ ক্ষমতাটুকু সম্মেলন থেকে আপনারা আমাদের পার্টিকে দিন।

আমরা আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—আর কথা দিয়ে কথা ভঙ্গ এমন কথা আমাদের ইতালীর সোস্যালিস্ট পার্টি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোনদিন কেউই বলতে পারবেন না—ব্যাপকভাবে এই বিতাড়নের (পার্জ) কাজ সুরু করা হবে। কিন্তু

সেই কাজটুকু আমাদের এমনভাবে করার সুযোগ দিন যাতে সেটা জনগণের, পার্টির ও আসন্ন বিপ্লবের সহায়ক হয়।'

সেরাতির এই বক্তৃতার নিন্দা করে লেনিন সেই কংগ্রেসে বলেছিলেন: সেরাতির বক্তব্য 'সম্পূর্ণ ভ্রান্ত' ('Utterly wrong')। [See, False Speeches About Freedom'—Lenin: Selected Works, Vol. X, P. 255.]

লেনিনের মন্ত্রশিষ্য স্তালিন কি সাচ্চা গণতন্ত্রী বনে গিয়ে লেনিনের নীতি বিসর্জন দিয়ে কমিণ্টার্ণ ভেঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন? লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিন তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্বাহ্ণে সর্বসাধারণের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন:

"In leaving us comrade Lenin enjoined on us fidelity to the Communist International. We swear to thee, comrade Lenin, to devote our lives to the enlargement and strengthening of the union of the workers of the world, the Communist International" (Stalin)

অর্থাৎ:

'কমরেড লেনিন আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু তিনি আমাদের কমিউনিস্ট অন্তর্জাতিকের প্রতি আনুগাত্য অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন। কমরেড লেনিন, আপনাকে সামনে রেখে শপথ নিচ্ছি, এই কমিউনিস্ট আন্তার্জাতিককে আরও শক্তিশালী ও পরিব্যাপ্ত করার কাজে মন-প্রাণ উৎসর্গ করব বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য সাধনে।'

লেনিনের মরদেহকে সাক্ষী রেখে তাঁর শিষ্য স্তালিন যে গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রতিশ্রুতি বিশ্ববাসীদের তথা দুনিয়ার কমিউনিস্টদের শোনালেন সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে তো তাঁর [illegible]? লেনিন সমস্ত জীবন তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্বের মধ্য দিয়ে অন্যতম একটি তত্ত্ব মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট করতে নিরলসভাবে চেষ্টা করেছিলেন। সেটি হল: জীবনে 'শৃঙ্খলার' (Iron-discipline) স্থান 'সত্যের' ওপরে বিবেকের আহ্বানের ওপরে। কিন্তু ব্যক্তির জীবনে নিজের মাতৃভূমির প্রতি, জাতির প্রতি কর্তব্যের আহ্বান কি উপেক্ষণীয়? এমন বিবেকসম্পন্ন মানুষ কে আছেন যিনি সেই কর্তব্যের আহ্বানে মন ফিরিয়ে থাকতে পারেন? লেনিন যত বড় বড় বিপ্লবী তত্ত্বকথা জ্বালাময়ী ভাষায় বিভিন্ন ভাষণে ও রচনায় ব্যক্ত করে থাকুন না কেন নিজের জাতি ও দেশের প্রতি

কর্তব্যের আহ্বানে একজন নৈষ্ঠিক জাতীয়তাবাদীরূপে সাড়া না দিয়ে তিনি কি থাকতে পেরেছিলেন? ১৯১৮ সালের চরম অপমানজনক ব্রেস্ট্‌লিটভ্‌স্ক চুক্তিতে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে কি সামিল করেননি? বিশ্ব-বিপ্লবের স্বার্থে আদৌ নয়—নিজের দেশের 'সফল বিপ্লবকে' বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থেই তিনি দলের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিরুদ্ধেই এই চুক্তিতে আবদ্ধ হবার যৌক্তিকতা সমর্থন করেছিলেন। দেশপ্রম তো একটি মহৎ 'সত্য' ও 'প্রমূল্য' ( value )। তাঁর নীরস 'শৃঙ্খলার' প্রাধান্য-তত্ত্ব স্রোতের তোড়ে ভেসে গেছে। লেনিনের চাইতেও বড় লেনিনবাদীদের কাছে সেটা কবুল হবে না। কিন্তু ইতিহাসকে তো ফাঁকি দেওয়া যায় না। সহজ সত্য কথাটা বড় গলায় হাটের মাঝে বলতে বাধা কোথায়? বাধা মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক জড়বাদের সুবিধাবাদী দ্বৈত নৈতিকতা বোধ ( double standard of morality )। স্তালিনকে এক চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্য দেশের প্রতি কর্তব্যের আহ্বানে একজন পাকা জাতীয়তাবাদীর ভূমিকা নিতে গিয়েও দ্বৈত নৈতিক আচরণের আশ্রয় নিতে হল। কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে 'কমিণ্টার্ণকে' ভেঙে দিতে হল নানা আষাঢ়ে গল্প শুনিয়ে। কাজটা এমনভাবে করার চেষ্টা হল যাতে মহান স্তালিনের হাতে বিশ্ব-বিপ্লবের অপমৃত্যু ঘটেছে একথা অন্যান্য দেশের—এমন কি নিজের দেশের কমিউনিস্টরাও—বলতে না পারেন।

গোপনীয়তা ( secrecy ) 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের' ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যেমন এই সংস্থা তার আসল উদ্দেশ্য ও ভূমিকা তার শত্রুর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিল—তেমনি তার সংশ্লিষ্ট অন্তর্ভুক্ত সহযোগী দল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে জানতে দেয়নি তার আসল উদ্দেশ্য ও মতলব। ভাসমান হিমশৈলের জলের ওপরে জেগে থাকা ক্ষুদ্র অংশটি থেকে যেমন বোঝা যায় না দৃশ্যমান বহির্ভাগের তলদেশের কত গভীরে তার অদৃশ্য বিরাট অংশটা পরিব্যাপ্ত তেমনি বাইরের কাজ দিয়ে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের' আসল মতলব ও ভূমিকার সম্যক উপলব্ধি অসম্ভব। মস্কো বা পিকিং-এর স্বার্থে লেনিনবাদ-স্তালিনবাদের আঁকা-বাঁকা কূটনীতির সর্পিল পথে চলতে গিয়ে মস্কো অথবা পিকিং-কে সকলপ্রকার সন্দেহ দোষত্রুটির উর্ধ্বে অবস্থিত—অভ্রান্ত, নিষ্পাপ, বিশ্ব শান্তি ও মুক্তির একমাত্র শক্তিরূপে দেখতে শেখার ও উদ্বুদ্ধ হবার অবৈজ্ঞানিক মানসিকতা অন্য দেশের কমিউনিস্ট ও মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদীর আদর্শবাদের ও উৎসর্গীকৃত মনের অমূল্য সঞ্চয় নিঃশেষে মুছে দিয়ে থাকে,—বিভিন্ন দেশের মার্কস্‌বাদী বিপ্লবীরা মস্কো পিকিং-এর রাজনৈতিক দাবা বোর্ডের খেলার ঘুঁটিতে রূপান্তরিত হয়ে যান।

"The Bolshevik legacy included the dual secret apparatus —one branch concealed from the eyes of the enemy, the other from most of the Comintern's sections." [ The Revolutionary Internationals, 1864-1943 : Edited by Milorad M. Drachkovitch, P. 197. ]

কিন্তু মিথ্যার কালো মেঘ, কূটনীতির কুয়াশা কি চিরদিন সত্য-রূপ সূর্যকে আড়াল করে সত্য-সন্ধানীদের আলোর পিপাসা রোধ করতে পারে ?

---